রুণু
গুহ নিয়োগী
সাদা
আমি
কালো
আমি

রুণু গুহ নিয়োগী

সাদা আমি কালো আমি

(প্রথম খণ্ড)

জিনিয়া পাবলিশার্স
৭৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯
দূরভাষ : ২৪১৯১৮১, ২৪৮৩০৬৬

প্রকাশক :
জিনিয়া পাবলিশার্স
৭৮, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯
প্রথম প্রকাশ: ১৩৬৬
প্রচ্ছদ : তড়িৎ চৌধুরী
লেজার টাইপ সেটিং:
ক্রেস্ট গ্রাফিক্স
২, চার্চ লেন
কলকাতা ৭০০০০১
মুদ্রক :
শীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, রেভারেণ্ড কালী ব্যানার্জি রো
কলকাতা ৭০০০০৬

যে সব সহকর্মী
হত্যাকারীর হাতে
অকালে জীবন হারিয়েছেন
তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে
আমার এই ক্ষুদ্র অঞ্জলি !

ক'টি কথা

জীবন বড় বিচিত্র। আর বিচিত্রের মধ্যেই পাওয়া যায় বেঁচে থাকার রসদ। জীবনে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি কলম ধরে কাহিনী লিখব। অথচ বিচিত্র জীবনের গতির বাঁকে এসে আমাকে তাই-ই ধরতে হল। যাঁদের জন্য আমি এই প্রেরণা পেলাম তাঁদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ!

কারা তাঁরা? '৯৬-এর জানুয়ারিতে কলকাতার এক নতুন বাংলা দৈনিক পত্রিকার তরফ থেকে আমাকে অনুরোধ করা হল আমার কর্মজীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা প্রতি রবিবার ধারাবাহিকভাবে তাঁদের পত্রিকায় লিখতে। আমি রাজি হলাম। অল্প কটা সংখ্যায় লেখা বার হতেই এক বিশেষ রাজনীতির সমর্থক গুটিকয় ছেলেমেয়ে সেই পত্রিকার অফিস হামলা করল যাতে আমার লেখা ছাপা না হয়। পত্রিকাটিও সেই "জনমতের" রায় শিরোধার্য করে আমার লেখা ছাপা বন্ধ করে দিল। "জনমতের" এই অসাধারণ ব্যাখ্যা প্লুটো, অ্যারিস্টটল থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত ঘেঁটেও আমি পাইনি। তিরানব্বই কোটি মানুষের প্রতিনিধি কি ওই পঁচিশ-তিরিশ জন ছেলেমেয়ে?

তখন থেকে বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে চাপ দিতে শুরু করল বই প্রকাশ করতে। আমি হার মানলাম। কিন্তু এ তো একটা সাধনা। যে সাধনা আমি কোনদিনও করিনি। তবে? বন্ধুরাই যোগাল মনোবল, তাঁদের ইচ্ছাশক্তির জোরে শুরু করলাম ঝড়। কারণ তারা ততদিনে ঠিক করে ফেলেছে কবে হবে প্রকাশ। সময় বাকি মাত্র চারমাস।

প্রথমেই দেখা দিল সমস্যা, হাজারও মুখ ও ঘটনা সামনে এসে দাঁড়াল। কোনটা আগে লিখি, কোনটা পরে? তখন সব সরিয়ে, লিখতে লিখতে যেটা যখন সামনে এসেছে সেটাই লিখেছি, তাই, লেখায় সময়ের কোনও ক্রমানুযায়ী ধারাবাহিকতা নেই।

আবার বাধা ভাবলাম যে সব ঘটনার কথা লিখছি তাতে যারা জড়িত ছিল, তাদের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত, তাই তাদের সত্যিকারের নামগুলো কি প্রকাশ করব? তাদের অনেকেই এখন সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। তখন ঠিক করলাম কিছু নাম গোপন করব, কিছু দেব উল্টো, কিছু সত্যি। প্রয়োজন মত।

কুৎসা বা ব্যক্তিগত আক্রমণ আমার লেখার উদ্দেশ্য নয়, তবু যদি কেউ আমার লেখায় আঘাত পান, তবে সেটা আমার দুর্ভাগ্য। সে জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এক খন্ডে এত ঘটনা লেখা সম্ভব ছিল না, তাই ভাগ করে নিয়েছি। আগামী খন্ডেও থাকবে আরও নানা সব জ্বলন্ত ঘটনার কথা। এখানে যা আছে তা আংশিক, এমন কি রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর কথাও আছে আংশিক।

জানি না আমার সাধনা সার্থক হয়েছে কিনা। তা বলবেন আপনারা। আমি শুধু অকপটে বলে গেছি সত্য ঘটনা। এবং আগামীদিনেও তাই বলব।

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব কোণের এক ছোট্ট সুন্দর সাজান শহরের এক বাড়িতে খুব ছোট্ট একটা ছেলে মায়ের কোল ঘেঁষে ঘুমত আর স্বপ্ন দেখত টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলে যাবে কোনও এক কিন্নর-কিন্নরী আর পরীদের দেশে, সেখানে তাদের সাথে সারাদিন খেলবে, হাসবে, নাচবে। তারপর ক্লান্ত শরীর নিয়ে পাখিদের গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে, আবার তাদেরই ঘুম-জাগানিয়া কলরবে

জেগে উঠে ছুটিয়ে দেবে ঘোড়া খোলা প্রান্তরে। ঘোড়ার খুরের শব্দে ছোট্ট ছেলেটা ভোরবেলায় জেগে উঠত। ততক্ষণে মদনমোহন মন্দিরের নহবতখানায় বেনারসী ওস্তাদ সানাইবাদক আহির ভৈরব কিংবা ভাটিয়ার ললিতরাগের মূর্ছনা ভোরের বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে সবার মনে। সেই সুরের আবেগের সাথে, ঘোড়ার খুরের শব্দের টানে ছেলেটা মায়ের কোলের উষ্ণতা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যেত বাড়ি থেকে মহারাজের ভোরের ঘোড়া ছোটান দেখতে। সেই সুন্দর শহরের মধ্যে আরও সুন্দর রাজপ্রাসাদের চারধারে সোজা লম্বা লম্বা লাল সুরকির রাস্তায় রোজ ভোরে মহারাজ ঘোড়া ছুটিয়ে দেখতেন তাঁর শহরে কোথাও ময়লা নেই তো? যৌবনের অহংকার ভরা ঘোড়ার ছোটার ভঙ্গিমা দেখে ছোট্ট ছেলেটার উত্তেজনা বেড়েই যেত। শুধু সে নয়, তার মত আরও অনেক ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা মহারাজের ঘোড়া ছোটানর মত্ত মুহূর্তের সাক্ষী হতে আসত আর নিজেদের রঙিন স্বপ্নের ঘোড়াগুলোর মত্ততা ততই বাড়ত। এরা সবাই বন্ধু ছিল। ভোরের আলো একটু পরিষ্কার হলেই তারা ছুটে ফিরে যেত যে যার বাড়ি। তারপর বাড়ি মাথায় করে চেঁচিয়ে তারা স্কুলের পড়া পড়ত। পড়া শেষ হলে পুকুর আর দীঘির জল উথাল-পাথাল করে ছুটত সবাই স্কুলে। স্কুলের ক্লাস শেষ করে ফুটবল নিয়ে নামত তারা মাঠ দাপাতে। তাদের স্কুলের ভেতর ছিল অনেকগুলো ফুটবল দল। কোচবিহারের মহারাজাদের নামে ছিল তাদের নাম। ওই সময়কার যিনি মহারাজ তিনি ফুটবলে দারুণ উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজেই স্কুলের আর শহরের ফুটবলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার ফলে ফুটবল খেলা ওই শহরটার প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল, সেটাই বিনোদনের একমাত্র পথ ছিল। সন্ধেবেলায় আবার মন্দিরের নহবতখানায় ওস্তাদদের সানাই উঠত বেজে।

কোনওদিন পূরবী, কোনওদিন মূলতানী কিংবা পুরিয়াধানেশ্রী বা কল্যাণ রাগ শহরের আকাশ সুরে সুরে মেখে ডাক দিত ঘরে ফেরার। সন্ধে সাতটার মধ্যেই শহরটা নিঝুম শুনশান হয়ে যেত। শহরের বুকচেরা দীর্ঘ রাস্তাগুলোর দুপাশে সারি দিয়ে লাগান গাছে পাতার খসখসানির আওয়াজ ছাড়া কিছুই যেত না শোনা। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা সারাদিনের ছুটন্ত দাপানির চোটে ক্লান্তির কোলে ঢুলে ঢুলে সন্ধের পড়াটা কিছুটা পড়েই ঘুমের দোলনায় শুয়ে পড়ত, চলে যেত স্বপ্নের দেশে। সেখানে শুধু ঘোড়া আর ফুটবল।

ছোট্ট ছেলেটার রক্তে ফুটবল গিয়েছিল মিশে। তখন তাদের শহরে মহারাজের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার দল আসত খেলতে। খেলতে আসত রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির জেলাদলগুলো। তাছাড়া আসত কলকাতার সব নামী দামী দল। সেইসব খেলা সে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে দূর থেকে চোখ দিয়ে গিলত। সব দলের খেলোয়াড়দের সে স্বপ্নরাজ্যের লোক বলে ভাবত। স্বপ্ন দেখত, সেও একদিন ওদের মত সব পেয়েছির দেশে বিচরণ করবে।

দেশ স্বাধীন হতে গঙ্গা আর পদ্মা দুদিকে চলে গেল। চোখের জলের রেখায় সীমানা টেনে বাংলাদেশ দুটুকরো হয়ে গেল। তারপর থেকে পূর্ববাংলার দলগুলো আর সেই ছোট্ট শহরটায় খেলতে আসত না। ছেলেটার খুব খারাপ লাগত, কিন্তু তার তো আর সেই জোর ছিল না যে ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে আবার আগের মত সীমানা মুছে দিয়ে মাঠে ফুটবল নিয়ে মাতবে সবাই ! তখন তাদের ছোট্ট শহর ও জেলাটা ভারতবর্ষের করদ রাজ্য ছিল।

পূর্ববাংলার দলগুলির খেলতে আসা বন্ধ হলেও কলকাতা থেকে অনেক ছোট বড় দল অবশ্য সেখানে ফুটবল খেলতে যেত। কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় রানা সামসের জং, নূর মহঃ, জুম্মা খাঁ আর বাচ্চি খাঁর খেলা ছোট্ট ছেলেটাকে মুগ্ধ করেছিল।

ছেলেটা যখন ক্লাস এইটে পড়ত তখনই সে তার জেনকিনস স্কুলের প্রধান ফুটবল দলের সদস্য হয়ে গেল। জেলার স্কুলগুলোর মধ্যে যে শিল্ড খেলা হত সেখানে সে নিজের স্কুল দলের হয়ে খুব দাপটের সঙ্গে খেলতে শুরু করল। খেলাধুলোয় চৌকস ছিল বলে স্কুলের মাস্টারমশাইরা ছেলেটাকে ভালবাসতেন।

মহারাজের ফুটবল খেলার ওপর আকর্ষণের জন্যই ছেলেটা তাঁর সুনজরে পড়ে গেল। সেই মহারাজ কলকাতার কালীঘাট টিমের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শুধু ফুটবল নয়, তিনি ক্রিকেটেও খুব উৎসাহী ছিলেন। মহারাজ ক্রিকেট ক্লাব অফ বেঙ্গলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তখন টেস্ট খেলতে যাঁরাই কলকাতায় আসতেন, মহারাজের আমন্ত্রণে তাঁরা ওই ছোট্ট শহরে বেড়াতে ও শিকার করতে যেতেন। ছেলেটা ওঁদেরও দেখত দূর থেকে। কিন্তু ক্রিকেটের থেকে ফুটবলের প্রতি তার টান ছিল বেশি, তাই ছেলেটা ফুটবল নিয়েই মাঠ থেকে মাঠে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। ততদিনে মহারাজের সেই করদ রাজ্যের রাজত্ব উঠে গিয়ে সেটা পশ্চিমবঙ্গের একটা রাজ্য হয়ে গেছে।

ছেলেটাও স্কুল থেকে বেরিয়ে তার শহরের ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। কলেজে ঢুকে সে শুধুমাত্র ফুটবলেই নয়, অ্যাথেলেটিক্সেও দাপট দেখাতে শুরু করল। কলেজের ফুটবল দলে তো ছিলই, অন্যদিকে পরপর চার বছর সে কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অ্যাথেলেট হিসেবে পুরস্কার পেল। স্কুলের মত কলেজের প্রফেসররাও তাকে খুব ভালবাসতেন। অধ্যাপকদের মধ্যে বাংলা পড়াতেন বিখ্যাত কবি হরপ্রসাদ মিত্র।

সেই ছোট্ট ছেলেটা এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। কলেজে পড়ে। চাকরি করে। হ্যাঁ, চাকরিও তাকে করতে হয়। অবশ্য শুধুমাত্র হাজিরা খাতায় সই করেই তার চাকরির দায়িত্ব শেষ। ওই ছোট্ট শহরে অফিস টিমগুলোর মধ্যে একটা ভীষণ নামকরা টুর্নামেন্ট হত। সেই শশীকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ডে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের হয়ে ছেলেটা খেলতে শুরু করল। সেই সুবাদে তাকে ওই ডিপার্টমেন্টে ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি করতে হত।

কলেজ আর মাঠ, মাঠ আর কলেজ, এই ছেলেটার সারাদিনের কাজ। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের হয়ে শশীকান্ত মেমোরিয়াল শিল্ডে দারুণ খেলে তাদের চ্যাম্পিয়ান করে দিল ছেলেটা। অন্যদিকে সে তখন তার জেলা দলের হয়ে বহু জায়গায় খেলে বেড়াচ্ছিল। অসমের গুয়াহাটিতে খেলে ওখানে দারুণ নাম করল। ওখানকার মহারানা ক্লাব ছেলেটাকে তার জেলা দলের থেকে ধার করে অন্য পরিচয়ের আড়ালে কলকাতায় নিয়ে এল আই. এফ. এ শিল্ডে খেলাতে। সেই প্রথম ছেলেটার কলকাতায় আসা। তারা পুরো দলকে রাখল শিয়ালদার "শান্তিনিকেতন হোটেলে”।

শিল্ডের খেলায় মহারানা ক্লাব হেরে যেতে ছেলেটা ফিরে গেল তাঁর আপন মায়ামাখা শহরে। যেখানে বেঁচে আছে তার স্বপ্ন। সেখানে ফিরে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মহারাজা ছেলেটাকে প্লেনে করে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় তাঁর দল কালীঘাটের হয়ে লিগ ফুটবল খেলতে। তখন কলকাতার লিগ ফুটবল একটা দারুণ রমরমা ব্যাপার। যেসব বিখ্যাত খেলোয়াড়দের এতদিন সে দূর থেকে দেখে রোমাঞ্চিত হত, তাঁদের সাথেই কলকাতার ময়দানে পায়ে পা মিলিয়ে খেলতে লাগল। তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল ডেকার্স লেনের মেট্রোপলিটন হোটেলে। তখনকার দিনে বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় ওই হোটেলে থাকতেন। সালে, কেম্পিয়া, ধনরাজ, গাজীর মত ময়দান কাঁপান কিংবদন্তী সব খেলোয়াড়রা ওই হোটেলের ঘর আলো করতেন। বড় বড় খেলোয়াড়দের পাশে থাকতে পেরে সুদূর মফস্বল থেকে আসা ছেলেটা নিজেকে ধন্য মনে করত। ময়দান আর হোটেল

এই ছিল তার গণ্ডি। কিন্তু সেই খাঁচার জীবনে আবদ্ধ পাখি সীমাহীন আকাশে ফিরে যেতে চাইত। ডেকার্স লেনের ভিড় থেকে সে পালাতে চাইত। তাই সে একদিন চলে গেল আলিপুরে উডল্যান্ডে মহারাজার বাড়ির কর্মচারীদের থাকার কোয়ার্টারে। সেখানে রাতে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখত আর ভোরবেলার অসংখ্য পাখির ডাকের সাথে বিছানা ছেড়ে উঠে দৌড় লাগাত ময়দানের দিকে। ময়দানে ক্লাবের মাঠে শুরু হত তাঁর বল নিয়ে অনুশীলন। কিন্তু মন যে তার পড়ে থাকত “যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে।”

কিন্তু কি করবে সে? একদিকে ফুটবলের মোহ, অন্যদিকে ঘরের টান। এই দোটানার মধ্যে শেষ হল সে বছরের লিগের খেলা, লিগ শেষ হতেই ছেলেটা ছুটে চলে গেল তার ছোট্ট শহরটায়। এবার সে মন দিল পড়াশুনোয়। বি. এ. পাশ করল। কিন্তু ফুটবল অন্ত তার প্রাণ, ফুটবল ছাড়া যে তার জীবন অচল। তাই সে কদিন পরই জলপাইগুড়ির বহু চা বাগানের মালিক, ফুটবল পাগল, তখনকার কংগ্রেস পার্টির রাজ্যসভার সদস্য মিঃ এস.পি. রায়ের ডাকে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে খেলতে চলে গেল। রায়সাহেব তাঁর একটা চা বাগানে ছেলেটাকে চাকরি দিলেন। তিনিই ছিলেন জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। তিনি ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ফুটবলের জন্য অনেক সময় দিতেন।

ছেলেটা তারপর থেকে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে খেলতে শুরু করল। কদিনেই সে জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষের চোখের মণি হয়ে উঠল। সেও অল্পদিনেই জলপাইগুড়ির মানুষজনকে আপন করে নিল। তার কারণও ছিল। তার নিজের জেলার সাথে জলপাইগুড়ি জেলার মানুষের আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, মানুষকে আপন করে নেওয়ার মানসিকতার মিল ছিল। জলপাইগুড়ির বহু বাড়িতেই তার মেলামেশা, যাতায়াত অবাধ হয়ে গেল। নিজের বাড়ি নিজের শহর ছেড়ে আসার দুঃখ, বাড়ির জন্য মনকেমন সে আর তেমন অনুভব করে না। অন্য জেলার খেলোয়াড় হলেও সে একসময় জলপাইগুড়ি জেলা টিমের অধিনায়ক হয়ে গেল। অধিনায়ক হয়েই সে অসম থেকে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় “বরদলৈ কাপ” জিতে নিয়ে এল। জলপাইগুড়ি জেলার মানুষ এই জয়ে তখন আত্মহারা। ছেলেটাও তাদের জন্য কিছু করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করল।

যখন খেলা থাকত না, সে শহর ছেড়ে দূরে চাকরিস্থলে চা বাগানে চলে যেত। চা বাগানের নির্জনতায় থাকতেই সে বেশি ভালবাসত। সেখানে সন্ধের পর একা একা মনের সুখে গলা ছেড়ে গান ধরত আর রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতা শোনাত খোলা আকাশ আর উতলা বাতাসকে। এভাবেই হয়ত ছেলেটার জীবন শেষ হয়ে যেত নিস্তরঙ্গ নির্জনতায়, চা বাগানের সবুজে সবুজে ঘেরা নীল নীলিমায় যদি না উত্তরবঙ্গ দলের সাথে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাটা দেখতে আসতেন তখনকার কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসার মিঃ রঞ্জিত গুপ্ত। একসময় তিনি জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। সেই সূত্রে জলপাইগুড়ির মানুষের সাথে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। তিনি নিজেও খেলাধুলো, বিশেষ করে ফুটবল ভীষণ ভালবাসতেন। আবার মিঃ এস.পি. রায়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা আছে শুনে মাঠে চলে এসেছিলেন। যদিও বিশেষ কাজ নিয়ে তিনি জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলেন, সেটা ফেলে রেখেই খেলা দেখতে মাঠে এসে বসে পড়লেন। ওই খেলায় সেই ছেলেটা উত্তরবঙ্গ দলের সেন্টার হাফে খেলছিল। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেই ছেলেটা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের জালে একটা গোল ঢুকিয়েছিল যা মিঃ রঞ্জিত গুপ্তকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলল। সেই গোলের ছবিটা আজও ছেলেটার মনে উজ্জ্বল। এক খেলোয়াড়ের থেকে বলটা মাঝমাঠে ডানপায়ে ধরে দ্রুত সে প্রতিপক্ষের সীমানায় ঢুকতে থাকে। বল নিয়ে দৌড়ে পরপর কাটিয়ে যায় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের চারজন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়কে। সামনে শুধু গোলকিপার। গোলকিপার বিপদ বুঝে গোলের মুখ ছোট করতে গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসে পেনাল্টি এরিয়ার মাথায়। ছেলেটা সেটা দেখে মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ডান পায়ে আস্তে লব করে

গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বলটা রাখে গোলে। গোল, গোল, সারা মাঠ জুড়ে শুধু চিৎকার, সহ খেলোয়াড়দের অভিনন্দনে ডুবে যায় ছেলেটা।

সেদিন খেলা শেষে মিঃ রঞ্জিত গুপ্ত ছেলেটাকে চোস্ত ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কলকাতা পুলিশে যোগ দেবে?" মিঃ গুপ্তের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ দাজু সেন। তিনি ছিলেন জলপাইগুড়ির এক চা বাগানের ডিরেক্টর, জলপাইগুড়ির মানুষের কাছে খুবই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন দারুণ দাপুটে ও ব্যক্তিত্বময় মানুষ। ছেলেটা মিঃ রঞ্জিত গুপ্তকে কিছু বলার আগেই মিঃ দাজু সেন বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে, কোচবিহার থেকে এখানে রায়সাহেব নিয়ে এসেছে, কিন্তু এখানে ও পড়ে থেকে কি করবে?" মিঃ গুপ্ত ছেলেটাকে ফের প্রশ্ন করলেন, "তুমি কোচবিহারের ছেলে?" লাজুক ছেলেটা উত্তর দিল, "হ্যাঁ।" মিঃ গুপ্ত বললেন, "কোচবিহারের অনেক খেলোয়াড় কলকাতায় খেলে। তুমিও কলকাতার পুলিশ টিমে খেলবে।" ছেলেটার উত্তরের অপেক্ষা না করে মিঃ গুপ্ত ও মিঃ সেন চলে গেলেন! ছেলেটা ভাবতে লাগল, ওদের জেলার বহু খেলোয়াড়ই কলকাতায় খেলে প্রচুর নাম করেছে। কলকাতার নামী দামী ক্লাবে খেলে সারা ভারতে তাঁদের পরিচিতি হয়েছে। যেমন অরুণ বা ঝান্টু দাশগুপ্ত, কুমার সুরেন, কুমার রুনারায়ণ, সুব্রত রায়চৌধুরী, অমল বসু। ছেলেটা ভাবল, সেও কলকাতায় ভাল খেলতে পারলে সারা ভারতের ফুটবল আঙ্গিনায় পৌঁছে যাবে। তখন কলকাতা পুলিশের টিম কলকাতার ফুটবল লিগে প্রথম ডিভিশনে দাপিয়ে খেলছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের মত বড় বড় ক্লাবও সমীহ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামত।,

একদিকে উত্তরবঙ্গের সবুজ গালিচায় মোড়া চা বাগানের টান, অন্যদিকে কলকাতার ময়দানে ফুটবল খেলার আকর্ষণ, দুয়ের দোলায় ছেলেটার মন দুলতে লাগল। মন যখন টানাপোড়েনে চঞ্চল তখনই হঠাৎ একদিন মিঃ দাজু সেনের বাড়িতে ছেলেটার নামে এল মিঃ রঞ্জিত গুপ্তের টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামে লেখা, "সিলেকশনের জন্য তাড়াতাড়ি এস।" ছেলেটা কিছু ভাবার আগেই মিঃ দাজু সেন কলকাতায় আসার প্লেনে টিকিট হাতে ধরিয়ে দিলেন। সে জামিয়ার এয়ারক্র্যাফ্টে চড়ে আমবারি ফালাকাটা থেকে সোজা এল কলকাতায়।

এর আগে ছেলেটা যখনই কলকাতায় এসেছে, প্রতিবারই ছিল অল্পদিনের জন্য, পেছনের টানটা বজায় রেখে। এবার এল অন্য পরিস্থিতিতে, চাকরি করতে, খেলতে। তার অর্থ দাঁড়ায় প্রায় বাকি জীবনের জন্য। এসেছে একা। ফেলে এসেছে তার আপনার প্রিয় ছোট্ট শহর, মা, বাবা, একসঙ্গে বেড়ে ওঠা কৈশোরের বন্ধুদের, তোর্সা নদীর ঢেউয়ের সাথে তালে তালে নাচ, রাজবাড়ি, সাগরদীঘির পাড়ে সুন্দর ভোর আর সন্ধ্যা, নহবতখানা থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের সুর। আসার সময় সে নিয়ে এসেছে তার জেলার খেলোয়াড় ঝান্টু দাশগুপ্তের ও অমল বসু বা বেনুর ঠিকানা। বেনু তখন উয়াড়ি টিমে খেলত। কলকাতায় নেমেই ছেলেটা বেনুর সাথে দেখা করল। ওর সব কথা শুনে বেনু আশ্বাস দিল, "আরে ঘাবড়াস না, এখানে থাকতে থাকতে দেখবি এখানেই মন বসে গেছে, এখানেই অনেক বন্ধুবান্ধব হয়ে যাবে, তখন আর কোচবিহারের জন্য সবসময় মন আঁকুপাঁকু করবে না। প্রথম প্রথম আমারও কিছু ভাল লাগে না, ভাল লাগে না এমন একটা মন খারাপ থাকত। আরে তুই তো ফুটবল প্লেয়ার, ফুটবল নিয়েই ভাববি, ফুটবল নিয়েই ঘুমবি, ফুটবল নিয়েই ভাত খাবি, ফুটবলকে পুজো করবি, আর সব বাদ দিয়ে দে। এখন থেকে তোর কাছে মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধুবান্ধব সব ওই ফুটবল। এরকম ভাবতে পারলে তখনই দেখবি তোর স্বপ্ন সফল হচ্ছে, দেখবি তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিস।" ছেলেটা বেনুর কথাটা মন দিয়ে শুনল। তারপর বেনু বলল, "চল, আজ বিকেলে ফোর্ট উইলিয়মে আমাদের টিমের সাথে ফৌজি টিমের একটা প্রদর্শনী ম্যাচ আছে। আমাদের টিমে প্লেয়ার কম আছে, তুই আমাদের হয়ে খেলবি।"

সেদিন বিকেলে উয়াড়ি টিমের হয়ে ফোর্ট উইলিয়মে ফৌজি দলের বিরুদ্ধে সে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলল। ওখানে ছিলেন কলকাতা পুলিশ টিমের নিয়মিত খেলোয়াড় সার্জেন্ট সুদেব দত্ত। তিনি ছেলেটাকে মাঠ থেকেই নিয়ে যান মিঃ রঞ্জিত গুপ্তের কাছে। সুদেব দত্ত

ছেলেটাকে দেখিয়ে বললেন, "স্যার, এই ছেলেটা খুব ভাল খেলে।" মিঃ গুপ্ত একপলক তাকিয়ে হেসে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে আমি আগেই সিলেক্ট করেছি।" তারপর ছেলেটার দিকে ফিরে বললেন, "আগামীকাল সকালে এস, তোমার ইন্টারভিউ হবে। "

পরদিন ছেলেটা তার ও তার জেলার সমস্ত মানুষেরই আরাধ্য দেবতা মদনমোহনের নাম করতে করতে ইন্টারভিউয়ের জন্য হাজির হল। মিঃ রঞ্জিত গুপ্ত ছাড়াও ইন্টারভিউ বোর্ডে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মিঃ গুপ্তই ছেলেটাকে প্রথম প্রশ্নটা করলেন। উত্তরবঙ্গ বনাম মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলায় ছেলেটা যে গোলটা মহামেডানের বিরুদ্ধে দিয়েছিল, তার বিবরণ দিতে বললেন। ছেলেটা যথাসাধ্য গুছিয়ে বলল। মিঃ গুপ্ত বললেন, "তুমি আগামীকালই আমাদের টিমে যোগ দাও।" তারপর থেকে শুরু হল তার কলকাতা পুলিশ টিমের হয়ে খেলা আর ব্যারাকপুরে পুলিশের ট্রেনিং। এক বছর বিস্তর পরিশ্রম করে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে ছেলেটা সরাসরি অফিসার হিসেবে যোগ দিল। তার থাকার ব্যবস্থা হল আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডের পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে। খেলায় ময়দানে অল্প অল্প নাম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কলকাতার হালচাল, কলকাতার ভিড় সে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না। রাতে বিছানায় শুয়ে সে কোচবিহারে চলে যায়। সেখানকার মন্দির, নহবতখানা, রাজবাড়ি, সবুজে ঘেরা ছোট্ট শহরের আনাচে কানাচে সে মনে মনে ঘুরে বেড়ায়। তার মনে হয়, কলকাতাটা নিঃসঙ্গ মানুষের ভিড়ে ভরা। যে যার ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত, অন্যের দিকে ফিরে তাকাবার সময় কোথায়? বন্ধুত্বটাও বড় নিক্তি মাপা। তাদের কথাবার্তার মধ্যে সে সরলতা খুঁজে পায় না, তাই নিজে একমাত্র খেলার মাঠ ছাড়া অন্যখানে কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। মনে হয় "ভিড়ে ভরা নির্জন দ্বীপে" সে একা।

সেদিন ছিল তার পুলিশ টিমের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা। ইতিমধ্যে কেটে গেছে দুটো বছর। সেদিন খেলার মাঝামাঝি সময় বল দখলের লড়াইতে আচমকা বিপক্ষ দলের এক খেলোয়াড় সজোরে আঘাত করে বসল তার ডান পায়ের হাঁটুতে। ছেলেটা মাঠে পড়ে গেল। অসম্ভব যন্ত্রণা। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। সহ খেলোয়াড়দের সাহায্যে বেরিয়ে এল মাঠ থেকে। ব্যস, ওখানেই শেষ হয়ে গেল তার খেলোয়াড় জীবন।

তারপর সেই হাঁটু নিয়ে কলকাতার সব নামী দামী অর্থোপেডিক ডাক্তারের কাছে শুরু হল ছোটাছুটি, কিন্তু কোন ডাক্তারই আশ্বাস তেমন দিলেন না। ছেলেটা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে বালিশ ভিজিয়ে দিত নিঃশব্দে। খেলা শেষ, সে ভাবতে পারত না। তবু বাস্তবকে মেনে নিতেই হবে। অগত্যা সে মন দিল চাকরিতে।

সেই সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্যামপুকুর, মুচিপাড়া ও ভবানীপুর এই তিনটে থানাকে আদর্শ থানা হিসেবে গড়ে তুলবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সূত্রে ছেলেটাকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে মুচিপাড়া থানায় নিয়োগ করলেন। আদর্শ থানা হিসেবে ঘোষিত থানাগুলোতে চোদ্দ পনের জন করে নতুন অফিসার দেওয়া হয়েছিল। ছেলেটা মুচিপাড়া থানার সবচেয়ে কমবয়সী অফিসার হয়ে যোগ দিল। তখন ওই থানার অফিসার-ইন-চার্জ ছিলেন পরেশ ব্যানার্জি। তিনি অফিসের কাজ শুরু করতেন রাত সাতটা-আটটার সময়। তারপর থানায় তাঁর ঘরে থাকতেন রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত। তিনি তাঁর প্রিয় পোষা ল্যাপ ডগ নিয়ে অফিসে আসতেন। ওটাকে টেবিলের ওপর বসিয়ে কাজ শুরু করতেন। প্রথম দিন ছেলেটাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, "আজকেই তো এখানে আসা হয়েছে, কি নাম?" ছেলেটা বলল, "আমার নাম স্যার রুণ গুহনিয়োগী।"

ব্যানার্জি সাহেব মুখ ঘুরিয়ে তাঁর আর্দালিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার হলোটা কই?" আর্দালি বলল, "স্যার, দেখছি না।" আমি ভাবলাম, ওঁর যেমন পোষা কুকুর আছে, তেমনই বোধহয় পোষা বেড়ালও আছে, তারই কথা আর্দালিকে জিজ্ঞেস করছেন। কিন্তু মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে রইল। হঠাৎ অফিসে বসেই বেড়ালের কথা জানতে চাইবেন কেন? আমি একটু পরে এক সিনিয়র অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, "দাদা, আমাদের স্যার বুঝি বেড়ালও পোষেন?" উনি আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কেন?" আমি বললাম, "উনি এসেই আর্দালির কাছে জানতে চাইলেন ওঁর হুলো কই, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।" আমার কথা শুনেই সেই সিনিয়র অফিসার হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসির ধাক্কা একটু কমলে বললেন, "হলো জান না? আর জানবেই বা কি করে, পুলিশের ট্রেনিংয়ে তো আর ওই বিষয়ে পড়ান হয় না, শেখানও হয় না। কিন্তু হলো নিয়ে একটা ক্লাস থাকলে ভালই হত। হুলো ছাড়া পুলিশের চাকরি বেকার, নির্জলা। ধৈর্য ধর, একটু পরেই বড়বাবুর হুলো আসবে, দেখবে।"

কিছুক্ষণ পর এক ধোপদুরস্ত মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এসে হাসতে হাসতে সোজা অফিসার-ইন-চার্জের ঘরে ঢুকে গেলেন। বড়বাবু তখন টেবিলের ওপর তাঁর পোষা কুকুরটার গা খুঁটে খুঁটে পোকা বার করছিলেন, আর টেবিলের ওপরেই ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে সেগুলোকে টিপে টিপে মারছিলেন। সেই ভদ্রলোক বড়বাবুর টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে একই কায়দায় পোকা বাছতে শুরু করে দিলেন। লক্ষ্য করলাম, মাঝে মাঝে ওই ভদ্রলোক পোকা ছাড়াই নখ দিয়ে টিপে পোকা মারার ভান করে যাচ্ছেন আর বড়বাবুর সামনে দাঁত বার করে হেসে হেসে কথা বলছেন। সেই সিনিয়র অফিসার আমাকে বললেন, "দেখেছ, এই হচ্ছে বড়বাবুর হলো।"

পরদিন সকালবেলা সেই ভদ্রলোক একটা কুকুর নিয়ে এসে হাজির। তারপর দেখলাম, বড়বাবুর আর্দালি থানার ওপরতলায় বড়বাবুর কোয়ার্টার থেকে নিয়ে এল বড়বাবুর পোষা মেয়ে কুকুরটাকে। আমি আর্দালিকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি হবে?" সে জানাল, "বড়বাবুর কুকুরের বিট দেওয়া হবে।" আর্দালি তখন বড়বাবুর ঘরে দুটো কুকুরকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বড়বাবু কিন্তু ওপর থেকে নামেননি। সেই ভদ্রলোক দরজার পাশের একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছেন, ঘরের ভেতর কুকুর দুটো কি করছে। থানার অন্য সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। প্রায় আধ ঘণ্টা পর হঠাৎ সেই ভদ্রলোক নাচতে নাচতে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "হয়েছে, হয়েছে।" আমরা বুঝলাম, তাঁর কুকুর নিয়ে আসার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোক আর চিৎকার থামাচ্ছেন না। একটু পরে বড়বাবুর বাড়ির কাজের ছেলে এসে সেই ভদ্রলোককে বলল, "বড়বাবু শুনেছেন।" তখন উনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "বড়বাবু শুনেছেন?" ছেলেটা ফের বলল, "হ্যাঁ।" এতক্ষণে ভদ্রলোক

তাঁর চিৎকার থামালেন।'

আমার চাকরি জীবনে আমি এরকম বহু হুলো দেখেছি, দেখেছি প্রায় প্রত্যেক পুলিশ কর্মীরই হুলো থাকে। চাকরির স্তর অনুযায়ী হুলোরও স্তর তৈরি হয়। আই. পি. এস. অফিসার থেকে শুরু করে সবচেয়ে নিচু স্তরের সিপাই পর্যন্ত সবারই হুলো থাকে কমপক্ষে চার পাঁচ জন করে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেলেও অসুবিধে নেই। নতুন জায়গায় আবার নতুন হুলোর আমদানি হয়। হুলোরা হচ্ছে অনেকটা আগেকার জমিদারদের মোসাহেবদের মত। এরা পুলিশের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ানর জন্য, এলাকায় মাতব্বরি করার লোভে। এর জন্য তাদের অনেক পয়সাও খরচ করতে হয়। অফিসারদের মর্জি মত খানাপিনাও করাতে হয়, বেড়াতে নিয়ে যেতে হয়। তাতে হুলোরা অবশ্য কখনও পিছিয়ে যায় না। এলাকায় খাতির পেতে এরা কখনও কখনও পুলিশের কাছ থেকে পাড়ার দু একটা পেটি কেসের আসামীকে ছাড়িয়েও নিয়ে যায়।

পুলিশকেও হুলোদের অনুরোধ রাখতে হয়। হুলোরা অঞ্চলের অনেক গোপন খবর পুলিশকে দেয়, তাতে পুলিশ এলাকার হালচাল বুঝতে পারে। ষাটের দশকে একজন হুলোকে দেখেছি, যিনি ছিলেন কলকাতার এক প্রখ্যাত জুয়েলারি ব্যবসায়ীর বাড়ির ছেলে। তিনি প্রায় প্রতিদিন কোঁচা দেওয়া ধুতি আর ফিনফিনে গিলে করা দামি পাঞ্জাবি পরে পুরোপুরি ফুলবাবু সেজে গাড়ি নিয়ে থানায় আসতেন। তারপর তাঁর পেয়ারের অফিসারদের নিয়ে সোজা চলে যেতেন নামী হোটেল কিংবা পানশালায়। সেখানে সবাইকে ঢালাও খাওয়া দাওয়া করিয়ে প্রতি রাতে অন্তত দুতিন হাজার টাকা খরচ করে বাড়ি ফিরতেন।

একবার আমার এক সিনিয়র অফিসারের একটা নতুন হুলো এল। সে দারুণ সব বড় বড় গল্প বলতে শুরু করল। অফিসার চুপচাপ তার সব চালবাজি হজম করলেন, তারপর সন্ধেবেলায় সেই হুলোকে সঙ্গে করে আমার মত আরও দুতিনজন জুনিয়র অফিসারকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কলকাতার এক নামজাদা হোটেলের বারে। আমার বস স্কচ হুইস্কি পান করতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে রাত বাড়তে লাগল, হুইস্কির সাথে খাবার-দাবারও প্রচুর ছিল। আমি লক্ষ্য করছিলাম সেই নতুন হুলো কেমন যেন উসখুস উসখুস করছে। এদিকে বিল বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। রাত প্রায় এগারটা নাগাদ সেই লোকটি সিনিয়র অফিসারকে বলেই ফেলল, "দাদা আমায় যে বাড়ি যেতে হবে।" হুলোরা সাধারণত এরকম আচরণ করে না, অফিসারের মর্জি মেনেই তারা চলে। তা সেই অফিসার ওই ভদ্রলোকের কাতর অনুরোধ শুনে বললেন, "হ্যাঁ চলুন।" হলো কোনমতে মোটা বিলটা মেটালে আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে ওঠার পর আমি বসকে বললাম, "স্যার একদিনেই সোনার ডিম পাড়া হাঁসটাকে কেটে ফেললেন!" উনি হেসে উত্তর দিলেন, "না রে, দেখলাম, এ ছলো পার্মানেন্ট হওয়ার নয়, তাই ঠিক করলাম একদিনেই যা হওয়ার হয়ে যাক।"

পুলিশেরা হুলোদের শুধু পকেটই কাটে না, তাদের সোর্স হিসেবেও কাজে লাগায়। এলাকায় ইলোরা নিজের ক্ষমতা দেখানর ধান্দায় সবরকম মানুষের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে, বিশেষ করে উঠতি মাস্তান ও 'দাদাদের' সঙ্গে, সেই সূত্রে তারা এলাকার প্রচুর খবরাখবর রাখে আর প্রয়োজনমত তা পুলিশকে জানিয়েও দেয়। চাকরি জীবনে আমি বিভিন্ন অফিসারের বহুরকম হুলো দেখেছি। দেখেছি একদিন যে হুলো দারুণ রহিস ছিল, রোজ প্রচুর টাকা অফিসারদের পেছনে উড়িয়ে দিত, বাড়িতে নেমন্তন্ন করে অফিসারদের ভোজ খাওয়াত, একদিন তারাই ফতুর হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, শেষ বয়সে নিঃস্ব হয়ে দারিদ্র্যের জ্বালায় জ্বলছে।

আমি যখন মুচিপাড়া থানায় এলাম তখন ওই অঞ্চল ছিল গুণ্ডা, সমাজবিরোধী মাস্তানদের স্বর্গরাজ্য। এই মাস্তান শব্দটা ফরাসী ভাষা থেকে কে যে বাংলায় আমদানি করেছিল জানি না, কিন্তু কাজটা যথাযোগ্য হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর ব্যাপ্তি ও ওজন এতই প্রসারিত যে একটা কথাতেই পুরো চরিত্র একেবারে সামনে চলে আসে। ওই মুচিপাড়া অঞ্চলেই আমার সাথে একে একে আলাপ হতে লাগল পুরনো দিনের

কলকাতা কাঁপান সব মাস্তানদের। তাদের সাথে যখন আমার মোলাকাৎ হল, তার অনেক আগে থেকেই কলকাতা আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 'দাদাগিরির' কিছুটা স্বাদ পেয়ে গেছে।

পূর্ববাংলা থেকে দেশ বিভাগের সময় যখন হাজার হাজার উদ্বাস্তু আসতে লাগল পশ্চিমবঙ্গে, তখনই শহর ঘিরে মাথা চাড়া দিল একদল মাতব্বর। শরণার্থীরা কোথায় থাকবে, কি খাবে, কিভাবে ঘর বাঁধবে এই সব দেখাশুনোর ভার নিজেরাই নিজেদের কাঁধে তুলে নিল দাদারা। জবরদখল জায়গার কোনখানটা পাবে কোন উদ্বাস্তু পরিবার, তা ওই মাতব্বররাই ঠিক করে দিত। এরা সবাই, বলাই বাহুল্য ছিল এলাকার পুরনো বাসিন্দা। এদের নির্দেশেই উদ্বাস্তুদের ভাগ্য নির্ধারিত হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে এরাই এলাকার দাদা হয়ে গেল। এদের কথা অমান্য করার অর্থ আবার নতুন করে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া। চালচুলোহীন, একেবারে নিঃস্ব হয়ে আসা শরণার্থীরা ভয়ে সেইসব দাদাদের বিরুদ্ধে কিছু বলত না। এরা সেইসব উদ্বাস্তু পরিবারের বেকার ছেলেদের নিয়ে নিজেদের এক একটা বাহিনীও তৈরি করে নিল। দাদাদের হাত ধরে সেইসব বেকার তরুণেরা রুটিরুজির ধান্দা করে ফেলল। এইসব দাদারা কিন্তু নিষ্ঠুর চরিত্রের ছিল না। মাতব্বরি করাটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল এদের। দাদাদের মধ্যে অনেকে ছিল, যারা মনে করত উদ্বাস্তুদের জায়গা দখল করতে সাহায্য করা মানে দেশসেবা করা। সদ্য সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের মধ্যে দেশসেবার একটা হাওয়া তো ছিলই, সেই হাওয়া অল্প হলেও এদের গায়ে লেগেছিল। কিন্তু সেই সেবকদের মধ্যে আড়ালে দু-একজন যে বদ চরিত্রের ছিল, তাও দেখা গেছে। তারা শরণার্থীদের অসহায়তার অনেক সুযোগই নিয়েছে। সরকারি সাহায্যের জিনিসপত্র ও টাকাপয়সা তছনছ এরাই করেছে। দাদাগিরির উত্থান তখনই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ দেখে। যদিও এই দাদাগিরিটা কখনই মুম্বাইয়ের মত প্রবল আকার ধারণ করেনি। সেখানে তো দাদারা নিজেদের মধ্যে এলাকা ভাগ করে অন্ধকার রাজত্বটা চালায়, রীতিমত উসুলী অফিস খোলে। তাদের অঙ্গুলি হেলনেই এলাকার লোকেদের চলতে ফিরতে হয়। তাদের অমান্য করার অর্থ মৃত্যুকে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ জানান।

যাই হক, আমি সেইসব প্রাক্তন দাদাদের সঙ্গে একে একে পরিচিত হতে লাগলাম। শুনেছি, একদিন এরা মহাত্মা গান্ধীর কাছে নিজেদের অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। এখন যেখানে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও রাজা রামমোহন সরণির সংযোগস্থলে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখা আছে, ঠিক সেখানে একসময় কলকাতার এক বিখ্যাত জুয়েলারি দোকান ছিল। তারই পাশের মাঠে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে ওই সব মাস্তানরা তাদের পিস্তল, রিভলবার মহাত্মা গান্ধীর কাছে সমর্পণ করেছিল। আর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁদের প্রত্যেককে একটা করে ট্যাক্সির পারমিট দিয়েছিলেন। সেইসব মাস্তানদের মধ্যে অনেকেই সেই পারমিট নিয়ে ট্যাক্সি বার করেছিল। তারা কেউ নিজেই ট্যাক্সি চালাত, কেউ ড্রাইভার দিয়ে চালাত।

এইসব মাস্তানরা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সময় বিশেষ এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করত এবং তা নিয়ে গর্ব করে বলেও বেড়াত। আবার এরাই কোনও কোনও এলাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে দমনও করত। একে একে আমার সাথে আলাপ হল মিঃ মুখার্জি, ভানু বসু, শচী মিত্র, মৃত্যুঞ্জয় দত্ত, কমলেশ, লালকমল, শান্ত ঘোষের। মৃত্যুঞ্জয় দত্ত খুব ভাল পিস্তল, রিভলবার সারাই করতে পারত। কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলের মাস্তানদের অস্ত্রশস্ত্র সারাই করে দিত। ওর মনটাও খুব বড় ছিল। আবার এদের মধ্যেই একজন ছিল, মাস্তানির আড়ালে চিটিংবাজি করত। এদের কাছ থেকে পুরনো দিনের মাস্তানির গল্প শুনতাম। ওদের কাছে আসত নতুন উঠতি সব মাস্তানরা নানা অঞ্চল থেকে। প্রাক্তন মাস্তানরা তাদের পুরনো দিনের কীর্তি কাহিনীর গল্প ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নতুন মাস্তানদের শোনাত, ওরা সেইসব গল্প গোগ্রাসে গিলত। আসলে এটা ছিল নতুনদের নিজেদের কব্জায় ধরে রাখবার কায়দা।

আমার সঙ্গে উঠতি মাস্তানদেরও আলাপ হতে লাগল, আস্তে আস্তে আমি এদের

মানসিকতা, চালচলন, কথাবার্তা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। ওদের আড্ডাগুলো, গোপন ডেরাগুলো চিনবার উদ্দেশে ওদের সাথে মিশতে শুরু করলাম। ওদের হেড কোয়ার্টার ছিল বৌবাজারে শশীভূষণ দে স্ট্রিটের মোড়ে 'গোল্ডেন ভ্যালি' নামে একটা রেস্তোঁরা। তাছাড়া ক্রিক রোয়ের মোড়ে 'শ্যামল রেস্তোঁরা' ও শ্যামবাজারের 'সুকৃতি' আর কফি হাউসে বসত ওরা। অধুনা অবলুপ্ত গোল্ডেন ভ্যালির মালিক ছিল চট্টগ্রাম থেকে আসা বাটুল নামে একটা ছেলে। ঐ রেস্তোঁরাতে আমিও যাতায়াত করতে শুরু করলাম। বাটুলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বাটুলকে সবাই চিনত এবং ভালও বাসত। সেই বাটুলের মাধ্যমেই দক্ষিণ কলকাতার তাজা, লিন্টে, টালিগঞ্জের টুলু মুখার্জি, বুলু মজুমদার, উত্তর কলকাতার পৃথ্বীশ, বাপী, ল্যাংড়া চিত্ত, বেলঘরিয়ার ইণু মিত্র, মির্জাপুরের দেবু ব্যানার্জি, কালো রোজা, ওয়াচেন মোল্লার দোকানে ডাকাতিতে ধৃত অমল চক্রবর্তী, কুখ্যাত মাকাল কুণ্ডু, পরে আমার হাতে ধরা পড়ে ধর্ষণের মামলায় সাজা হয়েছিল। জগু, দীপু, কালী মুখার্জি, দেতোঁ কালী এমনি সব কুখ্যাত মাস্তানদের চিনলাম। ওখানেই আরও একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। উনি অবশ্য কলকাতার বাইরে থাকতেন, তবে মাঝে মাঝেই আসতেন। উনি চিরদিন রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ছিলেন। জগা বসুর ভাই ভানু বসুও একবার কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে রাজনীতির আঙ্গিনায় পা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল।

প্রাক্তন মাস্তানরা যারা ট্যাক্সি চালাত, তারাও সন্ধের পর শুধু আড্ডার টানে গোল্ডেন ভ্যালিতে আসত। অনেকে নতুন মাস্তানদের হপ্তা আদায় থেকে কাটমানি নিত। কেউ কেউ লুকিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের লেনদেনও করত। তবে পুরনো দিনের মাস্তানদের সাথে নতুন মাস্তানদের মানসিকতার অনেক ফারাক ছিল। প্রথমত পুরনো মাস্তানরা কেউ মনেপ্রাণে ধান্দাবাজ ছিল না। মাস্তানি করে নিজের আখের গুছিয়ে নেব এই চিন্তা ওরা করত না। ওদের মাস্তানিটা অনেকটাই সীমাবদ্ধ ছিল বীরত্ব প্রদর্শনের গণ্ডিতে। এরা কেউ মহিলাদের বিরক্ত করত না, বরং অন্য কেউ তা করলে সেটা প্রতিরোধ করত। বয়স্ক লোকেদের শ্রদ্ধাভক্তি করত। কিন্তু নতুন মাস্তানদের মধ্যে এসব গুণ প্রায় দেখাই যেত না। সমাজের অবক্ষয়ের সাথে সাথে মাস্তানদের মানসিকতার পার্থক্যও স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল। নতুনেরা প্রায় সবাই ধান্দাবাজ। আমি এদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে লাগলাম এবং সেই সূত্রে কলকাতার প্রায় সব প্রান্তের মাস্তানদের আস্তানা চিনতে শুরু করলাম। চিনলাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুয়ের পিটারকে, মির্জাপুরের বি গাঙ্গুলি, চীনা ভাষায় পারদর্শী মলোঙ্গা লেনের নন্দুয়া ও শম্ভু দাস ওরফে বোমকাটি, দমদমের পলকে। এদের সূত্রেই গ্রেপ্তার করলাম ডিকসন লেনের কেলোকে এবং উদ্ধার করলাম প্রচুর পরিমাণে গাঁজা। গোল্ডেন ভ্যালিতে আসতেন পরবর্তীকালের আই. এন. টি. ইউ. সি. নেতা বিজয় মুখার্জিও। তাঁর সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর সূত্র ধরেই আমি চিনলাম খিদিরপুর, গার্ডেলরিচ এলাকার মাস্তানদের।

অন্যদিকে মুচিপাড়া থানায় যেহেতু আমি সবচেয়ে জুনিয়র অফিসার ছিলাম, সিনিয়র অফিসাররা যেমন শিকদারদা, রায়চৌধুরীদা, দস্তিদারদা ও দিব্যেন্দু দত্ত আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন আসামীদের ধরার সময়, সমাজবিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য কিংবা জেরা ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় হাজির থাকতে বলতেন। দিব্যেন্দু দত্ত আবার মুচিপাড়া অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিলেন, ফলে তাঁর সাথে সাধারণ মানুষের অনেক বেশি যোগাযোগ ছিল। আমিও সমাজবিরোধী দমনের সূত্রে মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেলাম। একদিকে মাস্তানদের সঙ্গে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ধীরে ধীরে আমি আমার নিজস্ব একটা 'সোর্স' বাহিনী গড়ে তুলতে পারলাম। ইতিমধ্যে মুচিপাড়া থানায় আমার অল্পসল্প নাম হয়েছে। শুধুমাত্র সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যই নয়, নাম হয়েছে অন্য একটা কাজের জন্য।

দিনটা ছিল বাষট্টি সালের চার সেপ্টেম্বর। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এক ছাত্র শিয়ালদায়

গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সকাল এগারটা নাগাদ, তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ট্রেনে চড়ার অপরাধে। সেই ছাত্রকে তারা নিয়ে গিয়েছিল শিয়ালদার সাউথ স্টেশনের জি. আর. পি. থানায়। সেখানে শখানেক লোক বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে থানা আক্রমণ করে বসল। জি. আর. পি. বিক্ষোভকারীদের থেকে প্রায় কুড়ি জন লোককে গ্রেফতার করে থানায় আটক করে রাখল। বাকি বিক্ষোভকারীরা স্টেশন চত্বর ছেড়ে চলে এল মহাত্মা গান্ধী রোডে। এসেই ওখানে দাঁড়ান ট্রাফিক পুলিশের ওপর ঢিল ছুঁড়তে লাগল। তারপর তারা রাস্তায় ট্রাম বাস থামিয়ে লোকজন নামিয়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে শুরু করল।

খবর পাওয়ার সাথে সাথে মুচিপাড়া থানার থেকে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হলাম। ওরা আমাদের দূর থেকে দেখেই ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়তে লাগল। ট্রাম লাইন সারানর জন্য রাস্তার পাশে স্টোন চিপস ফেলা হয়েছিল। তাতে তাদের ঢিল আমদানির কাজটা সহজ হয়ে গেল। সেই পাথর বৃষ্টির মুখে আমরা ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে জুটে গেছে আরও অনেক ছাত্র এবং সমাজবিরোধীরা। চারপাশের বাড়ির লোকজন ছাদ ও বারান্দা থেকে ওদের বিক্ষোভ দেখতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মধ্য কলকাতার ডেপুটি কমিশনার মিঃ এস. কে. মল্লিক হাজির। তাঁর নির্দেশে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হল। কিন্তু টিয়ার গ্যাস আমাদের কাছে খুব অল্প পরিমাণে মজুত থাকাতে কিছুক্ষণ পরই তা বন্ধ করে দিতে হল। টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া বন্ধ হতেই আক্রমণকারীরা ফের দ্বিগুণ উৎসাহে ঢিল ছোঁড়া শুরু করল। আমরা তখন রাইফেল বাগিয়ে গুলি ছোঁড়ার অভিনয় করে তাদের তাড়া করলাম। ওরা কিছুটা পিছু হটেই বুঝে গেল, আমরা বুলেট ব্যবহার করতে চাইছি না। শুরু হল আবার ঢিল বর্ষণ। মহাত্মা গান্ধী রোড ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডের সংযোগস্থলে আমরা ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভাদ্র মাসের ঝাঁঝাঁ রোদে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ধৈর্যের পরীক্ষা চলছে। দেড়টা নাগাদ আমি ও সত্যেন ঘোষ ঢিল আর বৃষ্টির মাঝখান দিয়ে হাত জোড় করে বিক্ষোভকারীদের দিকে এগিয়ে চললাম। আমরা দুজনে চিৎকার করে বলতে লাগলাম, "আপনারা শান্ত হন, আমরা আপনাদের কথা শুনছি।" কোনমতে ঢিল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলছি, প্রায় পাঁচশ মিটার হেঁটে ওদের কাছাকাছি পৌঁছলাম। একেবারে সামনাসামনি দেখেই বোধহয় একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওরা ঢিল ছোঁড়াটা থামাল। আমরা হাত জোড় করে আবার বললাম, "আপনারা শান্ত হন, দয়া করে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করুন, আমরা আপনাদের কথা শুনছি।" বিক্ষোভকারীদের মধ্যে যাদের মনে হল ভদ্র ছাত্র, আমি আর সত্যেন ঘোষ তাদের সামনে গিয়ে বললাম, "আপনারা দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন, কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় তার চেষ্টা করুন। আপনাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন চলুন, আমাদের ডেপুটি কমিশনার সাহেব আছেন, আলোচনা করে ঠিক করুন, কিভাবে শান্তি আনা যায়।"

আমাদের কথা শুনে বিক্ষোভকারীরা নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করে নিল। তারপর চারজন ছাত্র নেতা দল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বলল, "চলুন, ডেপুটি কমিশনার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করছি কি করা যায়।" আমি আর সত্যেন ওদের হাজির করলাম মিঃ মল্লিকের কাছে। 'শান্তির প্রস্তাব' নিয়ে মিঃ মল্লিকের সাথে ছাত্র প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরু হল। আলোচনা যখন চলছে তখনও বিক্ষোভকারীদের একাংশ ঢিল ছুঁড়ে যেতে লাগল। দুজন ছাত্র প্রতিনিধি বহুবার আলোচনা থামিয়ে হাতজোড় করে ওদের অনুরোধ করল ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করতে। ছাত্ররা মিঃ মল্লিককে বলল, কজন সিনিয়র অফিসার যেন তাড়াতাড়ি সুরেন্দ্রনাথ কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। যখন আলোচনা একটা নির্দিষ্ট পথে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় 'শান্তিবিরোধীরা' আমাদের বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসল। ঢিল বৃষ্টি আরও তুমুল আকার ধারণ করল। ভেস্তে গেল আলোচনা। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রামে ওরা ফের আগুন ধরিয়ে দিল। তার লেলিহান শিখা আশেপাশের বাড়িগুলোকে ছোঁয়ার উপক্রম করল। বাড়ির মা

বোনেরা ঘর থেকে রান্নার জল, খাবার জল এনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আগুন নেবানর চেষ্টা করতে লাগলেন। মির্জাপুরের মোড়ের পেট্রল পাম্প বন্ধ করে এসে পাম্পের কর্মচারীরা জল ছিটতে লাগল জ্বলন্ত ট্রামের গায়ে। ক্রমে হাঙ্গামা আরও বিশাল আকার ধারণ করল। বিকেলের দিকে সরেজমিনে দেখতে এলেন চিফ সেক্রেটারি মিঃ আর. গুপ্ত, পুলিশ কমিশনার মিঃ এস. এম. ঘোষ। তাঁরা সবকিছু দেখে ডেপুটি কমিশনার সাহেবের সাথে কথা বলে চলে গেলেন। আরও পুলিশ ঘটনাস্থলে আনা হল। আমরা হাঙ্গামাকারীদের পেছন দিয়ে গিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে লাগলাম। প্রায় আট ঘণ্টা পর সন্ধে সাতটা নাগাদ পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে এল। এই ঘটনায় ছটা ট্রাম একদম ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল, সরকারি ও বেসরকারি অনেক গাড়ির প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। প্রায় আশি জন আহত হল, তার মধ্যে পুলিশ কর্মচারীই ষাট জন, প্রায় দুশো জন লোককে গ্রেফতার করা হল।

সেদিন আমার আর সত্যেন ঘোষের প্রচেষ্টার সবাই খুব প্রশংসা করলেন। পরদিন কলকাতার সব পত্রপত্রিকায় বিশেষ করে দি স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকায় আমাদের নামে লেখা বের হল। এতবড় ঘটনায় একটাও কিন্তু বুলেট খরচ হয়নি। কোন সাধারণ মানুষকে মরতে হয়নি। যে আশি জন আহত হল, তার মধ্যে ষাট জনই পুলিশ। ক্ষিপ্ত জনতাকে দমন করা যায় শুধু ধৈর্য ধরে, এই ঘটনা তার জলজ্যান্ত উদাহরণ।

এরপর থেকে মুচিপাড়া থানায় সিনিয়র অফিসাররা আমাকে বিশেষ চোখে দেখতে শুরু করলেও আমি কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে শিখতে চাইতাম সবসময়ই, কিভাবে সোর্স ধরে রাখা যায়, লালনপালন করা যায় এবং তাদের কথায় কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পরবর্তীকালে আমার চাকরি জীবনে এই মাস্তানদের ভেতর সোর্স তৈরি করার ব্যাপারটা খুবই কাজে লেগেছিল।

মাস্তান ও সমাজবিরোধীদের মধ্যে থেকে সোর্স না তৈরি করলে, আমরা পুলিশেরা অপরাধীদের খবর পাব কোথা থেকে? সাধারণ মানুষ তো আর অপরাধ জগতের খবরাখবর রাখে না। তাই অন্ধকার দুনিয়ার ভেতর থেকেই আমাদের সোর্স তৈরি করতে হয়। যে পুলিশ অফিসার যত বেশি অপরাধ জগতের সঙ্গে সুকৌশলে যোগ রাখতে পারবে সে তত বেশি অপরাধী ধরতে পারবে। পুলিশের চাকরি তো আর মন্দিরের পুরোহিতের কাজ নয় যে ঈশ্বরের উপাসনা করলেই হবে। কিংবা পুলিশের চাকরি এও নয় যে সারাদিন অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে বসে রাহুল সাংকৃত্যায়ন বা শেক্সপিয়র আলোচনা করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এটা অনেকটা ঝাড়ুদারদের মত কাজ, তাকে নোংরা ঘাঁটতেই হবে। নোংরা না ঘাঁটলে সে আর কি করে নোংরা পরিষ্কার করবে? অপরাধ জগতের ভেতর ভালরকম সোর্স না থাকলে পুলিশি কাজকর্ম চালানই মুশকিল। পুলিশ তো আর জ্যোতিষি নয় যে হাত গুনে বলে দেবে কোথায় কোন অপরাধী লুকিয়ে আছে বা কোথায় কবে কোন অপরাধ ঘটবে। পুলিশকে এক অপরাধীর মাধ্যমেই অন্য অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হয়। আমার পুলিশি জীবনে এমন বহুবার ঘটেছে যে বড় বড় মাস্তানদের থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ সব খবর পেয়েছি যা দিয়ে বড় বড় তদন্তের কিনারা করতে পেরেছি।

ট্রাক ডাকাতি

ষাট সত্তরের দশক জুড়ে অদ্ভুত ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটছিল মালদার একটা অঞ্চলে। উত্তরবঙ্গ থেকে চা, মশলা কিংবা অন্য দামি জিনিস নিয়ে যে সব লরি রাতে দক্ষিণবঙ্গের দিকে আসত, তার মধ্যে মাসে দু তিনটে ফারাক্কা পার হয়ে বেশ কিছুটা আসার পরই হাইওয়ের একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, নিঝুম জায়গায় উধাও হয়ে যেত। সেখানে পৌঁছলেই ড্রাইভারদের কি যে হত, লরি নিয়ে তারা নির্দিষ্ট পথে না গিয়ে অন্য পথে চলে যেত, যার খোঁজ কখনও কেউ পেত না। আতসবাজির ফুলঝুরির মত শূন্যে মিলিয়ে যেত, যেন বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল। লরির মালিকেরা পুলিশের সাহায্যে বহু খোঁজ নিয়েও ড্রাইভার, খালাসি কিংবা লরির হদিস পেত না। ড্রাইভার, খালাসিরা তাদের বাড়িতেও আর ফিরে আসত না, কোনও টাকাপয়সা, চিঠিপত্র, কিছুই পাঠাত না। এইভাবে চলে যেত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। মালিকও ড্রাইভার, খালাসিদের বিরুদ্ধে লরি নিয়ে বেপাত্তা হওয়ার অভিযোগ থানায় ডায়েরি করে অপেক্ষা করত কবে পুলিশ তার হারিয়ে যাওয়া লরি উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। কিন্তু অপেক্ষাই সার হত। তারপর সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে একসময় নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে ভুলে যেত সব।

পুলিশও কিছু বুঝতে পারত না, কোথায় কখন লরির ড্রাইভার লরি নিয়ে পালিয়ে গেল। তার ওপর মালিকেরা তো আর এক থানায় ডায়েরি করছে না। যে যে থানার এলাকা থেকে তারা গাড়ি ছেড়েছে, নিখোঁজের খবর লিখিয়ে আসছে সেই সেই থানায়। আর থানার কাছে লরি নিখোঁজের কেস খুব গুরুত্বপূর্ণ কেস নয়। সুতরাং পুলিশকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুসন্ধান করতে দেখা যেত না। কোনও কোনও মালিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু খবরাখবর হয়ত পেত, ফারাক্কা পর্যন্ত তার লরি দেখা গেছে এইটুকু খবর, তার বেশি কিছু তারা আর জানতে পারত না। তারা ড্রাইভার, খালাসিদের ধরার জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করতে যেত। ড্রাইভারদের মহল্লায় মহল্লায়, বাড়িতে, মদের আড্ডায়, কিংবা হাইওয়ের ধারে ধাবা ও গণিকালয়ে হানা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসত। মালিকেরা ভেবে পেত না তাদের এতদিনের বিশ্বস্ত ড্রাইভার, খালাসিরা কি করে এতবড় বেইমানি করল?

ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে ভালই যোগাযোগ থাকে, তাদের নিজস্ব খুব বড় এবং শক্ত সংগঠন আছে, তারাও নিখোঁজ হয়ে যাওয়া লরির কোনও খোঁজ দিতে পারত না। ড্রাইভারদেরও পরস্পরের সঙ্গে জানপহচান থাকে, কিন্তু কোনও ড্রাইভারই হারিয়ে যাওয়া অন্য ড্রাইভারদের হদিশ দিতে পারত না। আর এসব খবর কোনও পত্রপত্রিকাতে প্রকাশও হত না। ড্রাইভার লরি নিয়ে পালিয়ে গেছে, এটা কোনও খবরের মধ্যেই পড়ে না। ড্রাইভাররা তাদের অপরাধের কোনও চিহ্নই ফেলে রেখে যেত না। এত নিখুঁতভাবে তারা লরি ও শরির জিনিসপত্র নিয়ে অন্তর্ধান করত যে, ওই সব লরির কোনও অংশবিশেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যেত না। এমন কি যে সব বাজারে পুরনো ইঞ্জিন ও পার্টস বিক্রি হয় সেখানেও ওই সব লরির কোন কিছু পাওয়া যেত না।

এইসব নিখোঁজ হয়ে যাওয়া লরির কোনও খবরই কলকাতা পুলিশ রাখত না। কারণ এইসব কেসগুলো সবই রাজ্য পুলিশ এলাকায় হত। কলকাতা পুলিশের কেউ কেউ উড়ো খবরের মত এ খবরটা শুনেছিল, তার বেশি কিছু না। কিন্তু দায়িত্বশীল পুলিশের কাজই হচ্ছে শোনা খবরটা গুরুত্ব সহকারে সযত্নে মনে রাখা, যতদিন না সেই খবরের সত্যাসত্য সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে।

এভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, ওদিকে ম্যাজিকের মত একের পর এক উবে যায় লরি নিয়ে ড্রাইভাররা। সেসময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সত্তর দশকের নকশাল অভ্যুত্থানের ডামাডোলের মধ্যে কে, কোথায় লরি চুরি করে পালাল কে আর রাখে

তার খোঁজ?

আমার তখন অনেকদিন মুচিপাড়া, বড়বাজার, জোড়াসাঁকো থানা হয়ে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে পোস্টিং হয়েছে। গোয়েন্দা দফতরের সোর্সের বিরাট জাল ছড়িয়ে ছিল কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। তখন আমরা লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মচারী একটা টিম হিসেবে কাজ করতাম। কে কোন বিভাগ তার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতাম না। মার্ডার স্কোয়াডের, কি ডাকাতি, কি ছিনতাই বা অন্য ডিপার্টমেন্টের সেরকম হলেও কেস এলে সবাই মিলে একসঙ্গে তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করতাম। আমরা সবাই এক পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজেদের ভাবতাম ও অপরাধী ধরতে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তাই তখন সোর্সের জালটাও খুব ভালভাবে বিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল।

একদিন কলকাতার এক নামজাদা মাস্তান, আমার সোর্স, আমায় খবর দিল, মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের একটা লোক তার কাছে জার্মানির তৈরি 'বেটাগন' পিস্তল বিক্রি করতে নিয়ে এসেছিল। পিস্তলটা অত্যাধুনিক মডেলের, তাকে সে পিস্তলটা দেখিয়েওছে। আমার বিশ্বস্ত মাস্তান সোর্সটি অবশ্য সেটা কেনেনি, তাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছে।

খবর তো পেলাম। এবার যার খবর পেলাম তার গতিবিধি, কাজকর্ম, দলবলের পাত্তা লাগাতে তার পেছনে আমাদের লোক লাগিয়ে দিলাম। কদিন বাদে খবর পেলাম, সেই লোকটি অতি সাধারণ চেহারার, মাঝারি উচ্চতার। চোখে এত হাই পাওয়ারের চশমা যে মনে হয় কাঁচের বোতলের পেছনের দিকের দুটো ভাঙা কাঁচ যেন চোখে পরে আছে। নিচু স্বরে, বিনয়ের সাথে মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে। সে আবার মধ্যমগ্রাম অঞ্চলের কংগ্রেস পার্টির মাঝারি মাপের নেতা! তাকে একডাকে ওই অঞ্চলে সবাই চেনে। কিন্তু সে কি করে, ঠিক কোন কাজের সঙ্গে জড়িত তা কেউ বলতে পারল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ভয়েই হোক কিংবা শ্রদ্ধায়ই হোক তার বিরুদ্ধে কোনও কথা কেউ বলে না। প্রায় প্রতিদিনই সে ছ'সাত ঘণ্টার জন্য মধ্যমগ্রামের বাইরে কোথায় চলে যায় কেউ তা জানে না। কদিন বাদে আরও খবর পেলাম, তাকে কখনও দেখা গেছে নৈহাটি, কখনও বনগাঁ, কখনও বর্ধমান বা কলকাতা ও উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে। কিন্তু কোনও পুলিশের খাতায়ই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব খবরাখবর নিতে লাগলাম, বিভাগের অন্য কেউ জানে না। আমার লক্ষ্য 'বেটাগন' পিস্তলের সূত্র ধরে আরও বেশি অস্ত্র উদ্ধার করা যায় কিনা।

একদিন সকালবেলা আমি গাড়িতে করে আমার এক ওয়াচম্যানকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যমগ্রামের দিকে রওনা দিলাম। আমার সেই ওয়াচম্যান জানে সকালে সেই লোকটি কখন একটা চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে আসে। আমরা চায়ের দোকানের কাছাকাছি আসতে ওয়াচম্যান লোকটাকে দেখিয়ে দিল দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না, ওই লোকটা বেআইনি অস্ত্রের ব্যবসা করে। বরং পাঞ্জাবি, পায়জামা পরা লোকটাকে দেখে মনে হতে পারে গ্রামের কোনও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। হাত দুটো কোলের কাছে জড়ো করে নম্র গলায় মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে কথা বলে। আমি আমাদের ওয়াচম্যানকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, ওর ওপর নজর রাখাটা দরকার। অস্ত্র সমেত হাতেনাতে ধরতে হবে ওকে, কারণ ওর সাথে কংগ্রেসের বড় বড় নেতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাছাড়া শুধুমাত্র একটা খবরের ভিত্তিতে ওকে ধরা যাবে না। চারদিকে হৈচৈ ফেলে দেবে কংগ্রেসীরা। অন্যদিকে বুঝতে হবে, ওই লোকটা কোনও একটা জায়গায় হঠাৎ একটা পিস্তল পেয়ে বিক্রি করে দিতে চেয়েছে, নাকি অস্ত্রের কালোবাজারীটাই ওর আসল ব্যবসা। যদি হঠাৎ একটা অস্ত্র পেয়ে কারোকে বিক্রি করে হাত ধুয়ে ফেলে তাহলে ওকে ধরে কোনও লাভ হবে না, ছেড়ে দিতে হবে প্রমাণের অভাবে, উল্টে আমাদেরই বদনাম হবে। আর যারা ওই ব্যবসায় ওর সাথে জড়িত তারা তো আর বোকার মত আমাদের হাতে এসে ধরা দেবে না। গোটা দলকে ধরার জন্য ফাঁদ পাততে হবে, ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই পাখি ধরা পড়তে পারে। লোকটাকে মধ্যমগ্রামে

দেখে আসার পর মাথায় শুধু ঘুরতে লাগল কিভাবে ওই লোকটাকে ফাঁদে ফেলে ধরা যায়। নজরদাররা নতুন কোনও তথ্য দিতে পারছে না, শুধু কখন মধ্যমগ্রাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কখন ফিরছে, এসব খবর পাচ্ছি। অপেক্ষা করছি নতুন কোনও তথ্যের। এইভাবেই কটা দিন কেটে গেল। হঠাৎ বনগাঁ থেকে একটা ডাকাতির মামলায় একটা ছেলেকে গ্রেফতার করা হল। সেই ছেলেটা আমাদের প্রচণ্ড জেরার মুখে এমন সব অজানা তথ্য দিল যা শোনার জন্য আমরা নিজেরাই প্রস্তুত ছিলাম না। সেই তথ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক ছিল মধ্যমগ্রামের সেই লোকটার সম্পর্কে।

আগেই খবর পেয়েছি, প্রদেশ কংগ্রেসের পুরনো অফিসে প্রায়দিনই সে মধ্যমগ্রাম থেকে সন্ধেবেলায় আসে। নজরদারদের কাছে খবর নিলাম সে দিনও এসেছে। আমি আর দেরি না করে একটা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে সোজা প্রদেশ কংগ্রেসের ওই অফিসে চলে গেলাম। অফিসে ঢুকে খুঁজতে লাগলাম মধ্যমগ্রামের সেই পুরু চশমা লাগানো বিনয়ী লোকটাকে। এদিক ওদিক খুঁজতেই তাকে দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে বললাম, "এই যে মিঃ সমাদ্দার, আপনার সাথে আমার একটু প্রয়োজন ছিল।" সে আমাকে তাজ্জব বানিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার রুণুদা?" আমি ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলাম, ও আমাকে চিনল কি করে? কোনদিন তো ওর সাথে আমার পরিচয় হয়নি। তবে বুঝলাম, আমি ঠিক লোককেই ধরতে এসেছি, কারণ পেশাদার অপরাধী না হলে পুলিশ অফিসারকে চিনে রাখার প্রয়োজন কি? আমি তাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে শুধু বললাম, "একটু অফিসের বাইরে আসুন, বলছি।" সে ঘাড় নাড়ল, "চলুন।" সে আমার সঙ্গে কংগ্রেস অফিসের বাইরে আসতে আমি বললাম, "আপনাকে আমার সাথে একটু লালবাজারে যেতে হবে, একটা আসামীকে ধরেছি, সে বলছে সে নাকি মধ্যমগ্রামে কংগ্রেস পার্টি করে, তার কথাটা ঠিক কিনা আপনি দূর থেকে ছেলেটাকে দেখে বলে দেবেন।" বিনয়ী সমাদ্দার বলল, "এই কথা, এর জন্য আপনি আবার ছুটে এলেন কেন, কারোকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলেই তো আমি চলে যেতাম।" কথা বলতে বলতে সে আমার গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি ছুটে চলল লালবাজারের দিকে। সমাদ্দার চুপচাপ, নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে, মুখ দেখে ওর মনের প্রতিক্রিয়া আমি জানতে পারছি না। কিন্তু আমার মনের মধ্যেও অসংখ্য প্রশ্ন জাগছে। ভাবছি, যে কারণে ওকে ধরে নিয়ে এলাম, সেই চেষ্টায় সফল হব তো? উদ্ধার করতে পারব তো ওর থেকে অস্ত্রশস্ত্র, ধরতে পারব তো দলের অন্য সব লোকেদের? তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সমাদ্দার খুব ঠাণ্ডা মাথার ক্রিমিনাল, আমাকে সে আগের থেকে চিনে রেখেছে, হয়ত আমার মত বহু অফিসারকেই সে চেনে। সবচেয়ে বড় কথা সে যে চিনে রেখেছে তা কিন্তু তার আচরণে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাচ্ছে না, উল্টে মৌনীবাবা হয়ে আমার সঙ্গে লালবাজারে যাচ্ছে। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এক প্রকৃত দেশসেবক গান্ধীবাদী কংগ্রেসী, পুলিশকে সাহায্য করার জন্য নিজের কাজ ফেলে দেশের সেবায় লাগতে যাচ্ছে।

গাড়ি এসে থামল লালবাজাবের গোয়েন্দা বিভাগের বড় বিল্ডিংটার নিচে। দুজনেই গাড়ি থেকে নামলাম। সমাদ্দারকে বললাম, "চলুন।" সমাদ্দার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শুরু করল। আমি তার পেছন পেছন উঠতে লাগলাম। অফিসে ঢুকতেই সমাদ্দার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় সেই ছেলেটা রুণুদা?" আমি তার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আমাদের বিভাগের অন্য অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এই হচ্ছে মিঃ সমাদ্দার, একে পেছনের অফিস ঘরটায় নিয়ে যাও, চা খেতে দিও, বেশি যদি ওর খিদে পায় তবে 'টা'ও দিও।" সমাদ্দার আমার কথা শুনে খুব নম্র স্বরে বলল, "না, না, আমার খিদে পায়নি, কিছুক্ষণ আগেই খেয়েছি।" আমি আবারও ওর কথার জবাব না দিয়ে অফিসারদের বললাম, "আমি একটু বেরচ্ছি, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আসব।"

গাড়ি নিয়ে ঘুরছি এদিক ওদিক, চলে গেলাম গঙ্গার ধারে, ভাবছি, আমাদের অফিসাররা সমাদ্দারের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পেরেছে কি না। যদিও জানি অফিসাররা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড দক্ষ, সমাদ্দারের কাছ থেকে সত্যি কথাটা বের করে ছাড়বেই, সমাদ্দারের

পালানর পথ নেই। গঙ্গার হাওয়ায় উত্তেজনা কিছুটা ঠাণ্ডা করে ফিরে এলাম লালবাজারে। ততক্ষণে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। নিজের ঘরে ঢুকতেই এক অফিসার এসে বললেন, “সমাদ্দার সব স্বীকার করেছে।” যে ঘরে সমাদ্দার ছিল সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি, সমাদ্দার বিধ্বস্ত, ওর চশমাটা টেবিলের ওপর রাখা। বুঝলাম শুধু 'চা-য়ে' সে স্বীকার করেনি, টা'ও কিছু খেয়েছে। আমাকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, “আমাকে বাঁচান রুণুদা, আমি আর কিছু করব না, সব ছেড়েছুড়ে দেওয়ার মুখেই আমি ধরা পড়লাম।” আমি কড়া গলায় বললাম, “বাঁচতে চাস তো কোথায় কোথায় তোর আর্মস রাখা আছে, আজ রাতেই দেখিয়ে দে। আর তোর দলের লোকেদের কোথায় পাওয়া যাবে আমাদের বল।” সমাদ্দার বলল, "ঠিক আছে, বলছি।”

এরপর সমাদ্দারকে নিয়ে আমাদের একটা দল চলে গেল গোপন অস্ত্র উদ্ধার করতে, অন্য একটা দল গেল সমাদ্দারের দেওয়া ঠিকানা নিয়ে ওর শাগরেদদের সন্ধানে। গভীর রাতে প্রথম দলটা লালবাজারে ফিরে এল বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে, সমাদ্দারই তার গুপ্ত ডেরায় নিয়ে গিয়ে সেইসব দেখিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল রিভলবার, পিস্তল, কার্বাইন ভোজালি। অস্ত্রগুলো দেখে বললাম, “আর কোথায় কি আছে সমাদ্দার?” সমাদ্দার মাথা নিচু করে বলল, “আর নেই, যা ছিল সবই দেখিয়ে দিয়েছি।” আমাদের দ্বিতীয় দলটা ফিরে এল তারও অনেক পরে। তারা কারোকে গ্রেফতার করতে পারেনি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নিয়ে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই কয়েকদিনের মধ্যে মধ্যমগ্রামের এক জায়গা থেকে গ্রেফতার করলাম দুবে নামে একটা ছেলেকে আর নৈহাটির এক পাড়া থেকে ধরলাম ভাইয়াকে। দলের অন্য লোকেরা ওদের ধরা পড়ার খবর শুনে কোথায় আত্মগোপন করেছে, তার খোঁজে আমাদের একটা দল ব্যস্ত রইল।

এবার আমরা ধৃত তিনজনকে নিয়ে পড়লাম, আসল রহস্য উদ্ধারে। আমরা তিনজনকে আলাদা আলাদা ভাবে জেরা করতে শুরু করলাম, যাতে কে কি বলছে, তা অন্যজনে জানতে না পারে। একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে খেপিয়ে দিলাম, যাতে সত্যি কথা সব বেরিয়ে আসে। এটা পুলিশের একটা চালু পদ্ধতি। আমাদের জেরায় জেরবার হয়ে ওরা ওদের কীর্তিকাহিনী যা শোনাল তা পুলিশ মহলকে স্তম্ভিত করে দেওয়ার মত।

ওই বিনয়ী তাত্ত্বিক নেতার ভড়ং ধরা সমাদ্দারই ছিল ওদের দলের একচ্ছত্র নেতা। পুরো দলটাই তার হাতে তৈরি। বেকার ছেলেদের এক এক করে লোভ দেখিয়ে টেনে এনে নিজের দল তৈরি করেছে। নিজেই টাকা যোগাড় করে রিভলবার, পিস্তল কিনেছে। দল যখন তৈরি হল, অস্ত্রও কেনা হল, তখন সমাদ্দার দলের সব ছেলেকে একদিন মধ্যমগ্রামের একটা মাঠে গভীর রাতে ডাকল। ওর পরিকল্পনার কথা বলল। সমাদ্দার তাদের বোঝাল, সাধারণ ডাকাতি করলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু শহর থেকে অনেক দূরে ডাকাতি করে এখানে পালিয়ে এলে কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না। সে বলল, “তাই আমি ঠিক করেছি বহুদূরে কোথাও গিয়ে আমরা আমাদের কাজ করে রাতারাতি ফিরে আসব। সেই অনুযায়ী সব তৈরি, তোমরা আগামীকাল সন্ধে ছটার মধ্যে এখানে সবাই চলে আসবে, তারপর আমরা রওনা দেব।”

সমাদ্দারের কথায় সবাই রাজি হয়ে গেল। পরদিন সন্ধে ছটার আগেই সবাই হাজির। সমাদ্দার সঙ্গে এনেছে দুটো বড় বড় কিটস ব্যাগ। তার ভেতরেই সে নিয়ে এসেছে অস্ত্রশস্ত্র। সমাদ্দার দলে নিয়েছিল দুটো পাকা লরি ড্রাইভারকে। তাদের নিয়ে সে এগিয়ে গেল কিছুটা দূরে দাঁড় করান একটা লরির দিকে। একজন ড্রাইভারের হাতে লরির চাবিটা দিল, ছেলেদের বলল লরিতে উঠে পড়তে, তারপর সে ড্রাইভারের পাশে বসে বলল, “চল।” রাস্তায় একটা পেট্রল পাম্প থেকে ট্যাঙ্কভর্তি ডিজেল নিয়ে নিল। কৃষ্ণনগর ছাড়িয়ে একটা জায়গায় সমাদ্দার গাড়ি দাঁড় করিয়ে দলের সমস্ত লোককে ডেকে ওর পুরো ছকটা বলল। সবাইকে কাজের ভার বুঝিয়ে দিয়ে আবার লরি ছেড়ে দিল। লরি দ্রুতগতিতে ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়ল মালদা জেলায়।

ফারাক্কা থেকে বেশ খানিকটা আগে হাইওয়ের ওপর একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার জায়গায় সমাদ্দার ড্রাইভারকে বলল গাড়ি থামাতে, তারপর গাড়ি থেকে নেমে প্রত্যেককে হুঁশিয়ার করে বলল, “যখন তখন আমাদের মাল এসে যেতে পারে, সবাই রেডি হয়ে নাও।” এরপর কিটস ব্যাগ খুলে সবার হাতে ধরিয়ে দিল অস্ত্র, নিজে রাখল একটা পিস্তল, আর কোমরে গুঁজে নিল একটা ভোজালি। অন্ধকার রাত চিরে ওদের, লরির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য লরির দল। সমাদ্দার আর ওদের দলের প্রত্যেকেই রাস্তার ওপর নজর রাখছে। এইভাবে কেটে গেল আধঘণ্টা। হঠাৎ একটা লরিকে দ্রুতগতিতে হেড লাইটের তীব্র আলো জ্বেলে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তক্ষুণি সমাদ্দার বলে উঠল, “চার্জ।” ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করল। হেডলাইটটা একবার জ্বালাচ্ছে, একবার নেবাচ্ছে, যাতে উল্টো দিক থেকে ছুটে আসা লরিটা ওর সিগন্যালে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে নিজের গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়। সমাদ্দারের নির্দেশে ড্রাইভার রাস্তার ডানপাশ চেপে লরি নিয়ে চলেছে, যাতে বিপরীত দিকের লরিটা পাশ কাটিয়ে বের হওয়ার জায়গা না পায়।

উত্তরবঙ্গের দিক থেকে আসা লরিটা বাধ্য হয়ে গতি কমিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমাদ্দারদের লরিটা ওই গাড়ির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতেই সবাই লাফ মেরে রাস্তায় নেমে ঘিরে ধরল লরিটাকে। সবার হাতেই কিছু না কিছু আগ্নেয়াস্ত্র। ঝটপট ড্রাইভার আর খালাসিকে টেনে নামিয়ে নিল ওরা। চিৎকার করে উঠতেই দুটো ভোজালি নেমে এল দুজনের গলায়। বন্ধ হয়ে গেল চিৎকার, লুটিয়ে পড়ল দুটো রক্তাক্ত দেহ। কাটা পাঁঠার মত দুবার হাত পা ঝটকা দিয়ে স্থির হয়ে গেল। তারপর ওদেরই কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে তুলে দেওয়া হল নিজেদের ফাঁকা লরিতে। সমস্ত কাজটাই হয়ে গেল তিন চার মিনিটের মধ্যে। ওদিকে মালবোঝাই গাড়িতে উঠে গেছে সমাদ্দারের ড্রাইভার। গাড়িতে বোঝাই চায়ের বাক্স। নিজেদের গাড়ি একটু পিছিয়ে নিয়ে এসে ওই গাড়িটাকে জায়গা দিল বেরিয়ে যাওয়ার। লাশ দুটোকে ঢেকে দেওয়া হল ত্রিপল দিয়ে। দুটো গাড়িই বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সমাদ্দার চা বোঝাই লরিতে ড্রাইভারের সাথে অন্য একটা ছেলেকে তুলে দিল, তারা তার নির্দেশ মত চলে গেল বিহারে। সমাদ্দার নিজেদের লরিটা নিয়ে মধ্যমগ্রামের রাস্তা ধরল। বেশ অনেকটা আসার পর রাস্তার ধারে একটা পানাভর্তি খালে চটের বস্তায় লাশ দুটো ভরে, ইঁট বেঁধে ফেলে সে রাতেই ওরা ফিরে এল মধ্যমগ্রাম।

কিন্তু এই ডাকাতিটা সমাদ্দারের নিজের তেমন পছন্দ হল না। লাশ দুটো দিন দশ পর ইঁটের বস্তার বাঁধন ছিঁড়ে জলে ভেসে উঠেছিল, অবশ্য এত পচাগলা হয়ে গিয়েছিল যে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে চায়ের দামও ভাল পাওয়া যাযনি, ডাকাতি করা লরিটা প্রায় স্ক্র্যাপের দরে বিক্রি করতে হযেছিল।

সমাদ্দার এবার তার ছকটা পাল্টে ফেলল। প্রথম যে লরি নিয়ে ডাকাতি করতে গিয়েছিল, সেটা ছিল ভাড়া করা। এটা তার ঘোর অপছন্দ। এবার তাই সে একটা পুরনো লরি কিনে নিল। তারপর চলে গেল বিহারে। সেখানে গিয়ে সে এবার লরি ও ডাকাতির জিনিস কেনাব লোক আগে থেকেই ঠিক করে এল।

সমস্ত ছকটা আবার নতুনভাবে সাজিয়ে এক অমাবস্যার রাতে লরি নিয়ে সমাদ্দারের দল পৌঁছে গেল আবার মালদা জেলার হাইওয়ের ওপর সেই জায়গাটায়। তারপর নিজেদের গাড়িটার মুখ ঘুরিযে দক্ষিণে করে গাড়ির আলো নিবিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল কখন আসবে একা কোনও মালবোঝাই লরি। সাধারণত রাতে হাইওয়েতে দল বেঁধে লরি যাতায়াত করে ডাকাতির ভয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে দুএকটা লরি দলছুট হয়েও ছোটে, আর সেগুলোই সমাদ্দারের লক্ষ্যবস্তু। ওরা গাড়ি নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় নেমে সমাদ্দার দেখছে শিকার ফাঁদে পা দিতে এল কিনা। রাত দশটা নাগাদ দেখতে পেল একটা গাড়ি দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। তার ইশারায় ড্রাইভার গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে রাখল। যেই ওই মালবোঝাই গাড়িটা ওদের গাড়িকে টপকে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সমাদ্দারদের গাড়িও ওই লরিটার পিছু ধাওয়া করল।

প্রায় আধ কিলোমিটার পথ পার হয়ে সমাদ্দারদের গাড়ি মালবোঝাই লরিটাকে ওভারটেক করে দাঁড়িয়ে পড়ল তার সামনে। লরিটা প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে দাঁড়াতে বাধ্য হল। সমাদ্দারদের লরির পেছন থেকে নেমে দাঁড়াল দুজন লোক ওই লরির ড্রাইভারের দিকে স্টেনগান তাক করে, আর অন্য চারজন পিস্তল, রিভলবার উঁচিয়ে ঘিরে ফেলল ড্রাইভারের কেবিন। সমাদ্দার ড্রাইভারের কেবিনে উঠেই তার মাথায় সজোরে আঘাত করল রিভলবারের বাঁট দিয়ে। ড্রাইভাব নেতিয়ে পড়তেই ওকে সমাদ্দার টেনে নামিয়ে নিল রাস্তায়। অন্যদিকে খালাসি ও একটা বাচ্চা ছেলেকে ততক্ষণে নামিয়ে নিয়েছে শাগরেদরা। বাচ্চা ছেলেটা ড্রাইভারের ভাই, লরিতে করে যাচ্ছিল কলকাতা দেখতে। তিনজনকেই ওরা টানতে টানতে নিয়ে গেল নিজেদের লরির পেছনে, খালাসি একবার কি বলে উঠতেই ধাঁই করে ওর মুখে পড়ল সমাদ্দারের ঘুষি। চাপা গলায় সমাদ্দার বলে উঠল, "চোপরাও, দোনস্বরী মাল লেকে যাতা হ্যায়, ফিন বাত নিকালতা।" ড্রাইভার আধো চেতনায় কোনওমতে বলল, "দুনম্বরী মাল নয়, কেবিনে সব চালান আছে।" সমাদ্দার আর ওর শাগরেদরা ততক্ষণে ওদের ঠেলে তুলে দিয়েছে নিজেদের লরিতে। তারপর পিছমোড়া করে হাত বেঁধে দিয়ে একই দড়ি দিয়ে তিনজনকে বেঁধে বসিয়ে দিয়ে লবি ছুটিয়ে দিয়েছে। মালবোঝাই লরিটা নিয়ে তখন সমাদ্দারের পাকা ড্রাইভার আর এক শাগরেদ চলতে শুরু করেছে বিহারের দিকে। বিহারে কথাবার্তা সব পাকা আছে। এবার দামও ভাল পাওয়া যাবে। লরিতে আছে মশলাপাতি। সমাদ্দারের ড্রাইভারের গলা দিয়ে গান বেরিয়ে এল।

ওদিকে সমাদ্দার তার গাড়ি নিয়ে ছুটছে মধ্যমগ্রামের দিকে। পেছনে তার লোকেরা স্টেনগান উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে তিনজন বন্দিকে। ড্রাইভারটা একবার কাতর গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বাবু?" সমাদ্দারের পাহারাদার শাগরেদ বলল, "কলকাতা।" লরি চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। বাচ্চাটা ভয়ে কুঁকড়ে আছে। মাঝে মাঝে চোখ বড় করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, হয়ত ভাবছে কলকাতায় বেড়াতে গেলে এইভাবেই যেতে হয়। ড্রাইভার একবার কোনমতে মিনমিন করে বলল, "আমাদের যা ইচ্ছে করুন, আমার ভাইকে ছেড়ে দিন।" পাহারাদার ওকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়ে মুখে মারল পরপর কটা ঘুষি। নাক, মুখ ফেটে গেল ড্রাইভারের, সে কথা বন্ধ করে দিল।

অন্ধকার রাস্তায় হু হু করে ছুটছে লরি। মধ্যরাত পার করে লরি এসে পৌঁছল মধ্যমগ্রামে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে সর্বাধিনায়ক সমাদ্দার। এবার লরি মধ্যমগ্রামের মূল রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে একটা কাঁচা রাস্তা ধরল। গাড়ি এবার আর আগের মত গতিতে ছুটতে পারছে না। আস্তে আস্তে বসতি শেষ হয়ে গেল। রাস্তার দুধারে বড় বড় প্রাচীন গাছ। গাছে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য পাখি, কাঠবেড়ালি, গিরগিটি, তক্ষক সাপ যারা প্রহরে প্রহরে ডাক দিয়ে সঙ্গীসাথীদের জানায় ভোর হতে আর ঠিক কত দেরি। এই গভীর গহন রাতে আচমকা লরির আওয়াজের আক্রমণে আর হেডলাইটের তীব্র আলোয় ওরা ভয় পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে ডাকতে শুরু করল। লরির সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল দুটো শেয়াল। যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাঁচা রাস্তায় সমাদ্দারের লরি দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল।

কালো আকাশের গায়ে মেঘের আস্তরণ সরিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে, কিছু নক্ষত্র, যেন তারা গভীর কৌতূহলে দেখছে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সমাদ্দাররা ওই অসহায় তিনটি প্রাণীকে। এভাবে প্রায় দু কিলোমিটার চলার পর লরি থামল একটা জায়গায়। জায়গাটা ঘিরে আছে জংলি ঝোপ, বড় বড় গাছগুলোকে মুড়ে রেখেছে লতানো গাছ, অসংখ্য বাঁশ ঝাড়। বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে মাঝেমাঝে নিঃস্তব্ধতা ভেঙে শব্দ হচ্ছে ক্যাঁকর ক্যাঁকর, ক্যাকর ক্যাঁক। চারদিকে থমথমে জমাটবাঁধা অন্ধকার। সমাদ্দার আর তার সঙ্গিরা লরি থেকে নামিয়ে নিল বন্দিদের। তারপর তাদের কোমরের লম্বা দড়ি ধরে টানতে টানতে লাইন দিয়ে নিয়ে চলল অন্ধকার পথ ধরে। দড়ির সামনের দিক ধরে আছে একজন, পেছন দিক অন্যজন। যেন তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোনও আদালতে বিচারের জন্য। সমাদ্দার খোলা রিভলবার হাতে সবার সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার শাগরেদদের সবার হাতেই

স্টেনগান, নয়তো রিভলবার কি পিস্তল।

চারদিক জঙ্গল অন্ধকারে চোখ সইতেই দেখা গেল কিছুটা খোলা জায়গা, দিয়ে ঘেরা। জমিটা অসমান। মাঝে মাঝে পুরনো বুজে যাওয়া গর্ত। প্রখর দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বহুদিন আগেকার আধপোড়া কাঠ। মাঠের চারপাশে স্তূপ স্তূপ অন্ধকার ঝোপে ঝোপে আটকে আছে। বোঝাই যায় এ মাঠে দিনের বেলাতেও যাতায়াত করে না মানুষজন। হঠাৎ এই অমাবস্যার নিশুতরাতে অনাহূতের আগমনে আতঙ্কিত হয়ে ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে বেজি, ব্যাঙ, শেয়াল। সমাদ্দাররা তাদের তিন বন্দিকে নিয়ে এসে দাঁড়াল ওই মাঠের মাঝখানে। খালাসিটা জিজ্ঞেস করল, "এ আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছেন বাবু?" সমাদ্দারের এক শাগরেদ তার উত্তরে খালাসিটার ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরে বলল, "যমদুয়ারে।" সত্যিই ওটা যমদুয়ার। ওটা একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত শ্মশান। সাঁঝেরহাট শ্মশান।

শ্মশানের মাঝখানে একটা গাছের তলায় ওদের এনে বসিয়ে দিল সমাদ্দাররা। দড়ির দুই প্রান্ত বেঁধে দিল গাছের দুই বিপরীত ডালে, যাতে ওরা ছুটে পালিয়ে না যেতে পারে। বাচ্চা ছেলেটা তার ড্রাইভার দাদাকে কি একটা বলতে যেতেই সমাদ্দারের বুটের সপাট কিক খেয়ে ককিয়ে উঠে শুয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর সমান্দাররা শ্মশানের বাঁদিকে চলে গেল, ওখানে ঝোপের আড়ালে রাখা আছে স্তূপীকৃত নতুন কাঠ। কাঠের পাশেই কোদাল, কুড়ুল, শাবল ইত্যাদি মজুদ। সমাদ্দারের নির্দেশে ওর দুই শাগরেদ পাশের দুই পুরনো গর্তকে কোদাল দিয়ে নতুন করে খুঁড়তে শুরু করল। হাতখানেক গর্ত হতেই সমাদ্দার তাদের থামিয়ে দিল। তারপর দ্রুত হাতে দুটো গর্তের ওপর কাঠ দিয়ে সাজাতে লাগল চিতা। দুটো চিতাই সাজান হয়ে গেলে ওরা ফিরে এল বন্দীদের কাছে। বন্দি তিনজন তখন বলির পাঁঠার মত দড়ি বাঁধা অবস্থায় অন্ধকার মাঠে বসে কাঁপছে। ভয়ে ওরা বসে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। এরাই রাতের অন্ধকারে অসীম সাহসে বুক বেঁধে হাইওয়ে দিয়ে বড় বড় মালবোঝাই লরি চালিয়ে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে যায়, এখন দেখলে বোঝা মুশকিল।

সমাদ্দাররা ওদের টানতে টানতে নিয়ে এল চিতার কাছাকাছি। ড্রাইভারটা কাতর কণ্ঠে সমাদ্দারকে বলল, "বাবু আমাদের যা ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু আমার ছোট ভাইটাকে ছেড়ে দিন।" উত্তরে সমাদ্দারের হাতের স্টেনগান গর্জে উঠল। ধুপ ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল পরপর তিনটি দেহ। চিতা তৈরি করাই আছে। শাগরেদরা দেহগুলো তুলে দিল চিতায়। ড্রাইভার আর তার আদরের ভাইকে সমাদ্দার দয়া করে একটা চিতায় তুলল, খালাসিকে অন্য চিতায়। টপটপ করে রক্ত পড়ছে চিতার কাঠে। সবাই মিলে দ্রুত হাতে লাশ দুটোর ওপর চাপাতে লাগল আরও কাঠ। তারপর দুটো চিতায় ধরিয়ে দেওয়া হল আগুন। আস্তে আস্তে চিতা দুটোর কাঠ জ্বলে উঠল, আগুনের আভায় দেখা যেতে লাগল শ্মশানের চারদিক।

অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখায় চারদিকের ঝোপে আর গাছে ঘুমিয়ে থাকা পাখিরা, ছোট ছোট জন্তু-জানোয়াররা ভয় পেয়ে বেরিয়ে এল। ডাকতে লাগল এমন স্বরে যেন বলতে চাইছে, "এ কোন নতুন পশু আমাদের আস্তানায় রাতের অন্ধকারে হানা দিল?" তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে বাচ্চাটার দেহ। নতুন কাঠ পেয়ে আগুনের তীব্রতা বেড়ে গেল। পুরো শ্মশানের চিত্রটাই দেখা যাচ্ছে। চিতার শিখা হাওয়ার দোলায় পাশের ঝোপঝাড়েও ধরিয়ে দিল আগুন। পাখিদের ক্রমাগত আর্তনাদে নিঃঝুম অঞ্চলটা খানখান। তাঁরা যেন আর্তনাদে জানতে চাইছে পৃথিবীর কাছে, কেউ কি কখনও দেখেছে এমন নিষ্ঠুর, হিংস্র, চরম পাশবিক মৃত্যু। নিজের জন্য বানানো চিতার সামনে দাঁড়িয়ে খুন হয়ে সাথে সাথে সেই চিতায় পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া? সমাদ্দারের এক সঙ্গী বলল, "ড্রাইভার দাদার চিতায় ভালই মানিয়েছে ওকে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে চিতার আগুনে ড্রাইভার, খালাসি আর বাচ্চার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তক্ষক সাপটা প্রহর শেষের ডাক দিয়ে জানান দিল ভোর হল বলে। সমাদ্দারের শাগরেদরা শ্মশানের পাশের পুকুর থেকে বালতি করে করে জল এনে নিবিয়ে দিল চিতা দুটো। তারপর সবাই হাত ধুয়ে দেখে নিল সব কাজ ঠিকঠাক শেষ হয়েছে

কিনা। ওদের নিয়ে লরি ছেড়ে দিল। ভোরের হাওয়ায় চিতার ছাই উড়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা শ্মশানের মাঠে, আশেপাশের ঝোপঝাড় ও বড়বড় গাছের পাতায়। ওই ছাইয়ের মধ্যেই মিশে রইল ড্রাইভার, খালাসি আর বাচ্চাটার মৃত্যুযন্ত্রণা।

লরি ফিরতে শুরু করলে সমাদ্দারের মন অনেকটা শান্ত হল। সে তার অস্ত্রশস্ত্রের কিটস ব্যাগ গুছিয়ে নিল। মুখে অল্প অল্প হাসি দেখা দিতে শাগরেদরাও আশ্চর্য হয়ে গেল। কাজের মধ্যে কোনরকম হাসিঠাট্টা চলবে না, এরকমই নির্দেশ ছিল দলের ছেলেদের ওপর। লরি মধ্যমগ্রামে পৌঁছলে তারা নেমে যে যার বাড়ির পথ ধরল। দিন দুই পর সন্ধেবেলায় সমাদ্দারের দুই শাগরেদ বিহার থেকে ফিরে এল লরি ও মশলাপাতি বিক্রির টাকা নিয়ে। তখন সমাদ্দার কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে, লম্বা খদ্দরের পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরে একটা মিটিংয়ে যাচ্ছিল গান্ধীজীর অহিংস নীতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে। সমাদ্দার শাগরেদদের কাছ থেকে টাকাপয়সা নিয়ে, যথাস্থানে রেখে, ওদের নির্দেশ দিয়ে দিল কে, কোথায়, কখন তার সাথে দেখা করবে।

নির্দিষ্ট দিনে সবাই মিলে খুব খানাপিনা হল। গ্যারেজে তখন নিজেদের লরি চেকআপ করা হচ্ছে, চুটিয়ে ব্যবসা করতে হলে বাহনকে চাবুক ফর্মে রাখতে হবে তো। ওদিকে তখন বিহারে আড়তদারের কাছে বিক্রি করা মশলাপাতি চালান হয়ে গেছে বিভিন্ন দোকানে। দোকান থেকে সেসব সাধারণ মানুষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে বান্নার স্বাদ বাড়ানর জন্য। কেউ কি জানে ওই মশলায় মিশে আছে তিন তিনটে তাজা প্রাণের রক্ত? বিক্রি করা লরিটার পাল্টে গেছে নম্বর প্লেট, দেহের সাজসজ্জায় এমন পরিবর্তন হয়েছে যে খোদ মালিকও চিনতে পারবে না। যদিও সে তখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার লরি, ড্রাইভার আর খালাসিকে।

মাসখানেক বাদে আবার এক রাতে সমাদ্দাররা পৌঁছে গেল মালদার হাইওয়ের সেই জায়গায়। সেদিন আর ওদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এবার যে লরিটা তারা ওই একই কায়দায় আটকাল, সেটা একদম ঝকঝকে নতুন চা বোঝাই টাটা গাড়ি। ভেতরে বড় কেবিন। লরিতে ড্রাইভার ও খালাসি ছাড়াও ছিল আরও চারজন, সঙ্গে একটা একেবারে দুধের শিশু। ওই চারজনের মধ্যে দুজন পুরুষ, দুজন মহিলা। এরা সবাই ওই লরিতে উঠেছিল প্যাসেঞ্জার হিসেবে। শেষ বাস চলে যেতে তারা বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায় হাত দেখিয়ে থামিয়ে লরিটাতে উঠেছিল, যেরকম হাইওয়েতে আকছার হয়।

সমাদ্দাররা ড্রাইভার আর খালাসিকে প্রথমে টেনে নামিয়ে নিল রাস্তায়, ওরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সাথে সাথে ওদের মুখের ওপর পড়ল সমাদ্দারের ঘুঁষি। স্টেনগান, পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমাদ্দারের শাগরেদরা। কে পাল্টা মারার সাহস পাবে? ঘুষি খেয়ে ড্রাইভাররা চুপ করতেই তাদের তুলে দেওয়া হল নিজেদের লরিতে। পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হল হাত। ওদেরই গামছা দিয়ে ওদের মুখ বেঁধে দেওয়া হল। ওদিকে কেবিন থেকে সমাদ্দার তার শাগরেদরা টেনে নামাল চারজনকে। তারা ভয় পেয়ে চিৎকার করতে লাগল। চারপাশে খোলা ধূ-ধূ অন্ধকার মাঠ, জোনাকিরা মাঝে মাঝে টুকটুক আলো জ্বালিয়ে আরও ভয়ার্ত করে তুলেছে পরিবেশ। অন্ধকার ভেদ করে ওদের আর্তনাদ এমন কোনও জায়গায় পৌঁছবে না যাতে সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসতে পারে। তবু সাবধানের মার নেই। ওদের এলোপাথাড়ি ঘুষি মেরে চুপ করিয়ে দিল সমাদ্দাররা। এইসব গণ্ডগোলের মধ্যে দুধের বাচ্চাটা ঘুম-ভাঙা কান্না জুড়ে দিয়েছে। সেই কান্না শুনে কোনও এক রাতজাগা পাখি মাথার উপর ঠ্যাঁ ঠ্যাঁ করে ডাকতে শুরু করল, বোধহয় ঈশ্বরকে।

চা বোঝাই লরি নিয়ে ততক্ষণে সমাদ্দারের ড্রাইভার ছুটতে শুরু করে দিয়েছে বিহারের দিকে। এখন আর কারোকে কিছু বলতে হয় না। শাগরেদরা জানে কার কি ডিউটি। এদিকে চার যাত্রীকে রিভলবার উঁচিয়ে টানতে টানতে সমাদ্দার তুলে ফেলেছে নিজের লরিতে। তারপর ড্রাইভার আর খালাসিকে যেমনভাবে পিছমোড়া করে বেঁধে, মুখ বেঁধে দেওয়া

হয়েছিল তেমনি এদেরও জোড়ায় জোড়ায় বেঁধে দেওয়া হল। লরি ছাড়া হল মধ্যমগ্রামের দিকে। হু হু করে লরি ছুটছে, বাচ্চাটা বলের মত এদিক ওদিক ওলোটপালোট খাচ্ছে। ওর কান্না বন্ধ হয়ে এল, বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।' ওর মা তখন অন্য মহিলার সাথে একই দড়িতে বাঁধা, অঝোরে কাঁদছে, কিন্তু বাচ্চার ওই অবস্থা দেখেও কিছুই করতে পারছে না। এমনকি চিৎকার করে কাঁদতেও পারছে না, মুখ বাঁধা। সমাদ্দারের শাগরেদরা স্টেনগান, রিভলবার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

মধ্যরাতের আগেই এসে গেল মধ্যমগ্রাম। তারপর সেই সাঁঝেরহাট শ্মশানের পথ ধরল লরি। গাড়ির গতি এবার কমে গেল। কিছুটা সেই কাঁচা রাস্তায় চলতেই পাশের একটা নিচু গাছের ডালে ধাক্কা লাগল। গাছের মধ্যে ঝুলে থাকা বাদুড়গুলো উড়তে লাগল। একটা বাদুড় ঝুপ করে পড়ল লরির মধ্যে। এর গায়ে ওর গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে উড়ে গেল অন্ধকার জঙ্গলের দিকে। বাঁশঝাড়ের শব্দ, পাতার খসখস আওয়াজ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। ঘন অন্ধকার বাঁশ ঝাড় থেকে শেয়ালরা বেরিয়ে ছুটতে লাগল এদিক ওদিক। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল বন্দিরা। লরি পৌঁছে গেল শ্মশানের কাছে। লরির ডালা খুলে দুজন দুজন করে নামিয়ে কোমরের দড়ি ধরে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানের মাঠে। মাঠের পাশে বেঁধে রাখা হল তাদের। তারপর যে ঝোপের আড়ালে কাঠের স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে সমাদ্দার, সেখানে গিয়ে তিনটে চিতা দ্রুত সাজাতে লাগল শাগরেদরা। আগের দুটো চিতার থেকে কিছু আধপোড়া কাঠ পাওয়া গেল। চিতায় কাঠ চাপিয়ে তাতে ঢেলে দিল পেট্রোল। আগেরবার পেট্রোল না আনাতে চিতা জ্বালাতে সমাদ্দারের একটু অসুবিধে হয়েছিল।

চিতা সাজান হলে পরপর দাঁড় করিয়ে স্টেনগান দিয়ে গুলি করে মারল হতভাগ্য ওই ছ'জনকে। তিনটে চিতাতে তুলে দিল লাশগুলো। তখন চারদিকে এক দমচাপা নৈঃশব্দ। পাখিরা, শেয়ালরা, বেজিরাও লজ্জায় লুকিয়ে পড়েছে কোথায়। আকাশের নক্ষত্ররা কেন জেগে আছে? কি দেখছে তারা? আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। সমাদ্দার শ্মশানের মাঠ পেরিয়ে চলে এল লরির কাছে। লরির ওপর পড়ে আছে কচি শিশুটা। তার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে। ডালা খোলাই আছে। সমাদ্দার নিচ থেকেই বাচ্চাটার পা ধরে টেনে নামিয়ে নিল। তারপর কাটা মুরগির মত ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। তৃতীয় চিতার সামনে এসে ফুটবলের মত ছুঁড়ে দিল তাকে। বাচ্চাটা আগুনের মধ্যে হয়ত খুঁজে পেল তার মৃত মায়ের কোল। কয়েকটা কাঠ ফাটার আওয়াজ হল, শাগরেদরা বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোড়াতে লাগল লাশগুলো। তিনটে চিতার দাউদাউ আগুনে চারদিক উদ্ভাসিত, সাঁঝেরহাট শ্মশান যেন তার হারানো দিন ফিরে পেয়েছে। সেই আগুনের শিখায় সমাদ্দারদের জান্তব চোখগুলো চকচক করছে।

এদিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ভোর। দাউদাউ আগুণ নিভে গমগম করে জ্বলছে কাঠ। চিতা সাজাতে আর তাতে সময়মত কাঠের যোগান দিয়ে চিতাকে সক্রিয় রাখতে ওরা যে কোনও শ্মশান কর্মচারীর থেকেও বোধহয় দক্ষ ছিল। সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে চিতায় জল ঢেলে ওরা লরি নিয়ে চলে এল, অস্ত্র পাঠিয়ে দিল গোপন ডেরায়। তারপর নিশ্চিন্ত মনে মিশে গেল সমাজে।

ঠিক সময়ে বিহার থেকে চা ও নতুন লরি বিক্রির টাকাও চলে এল সমাদ্দারের হাতে। রাতে ঢালাও ফূর্তি। কিন্তু দিনে সাবধান, একদম ভদ্রলোক সেজে থাক যে যার এলাকায়। কোনও লোকের সাথে কখনও ঝগড়া করবে না। দলের সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিল সমাদ্দার, "এ লাইনে টিকে থাকতে হলে, কারও সাথে চোখ তুলে কথা বলবে না, অপরিচিত কারও সাথে আড্ডায় বসবে না, আর কোথায় কখন কি করতে যাচ্ছ কারোকে বলবে না, এমনকি বাড়ির লোকজনকেও না।"

কিন্তু যাদের আপনজন হারিয়ে যাচ্ছে তারা কি করবে? চারদিকে খোঁজখবর করে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরেও কোনও লাভ হচ্ছে না।

বছরের পর বছর, একের পর এক সমাদ্দাররা চালিয়ে গেছে নৃশংস অভিযান। মালদার ওই অঞ্চল থেকে হাওয়া করে দিয়েছে লরি, ড্রাইভার, খালাসি আর যাত্রীসমেত। ততদিনে সাঁঝেরহাট শ্মশানের নাম খ্যাত হয়ে গেছে সমাদ্দার শ্মশান নামে। শ্মশানের চারদিকে এমনিতেই কোনও বাড়িঘরদোর ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে চিতার আগুন জ্বলছে মানুষ দূর থেকে দেখত। কিন্তু কারও কোনদিন সাহস হয়নি, সামনে এসে দেখে কাকে দাহ করা হচ্ছে। সমাদ্দার ছিল সাক্ষাৎ নরখাদক যমদূত। ওর কাজের সাক্ষী হয়ে থাকার কোনও সুযোগ কাউকে দিত না। "তুমি ওর কাজ দেখে ফেলেছো, তাহলে চলে যাও বয়ান দিতে সোজা যমরাজের কাছে।" সমাদ্দারের ঐ রকম সাদাসিধা ভোলেভালা চেহারাটা ডাকাতি আর খুন করার সময় হয়ে উঠত হিংস্র রাক্ষুসে। ক্ষমাহীন শক্তিধর পশুর মতন। চোখের পলকে মানুষের গলায় চালিয়ে দিত ভোজালী কিংবা পিস্তল।

ওদের নৃশংসতা বাড়ছিল দিনের পর দিন। একবার সমাদ্দার একই কায়দায় মালদার ওই একই অঞ্চলে হাইওয়ের ওপর থামাল একটা লরি। লরিটা গাড়ির নানা পার্টস নিয়ে কলকাতা থেকে যাচ্ছিল উত্তরবঙ্গের দিকে। সেই গাড়ি থেকে সমাদ্দাররা নামাল ছজনকে। তারপর তাদের মারতে মারতে নিয়ে গেল নিজেদের লরির কাছে। টেনে তুলে নিল লরিতে। বাঁধাছাদা করে নিয়ে এল সেই সাঁঝেরহাট শ্মশানে। তারপর ক্ষিপ্র হাতে সাজিয়ে ফেলল পাশাপাশি তিনটে চিতা। সমাদ্দার তার শাগরেদদের নির্দেশ দিল ছজনকে নিয়ে এসে একই দড়ি দিয়ে পরপর বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিতে। ওরা তাই করল। এবার মারার কায়দাটা আরও চমৎকার! সমাদ্দার রাইফেল বের করল, তারপর প্রথম জনের বুকে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে চালিয়ে দিল গুলি। একসঙ্গে পড়ে গেল বাঁধা ছটা দেহ। রাইফেলের একটা মাত্র গুলি পরপর ছজনের বুক ভেদ করে চলে গেছে। সমাদ্দারের কাছে এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট। ছজনই মাটিতে পড়ে যেতে রাইফেলটা কাঠের স্তূপের পাশে রেখে উল্লাসে নেচে উঠল সে। তারপর চিতায় তুলে দেওয়া হল লাশগুলো।

সমাদ্দারের রাজত্ব ভালই চলছিল। দিনে মধ্যমগ্রামের মানুষের কাছে কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয় নেতা। আর অন্ধকারে নিজের বানান জগতে সে হিটলার। কত লরি যে সে ডাকাতি করেছে, কত মানুষকে খুন করেছে, সে নিজেও সঠিক হিসেব বলতে পারবে না। কিন্তু মুশকিল বাধল যখন সে তার কারবার গুটিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করল। প্রায় দু দশক ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে সমাদ্দার যখন দেখল বয়স বেড়ে গেছে, অনেক টাকা করে ফেলেছে, তখন সে গোটাতে গেল তার ব্যবসা। সে তার অতিরিক্ত অস্ত্র বিক্রি করতে শুরু করল। ওই অস্ত্র বিক্রি করতেই সমাদ্দার এসেছিল কলকাতার এক কুখ্যাত মাস্তানের কাছে, যার কাছ থেকে আমি প্রথম তার খবর জানতে পারি। তারপর বনগাঁর ছেলেটার কাছ থেকে পাই ওর আসল কাজের হদিস। এরপরই আমি গ্রেফতার করি ওকে।

আমরা সমাদ্দারের বিরুদ্ধে বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে আদালতে চার্জশিট দিলাম। সেই মামলায় ওর আর ওর দলবলের সাজা হল। তারপর সমাদ্দারদের আমরা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে তুলে দিলাম, হাইওয়েতে লরি ডাকাতি ও খুন করার অভিযোগে মামলা করার জন্য। তখন এক জুনিয়র অফিসার আমাকে বলল, "স্যার একে যদি সত্তর দশকে ধরতে পেতাম!" আমি জুনিয়র অফিসারের মুখের দিকে তাকালাম, তারপর ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "তোমার মনের কথাটা আমি বুঝি, কয়েকশ লোককে খুন করে দিব্যি ভাল মানুষ হয়ে আদালতে যাচ্ছে, তা তোমার মন মানতে চাইছে না, কিন্তু আমাদের তো কিছু করার নেই। দেখো, ও বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, কারণ কোনও জায়গাতেই ওর বিরুদ্ধে কোনও ডায়েরি নেই, সাক্ষী তো নেইই। কিসের ভিত্তিতে মামলা হবে?" আমার কথাটাই সত্যি প্রমাণিত হল, সমাদ্দাররা খালাস পেয়ে গেল। কারণ ওদের বিরুদ্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও সাক্ষী পাওয়া গেল না। শুধুমাত্র অস্ত্র রাখার অপরাধে যেটুকু সাজা হয়েছিল, তা খেটেই জেল থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

জেল থেকে বেরিয়ে সমাদ্দার অবশ্য আর অপরাধ জগতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ

পায়নি। আমি কিন্তু আমার সেই মাস্তান সোর্সকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানালাম। ওর জন্যই বেঁচে গেল আরও অনেকগুলো জীবন আর ওর জন্যই উদঘাটিত হল মালদা - ফারাক্কা বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্য।

প্রকৃতপক্ষে, পুলিশকে কাজের স্বার্থেই সমাজের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। সেখানে বাছবিচার করলেই মুশকিল। আসল কথা হল, পেশাদারি মনোভাব। সেখানে ঘাটতি হলেই অপরাধীরা সুযোগ নিয়ে নেবে। একটা ঘটনা বলি। একবার লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের তখনকার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দেবী রায় এক পুরনো সিপাইকে ডেকে নির্দেশ দিলেন এক ছিঁচকে চোরকে ধরে নিয়ে আসার। সিপাইটা তক্ষুণি লালবাজার থেকে বেরিয়ে সন্ধের সময় ঐ ছিঁচকে চোরটাকে ধরে নিয়ে এসে সোজা দেবীবাবুর সামনে হাজির করল। চোরের তখনও ঘোর কাটেনি, তার আগের দিনই সিপাইটা তার কাছ থেকে একশ টাকা ঘুষ নিয়ে এসেছে। দেবীবাবুর সামনে এসে সে তাই সরাসরি সিপাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল, "স্যার, গতকালই ও আমার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে এসেছে, আর আজ দেখুন আমায় ধরে নিয়ে এল।" সিপাইটা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার কাছ থেকে একশ টাকা নিয়েছিলাম কারণ গতকাল তোমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না। কিন্তু আজ আছে, সাহেবের নির্দেশে তোমাকে ধরে নিয়ে এসেছি।" ছিঁচকে চোরটা ছিল ওই সিপাইয়ের চেনা, সিপাইটা মাঝেমধ্যেই ওর কাছ থেকে টাকা নিত। সে ভাবত সিপাইকে যখন টাকা দিচ্ছে, তখন সে নিরাপদ। যখন তাকে সিপাইটা ধরে নিয়ে এল সে প্রথমে বুঝতেই পারেনি সত্যি তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। সিপাইটা ওর থেকে টাকা নিত ঠিকই, কিন্তু নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে চোরকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসে সে পেশাদারি আনুগত্য দেখাল। তার কাছ থেকে সব চুরির মালই পাওয়া গেল। একদিন আমি দেবীবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "সিপাইটাকে সাজা দিলেন না কেন?" দেবীবাবু বললেন, "একশ টাকা সে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারচেয়ে আনুগত্যের মূল্য অনেক বেশি। তাই ওকে সাজা দিলাম না।"

অন্য একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখন বড়বাজার এলাকায় ডকের থেকে আসা বিদেশি চোরাই জিনিসপত্র, জামাকাপড়, যন্ত্রাংশ ও প্রসাধনের হরেকরকম সামগ্রীর বিরাট বাজার ছিল। অভিযান চালিয়ে ওই সব স্মাগলিং করা জিনিসপত্রের ব্যবসায়ী নরসিং লাখোটিয়াকে ধরলাম। একেবারে অল্প বয়স। পরে ওকে আমি আমার সোর্স বানিয়ে ফেলেছিলাম। ওর মাধ্যমে ডক অঞ্চলের অনেক খবর পেয়েছিলাম। সেইসব খবরের ভিত্তিতে বিভিন্ন দিনে হানা দিয়ে প্রচুর চোরাই জিনিস উদ্ধার করেছিলাম। নরসিং লাখোটিয়ার মত অতুল সাহাও একই ব্যবসা করত। তখন অবশ্য তার বয়স হয়ে গেছে, সে ছিল আমাদের সিনিয়র অফিসার মনোরঞ্জন ব্যানার্জির সোর্স। সেও একসময় মনাদাকে অনেক খবর দিয়েছিল।

একদিন সকালবেলা দেবীবাবু আমাকে ডেকে বললেন, "রুণু, অতুল সাহাকে চেন?" আমি বললাম, "হ্যাঁ স্যার চিনি।" দেবীবাবু বললেন, "ওকে এক্ষুণি ধরে নিয়ে এস, ওকে পি. ডি. অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করার অর্ডার এসেছে।" তখন প্রভিশন্যাল ডিটেনশন অ্যাক্টে বিনা বিচারেই জেলে কমপক্ষে একবছর আটকে রাখা যেত। আমি দেবীবাবুর নির্দেশ শুনে তক্ষুণি একটা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়েই আমার মনে হল, অতুল সাহার মত নরসিংয়ের বিরুদ্ধেও নিশ্চয়ই পি. ডি. অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করার আদেশ আছে। আরও মনে হল, যেহেতু সে আমার সোর্স সেজন্য দেবীবাবু ওকে গ্রেফতারের দায়িত্ব আমাকে না দিয়ে মনাদার সোর্স অতুল সাহাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা মনে হতে প্রথমেই আমি সোজা চলে গেলাম নরসিংয়ের বাড়ি, তাকে বাঁচানর উদ্দেশে। নরসিংকে গিয়ে বললাম, "এক্ষুণি কলকাতা ছেড়ে পালাও, তোমাকে বোধহয় পি.ডি. অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করার আদেশ আছে।" নরসিং আমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, "কিন্তু স্যার, আমি তো আপনাদের সাহায্য করছি। সব খবরাখবর দিচ্ছি।" আমি বললাম, "সেজন্যই আমি তোমাকে আগাম সতর্ক করে দিলাম, যাতে তুমি পালিয়ে যেতে পার। একবার অ্যারেস্টের নির্দেশ এসে গেলে

কারও কিছু করার থাকবে না, তাই বলছি পালাও।”

আমি নরসিংকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা অতুল সাহার বাড়িতে গেলাম। ওকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এসে দেবীবাবুর চেম্বারে হাজির করলাম। অতুল সাহা দেবীবাবুকে বলল, “স্যার, আমি কি দোষ করেছি? আমি তো আপনাদেরই একজন, মনোরঞ্জনবাবুকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কতদিন ধরে আপনাদের কাজ করে আসছি।” দেবীবাবু উত্তরে বললেন, “তা জানি, কিন্তু আমরা সরকারের নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। এখন জেলে থাকুন, উপায় নেই।”

অতুল সাহা আর কি করবে, আমার সঙ্গে দেবীবাবুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল। আমি তাকে আমাদের অফিস ঘরে বসিয়ে রাখলাম। তখনই দেখি মনাদা বাইরে থেকে এসে সোজা দেবীবাবুর ঘরের দিকে যাচ্ছেন।

আমার কৌতূহল হল, মনে হল, দেবীবাবু যেমন অতুল সাহাকে আমায় ধরতে পাঠিয়েছেন, ঠিক তেমনি মনাদাকে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন নরসিংকে গ্রেফতার করতে। আমি তাই মনাদার পেছন পেছন দেবীবাবুর চেম্বারে ঢুকলাম। মনাদা ঢুকেই দেবীবাবুকে বললেন, “নরসিংহরে পাইলাম না, ব্যাটা বোধহয় পলাইছে, বাড়ি নাই।” মনাদা খাঁটি পূর্ববঙ্গের লোক, সবসময় বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন।

আমার আশঙ্কাই ঠিক হল, দেবীবাবু মনাদাকে পাঠিয়েছিলেন নরসিংকে গ্রেফতার করতে। যাক, এ যাত্রায় আমি আমার সোর্সকে বাঁচিয়ে দিলাম।

কিন্তু মুখে আমি বললাম, “সে কি, পেলেন না?” দেবীবাবু মনাদাকে বললেন, “আপনি নরসিংকে পেলেন না, কিন্তু রুণু তো অতুল সাহাকে ধরে এনেছে।” আমি দেবীবাবুকে বললাম, “স্যার আমি একবার দেখব, নবসিংকে পাই কিনা?” মনাদা বললেন, “পাইবা না।” দেবীবাবু বললেন, “চেষ্টা করতে দোষ কি, দেখ তো রুণু তুমি নরসিংকে পাও কিনা।”

আমি তো জানি নরসিংকে পাব না, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করছেই। সেটা ঢাকার জন্যই দেবীবাবুকে কথাটা বললাম। তাঁর নির্দেশ পেয়ে আমি তখন মনাদার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জমাদার গৌরকে নিয়ে একটা জিপে করে বেরিয়ে পড়লাম। গৌরকে সঙ্গে নিলাম এই জন্য যে, আমি সত্যিই নরসিংকে ধরতে নরসিংয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, যেন গৌরের মাধ্যমে মনাদা খবরটা পান।

নরসিংয়ের বাড়িতে গৌরকে নিয়ে পৌঁছে গেলাম। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার নরসিংকে পেয়ে গেলাম। বললাম, “চল, নরসিং আমার সাথে লালবাজার।” নরসিং আমার কথা শুনে বোকা বনে গেল, কোনমতে বলল, “সে কি স্যার, আমি আপনার কথা মতই তো পালিয়ে গিয়েছিলাম, আর এখন ধরে নিয়ে যেতে এসেছেন!” গৌর আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না, দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চাপা গলায় বললাম, “তখন তোমাকে ধরার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি, আমি একটা অনুমান করে তোমায় সাবধান হতে বলেছিলাম, এখন আর উপায় নেই, আমার সঙ্গে যেতেই হবে।” নরসিং প্রায় কেঁদেই ফেলল, “স্যার আমি বালি ব্রিজ পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখি পালাবার তাড়াহুড়োতে টাকাপয়সা নিতেই ভুলে গিয়েছি। আবার বাড়ি ফিরে এসে সেসব গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় আপনি এলেন।”

আমি হাসব না কি করব বুঝতে পারছি না, তবু মুখটাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, “তখন পালাতে পারলে পালাতে, এখন আর উপায় নেই, একবছর জেলে থাক, তারপর দেখা যাবে।” নরসিং আর কি বলবে, আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি নিয়ে আমরা ছুটলাম লালবাজার। লালবাজারে এসে নরসিংকে নিয়ে সোজা দেবীবাবুর চেম্বারে। দেবীবাবু নরসিংকে দেখে বললেন, “এই তো রুণু পেয়ে গেছে।” তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় পেলে?” আমি বললাম, “কেন স্যার, ওর বাড়িতেই।” গৌরের কাছ থেকে মনাদা খবর পেয়ে গেছেন ততক্ষণে, আমি নরসিংকে ধরে নিয়ে এসেছি।

মনাদাও দেবীবাবুর চেম্বারে এসে ঢুকলেন। মনাদা নরসিংকে দেখে অবাক আমাদের পেশাদারীত্বের আনুগত্যই ছিল এরকম। নিজেদের কাজের স্বো সোর্সকে বাঁচানোর চেষ্টা করব ঠিকই কিন্তু সরকারী আদেশ কখনও অমান্য করব না। অপরাধীকে অবাধে অপরাধ করতে কখনও দেব না। সে তুমি হুলোই হও, সোর্সই হও, এমন কি নিজেদের বাড়ির লোকই হও না কেন।

দেবীবাবু আর মনাদার কাছ থেকেই আমরা সোর্স তৈরি করে, তাকে কিভাবে লালনপালন করতে হয় তার বিশেষ কায়দা শিখেছি। যখন কাজের চাপ কম থাকত তখন মনাদার কাছ থেকে আমরা অতীতের গোয়েন্দাগিরির গল্প শুনতাম। তাঁরা কি কি উপায়ে জটিল সব কেসের সমাধান করেছেন, কিভাবে দুর্ধর্ষ আসামীদের গ্রেফতার করেছেন, সেইসব মন দিয়ে শুনতাম, শিখতাম। মনাদার কথা মনে পড়লেই এখনও শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। তখন দেবীবাবু আর মনাদাই ছিলেন গোয়েন্দা দফতরের প্রাণপুরুষ। তাঁদের যুগলবন্দিতে কঠিন কাজটাও সহজ হয়ে যেত। কোথায়, কোন স্তরে ছিল না তাঁদের সোর্স! আমরা যখন ষাটের দশকে গোয়েন্দা দফতরে এসেছিলাম, তার আগে তো বটেই, পরবর্তীকালেও আমাদের নিজস্ব সোর্স তৈরি করার আগে পর্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগ প্রায় পুরোপুরি ওদের সোর্সের খবরের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আমরাও তো আর চটজলদি একদিনেই সোর্সের জাল বুনতে পারিনি, ধীরে ধীরে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিলাম। তখনও পর্যন্ত দেবীবাবু আর মনাদার সোর্সই ছিল সম্বল। মনাদা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই ভীষণ প্রিয় ছিলেন। মনোরঞ্জন ব্যানার্জির নাম জানত না এমন কোনও ক্রিমিনাল কলকাতা বা তার আশেপাশে ছিল না। অথচ আমরা অবাক হয়ে দেখেছি, এরকম এক দক্ষ কর্মীর বিরুদ্ধেও কিভাবে হিংসার জ্বালায় বদনাম রটাচ্ছে পুলিশেরই কেউ কেউ। তখনকার দিনে সাংবাদিকরা কুৎসা রটনার ব্যাপারে এত উৎসাহী ছিলেন না বলে মনাদা আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। মনাদা অবশ্য ওই সব গুজব রটনাকে আমলই দিতেন না। নিজের মত নিজের কাজ নিয়েই থাকতেন। যেমন পূর্ববাংলার ভাষাটা তিনি কোনদিনও ত্যাগ করেননি, ঠিক তেমনি কাজের বেলাতেও কোনদিন অবহেলা করেননি। সেই মনাদাই হঠাৎ একদিন বিপাকে পড়ে গেলেন। আর বিপাক বলে বিপাক! তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর তার আশেপাশে সমাজবিরোধীদের একটা দল খুব সক্রিয় হয়েছিল। মাঠে যেসব প্রেমিক প্রেমিকা মশগুল হয়ে গল্পগুজব করত, ওই গুণ্ডারা তাদের কাছে এসে নানারকম ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে টাকাপয়সা আদায় করত। তাদের দৌরাত্ম্যে প্রেমিক প্রেমিকারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ঠিক করা হল ওই সব সমাজবিরোধীদের হাতে নাতে ধরা হবে। সেই অনুযায়ী তিনজন করে পুরুষ ও মহিলা পুলিশ অফিসারকে প্রেমিক প্রেমিকা সাজিয়ে ভিক্টোরিয়ায় পাঠান হত রোজ। সমাজবিরোধীরা তাদের কাছে এসে টাকাপয়সা চাইলেই হাতেনাতে গ্রেফতার করা হত। এইভাবে বেশ কজনকে ধরা হলেও অত্যাচার কিন্তু চলতেই লাগল। এদিকে আমাদের অভিযানও অব্যাহত রইল।

একদিন মনাদার ওপর প্রেমিক সাজার দায়িত্ব পড়ল। তাঁর সঙ্গে মহিলা অফিসার শোভা দেবীর প্রেমিকা সাজার ডিউটি। মনাদা ও শোভা দেবী অন্য দুজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা অফিসারের সঙ্গে লালবাজার থেকে বিকেলে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় মনাদা দোকান থেকে একটা লাল গোলাপ কিনে নিয়ে গেলেন, যাতে জমিয়ে 'প্রেম প্রেম' খেলাটা করা যায়। ভিক্টোরিয়ার কাছে এসে আলাদা হয়ে এক এক জোড়া এক এক দিকে গেলেন। মনাদা ও শোভা দেবী ভিক্টোরিয়ার মাঠে ঢুকে একটা গাছতলায় মুখোমুখি বেশ গুছিয়ে বসলেন। মনাদা গোলাপ ফুলটা ঘাসের ওপর রেখে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, "এ বয়সে কি আর এইসব পোষায়?" মনাদার বেশ বলিষ্ঠ চেহারা ছিল। তিনি বেশিরভাগ সময়ই হাফহাতা জামা পরতেন। সেদিনও তাই-ই পরেছিলেন। তবু পঞ্চাশ বছর পার, বয়সের একটা ছাপ তো পড়বেই। শোভা দেবীরও মোটামুটি বয়স হয়েছিল। বয়স্ক প্রেমিক প্রেমিকার অভিনয়ে তাঁদের বেশ সুন্দর মানিয়েও গিয়েছিল। হয়তো দূর থেকে ছেলে ছোকরারা তাঁদের দেখলে মন্তব্যও করছিল, "বুড়ো বয়সের ভীমরতি।" মনাদা সিগারেটটা শেষ করে টুকরোটা দূরে টস করে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "আপদগুলান কি ঝামেলা যে পাকাইল, অখন মাঠে আইসা বইসা থাক।" শোভা দেবী বললেন, "ভালই তো, এমনিতে তো আর মাঠে আসেন না, এই সুযোগে একটু অক্সিজেন টেনে নিন।" মনাদা উত্তরে বললেন, "অক্সিজেন না ছাই, কেউ যদি

আমাগো দেইখ্যা ফেলে তখন কি হইবো।”

মনাদা এবার হাতে গোলাপ ফুলটা তুলে নিলেন, তারপর মাস্তানদের তাড়াতাড়ি কাছে টানার জন্য শোভা দেবীর গালে গোলাপফুলটা বোলাতে লাগলেন। ভালই জমেছিল, হঠাৎ তড়াক করে উঠে “আমি না, আমি না” বলে ছুটতে শুরু করলেন মনাদা। শোভা দেবী ওই ছোটাটাকে অভিনয়ের বিশেষ কৌশল ভেবে মনাদার পেছন পেছন, “ওগো কি হল গো, এমন করে ছুটছ কেন, বল না, কি হল তোমার” বলতে বলতে ছুটতে লাগলেন। মনাদা তবু বলেই চলেছেন, “আমি না, আমি না।” শোভা দেবীও হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, “আরে থামো, এমন কোর না, আমি যে আর ছুটতে পারছি না।”

মনাদা ছুটতে ছুটতে বেশ খানিকটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, গোলাপ ফুলটা তখন কোথায় পড়ে গেছে। শোভা দেবীও ছুটে মনাদার কাছে পৌঁছলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের সামনে হাজির, না, কোন গুণ্ডা নয়, দুজন ভদ্রমহিলা। সঙ্গে এক যুবক। ভদ্রমহিলাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়স্কা, অন্যজন অল্পবয়সী, সম্ভবত সঙ্গের যুবকের স্ত্রী। শোভা দেবী কোনমতে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন, “আরে আমাকে ফেলে ছুটছ কেন?” মনাদা শোভা দেবীকে প্রায় ধমকের সুরে বললেন, “চুপ করেন তো।” শোভা দেবী তখনও অভিনয়ের ঘোরেই রয়েছেন। অবাক হয়ে একটু কান্না কান্না ভাব করে বললেন, “সে কি তুমি আবার আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলছ কেন?” মনাদার তখন নিজের মাথার চুল টেনে ছেঁড়ার অবস্থা। মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে বললেন, “শোভা, ইনি আমার স্ত্রী, আর এরা আমার শালা আর শালার বৌ।” মনাদার কথা শুনে শোভা দেবী ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়ে দুহাত জড়ো করে বললেন, “তাই? নমস্কার বৌদি।” মনাদার স্ত্রী মানে আমাদের বৌদির মাথায় তখন আগুন, শোভা দেবীর দিকে সেই আগুন চোখ ছিটিয়ে দিয়ে মনাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আজ বাড়ি এস, দেখছি। ছি ছি, ডিউটির নাম করে এসব করে বেড়ান হচ্ছে। রোজ সকালে বেরনর সময় ভাত দিতে একটু দেরি হলে বল, তাড়াতাড়ি দাও, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিসের দেরি তা তো বুঝতেই পারছি। বাড়ি চল, বুড়ো বয়সের ভিমরতি আজ আমি ছাড়াচ্ছি।”

শোভা দেবী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, মনাদা বৌদিকে বোঝানর চেষ্টা করে যাচ্ছেন, “বিশ্বাস কর, এটা আমাগো ডিউটি, ইনিও পুলিশ অফিসার, আরও কজন আশে পাশেই আছে।” কিন্তু বৌদি কোনও কথাই শুনছেন না। বললেন, “ছাড়, কি ডিউটি তা তো আমি বুঝতেই পারছি। ভাগ্যিস ভাই আজ বাড়ি এসে বলল, চল দিদি একটু ভিক্টোরিয়ার দিকে বেড়িয়ে আসি, আমিও ওর কথায় রাজি হলাম। নয়তো জানতেই পারতাম না ডুবে ডুবে কত জল খাও তুমি।” শোভা দেবী মনাদার অবস্থাটা বুঝে বৌদিকে বোঝানর চেষ্টা করলেন, “বিশ্বাস করুন বৌদি, সত্যিই আজ আমাদেব এখানে ডিউটি পড়েছিল।” কিন্তু কে কার কথা শোনে, বৌদি ভাই, ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে গজরাতে গজরাতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। মনাদা বৌদিকে শান্ত করার শেষ চেষ্টা করলেন, ছুটে গিয়ে পেছন থেকে বললেন, “শুনছ, তোমরা কিছু খাইবা?” বৌদি মনাদার কথার কোনও উত্তর তো দিলেনই না, এমন কি পেছন ফিরে তাকালেনও না পর্যন্ত। যেমন হাঁটছিলেন, তেমনভাবেই চলে গেলেন।

অগত্যা মনাদা আর শোভা দেবী গুটিগুটি লালবাজারে ফিরে এলেন। বিধ্বস্ত মনাদা অফিসে এসে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। অন্য দুজোড়া অফিসার যাঁরা মনাদার সঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁরা তখনও ফেরেননি। শোভা দেবী তাঁর ঘরের দিকে চলে গেছেন। মনাদা চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, “এ হালার ডিউটি আর করুম না, বুড়া বয়সে কি উৎপাত।” আমরা কয়েকজন অফিসার ওখানে ছিলাম, বুঝলাম, বিশেষ কিছু একটা হয়েছে, নয়তো মনাদার মত ডিউটি অন্ত প্রাণ মানুষের মুখ থেকে ওই রকম কথা বেরবে এটা ভাবাই যায় না। আমাদের মধ্যে থেকে একজন মনাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কেন মনাদা কেউ কি আপনাদের দেখে আওয়াজ দিয়েছে?” মনাদার গলাটা প্রায় খুঁজে এল, “আওয়াজ ফাওয়াজ না, তার জন্য তো রেডিই ছিলাম, এ তার চেয়ে অনেক বড়

বিপদ।” আমি প্রশ্ন করলাম, “কিসের বিপদ?”

এতক্ষণে মনাদা খাঁটি মাতৃভাষা ফিরে পেলেন, “আর কইয়ো না, যাওনের সময় আমি একটা গোলাপফুল কিইন্যা লইয়া গেছিলাম। তা ভিক্টোরিয়ার একটা গাছের তলায় আমি আর শোভা গিয়া বইস্যা রইছি, বদমাইসগুলান যাতে তাড়াতাড়ি আইসা আমাগো ধরে তার জইন্য আমি শোভার গালে ফুল বুলাইতে লাগলাম, হঠাৎ মুখ তুইল্লা দেখি কি সামনেই তোমাগো বৌদি!” আমি বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করলাম, “বৌদি, ওখানে?” মনাদা হতাশ স্বরে বললেন, “হ, নয়ত আর কইলাম কি? তার ভাই, ভাইয়ের বৌয়ের লগে আর জায়গা পায় নাই ওইখানেই বেড়াইতে গেছে। ওগো দেইখ্যাই আমি আর কোনও দিকে না তাকাইয়া দৌড় দিছি, শোভা ভাবছে আমার দৌড়টাও বোধহয় অভিনয়, সেও ওগো শুনছ, ওগো শুনছ, পলাইও না, পলাইও না কইরা বকতে বকতে আমার পিছন পিছন ছুট দিল। তারপর অ্যাঙ্কারে বাঘের মুখে। তোমাগো বৌদি কোনও কথাই বিশ্বাস করে নাই, বাড়ি গেলে কি যে হইব।” মনে মনে মনাদার ওই হেনস্থার দৃশ্যটা ভেবে আমার হাসি পাচ্ছিল। মুখে বললাম, “ভাববেন না, কিছু হবে না, আমরা সবাই আজ একসঙ্গে আপনার বাড়ি যাব, সবাই মিলে বৌদিকে বুঝিয়ে আসব, আপনি সত্যিই ওখানে ডিউটিতে গিয়েছিলেন, অন্য কোনও ব্যাপার নয়।” মনাদা নিচু স্বরে বললেন, “বোঝলে হয়।”

রাত নটা নাগাদ আমরা পাঁচজন অফিসার মনাদাকে নিয়ে ওঁর বাড়ি গেলাম। দরজা খুললেন মনাদার শালা। আমরা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই বললাম, “বৌদি কোথায়? বৌদিকে একটু ডাকুন তো।” মনাদাও আমাদের সঙ্গে বসে রইলেন। বৌদি এলেন, মুখ থমথমে। আমি বললাম, “বৌদি আমরা আসামী ধরে নিয়ে এসেছি, যা শাস্তি দেবার দিন, বুড়ো বয়সে পদস্খলন, শাস্তি তো পেতেই হবে।” বৌদি ধরা গলায় বললেন, “বুড়ো বয়সে এইসব, আগে কি করেছে কে জানে, তখন তো টের পাইনি, ডিউটির নাম করে রাতবিরেতে কোথায় কোথায় যেত কে জানে।” মনাদা ছাড়া আমরা সবাই বৌদির কথা শুনে মুখ টিপে টিপে হাসছি। আমাদের মুখ দেখে বৌদি বোধহয় আরও রেগে গেলেন, কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, “আপনারা বুঝি ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন?” আমি হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, “ওকালতি কেন? আমরা তো আসামীকেই গ্রেফতার করে এনেছি। আপনি বসুন, বিচার করুন, আমরা সাক্ষী দেব।” মনাদা পরিবেশটা একটু হাল্কা করার জন্য শালাকে বললেন, “দেখ তো, এদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।”

আমি এবার বললাম, “বৌদি বসুন।” বৌদি কি বুঝলেন জানি না, সোফায় বসলেন। আমি বৌদিকে তখন আদ্যোপান্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বললাম। এতক্ষণে মেঘ সরল। বৌদি আমার কথা শুনে হেসে ফেলেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, “তখন ছুটল কেন?” তারপর হাসতে হাসতে বললেন, “আরে আমি তো প্রথম দেখিনি, আমার ভাই দেখেছে, হঠাৎ আমাকে ভাই বলল, আরে দিদি দেখ দেখ, জামাইবাবু কিরকমভাবে ছুটছে। আমি দেখলাম, তাই তো। আবার পেছন পেছন ওকে ধরার জন্য একজন মহিলাও ছুটছে। তখন আপনারাই বলুন, আমার কি অবস্থা, ভাই, ভাইয়ের বৌয়ের কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। ভাবছি, এমন তো কখনও শুনিনি, ভাবিনি ও কোনদিন, অথচ চোখের সামনেই দেখছি।” আমি বললাম, “আসলে শোভা দেবী মনাদার ছোটাটাকে অভিনয় ভেবে পেছন পেছন ছুটেছিলেন, তিনি তো বোঝেননি মনাদা প্রাণভয়ে ছুটছেন।”

বৌদি আমার কথা শুনে বোধহয় একটু লজ্জা পেলেন। ততক্ষণে আমাদের চা এসে গেছে। বৌদি তখনও হাসছেন, “আবার জানেন, আমি যখন চলে আসছি, পেছন থেকে ছুটে এসে আমাকে বলে কিনা, তোমরা কিছু খাইবা?” বৌদির কথা শুনে আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। তারপর হাসি থামিয়ে বললাম, “আপনি খেলেন না, আমরা কিন্তু একদিন জমিয়ে খাব।” বৌদি বললেন, “নিশ্চয়ই, আপনারা কবে আসবেন বলুন।” আমরা চা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছি। বললাম, “ঠিক আসব, মনাদাকে দিয়ে খবর পাঠাব।”

সেই খাওয়াটা কাজের চাপে আজও খাওয়া হয়নি। যন্ত্রের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে

মানুষ নিজেও যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্র সভ্যতার জমকালো রঙিন স্বপ্নে বিভোর মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের কাছ থেকে। আমিও পারছি কই নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আগের মত ওই খোলামেলা ঘুরে বেড়াতে? আগে যতই কাজ থাকুক বিজয়ার পর সব সিনিয়র অফিসারের বাড়িতে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আসতাম। যদিও অফিসে আমাদের রোজই দেখা হত কিন্তু বিজয়া অফিসে কখনও সারতাম না, বাড়িতে গিয়ে প্রণাম করতাম। তখনকার দিনে সিনিয়র অফিসার, জুনিয়র অফিসার বা অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল দাদা-ভাইয়ের মত। তাই প্রতিটা কাজেই আমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কে কত ভাল কাজ করতে পারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ঠিকই, কিন্তু সেখানে ঈর্ষার কালো চোখ ছিল না। “ভাল, আরও ভাল কাজ দেখানর” সুস্থ স্বাভাবিক গঠনমূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পেশাদারী প্রতিযোগিতা ছিল সেটা।

সিনিয়র অফিসারের বাড়িতে বিজয়া করতে যাওয়ার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি একবার ছুটি নিয়ে নেপাল বেড়াতে গেলাম। সঙ্গে আমার স্ত্রী, ছেলে, আর আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার উমাশংকর লাহিড়ী, সে তখনও বিয়ে করেনি। আমরা নেপাল যাব শুনে, গোয়েন্দা বিভাগের বড়সাহেব আমাকে আর লাহিড়ীকে ডেকে বললেন, "ছুটি তোমাদের দিতে পারি একটা শর্তে, যদি তোমরা পশুপতিনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে দাও আমার নামে।" আমরা বললাম, "নিশ্চয়ই দেব স্যার।" উনি মনে করিয়ে দিলেন, "ফুল, প্রসাদ আনবে কিন্তু।" আমি বললাম, "এটা কি আর বলতে হবে স্যার।" উনি খুবই ধার্মিক ছিলেন। সকালে পুজো না করে জলও খেতেন না।

আমরা নির্দিষ্ট দিনে রকসৌল দিয়ে নেপাল পৌঁছলাম। তারপর আমি আর লাহিড়ী কাঠমাণ্ডু, তার আশেপাশের বহু জায়গায় ঘুরলাম। খুব ফূর্তি করলাম, খাওয়া দাওয়া হল প্রচুর, ক্যাসিনোতে গিয়ে খেললাম। বৌ-বাচ্চার আবদার মেটালাম। অনেক ফটো তুললাম। মধ্যবিত্ত বাঙালি বেড়াতে গিয়ে যা যা করে আর কি! চাকরির পিছুটান নেই, বাঁধনহারা হয়ে সময়ের গণ্ডিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি কাটল। কিভাবে যে দশটা দিন উড়িয়ে দিলাম বুঝতেই পারলাম না। বুঝলাম যখন ফেরার টিকিটের তারিখটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। আমরা লোটাকম্বল গুটিয়ে ফেরার জন্য বাসে চেপে বসলাম। রকসৌল স্টেশনে কিছু যাত্রী প্রচণ্ড গণ্ডগোল করল, ঢিল ছুঁড়ে ট্রেনের জানলার কাঁচফাচ ভেঙে দিল। কোনমতে মাথা বাঁচিয়ে চলে আসতে পেরেছি।

হাওড়া স্টেশনে নামলাম। একটুও ভাল লাগছে না। এই কোলাহল, ঘিঞ্জি, নোংরা পরিবেশ। বেশ ছিলাম কিছুদিন, খোলা আকাশের তলায় নেপালের অপূর্ব প্রকৃতির মাঝখানে এক অন্যরকম জীবন কাটান। সেখানে হাত বাড়িয়ে যেন জীবনটা উপভোগ করা যায়, দেখা যায়, স্বাদ পাওয়া যায় বেঁচে থাকার। বেড়িয়ে এসে সবারই মনের ভাব বোধ হয় আমার মত হয়।

আমরা অলস পায়ে এগিয়ে চলেছি স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে। একটা ট্যাক্সি ধরে চলতে শুরু করলাম, আবার সেই ছোটাছুটির জীবনের দিকে, চাকরির গণ্ডিতে, লালবাজারে। লালবাজারের কথা মনে হতেই আমি তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, "দাঁড়াও দাঁড়াও।" তখন আমাদের ট্যাক্সি হাওড়া ব্রিজে উঠে গেছে। ড্রাইভার আমার আতঙ্কগ্রস্ত গলা শুনে অবাক হয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড় করাতে লাহিড়ীকে বললাম, "নাম, নাম।" লাহিড়ী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, "এখানে?" আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।" 'আমার মুখ চোখ দেখে লাহিড়ী বুঝল কিছু একটা হয়েছে, সে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে নেমে পড়ল। আমি ট্যাক্সির জানালায় ঝুঁকে স্ত্রীকে বললাম, "তোমরা বাড়ি চলে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।" আমার স্ত্রী এতদিনে আমার চলাফেরা, আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সবার স্ত্রীই বোধহয় হয়। আমার হঠাৎ মত পরিবর্তনে সে বুঝে গেছে বিশেষ একটা কিছু ঘটেছে। সে আর প্রশ্ন না করে ছেলেকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে একটা ফাঁকা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। পেছনে লাহিড়ী। ড্রাইভারকে বললাম, "শিয়ালদা চল।" লাহিড়ী একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু আমার বিরক্তি মাখা মুখ দেখে জানতে চাইল না, হঠাৎ কি হয়েছে, কেন আমি শিয়ালদা যেতে চাইছি।

শিয়ালদা পৌঁছে আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রাখলাম। নেমে হাঁটতে শুরু করেছি, এবার আর লাহিড়ী ধৈর্য রাখতে পারল না। তবে প্রশ্ন নয় কোন, শুধু বলল, "স্যার।" আমারও সংক্ষিপ্ত জবাব, "বড়সাহেব।" লাহিড়ী তাড়াতাড়ি এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বড়সাহেবকে খুঁজতে লাগল, না পেয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?" আমি সোজা চলতে চলতে বললাম, "লালবাজারে।" লাহিড়ী তখন জানতে চাইল, "তাহলে এখানে কি?" বুঝলাম, ওর স্মৃতিশক্তি আমার চেয়েও প্রখর! গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "লাহিড়ী তুমি কখনও ব্রাহ্মী

শাক খেয়েছ?” আমার প্রশ্ন শুনে লাহিড়ী অবাক হয়ে গেল, “কি শাক স্যার?” ওর কৌতূহলী মুখটা দেখে আমার এবার হাসি পেল, আর ভণিতা না করে বললাম, “তোমার কি মনে নেই, বড়সাহেব আমাদের পশুপতিনাথ মন্দিরে পুজো দিতে বলেছিলেন? আমরা কি দিয়েছি?” লাহিড়ী জিভ কেটে বলল, “তাই তো, এখন কি হবে?” আমি বললাম, “কি আর হবে? এখন যাচ্ছি সেই পুজো দিতে।” লাহিড়ী আশ্চর্য হয়ে বলল, “এখানে?” আমি শুধু মাথা নেড়ে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আমি যখন মুচিপাড়া থানায় ছিলাম তখন থেকেই চিনি, ওখানে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর ফটো পাওয়া যায়। আমি দোকানদারকে বললাম, “ভাই আমাকে একটা নেপালের পশুপতিনাথের ফটো দাও তো।” দোকানদার তার অজস্র দেবদেবীর ফটোর স্টক থেকে খুঁজে বার করল টিনের ওপর রং দিয়ে আঁকা পশুপতিনাথের ফটো। ফটোটা দেখে আমার ঠিক পছন্দ হল না। পশুপতিনাথ মন্দিরে আমি গিয়েছিলাম, পুজোটুজোও দিয়েছিলাম। পশুপতিনাথের মূর্তি দেখেছি, কিন্তু ছুটির আনন্দে লাহিড়ীর মত আমিও সে সময় বড়সাহেব, লালবাজার, চাকরি সব ভুলে বেমালুম হজম করে ফেলেছিলাম। তাই এখন ছোটাছুটি। ফটোটা হাতে নিয়ে দেখলাম, মূর্তির সঙ্গে মিলের থেকে অমিলই বেশি। তাই আমি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম, “ভাই, এটা পশুপতিনাথের ফটো তো?” দোকানদার জোর গলায় জানাল, “একশ ভাগ আসল।” এমনভাবে সে বলল যেন পশুপতিনাথকে স্বচক্ষে দেখেছে। আমি জানতে চাইলাম, “সে কি, দেবদেবীর ফটোর মধ্যে আবার আসল-নকল আছে না কি?” দোকানদার আমার বোকামি দেখে অবাক, “নেই? নতুন যারা এ লাইনে নেমেছে তারা যা সব ছবি আঁকায়, আপনার দেখে ভক্তিই আসবে না। আর আমরা তো এ লাইনে নতুন নয়, তিনপুরুষ ধরে আছি। ঠাকুর্দার আমল থেকে সব ঠাকুরের একই আদলে ছবি তৈরি করি, দেখলেই আপনার গড় করতে ইচ্ছে করবে।”

সত্যিই তাই, আমার তখন ওই টিনের ফটোটা নিয়ে গড় করতেই ইচ্ছে করছিল। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, “বাবা পশুপতিনাথ, বড় সাহেবের গালাগালির হাত থেকে তুমি বাঁচিও। তুমি না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে এ যাত্রা।” ফটোর দাম মিটিয়ে আমি আর লাহিড়ী ওই টিনের ফটোটা বুকে ধরে অন্য একটা দোকানের দিকে চললাম। ফুল, বেলপাতা, দূর্বা প্রসাদ কিনতে হবে তো! দোকানদারকে বললাম, “আমাকে কিছু দুচার দিনের পুরনো ফুল, বেলপাতা, নকুলদানা, বাতাসা দাও তো।” দোকানদার অবাক হয়ে বলল, “পুরনো ফুল তো নেই।” আমি বললাম, "ঠিক আছে, যা আছে তাই দাও।” দোকানদার একটা শালপাতার ঠোঙায় জবা, গাঁদা ফুল আর সিঁদুর মাখান বেলপাতা দিল। আমি ফুলগুলো নিয়ে দুহাতে দলাইমলাই করে নিলাম, যাতে বোঝা যায় অন্তত তিনচার দিনের পুরনো। ফটোটাতে একটু তেল চিটচিটে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে শালপাতার ঠোঙার মধ্যে রাখলাম। তারপর নকুলদানা ও বাতাসা সেই ঠোঙার একপাশে গুঁজে দিলাম। হাতে একটু জল নিয়ে ঠোঙার গায়ে ছিটিয়ে দিলাম। যাতে বাতাসা ও নকুলদানাগুলো মিইয়ে কাদা কাদা হয়ে যায়। বাসি প্রসাদ বোঝাতে হবে তো !

কাজ শেষ হলে আমরা ট্যাক্সিতে এসে বসলাম। ঠোঙাটা আমি দুহাতে ধরে বসে আছি। ট্যাক্সি চলেছে লালবাজারের দিকে। লাহিড়ী আমার কাণ্ডকারখানা দেখে চুপ, মাঝে মাঝে একবার করে আমার দিকে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছে। কি ভাবছে ও কে জানে? ট্যাক্সি এসে আমাদের গোয়েন্দা দফতরের বাড়িটার নিচে দাঁড়াল। আমি ঠোঙাটা লাহিড়ীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, “লাহিড়ী তুমি এটা বড়সাহেবকে দিও।” লাহিড়ী আঁতকে উঠে বলল, “না, না স্যার, ও আমার কম্মো নয়, আপনিই দেবেন।” আমি আর কি বলি, বললাম, “ঠিক আছে, চল।” দুরু দুরু বুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। বড়সাহেবের চেম্বারে এসে বীরের মত প্রথমে আমি ঠোঙা হাতে ঢুকে পড়লাম, পেছনে লাহিড়ী। বড়সাহেব আমাদের দুজনকে দেখে বললেন, “ও তোমরা এসে গেছ? আমার পুজো?” আমি বললাম, “এই যে স্যার আপনার পুজোর প্রসাদ।” আমি ঠোঙাটা ওঁর দিকে এগিয়ে

দিলাম। উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে ঠোঙাটা নিতে গিয়েই হাতটা সরিয়ে নিলেন, বললেন, “না, না, দাঁড়াও আমি আসছি।” তারপর দ্রুতগতিতে নিচে নেমে গেলেন। আমি জানি, উনি কি জন্য নিচে গেলেন। ওঁর গাড়িতে সবসময় একটা গঙ্গাজলের বোতল থাকে, সেই জল দিয়ে হাত ধুতে গেলেন। আমরা উদভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে আছি শালপাতার ঠোঙাটা নিয়ে। সারারাতের ট্রেন জার্নিতে চেহারা আর জামাকাপড়ের যা হাল, মাথায় একমণ করে ধুলো, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার ওপর বড়সাহেবের পুজোর টেনশনে চোখমুখের করুণ অবস্থা। বেশিক্ষণ অবশ্য আমাদের দাঁড়াতে হল না। সাহেব সামনে এসে দুহাত বাড়িয়ে খুশিতে ডগমগে মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, “এবার দাও।” আমি ঠোঙাটা তাঁর হাতে দিতে উনি “জয় বাবা পশুপতিনাথ” বলে চোখ খুঁজে ঠোঙাটা কপালে ঠেকালেন তিনবার, আমাদের বললেন, “আমি আসছি।” তারপর উনি নিচে নেমে গাড়ি করে সোজা বাড়ি চলে গেলেন।

আমি আর লাহিড়ী আর কি করি, একটু পর বাড়ি চলে গেলাম।

তারপর কাজের চাপে আমি আর লাহিড়ী এই ঘটনা পুরো ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন পর বিজয়ার প্রণাম করতে বড়সাহেবের বাড়িতে সকালবেলা গেলাম। বৌদির কাছে শুনি, উনি ঠাকুরঘরে পুজো করছেন। বেরতে দেরি হবে। আমার তাড়া ছিল, তবু ভাবলাম, এসেছি যখন তখন দেখা করেই যাই। আমি পায়ে পায়ে ঠাকুরঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। চোখ বুজে বসে পুজো করছেন বড়সাহেব। দেবদেবীর সিংহাসনের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। দেখি, আমার দেওয়া ওই টিনের পশুপতিনাথের ফটোটা সিংহাসনের একদম মাঝখানে, তার চারপাশে অন্যান্য দেবদেবীর ফটো। তা দেখে আমার নিজের ওপরই একটা ধিক্কার এল। আমি কোনমতে বড়সাহেবকে ডাকলাম, “স্যার।” উনি ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখে বললেন, “আরে তুমি, কি ব্যাপার।” আমি নিচু স্বরে বললাম, “স্যার বিজয়াটা।” উনি বললেন, “এখন থাক।” তারপর আমার চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে ঠাকুরঘর থেকে উনি বেরিয়ে এলেন। আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে করতে ভাবলাম, ভক্তিটাই আসল, ভক্তিভরে যে কোনও মূর্তিকেই বোধহয় পুজো করা যায় ! বড়সাহেবের বাড়ি থেকে বেরনর সময় মনে হল, সেদিন আমরা ভেবেছিলাম জিতে গিয়েছি। না, আসলে আমরা সেদিন বড়সাহেবের কাছে গো-হারা হেরে গিয়েছি।

জীবনটাই তো হারা আর জেতার। "জীবন তো ভাই হার জিতের।" কিন্তু হেরেও যে এত আনন্দ আমি বড়সাহেবের বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রথম বুঝলাম। আমি ফুটবল খেলোয়াড় ছিলাম, তাই আমার মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল এই মন্ত্র, বিনা যুদ্ধে হেরে মাঠ ছাড়ব না কখনও। চাকরির ক্ষেত্রেও ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে এই মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমি বারবার বিপদে পড়েছি। মুচিপাড়া থানায় সমাজবিরোধীদের মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বড়বাজার থানায় বদলি হয়ে এলাম। ওখানে এসে আমি প্রথম প্রথম মারোয়াড়িদের আলাদা করে চিনতেই পারতাম না। সবাইকে একই রকম মনে হত। ধন্দে পড়ে যেতাম। ওখানকার বেশ কিছু কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে ভাবতাম, আরে এখানে কি পুলিশ বলে কিছু নেই? রাজকাটরা এলাকায় তখন পুলিশ ঢুকতে পারত না। ওটা ছিল স্মাগলার আর চোরাই মালের ঘাঁটি।

এশিয়ার বৃহত্তম এই বাজারে সারাদিন কালো টাকার অবাধ আমদানি রপ্তানি চলত। অবশ্য সেটা রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। সেই গড়ে ওঠার পেছনে যারা মদত দিয়েছিল আমি আস্তে আস্তে তাদেরও পরিচয় পেতে লাগলাম। কালোবাজারির একটা অংশ তারা হক হিসেবে পেয়ে থাকত। আমি কোন হুমকি মানলাম না। ওই স্মাগলিংয়ের ঘাঁটি ভাঙাটা আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। থানার কিছু সহকর্মী আমাকে নিষেধ করল, ভয় দেখাল, যাতে আমি ওই ভীমরুলের চাকে ঢিল মারতে না যাই। কিন্তু আমি দমলাম না। প্রায় প্রতিদিনই থানা থেকে কয়েকজন সিপাই নিয়ে রাজকাটরা অঞ্চলে স্মাগলারদের ডেরা রেড করতে লাগলাম। স্মাগলিং করা জিনিসপত্র আটক করে থানায় নিয়ে যেতাম। মাঝে মাঝেই স্মাগলারদের পোষা গুণ্ডাবাহিনীর সাথে আমাদের খণ্ডযুদ্ধ হতে থাকল। তাতে দুপক্ষেরই কিছু না কিছু লোক আহত হত। আমিও সেই আঘাতের হাত থেকে বাঁচতে পারিনি।

আমাকে সাহায্য করার জন্য একজন কাস্টম অফিসারকে ফুলটাইম নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রতিপক্ষকে একদম নাজেহাল করে দিলাম, চোরাই বাজার চালান ওদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। চোরাচালান চক্রে যুক্ত বেশ কিছু লোককে গ্রেফতার করে চালান করে দিলাম। যখন ওদের আমি দম ফেলতে দিচ্ছি না, ওরা স্বাভাবিকভাবেই আমাকে জব্দ করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। ওদের মধ্যে জয়চাঁদ নামে এক বড়সড় চাঁই ছিল। সে আমাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে হাই কোর্ট ও ব্যাঙ্কশাল কোর্টে দুটো মিথ্যে মামলা করল। ভাবল আমি মামলার ভয়ে ওদের বিরুদ্ধে আর দাঁড়াব না, চাকরিও চলে যাবে আমার। জীবনে সেই প্রথম আমার বিরুদ্ধে কেউ মামলা করল। তখন কমিশনার ছিলেন মিঃ এস. এম. ঘোষ। তিনি আমার পক্ষে দাঁড়ালেন, নিজে গিয়ে স্ট্যান্ডিং কাউনসেল মিঃ এ. কে. মিত্রকে পুরো ঘটনা বলে এলেন। মিঃ মিত্র আমার হয়ে কোর্টে লড়ে সেই সাজান মামলা নস্যাৎ করে দিলেন।

সে সময় বড়বাজার থানার অফিসার-ইন-চার্জ ছিলেন মিঃ কল্যাণ দত্ত। তাঁর আদি বাড়ি ছিল হাওড়ায়। তিনি অদ্ভুত খেয়ালি লোক ছিলেন। বদমেজাজী ও অহংকারীও বলা যায়। আর সবসময় কারণে, অকারণে টেনশনে ভুগতেন। তিনি একাই থানার ওপরে কোয়ার্টারে থাকতেন, সঙ্গে থাকত পঞ্চা নামে একটা কাজের ছেলে। একদিন সন্ধেবেলায় ভীষণ টেনশনে ভুগছেন উনি কারণ প্রায় দশটা বাজে, এখনও স্পেশাল রিপোর্ট তৈরি করা হয়নি। দশটার মধ্যে লালবাজারে প্রত্যেক থানা থেকে ও.সি.র স্পেশাল রিপোর্ট পাঠানর নিয়ম। সারাদিনে থানার থেকে কি বিশেষ বিশেষ ভাল কাজ করা হয়েছে তার বিবরণ লিখে স্পেশাল রিপোর্ট পাঠাতে হয়। কিন্তু সেদিন এমন কোনও কাজ হয়নি বা এমন কারোকে গ্রেফতার করা হয়নি যা লিখে পাঠান যায়। তাই টেনশন। পায়চারি করে যাচ্ছেন, আর আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছেন, "কি হবে?" আমি বললাম, "ঠিক কিছু না কিছু ব্যবস্থা হবে স্যার, চারদিকে লোক পাঠিয়েছি, কারোকে না কারোকে ধরে নিয়ে আসবে।" এদিকে ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে। যাদের কিছু একটা "কাজ" করে আসতে পাঠান

হয়েছে তাদের পাত্তা নেই। মিঃ দত্ত বিড়বিড় করে চলেছেন, "থানার একদম বদনাম হয়ে গেল, সারাদিনে কোনও ভাল কাজ নেই, ভ্যারেণ্ডা ভাজছে সব।"

আমি জানি, উনি থানার কথা নয়, নিজের বদনামের কথা ভাবছেন, আর তাই নিয়ে টেনশনে ভুগছেন। উনি ভাবছেন, "আমি কল্যাণ দত্ত, আমার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায় আর আমার থানা থেকেই কোনও স্পেশাল রিপোর্ট যাবে না, আমার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি!" উনি থানার সামনের বারান্দায় পায়চারি করছেন আর যাকে পাচ্ছেন তাকেই গালাগালি দিচ্ছেন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, যাদের পাঠিয়েছি "কাজ" করে আসতে, দেখছি, তারা কেউ আসছে কিনা। বড়বাবু আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। থানার সামনে দিয়ে বহু লোক যাতায়াত করছে, উনি লাল চোখ দুটো দিয়ে যেন সব গিলে খাবেন। হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লেন, "কে আছিস, কে আছিস?" সামনে একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল ছিল, তাকে বললেন, "ধর, ধর।" থতমত খেয়ে কনস্টেবল অন্ধের মত থানার বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল। কিন্তু কাকে ধরবে তা তো বুঝতে পারছে না। রাস্তা দিয়ে তখন দুটো বিশ-বাইশ বছরের মারোয়াড়ি ছেলে গল্প করতে করতে যাচ্ছে, একজনের হাতে একটা রেডিও। কনস্টেবল একবার বড়বাবুর দিকে দেখছে, আর একবার রাস্তার এদিক ওদিক খুঁজছে। কাকে ধরবার জন্য বড়বাবু বলছেন? বড়বাবু উত্তেজিতভাবে ওই ছেলে দুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে বললেন, "রেডিও, রেডিও।"

কনস্টেবল এবার বড়বাবুর নির্দেশ বুঝে চোখের পলকে ছুটে গিয়ে রেডিও হাতে যে ছেলেটা যাচ্ছিল তাকে জাপটে ধরল। সঙ্গের ছেলেটা তাই দেখে দে ছুট। বড়বাবু বললেন, "নিয়ে আয়, নিয়ে আয়।" কনস্টেবল ছেলেটাকে টানতে টানতে থানার বারান্দায় তুলে নিল। বড়বাবুর মুখ দেখে মনে হল যেন বহুদিনের ক্ষুধার্ত নেকড়ে একটা নধর খাসি পেয়েছে। ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বড়বাবুর সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আমি কি দোষ করেছি?" বড়বাবু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "রেডিও।" তারপর ছেলেটাকে নিয়ে গেলেন সামনের একটা ঘরে। অবাক ছেলেটা আবার জিজ্ঞেস করল, "স্যার আমার রেডিওর কি হয়েছে?" বড়বাবু খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইলেন, "লাইসেন্স আছে?" ছেলেটা বলল, "আছে স্যার।" বড়বাবু এবার দারুণ রেগে বললেন, "থাক।" তারপর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরকে ইংরেজিতে ডিকটেশন দিতে শুরু করলেন, "আজ আমরা একটা বেআইনি চোরাই রেডিও উদ্ধার করেছি।" সেটা শুনে ছেলেটা কাতর কণ্ঠে বড়বাবুকে বলল, "স্যার, বেআইনি নয়, লাইসেন্স আমার বাড়িতে আছে, এনে দেখাচ্ছি।"

বড়বাবু চোখ রাঙিয়ে গলা চড়িয়ে ছেলেটাকে বললেন, "বলেছি না থাক। ওটা ওখানেই থাক।" তারপর মুখ ঘুরিয়ে ফের ডিকটেশন দিলেন, "আমরা খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ওটা উদ্ধার করেছি।" আমি এবার শেষ চেষ্টা করলাম, "স্যার ও যখন বলছে লাইসেন্স আছে তখন একবার দেখাই যাক না।" বড়বাবু উত্তর দিলেন, "হবে হবে, আগে স্পেশাল রিপোর্ট পাঠাই, তারপর সব দেখব।" এবার তিনি এ. এস. আই-র দিকে ফিরে বললেন, "লিখুন, আমরা আসামীকে গ্রেফতার করেছি।" বড়বাবু বলে চলেছেন, আমি ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ছেলেটা দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে কাঁদছে, সে বুঝে গিয়েছে আজ আর তার নিস্তার নেই।

লেখা শেষ হলে বড়বাবু নিজেই টাইপ মেশিন নিয়ে বসে পড়লেন। দ্রুত হাতে টাইপ করে মেসেঞ্জারের হাতে স্পেশাল রিপোর্ট দিয়ে বড়বাবু বললেন, "ছোট।" বড়বাবুর গাড়ি নিয়ে সে ছুটল ওই "বিশেষ ভাল কাজের" রিপোর্টটা লালবাজারে জমা দিতে। মূষিক প্রসব করে বড়বাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। থানার সব কর্মচারীদের উদ্দেশে বললেন, "কাজ শেখ, কাজ শেখ।" তারপর ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি বলছিলি? লাইসেন্স আছে?" ছেলেটা জলভরা চোখে কোনমতে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।" বড়বাবু বললেন, "তবে রাস্তায় লাইসেন্স ছাড়া ঘুরিস কেন?" ছেলেটা চুপ করে রইল।

ইতিমধ্যে ছেলেটার বন্ধু বুদ্ধি করে রেডিওর লাইসেন্সটা বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে।

সেটা দেখে বড়বাবু ধমকে উঠলেন, "আর কখনও লাইসেন্স ছাড়া বের হবি?" ছেলেটা করুণ সুরে বলল, "কখনও না। রেডিও আমি বিক্রি করে দেব।" বড়বাবু বললেন, "কিন্তু তোর তো জামিন নিতে হবে, কেস লেখা হয়ে গেছে।" উকিল থানাতেই মজুদ। সব থানাতেই সন্ধের পর দু তিনজন উকিল থাকে, তারা থানায় আসে রাতের পেটি কেসের জামিনদার হতে। কিন্তু আদালতে গিয়ে এরা প্রায় বোবা হয়ে যায়, কোর্ট তো আর থানা নয়। এরকমই একজন জামিনদার হয়ে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে নিল। ছেলেটার কিছু টাকা গচ্চা গেল। সে জামিন পেয়ে বড়বাবুর পায়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করল। থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বড়বাবু ছেলেটাকে বললেন, "লাইসেন্সটা পরীক্ষা করে দেখব, তারপর তোকে রেডিও দেব। এখন যা।"

সেদিন বড়বাবুর কোয়ার্টারে যেতে একটু দেরি হয়ে গেল। এবার সেখানে খানাপিনার আসর বসবে। তাঁর হুলোরা সবাই অনেক আগেই এসে গেছে। হুলোদের মধ্যে ছিল বিশু উকিল, শুক্লা উকিল, রেলের কর্মচারি কেলো আর সার্জেন্ট এ. চ্যাটার্জি রোজ আসত চিনা খাবার নিয়ে। মদের মধ্যে ওদের পছন্দ ছিল রাম। আসরে বড়বাবু প্রচণ্ড খিস্তিখেউড় করতেন আর তাঁর হুলোরা গদগদ হয়ে হাসত। রাত এগারটা, বারোটা বা তারও বেশি সময় চলত নরক গুলজার।

একদিন আমার নাইট ডিউটি, সারারাত থানায় থাকতে হবে। রাত দশটা নাগাদ বড়বাবুর কাজের ছেলে পঞ্চার সাথে থানার বারান্দায় দেখা হল, সে নিচে এসেছিল সিগারেট কিনতে। পঞ্চা বলল, "স্যার, আজ খুব জমেছে।" আমি প্রশ্ন করলাম, "কি করে বুঝলি?" পঞ্চার উত্তর, "আজ যা খিস্তি হচ্ছে, তা বাপের জন্মে শুনিনি।" বুঝলাম, আসর জোর জমেছে। আমি পঞ্চাকে বললাম, "তাড়াতাড়ি ওপরে যা, শিখে নে সব, পরে কাজে লাগতে পারে।" পঞ্চা আমার কথায় একটু লজ্জা পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আমি অন্য কাজে চলে গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পর আমার এক অধস্তন কর্মচারী এসে বলল, "স্যার, ওপর থেকে বড়বাবু ফোন করে বললেন, একটু পরে বিশুবাবু নামবে, তাকে সিক্সটি এইট লিখে লক আপে ঢুকিয়ে দিতে।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তার মানে?" উত্তরে সে বলল, "হ্যাঁ, স্যার, এক্ষুণি বড়বাবু ফোন করে জানতে চাইলেন ডিউটি অফিসার কে আছে। আমি আপনার নাম করতেই, উনি ওই কথা বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন।" আমি বললাম, "ঠিক আছে, আপনি যান।" দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি, নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে যাতে বড়বাবু বিশুদার ওপর রেগে গিয়ে ওই অ্যারেস্টের অর্ডার দিয়েছেন। কিন্তু আমি যদি বড়বাবুর ঐ নির্দেশ মত কাজ না করি তবে আগামীকাল থেকে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করবে। তাই আমি বড়বাবুকে অযথা সে সুযোগ দেব না ঠিক করে উপর থেকে আমি সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, যাতে বিশুদা নামলেই ধরে লক আপে ঢোকাতে পারি। ওই থানার লাক-আপটা ছিল আবার সিঁড়ির পাশেই।

মিনিট দুয়েক পরেই দেখি বিশু উকিল একা একা বকতে বকতে টলতে টলতে নামছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখে সে যখন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরতে যাচ্ছে, আমি বললাম, "এই যে বিশুদা ওই দিকে নয়, এদিকে আসুন।" বিশুদা তখন তো আর জানে না আমি কি উদ্দেশে তাকে উল্টো দিকে ডাকছি। বিশুদা আমার দিকে তাকিয়ে বকবকানি থামিয়ে বলল, "কে, রুণু? আমি কি ভুল রাস্তায় যাচ্ছিলাম?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, এদিকে আসুন।" ইতিমধ্যে আমি ইশারা করে দিয়েছি, জমাদার লকআপের তালা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিশুদা ঘুরে একটু এগিয়ে আসতেই আমি কনুইটা ধরে লক-আপের সামনে নিয়ে গেলাম। বিশুদাকে লক-আপের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম। লক-আপে চোর, পকেটমার, আরও নানারকম আসামী ছিল। বিশুদাকে চেনে অনেকেই, তারা ওকে দেখেই আওয়াজ দিতে শুরু করল, "আরে বিশে উকিল, আমাদের সাথে রাত কাটাবে।" ঐ আওয়াজেই বিশুদার সম্বিত ফিরে এল। এবার আমাকে গালাগালি করতে লাগল। আমি দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি।

আজ সারারাত ধরেই উকিলবাবু আমার বাপান্ত করে যাবে নির্ঘাৎ।

আমি সে দিকে কান না দিয়ে বড়বাবুর নির্দেশ মত ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে রাখলাম, "মত্ত অবস্থায় থানার সামনে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে।" কিছুক্ষণ পর জমাদার এসে বলল, "স্যার, বিশুবাবু লক-আপের দরজার সামনে বসে আপনার নামে যা তা বলে যাচ্ছে।" আমি হেসে বললাম, "বলুক গে। আচ্ছা পঞ্চাকে একবার খবর পাঠান যাবে, আমি ডাকছি? সে যেন বড়বাবু ঘুমিয়ে পড়লে আমার সাথে একবার দেখা করে।" পঞ্চাই বলতে পারবে কি এমন ঘটেছিল যে বড়বাবু তার প্রাণের বন্ধু বিশুদার ওপর রেগে লক-আপে পুরে দিতে বললেন। রাত প্রায় একটা নাগাদ পঞ্চা আমার কাছে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে পঞ্চা, কি এমন হয়েছিল রে, যার জন্য বড়বাবু বিশুদাকে লক-আপে পুরে দিলেন?" পঞ্চা একটু হেসে বলল, "সে অনেক ঘটনা স্যার, বলব?" আমার কৌতূহল আরও বাড়ল। বললাম, "বল।"

পঞ্চা শুরু করল, "তখন তো দেখলেন, আমি সিগারেট নিয়ে ওপরে গেলাম। আমি বড়বাবুকে সিগারেট দিয়ে রান্নাঘরে গিয়েছি ওদের জন্য আলু ভাজা বানিয়ে আনতে। ভাজা নিয়ে যখন রান্নাঘর থেকে বেরচ্ছি দেখি বিশুবাবু বড়বাবুর শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার আগে আগে চলেছেন। উনি বড়বাবুকে গিয়ে বললেন, 'তোর টেস্ট আছে, কি সুন্দর সাদা মার্বেল দিয়ে তুই বাথরুমটা বানিয়েছিস। আমার বাথরুমটা জানিস কল্যাণ, সাদা নয়।' বড়বাবু বিশুবাবুর কথা শুনে মাথা নেড়ে হাসছিলেন। আমি খাবার দিয়ে রান্নাঘরে চলে এসেছি। কিছুক্ষণ পর বড়বাবুর রোধহয় খেয়াল হয়েছে বাথরুম তো সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি নয়, লাল সিমেন্টের। বিশুবাবু তবে কেন বলল সাদা মার্বেলের? সেটা দেখতে উনি শোওয়ার ঘর দিয়ে বাথরুম যাচ্ছিলেন, ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে আমায় ডাকলেন, আমি ছুটে গেলাম।" এই পর্যন্ত বলে মুখে হাত চাপা দিয়ে বেদন হাসতে লাগল পঞ্চা। কোনমতে হাসি থামিয়ে বলল, বড়বাবু তখন খুব রেগে বিশুবাবুর বাপ মা তুলে গালাগালি দিচ্ছেন। আমায় দেখে বললেন, দেখেছিস, বিশু কি করেছে? বড়বাবু আমায় বিছানাটা দেখালেন, দেখি সাদা ধবধবে বিছানাটা পুরোপুরি ভেজা।" হাসির চোটে পঞ্চার দম আটকে আসতে লাগল। কোনমতে বলল, "বড়বাবু তেড়ে তেড়ে উঠছিলেন, শালা আমায় বলে কিনা তোর টেস্ট আছে, মার্বেল দিয়ে বাথরুম বানিয়েছিস খুব সুন্দর।"

আমি বুঝলাম, বিশুবাবু বাথরুমে না গিয়ে বড়বাবুর বিছানাটাকে নেশার ঘোরে বাথরুম ভেবে মনের আনন্দে পুরোপুরি ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। পঞ্চা বলল, "বড়বাবু নাক টিপে ওখান থেকেই ফোন করে আপনাকে বললেন বিশুবাবুকে লক-আপে পুরে দিতে। তারপর বিশুবাবুকে গালাগালি দিতে দিতে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছেন। শুক্লাবাবুদের কোনও কথা বলতে দেননি।" আমি কোনমতে হাসি চেপে জানতে চাইলাম, "তা বড়বাবু এখন কোথায় ঘুমচ্ছেন?" পঞ্চা বলল, 'কোথায় আর ঘুমবে, ড্রয়িং রুমের সোফায়। কাল আমাকেই দেখবেন ওই বিছানা ফেলতে হবে, যা গন্ধ না স্যার, নিশ্চয়ই কোনও রোগ আছে।" আমি পঞ্চাকে আর কথা বাড়াতে না দিয়ে বললাম, "ঠিক আছে তুই যা।" পঞ্চা চলে যেতে আমি বড়বাবুর বিছানার হাল মনে করে একচোট হেসে নিলাম। বিশুদা তখনও লক-আপে বসে আমায় বাছা বাছা গালাগালি দিচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি। "

পরদিন সকালে বড়বাবু নিচে নেমে লক-আপে বিশুদাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আরে বিশু তুই এখানে?" বড়বাবু এমনভাবে কথাটা বললেন যেন উনি কিছু জানেন না। বিশুদা আমাকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে বলল, "রুণু কাল রাতে আমায় এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।" তারপর অন্যান্য আসামীদের দেখিয়ে বলল, "আমাকে এ শালারা সারারাত গালাগালি দিয়েছে, উৎপাত করেছে।" বড়বাবু হাসি হাসি মুখে বিশুদাকে প্রশ্ন করলেন, "কাল রাতে ভাল ঘুমিয়েছিস তো?" বিশুদা বড় বড় চোখ করে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "কল্যাণ তুই কি আমার সঙ্গে ইয়ারকি মারছিস।" বড়বাবু বিশুদার কথা যেন শোনেনেই নি এমন ভাব দেখিয়ে জমাদারের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে

নিজেই লক-আপ খুলে বিশুদাকে বললেন, “তুই এখন বেরিয়ে আয়, আজ রুণুকে দেখছি।” বিশুদা লক-আপ থেকে বেরিয়ে বলল, “কি আর দেখবি? এক রাত তো আমায় হাজতবাস করিয়ে দিল রুণুটা।” বড়বাবু বললেন, “তা করাল, কিন্তু কি জন্য করাল তা একটু তদন্ত করে দেখি।”

বড়বাবু নিজের ঘরে এসে বসলেন, পিছু পিছু বিশু উকিলও ঢুকল। বড়বাবু আমার লেখা কেস রিপোর্ট পড়তে লাগলেন। তার মধ্যেই বিশুদা বড়বাবুকে বলল, “কল্যাণ, তবে এখন আমি বাড়ি যাই। বাড়িতে সবাই চিন্তা করছে, সারারাত ফিরিনি, কি ভাবছে কে জানে।” বড়বাবু পড়া ছেড়ে মুখ তুলে বললেন, “সে কি রে তুই বাড়ি যাবি কি করে? তোর নামে তো রুণু সিক্সটি এইট লিখে গেছে, তুই কাল রাতে থানার সামনে মাতলামি করছিলি।” বিশুদা বড়বাবুর কথা শুনে ধপাস করে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, “তুই বিশ্বাস করলি কল্যাণ? আমায় কখনও মাতাল হতে দেখেছিস? যতই খাই, জ্ঞান আমার টনটনে থাকে না? তুই বল? যা করার কর, আমায় এখন যেতে দে।” বড়বাবুর চোয়াল একটু শক্ত হল, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, “তা হয় না, এখানে দেখছি তোকে কোর্টে পাঠানর চালানও করে রেখে গেছে রুণু, আমি তোকে ছাড়তে পারি না।” বিশুদা এবার আর্তনাদ করে উঠল, “তাহলে কি হবে?” বড়বাবু নির্বিকার ভাবে বললেন, “কি আর হবে, কোর্টে যাবি।” বিশুদা আঁতকে উঠল, “ওরে আমার মান-সম্মান সব যাবে, তুই বুঝতে পারছিস না?” বড়বাবুর ঠাণ্ডা গলা, “আমি বুঝে কি করব? তোকে যদি কোর্টে না পাঠাই, রুণু তোদের বার অ্যাসোসিয়েশনে জানাবে, তখন ওকালতির লাইসেন্সও ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে।” বিশুদা এবার প্রায় কেঁদে ফেলল, “আমায় তুই বাঁচা কল্যাণ, লাইসেন্স গেলে আমি খাব কি, মুখ দেখাব কোথায়?”

বড়বাবু চুপচাপ বিশুদার কথা শুনে যাচ্ছেন। বিশুদা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বড়বাবুর সামনে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “আমায় বাঁচা কল্যাণ, আমায় বাঁচা।” বড়বাবু বিশুদার কাছ থেকে এরকম কিছু বোধহয় আশা করেননি, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিশুদাকে টেনে তুললেন। “ঠিক আছে, দেখছি কি করা যায়, তুই বস।” বিশুদা চোখ মুছতে মুছতে একটা চেয়ারে বসল। বড়বাবু বললেন, “আরে তোর সকালের চা খাওয়া হয়নি তো।” বিশুদা মাথা নেড়ে জানাল, না। বড়বাবু আর্দালিকে চা আনতে দিলেন। চালানটা বড়বাবু চেপে দিলেন শেষ পর্যন্ত। বিশুদাকে কোর্টে না পাঠিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।

সেদিন সন্ধেবেলায় থানায় এসে সব খবরই পেলাম। পঞ্চা বলল, "“স্যার, পুরো বিছানাটাই ফেলে দিয়েছি।” আমি হেসে ফেললাম, “জানি পঞ্চা, তুই এখন যা।” বড়বাজার থানার বড়বাবুর বিসতারার কি ভাবনা? একটা গেলে দশটা আসবে !

বড়বাজার থানা থেকে বদলি হয়ে আমি জোড়াসাঁকো থানায় যাই। সেখান থেকে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে। এই বিভাগটার জন্ম ১৮৬৮ সালে। তখন ব্রিটিশ আমল। পয়লা এপ্রিল রাত দুটোর সময় আমহার্স্ট স্ট্রিটে টহল দিতে গিয়ে এক কনস্টেবল ফুটপাতে রক্তাক্ত অবস্থায় একজন মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখে। দ্রুত কাছের থানায় কর্তব্যরত অফিসারকে খবর দিয়েছিল সে। অফিসার এসে দেখলেন মহিলা মৃত। তাঁকে খুন করে ফেলে যাওয়া হয়েছে। ওই অফিসার তদন্ত শুরু করলেন। এই ঘটনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। ফলে কলকাতা পুলিশ দারুণ চাপে পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত রিচার্ড বিড নামে এক অফিসারের ওপর ওই খুনের তদন্তের ভার পড়ল। তদন্তে প্রকাশ পেল খুন হওয়া সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলার নাম রোজি ব্রাউন। সমাজের অন্যায়ের শিকার হয়ে বাধ্য হয়েছিলেন সমাজে আগাছার মত জীবনযাপন করতে। রিচার্ড রিড সেই খুনের মামলার রহস্য উদঘাটন করলেন।

এই খুনের ঘটনাটা আপাতদৃষ্টিতে হয়ত তেমন কিছুই না, এমন কতশত খুন তো শতাব্দী জুড়ে হয়েছে এ শহরের বুকে। কিন্তু তবু কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে এই খুনের ঘটনাটা একটা ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই খুনের তদন্তের সময়ই একটা 'বিশেষ তদন্ত বিভাগের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করা গেছিল। তখন কলকাতা পুলিশের অধিকর্তা স্যার স্টুয়ার্ট হগ এক নির্দেশ জারি করে আলাদা গোয়েন্দা বিভাগ তৈরি করলেন। তার বছর দশেক আগে একই ঢঙে তৈরি হয়েছিল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হলেন মিঃ এ. ইউন্যান, তাঁর সাহায্যকারী হলেন প্রথম শ্রেণীর ইন্সপেক্টর আর. ল্যাম্ব।

তাঁদের অধীনে রইলেন চার জন দারোগা, দশ জন হেড কনস্টেবল আর দশ জন করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কনস্টেবল। তখনকার দিনে ব্রিটিশরা বাঙালি কনস্টেবল খুব কম নিয়োগ করত। তাদের ধারণা ছিল বাঙালিরা অলস। তাই তারা ভারতের উত্তর দিককার প্রদেশগুলো থেকে কনস্টেবল নিত। আসলে এই কনস্টেবল বা সিপাই বাহিনীই পুলিশ ফোর্সের ভিত। এরাই সমাজের তৃণমূলের মানুষের মধ্যে থাকে, মেশে এবং সমস্ত খবরাখবর রাখে।

বাঙালিরা অনেকেই বুদ্ধিমত্তার জন্য অফিসার স্তরে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীনাথ পাল এবং কালীনাথ বসু ছিলেন রিচার্ড রিডের মত দক্ষ ইন্সপেক্টর। ১৮৭৯ সালে গোয়েন্দা দফতরকে দুভাগে ভাগ করা হল। একটা বিভাগকে দেওয়া হল রিড সাহেবের অধীনে লালবাজারে, অন্য বিভাগটা চলে গেল ৩৪ নং সুতারকিন লেনে শ্রীনাথ পাল ও কেষ্টচন্দ্র ব্যানার্জির অধীনে। আরও অনেক বাঙালি অফিসার ব্রিটিশ আমলে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, অক্ষয়কুমার ব্যানার্জি। ১৮৯৮ সালে যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র গোয়েন্দা দফতরের অধিকর্তা হয়েছিলেন। কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে তিনি মারা গেলে কেষ্টচন্দ্র ব্যানার্জি তাঁর পদে যোগ দেন। কিন্তু তিনিও বেশিদিন ওই পদে থাকতে পারেননি, বছর তিনেকের মাথায় ব্রিটিশরা তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত কবে। যদিও এর কোনও কারণ জানা যায়নি, তবে অনুমান করা যায়, ব্রিটিশরা কোনও নেটিভকে ওই রকম গুরুত্বপূর্ণ পদে আর রাখতে চায়নি। তাঁর জায়গায় এম. বি. ইলিয়াস নামে এক সাহেবকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

১৯০৮ সালে গোয়েন্দা দফতরের আলাদা একটা শাখা তৈরি করা হল। রাজনৈতিক খবরাখবর যোগাড় করা ও তার মোকাবিলা করা ছিল এর কাজ। সেই শাখাই হচ্ছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এস. এ. এলরিজ প্রথম এই শাখার অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন। গোয়েন্দা দফতরের এই দুটো শাখাই একসময় ছিল স্বদেশীদের হাত থেকে কোনমতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া টেগার্ট সাহেবের হাতে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গোয়েন্দা দফতর

চলতে লাগল। ১৯১৭ সালে ওই বিভাগের প্রথম ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হলেন এল. এম. বার্ড। ১৯২০ সালে তৈরি হল বিশেষ গুণ্ডা দমন শাখা। একজন সহকারি কমিশনারের অধীনে ছিল সেটি। ১৯৪০ সালে এই শাখায় প্রথম ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হলেন হীরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাজকর্ম দেখে এসে এখানকার গোয়েন্দা দফতরে "এচালি তত্ত্ব" প্রয়োগ করলেন। নানা ধরনের অপরাধীদের অপরাধের বৈশিষ্ট্য, ধরন, সময়, নকশা, কথাবার্তা, সহযোগী, যানবাহন, মানসিকতা এবং বিশেষ কোনও চিহ্ন নিয়ে দশ পয়েন্টের ব্যাখ্যা তৈরি করেছিলেন এচালি সাহেব। তাছাড়া এখনও তাঁর বানানো পরিকাঠামো অনুযায়ী গোয়েন্দা দফতর চলার কথা। যদিও যুগের সাথে মিলিয়ে কিছু ছোটখাট পরিবর্তন ও পরিমার্জন মাঝে মাঝে করতে হয়েছে। এখনও তাঁর তৈরি পরিকাঠামো অনুযায়ী গোয়েন্দা দফতর চলার কথা। তবে আমাদের সময় পর্যন্ত এচালির তত্ত্ব মানা হলেও এখন আধুনিকতার নামে অনেকে অনেক থিওরি আনছেন। তার ফল রোজ খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায়।

তাছাড়া আমাদের আমলে পুলিশের অন্যান্য দফতরের দক্ষ অফিসারদেরই শুধু মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে গোয়েন্দা দফতরে নেওয়া হত। আবার একবার গোয়েন্দা দফতরে বদলি হলে অন্য কোনও দফতরে চট করে বদলি করা হত না। বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে অন্যখানে পাঠিয়ে দেবার কোনও অর্থ নেই বলেই এই ব্যবস্থা ছিল।

আমি দেবীবাবুর অধীনে লালবাজারে যোগ দিলাম। তার আগে গোয়েন্দা দফতরের অ্যাসিন্ট্যাট কমিশনার (ইন্টেলিজেন্স) ছিলেন মিঃ দীনেশ চন্দ, খুবই দক্ষ অফিসার ছিলেন। তিনিই প্রথম বর্তমান যুগের উপযোগী করে সোর্সের জাল বিস্তার করা দেখিয়েছিলেন। গোয়েন্দা দফতরকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে দেওয়ার তিনিই প্রথম কাণ্ডারি বলা চলে। চন্দ সাহেব পরে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (নর্থ) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরসূরী দেবীবাবু চন্দ সাহেবের তৈরি বাগানটা আরও সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিলেন। আমরা সেই বাগানে ফুল হিসাবে নয়, সহযোদ্ধা হিসাবে ছিলাম। তাঁর অধীনে কাজ করতে করতে তদন্তের অনেক নতুন কৌশল শিখতে লাগলাম। তিনি অফিসারদের তদন্তের কাজে এগিয়ে দিয়ে নিজে চুপচাপ বসে থাকতেন না, সবদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শ দিতেন, সব রকম সাহায্য তো করতেনই। সব স্তরের কর্মচারিদের সুযোগ সুবিধের দিকে খেয়াল রাখতেন দেবীবাবু। অফিসারদের অফিসে আটকে রাখার দরুণ কৌশল জানতেন উনি। ফাঁকি দিয়ে আড্ডা মারতে পালিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। প্রয়োজনে হাতের কাছে দক্ষ হাতিয়ারদের পেতেই হবে, এই ছিল তাঁর জেদ।

এক পড়ন্ত বেলায় আমরা অফিসে বসে আছি। সেটা ছিল ছেষট্টি সালের নভেম্বর মাসের তিন তারিখ। হঠাৎ খবর এল, নিউ আলিপুরের একটা ফ্ল্যাটে এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন। ব্যস, তোল পাল, চালাও তরী। আমরা দুটো গাড়ি নিয়ে সাত আটজন জুনিয়র ও সিনিয়র অফিসার ছুটলাম। কে খুন হয়েছেন, কখন খুন হয়েছেন, কিভাবে খুন হয়েছেন, আমরা তখনও কিছুই জানি না।

আমাদের গাড়ি দুটো ঠিকানা মিলিয়ে সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির সামনে প্রচুর ভিড়। আলিপুর থানার অফিসার ও সিপাইরা ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। আমরা ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। ভেতরেও অনেক লোক, কোনও একটা ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। পুলিশ দেখে ভিড় একটু সরে গেল। আলিপুর থানার দুজন অফিসার ফ্ল্যাটেই ছিলেন। তাঁরা প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট লিখে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দেখলাম, রান্নাঘর আর ডাইনিং হলের সামনে করিডোরের ওপর পড়ে আছে মৃতদেহ। বীভৎস দৃশ্য। ভদ্রমহিলার মুখে খুনী কোনও ভারি পাথর বা বড় হাতুড়ি দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করে করে একেবারে থেঁতলে দিয়েছে। মাথায় মেরে খুলি চৌচির করে ফেলেছে। জমাট রক্তে চুল আটকে আছে মেঝের সাথে। বুকে, তলপেটে প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন। জামাকাপড় লণ্ডভণ্ড। বোঝা যাচ্ছে খুন হওয়ার আগে ভদ্রমহিলা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবত এত আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান। তখন আততায়ী প্রতিহিংসার জ্বালায় গায়ের সব শক্তি এক করে ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করতে করতে মুখটাকে একদম বিকৃত করে ছেড়েছে। ভদ্রমহিলার কে এমন শত্রু ছিল যে খুন করার পরও ওইভাবে চোখ, মুখ, নাকের ওপর আঘাত করেছে! হামান দিস্তার মত মারতে মারতে হিংসার তাড়নায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের জ্বালা মিটিয়েছে। প্রকৃত মুখের অবয়বের কোনও চিহ্নই আর অবশিষ্ট রাখেনি, মুখটা একটা দলা পাকান মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছে। এত বীভৎস খুন আগে কখনও দেখিনি।

আমাদের ফটোগ্রাফার ছবি তুলে নিয়ে গেল। আমরা তদন্তের কাজ শুরু করলাম। ভদ্রমহিলার নাম মহালক্ষ্মী দত্ত। ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের ম্যানেজারের স্ত্রী। বিশাল সাজান ফ্ল্যাট তখন বিধ্বস্ত, ওলটপালট। আলমারি ভাঙা, দেরাজ ওল্টান, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জামাকাপড়, অন্যান্য জিনিসপত্র। খুনী মহালক্ষ্মী দেবীকে খুন করার পর স্টিল ও কাঠের আলমারি, দেরাজ ভেঙে গয়নাগাঁটি, জামাকাপড় ইত্যাদি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কতটা কি নিয়েছে আমরা তার হিসাব নিতে পারছি না, কার থেকে জানব ওই পরিস্থিতিতে? ভদ্রমহিলার স্বামী মিঃ দত্ত ছাড়া ওই পরিবারের আর এক সদস্য তাঁদের চোখের মণি একমাত্র মেয়ে। তার ও তার বাবার তখন যা অবস্থা, কি প্রশ্ন করব তাদের? আমাদের তবু কর্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন হতেই হল। 'আইনের স্বার্থে, তদন্তের অগ্রগতির জন্য, সূত্র ধরে খুনীকে গ্রেফতারের আশায় জিজ্ঞাসাবাদ করে যাচ্ছি বিভিন্ন জনকে

ইতিমধ্যে আলিপুর থানার কর্মীরা মহালক্ষ্মী দেবীর মৃতদেহ সাদা কাপড় ঢেকে তুলে নিয়ে গেছে পোস্ট মর্টেমের জন্য। জানি, মমিনপুরের নারকীয় মর্গে কাটাছেঁড়ার জন্য চলে যাবে এই ধনী গৃহবধূর দেহ। সেখানে প্রথমেই বিশাল বিশাল ইঁদুরেরা ছুটে এসে খেয়ে নেবে তাঁর চোখ দুটো। লাশের গাদায় হিম জমাট অন্ধকার ঘরে অসহ্য দুর্গন্ধময় পরিবেশে পড়ে থাকবেন তিনি। লাশকাটা ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াবে শুয়োর, কুকুর, শেয়াল নিশ্চিন্তে, এই কলকাতা শহরের বুকেই আমাদের সভ্যতার অহংকারের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে। তারপর আগামীকাল এক বেহেড মাতাল ডোমের দয়ায়, মৃতার আত্মীয় পরিজনের সাথে টাকাপয়সার হিসেবনিকেশ শেষ হওয়ার পর শুরু হবে পোস্ট মর্টেম সেই ডোমের হাতেই। দূর থেকে দাঁড়িয়ে ডাক্তার তা দেখে রিপোর্ট লিখে রাখবেন খাতায়। তাঁর ভিসেরা কেটে পলিথিনের

ব্যাগে আলাদা করে রাখা থাকবে আরও হাজার হাজার ভিসেরার সঙ্গে। তারপর ডোমই সেলাই করে দেবে তাঁর দেহ। একটা ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে নিকট আত্মীয়ের হাতে তাঁর কাটাছেঁড়া শরীর, সঙ্গে সৎকার করার ছাড়পত্র। ওই পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট অনেক তদ্বির তদারকি করেও মাস দুয়েকের আগে পাওয়া যাবে না -হাতে। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম আজও নেই।

মহালক্ষ্মী দেবীর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়েই পুলিশি কর্তব্যের মধ্যে এইসব ভাবনা মনে আসছে। আশেপাশের ফ্ল্যাটের লোকজন ও পাড়ার ছেলেদের জিজ্ঞেস করে তখন পর্যন্ত আমরা যা জানতে পেরেছি তা হল, স্বামী আর একমাত্র মেয়ে নিয়ে ছিল তাঁর সুখের সংসার। কেউ কোনদিনও তাঁদের উঁচুগলায় কথা বলতে পর্যন্ত শোনেনি। মিঃ দত্ত এতবড় চাকরি করেন, কিন্তু এতটুকু অহংকার নেই, ভীষণ অমায়িক ও ভদ্র। প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার সময় তিনি মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যান। স্কুলেরই একজন লোক ও গাড়ি ঠিক করা আছে। লোকটি মেয়েকে বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ছুটির পর।

সেদিনও মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে বারবার কলিংবেল টিপছে, “মা-মা” বলে ডাকছে, কিন্তু মা দরজা খুলছেন না। অথচ ফ্ল্যাটের বাইরে কোনও তালা ঝুলছে না, ভেতর থেকে ডোর লকটা আটকান, তার মানে মা ভেতরেই আছেন। মাসখানেক হল নকুল নামে ওড়িশার একটা লোক ঘরের কাজের জন্য বহাল হয়েছে, সেও কি বাড়িতে নেই? মেয়েটি কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রায় আধঘণ্টা পর পাড়ার লোকেদের ডাকল সে। তারা এসে দরজা ধাক্কা দিতে শুরু করল, কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারা দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে হকচকিয়ে গেল। সারা ফ্ল্যাট জুড়ে যেন প্রলয় হয়ে গিয়েছে, জিনিসপত্র ছত্রাকার। একটু এগিয়ে যেতেই তাদের চোখে পড়ল মহালক্ষ্মী দেবীর বিকৃত নিষ্প্রাণ দেহ। সঙ্গে সঙ্গে তারা ফ্ল্যাটেরই ফোন থেকে খবর দিল আলিপুর থানায়, পাড়ার এক ডাক্তারবাবুকে আর মিঃ দত্তকে তাঁর অফিসে। মেয়েটি ওই দৃশ্য দেখে পাগলের মত করতে লাগল, তাকে সামলান দায়। আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে দু একজন মহিলা এসেছিলেন, তাঁরা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন অন্য একটা ঘরে। কিন্তু নকুল নেই কোথাও। নকুল প্রতিদিন তিনটে নাগাদ বেরিয়ে যেত ঘণ্টা দেড়েকের জন্য, আজও কি সে বেরিয়ে যাওয়ার পর এই ঘটনা ঘটেছে না কি অন্য কিছু?

ডাক্তার ও আলিপুর থানার পুলিশ প্রায় একই সঙ্গে ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছলেন। ডাক্তার দূর থেকে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়ে পুলিশ অফিসারকে জানিয়ে দিলেন অমোঘ সত্যটা। আমাদের পৌঁছনর অল্প কিছুক্ষণ আগেই মিঃ দত্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁর ফ্ল্যাটে। তখন থেকে তিনি প্রায় বোবা। কোনমতে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুর টেলিফোন নম্বর বলতে পেরেছেন পাড়ার ছেলেদের, তারা সেইসব জায়গায় ফোন করে চলে আসতে বলেছে তাঁদের। আমরা পৌঁছবার পরও দেখলাম তিনি কিছুতেই ধাতস্থ হতে পারছেন না।

এদিকে আস্তে আস্তে কার্তিক মাসের সন্ধে নেমে এসেছে। কিন্তু নকুলের কোনও খবর নেই, সে কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। মিঃ দত্ত আমাদের অনেক অনুরোধে কোনমতে তাঁদের হারানো গয়নাগাঁটির একটা হিসেব দিলেন। আমরা বললাম, “এই ফ্ল্যাটে আজ আর আপনারা থাকবেন না, অন্য কোনও বাড়িতে গিয়ে থাকুন। আগামীকাল আমরা আবার আসব। কি কি জিনিস খোয়া গেছে তার তালিকাটা আরও ভালভাবে করব।” আমাদের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ দত্ত জানালেন, তিনি নকুলের কোনও ঠিকানা জানেন না। মাসখানেক আগে বাড়ির সামনে এক রবিবার সকালে তাঁর সঙ্গে নকুলের আলাপ হয়েছিল, সেদিন নকুল তাঁকে বলেছিল যে সে বাড়িতে কাজ করতে চায়। মিঃ দত্ত সেদিন থেকে নকুলকে তাঁর বাড়িতে সারাদিনের কাজের লোক হিসেবে বহাল করেছিলেন। সে রান্না করত, থাকত। আর কিছু জানেন না। এমন কি নকুলের পদবিও তিনি বলতে পারলেন না। তারপর আমাদেরই পরামর্শে আলিপুর থানার অফিসাররা ফ্ল্যাটটা বন্ধ করে মিঃ দত্ত ও তাঁর মেয়েকে অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা সেদিনের মত চলে গেলাম, কিন্তু বাড়ির

ওপর সারারাত আমাদের নজরদারেরা নজর রাখল। অনেকসময়ই খুনী অকুস্থলে ফিরে আসে কিনা! কিন্তু না, তেমন কিছুই তাদের নজরে পড়ল না।

পরদিন সকালে মিঃ দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে নিয়ে আবার ফ্ল্যাটে গেলাম। মিঃ দত্তর চোখমুখ লাল, চোখের নিচে একরাতেই কালি বসে গেছে। বোঝা গেল গতরাতে তিনি একটুও ঘুমোননি। আমরা কি করব? কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে বিরক্ত করতেই হবে। আমরা সেই লণ্ডভণ্ড ফ্ল্যাটে ঢুকে আততায়ী কি কি জিনিস নিয়ে গেছে মিঃ দত্তর কাছ থেকে এক এক করে জানতে লাগলাম। গতদিনের তৈরি করা তালিকার সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। মিঃ দত্ত এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে তাঁকে বারবার প্রশ্ন করে বিব্রত করতে আমাদের সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু পুলিশের চাকরি করতে এসে এসব ভাবলে চলে না, তাই ধীরে ধীরে তাঁকে সময় দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। গতকালই আমরা খুনীর সম্ভাব্য ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো নিয়ে গিয়েছি। তার মধ্যে ছিল একটা বঁটি, বাটনা বাটার পাথরের নোড়া, একটা মোটা লাঠি, আধলা ইঁট। প্রায় সবগুলোই ছিল রক্তমাখা। এখন ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে সে সব পরীক্ষার জন্য রাখা আছে। তাছাড়া নিয়ে গিয়েছি নকুলের ব্যবহৃত কিছু জিনিস, সূত্র খোঁজার জন্য।

মিঃ দত্ত কিন্তু কিছুতেই নকুলের নাম ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারছেন না। তবে তিনি নকুলের চেহারার একটা বর্ণনা দিলেন, আর জানালেন ওর বয়স খুব বেশি হলে হবে বছর চল্লিশেক। কিন্তু দড়কচা মেরে এমন হয়েছে যে মনে হয় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। তিনি এরপর আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন। নকুল প্রতিদিন মহালক্ষ্মী দেবীর কাছ থেকে চারটে করে টাকা নিয়ে বিকেলে বেরত। ফিরে এসে বসে বসে ঝিমত। মিঃ দত্তের অনুমান, নকুল বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আফিং খেয়ে ফিরত। এর বেশি আর কোনও খবর তিনি নকুল সম্পর্কে দিতে পারলেন না। তিনি জানালেন, তাঁদের পরিবারের বা মহালক্ষ্মী দেবীর এমন কোনও শত্রু নেই যাকে তিনি খুনী হিসেবে সন্দেহ করছেন। গতকাল সকালে তিনি যেমন মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরন তেমনই বেরিয়েছিলেন, যাওয়ার সময়ই তিনি শেষবার নকুলকে দেখে গিয়েছেন। সে তখন যথারীতি বাড়ির কাজকর্ম করছিল। হঠাৎ কি যে সব ঘটে গেল তা তাঁর কাছে এখনও দুঃস্বপ্নই। টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি যা গিয়েছে তার জন্য তিনি দুঃখিত নন, কিন্তু মহালক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। মেয়ের কথা ভেবে তিনি আরও কাতর হয়ে পড়ছেন। আমরা আর কি সান্ত্বনা দিতে পারি? তবু যতটুকু সম্ভব আমরা বোঝনোর চেষ্টা করলাম। আর প্রতিজ্ঞা করলাম, মহালক্ষ্মী দেবীর খুনীকে ধরবই, তাহলে মিঃ দত্ত কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। আসলে সেসময় পুলিশের মধ্যে হিউম্যান এলিমেন্ট ছিল, আজকের দিনে যা দুর্লভ।

আমরা ভাবছি, ওই রকম একজন শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ অফিসার কি করে একটা অচেনা, অজানা ওড়িশাবাসী লোককে সারাদিনের কাজের জন্য ঠিক করলেন? এমন কি তিনি তার ঠিকানা পর্যন্ত রাখেননি। আগে নকুল কি করত বা কোথায় থাকত তারও কোনও খোঁজ নেননি, এটা সত্যিই অদ্ভুত। আমরা মিঃ দত্তকে তাঁর ফ্ল্যাটে তাঁর আত্মীয়দের কাছে রেখে বেরিয়ে এলাম।

ঠিক করলাম, এই হত্যারহস্যের সমাধানের জন্য নকুলকে খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু একমাত্র আফিং খাওয়ার খবর ছাড়া তার সম্পর্কে আমরা আর কিছুই জানি না। না আছে তার ফটো, না ঠিকানা, না বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয়স্বজনের কোনওরকম হদিস। নিউ আলিপুরের আশেপাশে কোথায় আফিংয়ের দোকান আছে, শুরু করলাম অনুসন্ধান। খুঁজতে খুঁজতে একটা দোকান পেয়ে গেলাম কালীঘাট অঞ্চলে। ভেবে দেখলাম, প্রতিদিন আফিং যখন সে কিনতে আসত তখন তার মত অন্য নেশাখোর খদ্দেরের সঙ্গে তার পরিচয় হতেই পারে, বন্ধুত্বও হতে পারে। সে প্রতিদিন বিকেল তিনটের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, অনুমান করা যায়, দোকানে পৌঁছতে তার সাড়ে তিনটে বাজত। তারপর আফিং খেয়ে নিশ্চয়ই কোনও জায়গায় একটু বসে সে ফিরে যেত ফ্ল্যাটে। সেই হিসেব অনুযায়ী আমি

সাড়ে তিনটে নাগাদ ওই আফিংয়ের দোকানে গেলাম। প্রথমে দোকানদারকে নকুল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে সে বলল, "হ্যাঁ, ওই রকম একটা লোক আসত বটে, তবে কোথা থেকে আসত, কোথায় চলে যেত, তা বলতে পারি না। "

তারপর আমি খদ্দেরদের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। চার পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে পেয়ে গেলাম ওড়িশার বাসিন্দা একজনকে। নকুলকে চেনে কিনা জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনি, এখানেই ওর সাথে আমার আলাপ হয়েছিল, সে তো নিউ আলিপুরে একটা বাড়িতে কাজ করত। দিন কয়েক আগে বলল, আগের বাড়িটা ছেড়ে মাসখানেক হল নিউ আলিপুরেই অন্য একটা বাড়িতে কাজ শুরু করেছে।" অন্ধকারে একটুখানি ফিকে আলো। তাড়াতাড়ি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "আগে যে বাড়িতে সে কাজ করত, সেই বাড়ি তুমি চেন বা বাড়ির কর্তা কি অন্য কারও নাম জান?" সে বলল, "না, তা তো আমি জানি না, এখন কোন বাড়িতে কাজ করে তাও চিনি না।" হাল না ছেড়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, "ওড়িশার কোথায় ওর বাড়ি, কোনদিন কিছু বলেছে?" লোকটি বলল, "না, জানি না, এখানে আসত, আফিং কিনে দু চার মিনিট কথা বলে চলে যেত, তার মধ্যে এত কথা কখন হবে?"

আমি ওই সামান্য তথ্যই মুঠিতে ধরে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। নকুল মিঃ দত্তর বাড়িতে কাজ করার আগে নিউ আলিপুরেই অন্য একটা বাড়িতে কাজ করত। কিন্তু কোন বাড়িতে কাজ করত তা জানি না। সেই বাড়িটা যদি খুঁজে বার করতে পারি, তাহলে হয়ত সেখান থেকে নকুলের সুলুক সন্ধান কিছু পেলেও পেতে পারি। উপায়ান্তর না দেখে নিউ আলিপুর অঞ্চলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, নকুলের বর্ণনা দিয়ে জানতে চেষ্টা করলাম, তেমন কোনও লোক তাদের বাড়িতে মাসখানেক আগে কাজ করেছে কিনা। সারাদিন চলে গেল, কিন্তু কোনও বাড়ি থেকেই সদুত্তর পেলাম না। এ যেন তুলোর বস্তার মধ্যে পিন খোঁজা। নিউ আলিপুর তো একেবারে ছোট অঞ্চল নয়। ধৈর্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

এদিকে এক একটা দিন যাচ্ছে, পত্রপত্রিকায় আমাদের ব্যর্থতা নিয়ে জ্বালাময়ী সব রিপোর্ট বেরচ্ছে। তিন তারিখে খুন হয়েছেন মহালক্ষ্মী দেবী, তিন দিন পার হয়ে গেল, এখনও কিনা খুনীর হদিস করতে পারলাম না, এতবড় অপদার্থ আমরা ! সেইসব লেখায় তখন কলকাতা উত্তাল। মিঃ দত্ত উচ্চপদস্থ অফিসার, সমাজে তাঁর বিরাট প্রতিষ্ঠা ও যোগাযোগ। তার ওপর তাঁর নিহত স্ত্রীও এক নামকরা পরিবারের মেয়ে ছিলেন, আলোড়ন তো হবেই, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা বসে আছি, করছি না, খুনীকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি না, তা তো নয়। আসলে তদন্তের স্বার্থেই আমরা কোন পথে কিভাবে এগচ্ছি তা খবরের কাগজকে জানাতে পারছি না।

আবার একদিন আমরা নিউ আলিপুরে নকুলের আগের মালিকের খোঁজে বের হলাম। বাড়ি বাড়ি খোঁজ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছি, "না" শুনে কান পচে গেল। মিঃ দত্তের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটা বাড়িতে গৃহকর্তাকে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ওই রকম একটা লোক কদিন আগে আমার কাছ থেকে একটা মানি অর্ডার ফর্ম ভর্তি করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।" আমার তখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, "বাবা, অন্ধজনে দেহ আলো।" তাড়াতাড়ি প্রশ্ন ছুঁড়লাম, "সেই ঠিকানাটা আপনার মনে আছে?" উনি একটু হেসে বললেন, "আপনারা ভেতরে আসুন।" উনি আমাদের ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে সোফা দেখিয়ে বললেন, "আপনারা বসুন, আমি একটু ভেবে দেখি ঠিকানাটা মনে করতে পারি কি না।" তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। ড্রয়িংরুমের চারদিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রকমের ফটো, তাঁদের লেখা বই। উনি মিনিট দশেক পর ফিরে এলেন। আমি তখন ফটোগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আমার পূর্বসূরীদের ছবি।" তারপর একটু থেমে বললেন, "দেখুন, আমি শুধু সেই মানি অর্ডারের পোস্ট অফিসের নামটা মনে করতে পারছি, আর যেটুকু মনে আছে তা হল মানি অর্ডারটা পাঠান হয়েছিল একজন মহিলাকে। তবে তাঁর নামটা মনে পড়ছে না।" আমি পোস্ট

অফিসের নামটা জানতে চাইলাম, উনি বলতে আমি সেটা আমার নোট বইতে লিখে রাখলাম। তারপর অনুরোধ করলাম, “আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি, ততক্ষণে দেখুন না ঠিকানাটা মনে পড়ে কিনা।” উনি হেসে বললেন, “মনে পড়লে এতক্ষণে পড়ত, আমি আপনাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছি, ঠিক আছে, যদি হঠাৎ মনে পড়েই যায় তবে টেলিফোনে আপনাদের জানিয়ে দেব।” আমরা আর কি করি ফিকে আলোটা সামান্য উজ্জ্বল করে বাংলার বাঘের উত্তরসূরীর অঙ্গন থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

লালবাজারে এসে ঠিক হল একমাত্র পোস্ট অফিসের নামের সূত্র ধরেই নকুলের সন্ধানে ওড়িশায় পাড়ি দেওয়া হবে। আমি যাব, সঙ্গে যাবে কনস্টেবল শঙ্কটা মিশির। আমি প্রথমেই চলে গেলাম বড়বাজার এলাকায়। সেখান থেকে দুজন ওড়িশার লোক, একসময়ের বড় মাস্তানকে যাত্রার সঙ্গী করে নিলাম। কারণ আমি ও মিশির কেউ ওড়িয়া ভাষাটা জানি না। যখন বড়বাজার থানায় ছিলাম, তখন দেখেছি ওখানে বহু ওই রাজ্যের মাস্তান আছে। ওদের ঠাণ্ডা করতে গিয়ে ওদের সাথে আমার পরিচয়। যে দুজনকে আমাদের সঙ্গী করলাম তাদের আমি আমার সোর্স বানিয়ে নিয়েছিলাম। তবে একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, আমাদের রাজ্যে, বিশেষ করে কলকাতায়, অন্য প্রদেশের লোক এসে কি করে অবাধে মাস্তানি করে? কলকাতায় সর্দারজি, বিহারি, ওড়িশাবাসী, উত্তরপ্রদেশীয়, রাজস্থানি, গুজরাটি— সবরকম মাস্তান আছে। এইসব মাস্তানদের উত্থান কি করে হয়? কাদের সাহায্যে? কই একটা বাঙালি গিয়ে তো দিল্লি, মুম্বাই, পাটনা বা ভারতবর্ষের অন্য কোনও শহরে মাস্তানি চালাতে পারে না! সেখানকার লোকেরা তাদের পিটিয়ে ছাতু করে দেবে। আমার এই ভাবনার মধ্যে হয়ত প্রাদেশিকতার গন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আমি অপারগ। কারণ আমি ভাবি একমাত্র আমরাই কি “এক দেহে হব লীনের” শপথ নিয়েছি? এমনকি মাস্তানির ক্ষেত্রেও? এইসব অন্য প্রদেশের মাস্তানরা আমাদের প্রদেশে যখন মাস্তানির সুযোগ পায়, তখন তাঁরা সাধারণ মানুষের উপর নির্দয়ভাবে মাত্রাহীন অত্যাচার চালায়, এদের ভিতর বিন্দুমাত্র দয়ামায়া থাকে না। এইসব ভিনপ্রদেশী মাস্তানেরা ভীষণ নির্দয় হয়। একমাত্র টাকা রোজগার ও ফূর্তি করার চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা এদের থাকে না।
"

সেদিনই সন্ধেবেলায় আমি আর মিশির সেই দুজন মাস্তানকে নিয়ে যাত্রা করলাম কটকের উদ্দেশে। ভাবছি, মহালক্ষ্মী দেবীর খুনীর সন্ধান পাব তো? আফিংখোর নকুল আর তার পাঠানো একটা মানি অর্ডারের পোস্ট অফিসের নাম, এই হচ্ছে সামান্য সূত্র। সেই সম্বল করে আমাদের পাড়ি। অন্ধকার চিরে ট্রেন ছুটছে। আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ছে মহালক্ষ্মী দেবীর ছোট্ট মেয়েটার অসহায় মুখ, তার পাগল করা কান্না, মিঃ দত্তের বুকফাটা হাহাকার। সকালে যখন মিশির আমার ঘুম ভাঙাল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। দেখলাম কোনও একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। মিশির ভাঁড়ে করে চা এনে দিল, জানাল, আর অল্পসময়ের মধ্যেই কটক এসে যাবে।

সঙ্গে জিনিসপত্র বেশি কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তা সবই জরুরি, তাই হাতে হাতে নিয়েই আমরা কটক স্টেশনের বাইরে এসে খোঁজ করতে শুরু করলাম, আশেপাশে কোথায় পোস্ট অফিস আছে। দোভাষী মাস্তানেরা জানাল কাছেই একটা পোস্ট অফিস আছে। আমরা সেখানে গিয়ে পোস্ট মাস্টারের কাছে জানতে চাইলাম নকুলের মানি অর্ডারে লেখা পোস্ট অফিসটা কোথায়? জানা গেল, সেই পোস্ট অফিস এখান থেকে অনেক দূর। আমাদের প্রথমে যেতে হবে রাজকণিকাপুর, কটক থেকে প্রায় আশি-পঁচাশি কিলোমিটার দূরে। সেখানে থেকে আরও ভেতরে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার গেলে পাওয়া যাবে সাতভায়া। সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে হবে সেই পোস্ট অফিসের। একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করলাম। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম রাজকণিকাপুর। সেখানে সবাই বলল, ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছি। সাতভায়া থেকে দশ-বারো কিলোমিটার গেলে পেয়ে যাব আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল সেই পোস্ট অফিসটা।

আমরা আবার গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম সাতভায়ার উদ্দেশে। সাতভায়া এসে শুনলাম, সেই পোস্ট অফিসে যেতে হলে কিছুটা যাওয়ার পর গাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, কারণ রাস্তা কাঁচা। তখন সন্ধে হয় হয়, আমরা ঠিক করলাম, সেদিন রাতটা সাতভায়াতে কাটিয়ে পরদিন সকালে রওনা হওয়া ভাল। এখন রওনা হলে পৌঁছতে পৌঁছতে পোস্ট অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেদিন সাতভায়াতে একটা খুবই জঘন্য হোটেলের ঘর ভাড়া করলাম। অবশ্য তার চেয়ে ভাল হোটেল ওই অঞ্চলে আর নেই। হোটেলের দুটো ঘরে চারটে খাটিয়া পেতে দেওয়া হল আমাদের। বালিশ আর তোষক বলে যা দেওয়া হল, তাতে কোনও ঢাকনা পর্যন্ত নেই। এত তেলচিটে যে তাতে একবার শুলে মাসখানেক আর শরীরে তেল না মাখলেও চলবে। ঘর দুটোই খুব নিচু, হ্যারিকেনের আলোয় চারপাশটা ভাল দেখাও যায় না। গুণ্ডি আর দোক্তার গন্ধ সারা ঘরময়। হোটেলের মালিক বলে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, তিনি ইতিমধ্যেই এমন ভদ্রলোক অতিথিদের যত্ন আত্তির জন্য দুবার ঘুরে গেছেন। রাতে কি খাব বারবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি প্রতিবারই উত্তর দিলাম, "যা খাওয়াবেন তাই খাব।" উনি আমাকে বোঝাতে চাইছিলেন, আমি যা-ই অর্ডার দিই না কেন, উনি তাই-ই বানিয়ে দিতে পারবেন এবং প্রতিটা আইটেমই এত সুস্বাদু যে বারবার চেয়ে খাব। তাঁর হোটেলের এত নাম ডাক যে, সাতভায়া এলে এখানে একবার খেতেই হবে।

মালিকভায়ার কিছু কথা আমার কানে আসছে, কিছু আসছে না, কিন্তু উনিও নাছোড়বান্দা, মনে মনে একটু বিরক্তই হলাম। মিশিরকে বললাম, “তোমাদের পছন্দ মত কিছু অর্ডার দিয়ে দাও, তাই আমি খাব।” আর পুলিশের চাকরি করতে এসে খাওয়া নিয়ে চিন্তা করার মত সময় কোথায়? সাতভায়ার হোটেলের মালিকভায়া যা দেবেন তাতেই খুশি। রাত দশটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া হল, মালিকভায়া নিজে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়ালেন। মাংস ভাত, এমনিতে খারাপ না, তবে এত মোটা চাল যে ছুঁড়ে মারলে মাথা ফেটে যেতে পারে। একটা সুবিধে, তাড়াতাড়ি হজম হবে না, আগামী দু একদিন খাওয়া জুটবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না। এবার শোওয়ার পালা। তেলচিটে বালিশটা সরিয়ে, সঙ্গে আনা ডাকব্যাকের বালিশটা ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নিলাম, তারপর একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘরের অন্য দিকে মিশির ততক্ষণে শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছে। হ্যারিকেনটা কমিয়ে রেখেছি। বড়জোর মিনিট পনের, খাটিয়ার চারপাশ থেকে বেরিয়ে পড়ল রক্তলোলুপ খটমলরা। তাদের কামড়ের ঠেলায় উঠে বসেছি। ওহে খটমলের দল, তোমরা কি ঘুষ খাও? যদি খাও তবে কত দিলে চলবে, সর্দারকে পাঠিয়ে দাও, আমি তার হাতে দিয়ে দিচ্ছি। তাও খাও না, শুধু রক্ত খাও? হ্যাঁ, তোমাদের এই গুণটা দারুণ, তোমরা নিষ্ঠাবান, উপোস করে থাকব, তবু ঘুষ খাব না। এই গুণটা যদি পুলিশের মধ্যে থাকত! খাটিয়ায় বসে এইসব আবোল তাবোল ভাবছি, হঠাৎ মিশির জেগে গিয়ে আমাকে বসে থাকতে দেখে অবাক, "স্যার, ঘুমোননি?” আমি হেসে বললাম, “ছারপোকার কামড়ের চোটে উঠে পড়েছি।” মিশির তো আমার কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, “ছারপোকা কোথায় স্যার, ছারপোকা থাকলে আমি বুঝতে পারব না? আমি ছারপোকার কামড় মোটেই সহ্য করতে পারি না।” মিশিরকে বললাম, “না, না, এখানে তেমন ছারপোকা নেই। আমার হঠাৎ মনে হল, তাই উঠে বসে আছি, ঘুম এলেই শুয়ে পড়ব। তুমি ঘুমোও, কাল সকালে আবার আমাদের অনেক হাঁটতে হবে।” মিশির আবার শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করল। হ্যারিকেনটা উস্কে দিয়ে দেখলাম, ছারপোকারা পরমানন্দে তার শরীরে মহাভোজ জমিয়েছে। আমি সারারাত বসে বসে কাটিয়ে দিলাম, কখনও ঘরে, কখনও বা বারান্দায়। ভাবছি, সাতভায়া না এসে কাছেই রিহাগড় বা আর একটু বড় শহর ভক্তিকণিকাতে গিয়ে রাতটা কাটালে ভাল হত, ওখানে সম্ভবত এর চেয়ে ভাল হোটেল পাওয়া যেত। ভেবে অবশ্য লাভ নেই, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ভোর হয়ে এল, এবার ছোটা শুরু।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা হোটেলের বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলাম। সর্দারজীদের হোটেল খুঁজে চা খেতে হবে। এই একটা জাত, সর্বত্র আছে। আর ওদের বিখ্যাত “পোয়া

পাত্তি” চা'টা নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া যায়। পেয়েও গেলাম চায়ের দোকান। চা খেয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সাতভায়া থেকে দশ কিলোমিটার মত এসে প্রথম লক্ষ্যস্থল পোস্ট অফিসে হাজির হলাম। এই পোস্ট অফিসের মারফতই নকুল এক মহিলাকে টাকা পাঠিয়েছে। কোন ঠিকানায় সেটাই এই পোস্ট অফিস থেকে খুঁজে বের করতে হবে। পোস্ট মাস্টারকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, “মাসখানেক আগে কলকাতা থেকে একটা মানি অর্ডার এসেছে, কার নামে কোন ঠিকানায় সেটা এসেছে, জানতে চাই।” উনি বললেন, “কলকাতা থেকে তো প্রচুর মানি অর্ডার আসে, কি করে বের করবেন? ঠিক আছে, আমি আমাদের মানি অর্ডারের এন্ট্রি লেজারটা দিচ্ছি, তা দেখে যদি আপনারা বের করে নিতে পারেন, দেখুন।”

আমি সেই লেজারটা নিয়ে বসলাম, সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তারিখ থেকে দেখতে শুরু করলাম। কলকাতা থেকে প্রচুর মানি অর্ডার এসেছে দেখছি, অর্থাৎ এ অঞ্চলের বহু লোক কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে। খুঁজতে খুঁজতে ইউরেকা, এইতো, নকুল জানা, নিউ আলিপুর থেকে এখানে গ্রামের এক মহিলাকে মানি অর্ডার পাঠিয়েছে। মন বলল, এই নকুল জানাই আমাদের নকুল, মহালক্ষ্মী দেবীর খুনের হদিস এবার হবেই।

মহিলার ঠিকানাটা টুকে নিয়ে পোস্ট মাস্টারকে বললাম, “এই ঠিকানায় কি করে যাব, বলুন।” তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, “ওরে বাবা, সে তো অনেক দূর, প্রায় আঠের উনিশ কিলোমিটার হাঁটা পথ, মাঝখানে দুটো নদী পার হতে হবে। আর আপনি চিনবেনই বা কি করে? এখানকার লোক নিয়ে যেতে হবে।” জিজ্ঞেস করলাম, “এখানকার থানাটা কোথায়?” ভদ্রলোক জানালেন, “এখানে থানা নেই, তবে একটা ফাঁড়ি আছে।” তারপর তিনি আমার দোভাষীকে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে আমাদের সেই ফাঁড়িতে যেতে হবে।

ফাঁড়িতে এসে নিজেদের পরিচয় দিয়ে আমাদের আসার কারণটা জানাতে ওখানকার ইনচার্জ দুজন সিপাই দিলেন সঙ্গে। স্থানীয় সিপাইদের নেতৃত্বে আমরা চলতে শুরু করলাম নকুলের গ্রামের দিকে। দুপুর বেলা, চড়া রোদ মাথায় করে হাঁটছি তো হাঁটছিই। সবারই খিদে পেয়ে গেছে। অন্যদিকে নকুলের ঠিকানাটা পাওয়ার পর থেকে একটা উত্তেজনা মাথার মধ্যে কাজ করছে। ভেবে দেখলাম এখন যদি পেটে না কিছু দিই, তবে হয়ত আর সময় পাব না। আমি দোভাষীদের বললাম, “কিছু খাবারের বন্দোবস্ত কর। সিপাইদের জিজ্ঞেস কর, কোথায় কি পাওয়া যায়?” একটু পরে ওরা একটা ঝুপড়ি দোকানে আমাদের নিয়ে গেল। সবাই ঘাড় নিচু করে ঢুকলাম। যে যা পারলাম পেটে ঢুকিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম।

ঘন্টাখানেক পর আমরা পৌঁছে গেলাম বিশাল এক নদীর ধারে। ব্রাহ্মণী নদী। এখানে ব্রাহ্মণী তার চওড়া বুক নিয়ে উজানে চলেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। খেয়া পার হতে হবে। খেয়া ছাড়ার মুহূর্তেই আমরা পৌঁছেছি। কিন্তু যা লোক তুলবার তা তোলা হয়ে গেছে, আমরা অতিরিক্ত। দেখলাম, স্থানীয় সিপাইরা নিজেদের ভাষায় চিৎকার করে মাঝিকে কি বলল। মাঝি তার উত্তরে কিছু বলে খেয়া থেকে গোটা দশেক লোককে নামিয়ে দিল। আমরা সেই জায়গা ভরাট করলাম। উচিত হল না, একদম উচিত হল না, মনে মনে ভাবছি। কিন্তু তখন নকুলকে ধরা ছাড়া আর কোন চিন্তাকেই সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। দেরি হলে পাখি উড়েও তো যেতে পারে। খুনী যখন খুন করে তখন কি তার মনের ভিতর ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত বোধকে মনে জায়গা দেয়? দেয় না। আমরাও সেই খুনীকে ধরতে যাবার সময় এত. উচিত অনুচিত, ন্যায় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে পারব করে? খুনীর খুন করাটা যতটা সহজ, আমাদের তাকে গ্রেফতার করে আদালতে মামলা করে সাজা দেওয়াটা ততটা কঠিন। উদ্দেশ্য যদি ন্যায়ের পক্ষে হয়, তবে কারও ক্ষতি না করে সামান্য অন্যায় করাটা বোধহয় ঈশ্বরও ক্ষমার চোখে দেখেন।

খেয়া ছেড়ে দিয়েছে, আমরা ব্রাহ্মণীর বুকের ওপর দিয়ে চলেছি। এখান থেকে মোহনা বেশি দূরে নয়। মায়পুরার কাছে ব্রাহ্মণী তার সতীনকে নিয়ে চলেছে, দুভাগে ভাগ হয়ে মিলেছে সাগরে। বিকেলের রোদে নদীর দুপারের গ্রামগুলো সোনালি ছবির মত। ওপারের

গ্রাম সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, এগিয়ে আসছে এপার। জীবনের খেয়া যেমন চলে তেমন নিয়মেই, আজ যা আছে কাল তা অতীত, আবার আজ যা নেই আগামীকাল তা ভবিষ্যৎ। ব্রাহ্মণী পার হয়ে আবার হাঁটা গ্রামের মাঝখান দিয়ে, ভীষণ গরিব সব গ্রাম, ছোট ছোট আদুল গায়ে ছেলেমেয়েদের দেখলেই বোঝা যায়, অপুষ্টির রোগে ভুগছে তারা।

আস্তে আস্তে কমে আসছে রোদ, পা চালালাম তাড়াতাড়ি, সন্ধে নেমে এলে মুশকিল। ভাঙা কাঁচা রাস্তায় দ্রুত হাঁটাও যায় না। স্থানীয় সিপাইরা আগে আগে যাচ্ছে গ্রামের মোড়ল জাতীয় লোকেদের সাথে কথা বলতে বলতে। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে গুন্ডি দিয়ে পান খাচ্ছে। এত পান খাওয়ার চোট দেখে আমার বিরক্ত লাগছে। কিন্তু কিছু বলতেও পারছি না। এখন ওরাই আমার কাণ্ডারী। গ্রামের ভেতর ওদের যা দাপট দেখছি, কলকাতায় কমিশনার সাহেবেরও বোধহয় এত দাপট নেই।

ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পর আবার একটা নদী। বৈতরণী। কে দিয়েছিল এই নাম? এই নদীর বুকে বৈঠা চালিয়ে সবাই নাকি পাড়ি দেয় স্বর্গে? আমরা তো যাচ্ছি খুনীর সন্ধানে, নরকের দরজায়। পার হওয়ার জন্য আমরা উঠে বসলাম নৌকোয়। এবার বেশি যাত্রী নেই। বৈতরণীও এখানে মোহনার কাছাকাছি এসে বেশ চওড়া। স্থানীয় সিপাইরা জানাল, কটক জেলা থেকে আমরা এবার বালেশ্বর জেলায় ঢুকছি। তাদের কাজের এলাকা ওটা নয়, তবু আমাদের সাহায্যের জন্য ওরা চলেছে সঙ্গী হয়ে। আমি ওদের ধন্যবাদ জানালাম। ওরা লজ্জা পেয়ে নৌকোর অন্য দিকে গিয়ে মাঝির সঙ্গে গ্রাম্য ওড়িয়া ভাষায় গল্প জুড়ে দিল। আমি তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি না। এখানে বঙ্গসন্তান বলতে একমাত্র আমি, রবীন্দ্রনাথের মাটির গন্ধ একমাত্র আমার গায়ে বৈতরণীর বুকে তাই রবীন্দ্রনাথ সুর করে আমার গলা দিয়ে গেয়ে উঠল, "ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা... পড়ন্ত বিকেলে বৈতরণী ঘরে ফেরার আনন্দে বিভোর, তবু মুখ ঘুরিয়ে বোধহয় একবার আমার দিকে তাকাল, কারণ দেখলাম, তার ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সূর্যের সোনা রঙ হেসে উঠল চিকচিক করে। মাথার ওপর ডানা মেলা অসংখ্য সামুদ্রিক পাখির দল সেই সোনা রঙে নিজেদের রাঙাতে ঝাঁপ দিয়ে নেমে এল নিচে, তারপর কোথায় কোন অজানা আকাশের দিকে উড়ে গেল। এই অপূর্ব গোধূলিতে মনে হল, পৃথিবীতে যেন নেমে আসছে চিরশান্তি!" হায়, এই পৃথিবীতে তো নকুলরাও আছে, খুন করে যারা গৃহলক্ষ্মীদের। দোভাষীর কাছে জানতে পারলাম, এই খেয়া পার হওয়ার মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব নকুলের গ্রামে।

নৌকো থেকে পা রাখলাম পাড়ের এক হাঁটু কাদায়। তারপর নদীর ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে ঢুকলাম একটা গ্রামে। খুব গরিব গ্রাম। এটাই নকুলের গ্রাম। সন্ধে হয়ে গেছে। গ্রামের বাড়িগুলো সবই মাটির দেওয়ালের ওপর খড় কিংবা খোলা দিয়ে ছাওয়া। সিপাইরা খুঁজে নিয়ে এল গ্রামের চৌকিদারকে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "নকুলের বাড়ি কোনটা?" সে পাল্টা প্রশ্ন করল, "কোন নকুল?" জানা গেল, এই গ্রামে তিনটে নকুল আছে। একটা নকুল কলকাতায় বাবুর বাড়ি কাজ করে, বহুদিন হল গ্রামে ফেরেনি। আর একটা নকুল বাড়িতেই আছে, তৃতীয় নকুলটা কে, পরে জানা যাবে। কাছেই দ্বিতীয় নকুলের বাড়ি, চৌকিদার হাঁক পাড়তেই নকুল তার ঘর থেকে গামছা পরে বেরিয়ে এল, আমাদের দেখে ঘাবড়ে গেল। আমি দেখেই বুঝলাম, এ নয়। এর বয়স অল্প, আমার শোনা ফেরারী নকুলের চেহারার বর্ণনার সাথে এর কোনও মিল নেই। আমার দোভাষী ওকে জিজ্ঞেস করল, "কবে কলকাতা থেকে এসেছ?" ছেলেটা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল সে কোনদিন কলকাতাতেই যায়নি। আমি দোভাষীকে থামিয়ে চৌকিদারকে বললাম, "চল অন্য নকুলের বাড়ি।" আমরা তৃতীয় নকুলের বাড়ির দিকে রওনা দিতেই চৌকিদার বলল, "ওই নকুলকে তো সকালবেলা দেখেছি নতুন একটা বাক্স কাঁধে, আরও সব জিনিসপত্তর আর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে খেয়ার দিকে যাচ্ছে।" চৌকিদারের কথা শুনে আমার বুকটা ধক করে উঠল, তার মানে সে এখান থেকে পালিয়েছে। চৌকিদার বলেই চলেছে, "নকুল তিনচারদিন হল কলকাতা থেকে এসেছে অনেক জিনিসটিনিস নিয়ে। আমায় বলল, সেইসব জিনিস নাকি তাকে তার কলকাতার

গিন্নিমা দিয়েছে। সে যে চুরি করে এখানে পালিয়ে এসেছে তা তো আমি জানি না। জানলে কি পালাতে দিতাম?” চৌকিদার নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এই নকুল চুরি করে পালিয়ে এসেছে। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হলাম, মহালক্ষ্মী দেবীকে এই নকুলই খুন করেছে, নয়ত সে পালাবে কেন? আর যে জিনিসপত্রের কথা চৌকিদার বলছে তা নিশ্চয়ই দত্ত পরিবারের খোয়া যাওয়া জিনিস। এখানে এসে নকুল নিজের গ্রামটাকেও নিরাপদ মনে করেনি, গ্রাম ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে। দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে মেলাতে আমরা একটা ছোট্ট মাটির বাড়ির সামনে হাজির। চৌকিদার বলল, এই সেই নকুলের বাড়ি। দেখলাম, বন্ধ দরজায় একটা ছোট লোহার তালা ঝুলছে। গ্রামের একটা কুকুর ঘরের ছোট বারান্দায় ঘুমচ্ছিল, আমাদের পায়ের শব্দে দে দৌড়। আমরা ফিরে চললাম। চৌকিদারের কাছে জানতে চাইলাম বৈতরণী নদী না পার হয়ে কি গ্রাম থেকে বেরনো যায়? চৌকিদার বলল, “না, অন্য কোনওরাস্তা নেই।”

মন খারাপ হয়ে গেল। এত দূর এসেও খালি হাতে ফিরতে হবে? ভাবলাম, খেয়া পার হয়েই যখন যেতে হয় তখন কোন না কোন নৌকোর মাঝি নকুলের গতিবিধি সম্পর্কে কিছু জানলেও জানতে পারে। ততক্ষণে আমরা প্রায় খেয়া ঘাটে পৌঁছে গেছি। আমার মন অস্থির। নকুলকে পাব কোথায়? কোথায় পালিয়েছে সে? তাকে যদি ধরতে না পারি তবে শুধু আমার নয়, গোটা কলকাতা পুলিশের মুখে চুনকালি পড়ে যাবে। মিঃ দত্ত আর তাঁর মেয়েকে কি জবাব দেব? রিপোর্টাররা তো নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। দাঁড়িয়ে আছি বৈতরণীর তীরে, মনে মনে নদীর দিকে তাকিয়ে বললাম, আমায় বিপদ থেকে পার কর মা। রাত ঘন হচ্ছে, দূরের গ্রামগুলোতে ছোট্ট ছোট্ট আলোর বিন্দু ফুটে আছে। নদীতে যে কটা নৌকো, তাদের ছইয়ের তলাতেও দেখছি কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে নৌকো, জলে কাঁপছে সেই কুপির আলো। ভেতরেও একইরকম অন্ধকার, তখনও সেখানে কোনও আলোর রেখা দেখছি না। আলোর আশায় আমি দোভাষী আর মিশিরকে ডেকে বললাম, “দেখ, নকুল এই খেয়া পার হয়ে গেছে। সে নিশ্চয়ই কলকাতায় ফিরে যায়নি, আশেপাশের কোনও অঞ্চলে আস্তানা গেড়েছে। নৌকোর মাঝিরা কিছু জানলেও জানতে পারে। তোমরা গল্পের ছলে যেভাবেই হোক সেটা বের করার চেষ্টা কর। দরকার হলে মদটদ খাওয়াও, গ্রামের ভেতর নিশ্চয়ই চোলাই মদ পাওয়া যাবে, চৌকিদার জানবে, তাকেও কাজে লাগাও। আমি দূরে থাকব, তবে কতদূর কি এগচ্ছে, তোমরা সে খবর আমায় দেবে।” দোভাষীরা চৌকিদারকে নিয়ে নদীর দিকে নেমে গেল, যেখানে নৌকোগুলো বাঁধা আছে। খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটা নৌকোয় মাঝিরা গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করছে। আমি বৈতরণী পার হওয়ার সময় বুঝেছিলাম মাঝি মদ খেয়ে আছে। তাতেই মনে হল, এখানে নিশ্চয়ই চোলাই মদের ঠেক আছে। মিশির আর দোভাষীরা চৌকিদারকে নিয়ে নেমে গেছে। আমি সিপাইদের নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি। মাঝিরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বাড়ছে। এখন ওদের কেরামতির ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। বেশ কিছুক্ষণ পর চৌকিদার আর মিশির অন্ধকার ফুঁড়ে পাড়ে উঠে এল। মিশির বলল, “স্যার, ওকে পঞ্চাশটা টাকা দিন, মাল নিয়ে আসবে।” আমি চৌকিদারের হাতে পঞ্চাশ টাকা দিতে সে চোলাই মদ কিনতে চলে গেল। মিশির ফিসফিসিয়ে বলল, “স্যার, এদের যত বোকা মনে হচ্ছে, তত বোকা এরা নয়, ঠারেঠোরে নকুলের কথা জিজ্ঞেস করাতে কেউ কিছু বলছে না, তবে মাল খেতে রাজি হয়েছে, এখন দেখা যাক পেটে পড়লে কি বের হয়।” আমি মিশিরকে বললাম, “তোমাকেই কায়দা করে বের করতে হবে, নকুল তো আর কর্পূরের মত উবে যায়নি। তোমরা এমন ভাব দেখাও যেন মনে হয় ওর সাথে দেখা করতে এসেছ। খুব আপন লোক হয়ে যাও।” কথাবার্তার মাঝখানেই দেখি চৌকিদার গ্রামের দিক থেকে আসছে। মিশিরকে ওর সাথে নৌকোয় যেতে বললাম। ওরা দুজনে চলে গেল।

একটা কাটা গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল, আমি তার ওপর বসে পড়লাম। একটু দূরে

সিপাইরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে। বসে বসে নদীর হাওয়াতে আমার ঝিমুনি আসছে, দুরাত ঘুম নেই। মাঝে মাঝে নৌকো থেকে ওদের হাসি ঠাট্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এদিকে রাত বাড়ছে। মিশিররা ব্যর্থ হলে নকুলকে তো পাওয়া যাবেই না, তার ওপর এখানেই সারারাত আটকে থাকতে হবে। দুদিন হল কলকাতা থেকে এসেছি, ওদিকে লালবাজারে কে কি ভাবছে কে জানে? এখানে ওই মাঝিরাই আমাদের শেষ যোগসূত্র। মন মাঝি কি করবে কে জানে! পরিস্থিতি যখন হাতের বাইরে চলে যায় তখন বসে বসে দুশ্চিন্তা করা ছাড়া উপায় কি? অন্ধকারে বৈতরণীর পারে একি শাস্তি আমার?

বসে বসে ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, মিশির আর এক দোভাষী প্রায় ছুটতে ছুটতে আমার দিকে আসছে। ওদের ছোটা দেখে আমার বুক ধক ধক করে উঠল। খবর ভাল নিশ্চয়ই, নয়ত ওইভাবে আসবে কেন? আমার আর তার সইছে না। মিশির এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "স্যার একটা মাঝি বলেছে, আজ সকালে সে নকুলকে এই নদীর মোহনার কাছে একটা দ্বীপে রেখে এসেছে।" খবর শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু মিশিরের পরের কথাতেই চুপসে গেলাম। "ওই মাঝিটা বলল এখনই যাওয়া দরকার, কিন্তু ওর নৌকোটা নিয়ে যাওয়া যাবে না, কি গণ্ডগোল আছে, অন্য নৌকো নিয়ে যেতে হবে।" আমি বললাম, "তাহলে? কিছু ব্যবস্থা করেছ?" মিশির বলল, "কি করা যায় সেটা জানতেই তো এসেছি।" একটু ভেবে বললাম, "তাহলে অন্য একটা নৌকোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। তা কি আজ রাতের মধ্যে সম্ভব?" সিপাইরা আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা বলল, "আমরা একবার চেষ্টা করে দেখি, আপনিও চলুন।" আমি ভাবলাম, সূত্র যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। দেরি হলে ফস্কে যেতে পারে। আমরা সবাই নিচে নামতে লাগলাম। চৌকিদার আর মাঝিমাল্লারা ওদিকে জমিয়ে ফূর্তি করছে। আমাদের আসতে দেখে একটু চুপ করল। ঝিমুনিটা এখনও কাটেনি, নিচে নামতে নামতে বুঝতে পারছিলাম। আজ রাতেই যদি দ্বীপে যেতে হয়, আমার যে নিদারুণ কষ্ট হবে তা এখনই মালুম হচ্ছে।

আমরা সবাই নৌকোয় এসে উঠলাম। মিশির সেই মাঝিকে চিনিয়ে দিল যে সকালে নকুলকে রেখে এসেছে। চৌকিদার আর সিপাইরা কাজে নেমে গিয়েছে, তারাই সেই নৌকোটা ঠিক করল যেটায় আমরা বৈতরণী পার হয়ে এসেছি। দুদিন ধরে হেঁটে হেঁটে, না ঘুমিয়ে শরীর আর চলছে না, মনে হচ্ছে একটা বিছানা পেলে শুয়ে পড়ি। কিন্তু চৌকিদারের প্রচণ্ড উৎসাহে আমরা তখনই পাড়ি জমালাম। বৈতরণীর কালো জলে শব্দ উঠছে ছলাৎ ছলাৎ। যে মাঝি নকুলকে সকালে নিয়ে গেছে, তাকেই রাজি করান হয়েছে নৌকো বাইতে। আমি নৌকোর মাঝখানে ছাউনিতে পিঠ দিয়ে বসলাম। ভাবলাম, একপক্ষে ভালই হল, সারারাত থাকতামই বা কোথায়? তাছাড়া নকুলের সন্ধান যখন পেয়েছি, তখন ওকে না ধরা পর্যন্ত আমার গ্র্যান্ড হোটেলের বিছানাতে শুয়েও ঘুম আসবে না।

চৌকিদার আর মাঝিদের কথাবার্তায় যতটুকু জানতে পেরেছি তা হল, বৈতরণী যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে তার এক কিলোমিটার আগে ওই দ্বীপ। সেখানে নদী যেন কোন বন্ধুকে দেখে গলা জড়িয়ে ধরে তাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরতে চেয়েছে। বৈতরণীর ওই হঠাৎ বাঁক নেওয়ার মুখে তৈরি হয়েছে একটা দ্বীপ। আর সেই দ্বীপেই মাঝি রেখে এসেছে নকুলকে ওখানে আছে আট দশটা ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। সেখানে চোর, ডাকাত, খুনীরা লুকিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ ওখানে পা দেয় না। দিনের বেলায় কেউ যদি বা গিয়ে পড়ে, দূর থেকেই ওখানকার বাসিন্দারা দেখতে পায় ৷ সতর্ক হয়ে নদীর অন্য দিক দিয়ে পালিয়ে যায় তারা। আত্মগোপন করার আদর্শ জায়গা। রাতের অন্ধকারেই ওখানে হানা দেওয়া ভাল। একজন দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি কথাবার্তা তোমরা চালাচ্ছ?" সে জানাল, "ভোর হতে না হতেই আমরা দ্বীপে পৌঁছে যাব। কেউ কিছু বোঝার আগেই আমরা দ্বীপটা ঘিরে ফেলতে পারব।" আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। উৎসাহে ঝিমুনি ভাবটাও কেটে গেছে, খিদে তেষ্টা সব উধাও। চৌকিদার দেখছি সবাইকে জাগিয়ে রেখে, হল্লা করতে করতে নিয়ে

যাচ্ছে। মাঝিকে দেখলাম, জোরে জোরে দাঁড় টানতে। মদ্যপানে সম্মানজ্ঞান, দায়িত্বজ্ঞান বেড়ে যায়, সেই ক্রিয়াই সবার মধ্যে চালু হয়েছে দেখে মনে মনে আনন্দ পেলাম। চৌকিদারের খুব সম্মানে লেগেছে, কারণ তাদের গ্রামের লোক "চুরি" করে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছে, তাতে শুধু তার নয় গ্রামের সম্মানহানি হয়েছে।

আমরা ক্রমশ মোহনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বৈতরণী আস্তে আস্তে আরও চওড়া হচ্ছে। নদীর উত্তর দিকের ধার ঘেঁষে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রাত শেষ হয়ে আসছে। আর কত দূর? মাঝি চৌকিদারকে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, দোভাষীর কাছে শুনলাম, মাঝি জানাল এখন শেষ প্রহর আর বেশি দূরে নেই দ্বীপ। মাঝির ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, সারারাত ক্লান্তিহীন দাঁড় টেনে চলেছে। বৈতরণীই ওর ঘরবাড়ি উঠোন, এ নদীর সব কিছু ওর নখদর্পণে। কতকালের চেনা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় অবলীলায় দাঁড় বাইছে। হঠাৎ মাঝি চিৎকার করে দোভাষীদের কি বলল, দোভাষীরা সেটা শুনে দাঁড়িয়ে পুব দিকে দেখতে লাগল। তারা আমায় বলল, "স্যার উঠে দাঁড়িয়ে দেখুন ওই যে দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা।" আমি উঠে দেখতে চেষ্টা করলাম। একটা কালো মত জায়গা নদীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়িয়েই রইলাম। ধীরে ধীরে সেই কালো টুকরোটা আরও পরিষ্কার হল। দেখলাম, সত্যিই নদীর একটা হাত যেন হঠাৎ বেরিয়ে আবার মূল স্রোতে ফিরে এসেছে একটা গোলাকার ছোট জমিকে জড়িয়ে ধরে। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেলা।

দ্বীপের একেবারে কাছে চলে এসেছি। দেখলাম, গাছপালার ভেতর সাত আটটা কুঁড়ে ঘর। ভোরের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সব ঘরই বন্ধ। ওখানে কোন একটা ঘরের মধ্যে নকুল আছে। অন্য ঘরে আছে আরও সব খুনী, চোর, ডাকাত। কি আশ্চর্য উপনিবেশ। হলিউড ছবিতে দেখেছি, ক্রাইম থ্রিলারে পড়েছি অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য এরকম সব দ্বীপের কথা। আমি দোভাষীর মাধ্যমে সবাইকে আক্রমণের কৌশলটা বলে দিলাম। নৌকো দ্বীপের মাটিতে ঠেকতেই সবাই লাফিয়ে নেমে পড়লাম, তারপর এক দৌড়ে উঠে গেলাম ওপরে। দ্বীপের চারদিকটা ঘিরে ফেলতে হবে যাতে নকুল কোনদিকে পালাতে না পারে। আমি ঘাটের দিকটা আগলে রাখলাম, নকুলকে নৌকোয় উঠতে দেওয়া চলবে না। হঠাৎ একটা কুঁড়েঘরের দরজা খুলে একটা লোক বেরিয়ে উল্টো দিকে দৌড়তে শুরু করল। চৌকিদার তাকে চিনে ফেলল, "নকুল, নকুল" বলে চেঁচাতে লাগল সে। মিশির, সিপাইরা আর দোভাষী দুজন, সবাই তার পেছনে ছুটতে শুরু করেছে। না, নকুল বেশিদূর যেতে পারেনি। সবাই মিলে লাফ দিয়ে ওকে জাপটে ধরল। আমাদের, ছুটোছুটি আর চিৎকারে অন্য ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে সব আত্মগোপনকারী ক্রিমিনালরা। আমরা নকুলকে ধরতেই তারা আমাদের আক্রমণ করল। নকুলকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেই। এমন সময় দেখলাম, আমার বড়বাজারের মাস্তানরা পুরনো ফর্মে ফিরে গেছে। সে কি হুঙ্কার। আর ওড়িয়া মাস্তানী ভাষায় যা বলতে লাগল তারা, তাতে নকুলের প্রতিবেশীরা চুপসে গেল। পরে ওদের কাছ থেকে শুনেছি, ওরা বলেছিল, আমরা সারা দ্বীপ ঘিরে ফেলেছি, পালাবার পথ নেই। তোমরা সবাই চুপ করে থাক, আমরা শুধু ওকেই ধরতে এসেছি, ওকে নিয়ে যেতে দাও। যদি কোনরকম বাধা দাও, তবে তোমাদেরও পিটিয়ে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব।

আমি মিঃ দত্তের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে এই নকুলকে চট করে মিলিয়ে নিলাম। চৌকিদারকে বললাম, "চল ও যে ঘরটায় ছিল সেখানে।" নকুলকে টানতে টানতে সবাই মিলে ওর ঘরের দিকে গেলাম। দরজা খোলাই ছিল। এক মহিলা, নকুলের স্ত্রী নিশ্চয়ই, বিছানায় বসে আছে। পাশেই রাখা একটা নতুন টিনের ট্রাঙ্ক, আর কতগুলো কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি। আমি তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কটা খুলে ফেললাম, এই তো মহালক্ষ্মী দেবীর গয়নাগাঁটি, কিছু প্রসাধনী। পুঁটলিগুলো ঘেঁটে পেলাম মহালক্ষ্মী দেবীর সব দামিদামি শাড়ি, আরও অন্যান্য জিনিস। মিশিরকে বললাম, "সব নিয়ে চল।" কয়েকটা শাড়িতে দেখলাম তখনও রক্ত লেগে আছে। মিশির আর চৌকিদার সব তুলে নিল। সিপাইরা আর দোভাষী নকুলকে ধরে

নিয়ে এল নৌকোর কাছে। নকুলের স্ত্রীকেও নিয়ে আসা হল। আমি নৌকোয় উঠে আমার ব্যাগে রাখা হ্যান্ডকাফটা বের করলাম। মিশির সেটা নকুলকে পরিয়ে দিল। নকুল মাঝিকে কিছু বলতে, মাঝিও খুব রেগে ওকে উত্তর দিল। নকুল বোধহয় বিশ্বাসঘাতক বা এরকম কোনও গালাগালি দিয়েছিল, নয়ত মাঝি অত রেগে যাবে কেন?

নৌকো ছেড়ে দিল। নকুলকে ছাউনির ভেতর দড়ি দিয়ে বেঁধে বসিয়ে রাখলাম। ছাউনির দুই মুখে আমি আর মিশির বসলাম। যাতে নকুল হঠাৎ বৈতরণীতে লাফ দিয়ে পড়তে না পারে। নৌকো ছাড়ার পর থেকেই চৌকিদার বকবক করছে, "কত খুনী, ডাকাত ধরলাম, এ তো সামান্য চোর। গ্রামের লোক বলে পার পেয়ে যাবে তা তো হয় না।" নৌকো ধীরে চলছে, স্রোতের উল্টো দিকে গতি কম হবেই। আমার মনের গতি কিন্তু তীব্র। এত কম সময়ের মধ্যেই যে নকুলকে ধরে ফেলতে পারব তা আশা করিনি। নিজেকে অনেক হালকা মনে হল।

আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে হুইলারস দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট দ্বীপটা। এখান থেকে ষাট সত্তর মাইল দক্ষিণে পারাদ্বীপ। মহানদীর মোহনা। বৈতরণীর খেয়ালী দ্বীপটা দারুণ পিকনিক স্পট হতে পারে। তার বদলে ওটা কিনা হয়ে গেছে খুনী ডাকাতদের গোপন ডেরা! অবহেলায় আমাদের দেশের কত কিছুই না পড়ে নষ্ট হচ্ছে এমন, কে তার খোঁজ করে?

নকুলকে নিয়ে কলকাতায় ফিরতে একটা দিন কেটে গেল। অবশ্য তার আগের দিনই বিকেলে লালবাজারে ফোন করে নকুলের গ্রেফতারের খবর জানাতে, গৌরাঙ্গবাবুর নেতৃত্বে এসকর্ট পার্টি এসে গেছে। তারা আজ সকালে আমাদের সঙ্গে জাজপুর কোর্টে মিলেছে। এখন আমরা জাজপুর স্টেশনে ট্রেনে উঠে বসে আছি। ট্রেন ছাড়বে। নকুলকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে কামরার মাঝখানে একটা রডের সঙ্গে বেঁধে রেখেছি। ট্রেন ছাড়লে ওকে নিয়ে পড়ব। গত কদিনের ছোটাছুটিতে শ্রান্ত শরীরকে একটু বিশ্রাম দেওয়া যাক। আমরা আর রাজকণিকা যাইনি, সোজা একটা গাড়ি ভাড়া করে জাজপুর চলে এসেছি। মাঝি আর চৌকিদারের হাতে নকুলের স্ত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি। ফেরার পথে নকুলকে দু একবার বাংলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন সে মহালক্ষ্মী দেবীকে খুন করেছে। কিন্তু সে প্রতিবারই এক উত্তর দিয়েছে, "মুঃ সে স্ত্রী লোকোকে মারি নাই। সেই স্ত্রী লোকো ধীরে ধীরে মুঃকে সুনার অলংকারও আর লোগাপটা দিয়েছে।" আমি আর বেশি জোরাজুরি করিনি। তখন আমার মাথার মধ্যে অন্য পরিকল্পনা খেলছে।

ছোটবেলায় আমাদের কোচবিহার শহরের একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেছে। আমাদের পাড়াতেই এক ভদ্রলোকের বাড়িতে একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট লাল রঙের গরু ছিল। এমনিতে শান্ত স্বভাবের সেই গরুটা আরও অন্য গরুর সঙ্গে সারাদিন চরে বেড়িয়ে সন্ধের একটু পরে গোয়ালঘরে ঢুকে ঝিমতে ঝিমতে ঘুমিয়ে পড়ত। সেই গরু গাভীন হতে মালিক তাকে আটকে রাখত, আর মাঠে চরতে দিত না। বাড়িতেই খড় কেটে খেতে দিত। গরুটা সেই খড় খেয়ে সারাদিন জাবর কাটত আর ঘুমত। কিন্তু সন্ধে হলেই তার কি যে হত, দড়ি ছিঁড়ে কোথায় চলে যেত। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে ফিরত। মালিক প্রথম প্রথম ততটা গুরুত্ব দেয়নি। সরু দড়ি দিয়ে বাঁধত। কিন্তু গরুটা প্রতিদিনই সেই দড়ি ছিঁড়ে সন্ধেবেলায় উধাও। একদিন মালিক গরুর এই সান্ধ্য "অভিসার" বন্ধ করার জন্য মোটা দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে রাখল। কিন্তু গরুটা ঠিক সন্ধেবেলায় সেই মোটা দড়িও গায়ের জোরে ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল, ফিরল ঠিক ঘণ্টাখানেক পর। পরদিন মালিক তার চেয়েও মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধল, কিন্তু ঠিক সন্ধে পড়তেই, সেই গরুর কি তেজ, যেন হাতির মত বলবান। সেই মোটা দড়ি ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মালিককে বোকা বানিয়ে। আবার ফিরেও এল শান্তশিষ্ট হয়ে। তারপর থেকে দেখা গেল, মালিক যতই মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধুক না কেন গরুটা প্রতিদিনই সন্ধেবেলায় দড়ি ছিঁড়ে নয়তো খুঁটি উপড়ে ফেলে কোথায় চলে যায় কিসের টানে! এই রহস্য কিছুতেই ভেদ করা গেল না।

অগত্যা মালিক একদিন এক বিহারী লোক ঠিক করল, তাকে বলল, গরুটা দড়ি ছিঁড়ে ছুটতে শুরু করলেই তুমিও গরুর পেছন পেছন ছুটে গিয়ে দেখে আসবে কোথায় কিসের টানে যায় সে। কথা মত, বিহারী লোকটা সন্ধের একটু আগে গোয়াল ঘরের সামনে হাজির। গরুটা নড়েচড়ে উঠল, তারপর বিরাট হাম্বা ডাক ছেড়ে দড়ি ছিঁড়ে ছুটতে শুরু করল। বিহারী নজরদারও তার পেছন পেছন ছুটতে লাগল। শহরের শেষ প্রান্তে যেখানে আর্মি ব্যারাক তার পেছনে খালাসপিট্টি নামে একটা জায়গা আছে। চোলাই মদের ভাটিখানা থেকে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় সেখানে মদের গাদটা ফেলে। গরুটা সেই গাদটা খেতেই যায়। সেদিনও সবটা খেয়ে ফেলে আস্তে আস্তে ঢুলতে ঢুলতে বাড়ির পথে ফিরতে শুরু করল। ঠিক ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে ঢুকল তার গোয়ালঘরে। বিহারী লোকটা মালিককে সব বলল। বোঝা গেল, গরুটা রীতিমত নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে। নেশার টানে সে দড়ি ছিঁড়ে ওই রকম পাগলের মত ছুটে চলে যায়।

আমি রাস্তায় এক দোকান থেকে আফিং কিনে ট্রেনে উঠেছি। আমার পরিকল্পনার কথা এখনও কেউ জানে না। ট্রেনটা ছাড়ুক, শুরু করব আমার অভিনব জেরা। নকুলের পেট থেকে বের করতেই হবে কথা, ট্রেন নড়ে উঠল। আমিও নড়েচড়ে বসলাম। স্টেশন ছাড়তেই আমি নকুলের সামনে এসে দাঁড়ালাম, আমার হাতে ধরা আফিংয়ের প্যাকেটটা।

ট্রেন ছুটতে শুরু করেছে। নকুলকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করাতেই হবে। মামলার প্রয়োজনে। কি কারণে সে খুন করল সেটা জানা জরুরী। তারপর তার কথার সূত্র ধরে যোগাড় করতে হবে সাক্ষী। প্রথমেই তার "না"য়ের বাঁধন ভেঙে "হ্যাঁ"তে নিয়ে আসতে হবে। নকুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বল, কেন তুই মহালক্ষ্মী দেবীকে খুন করেছিস?" এবারও একই কথা, "মুঃ ওই স্ত্রী লোকোকে মারি নাই।" কিন্তু আমি তো নিশ্চিত, নকুলই খুনী। এখনও শাড়ি কাপড়, কিছু কিছু গয়নাগাঁটিতে রক্ত লেগে আছে আর ও বলছে খুন করেনি! এদিকে আমি ওর শরীরের ভাষা পড়ে বুঝতে পারছি আফিংয়ের টান শুরু হয়ে গেছে। যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে উইথড্রয়াল সিমটম। গতকালও হয়েছিল, কিন্তু বেশি দূর বাড়তে পারেনি। আমাদের ধমকে এবং পরিস্থিতির চাপে চাপা পড়ে গিয়েছিল। আজ আমাকে এই ব্যাপারটা কাজে লাগাতে হবে।

আমি পকেট থেকে আফিং বার করে ডান হাতের চেটোতে নিয়ে বললাম, "নকুল তুই স্বীকার কর, তবে তোকে আফিং খেতে দেব।" নকুল মাথা নিচু করে বেঞ্চের পাশে বসে ছিল। ডান হাতটা লোহার রডের সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফে বাঁধা। আফিংয়ের কথা শুনেই চট করে মাথা তুলে তাকাল। আমার হাতের চেটোয় আফিং দেখেই ওর চোখটা চকচক করে উঠল। বললাম, "বল, এটা দেব।" নকুল চিৎকার করে বলে উঠল, "করি নাই, আমি করি নাই।" আমি এবার ডান হাতটা একটু এগিয়ে ওর সামনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, "বল, দেব।" নকুল ঝটিতি ওর বাঁ হাত দিয়ে আমার হাত থেকে আফিংটা ছিনিয়ে নিতে চাইল। আমি সতর্ক ছিলাম, হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললাম, "তুই বল, তোকে এমনিই দেব, চাইতে হবে না।"

নকুল একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর গলার এই অদ্ভুত আওয়াজে কামরার সব লোক চমকে তাকাল। ট্রেন দ্রুত গতিতে ছুটছে, অনেকটাই চাপা পড়ে গেল নকুলের গর্জন। তবু ওই চেহারা থেকে এমন রণহুঙ্কার, বড়ই বেমানান। শুধু গর্জন নয়, একই সঙ্গে নকুল ডানহাতটা হ্যাণ্ডকাফ থেকে ছাড়ানর জন্য টানতে লাগল। ওর জবাফুলের মত চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। নাক মুখ দিয়ে বুনো শুয়োরের মত ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস বেরচ্ছে। প্রতিহিংসার জ্বালায় আমার দিকেই তেড়ে আসতে চাইছে। আমি তখন বুঝে গিয়েছি, এই ওষুধেই কাজ হবে। বললাম, "শিগগির বল, আফিংটা তো তোর জন্যই এনেছি।" আবার হুঙ্কার, ওর শরীরের সমস্ত পেশী ফুলে ফুলে উঠছে, দু হাত দিয়ে লোহার রডটাকে এমন চাপ দিচ্ছে যেন ভেঙেই ফেলবে। যেন বহুদিনের ক্ষুধার্ত বন্দী বাঘ কচি বাছুর দেখে খাঁচা ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। নকুলের চোখমুখ এমন বীভৎস রূপ নিয়েছে যেন আমাকে চিবিয়ে খাবে। হ্যান্ডকাফের টানে ডানহাতের কব্জির কাছে চামড়া কেটে রক্ত

বেরচ্ছে, সেদিকে ওর খেয়ালই নেই। ওর শরীরে এখন অমানুষিক শক্তি। নেশাখোরদের নেশার জিনিস না পেলে এমনই হয়।

দেখলাম, নকুল হাতের টানে রঙটা অল্প বেঁকিয়ে ফেলেছে। লোহার রডের সঙ্গে বাঁধা হ্যান্ডকাফটা ঘষা লেগে ঝনঝন ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। নকুলের গলার বিকট আওয়াজের সঙ্গে লোহার ঝনঝনানি, তার ওপর ট্রেন ছোটার শব্দ, সব মিলিয়ে যেন কামরার ভেতর তুমুল প্রলয়। ওর কাণ্ড দেখে সবাই স্তম্ভিত। কিন্তু আমি তো জানি, কোচবিহারের সেই গরুর নেশার টানের ছটফটানি, অন্ধ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মত ছোটা, তাই আমার কাছে নকুলের এই পশুর মত আচরণ তেমন কোনও বিস্ময়ের উদ্রেক করল না। ও যত আমার দিকে তেড়ে তেড়ে আসতে চাইছে, আমি তত পিছিয়ে যাচ্ছি আর বলছি, “বল, সত্যি কথা বল, তোকে আফিং দেব।” নকুল চিৎকার করে আমাকে ওড়িয়া ভাষায় গালাগালি দিতে শুরু করল। আমার সঙ্গের মাস্তানরা তেড়ে মারতে গেল নকুলকে। আমি বারণ করলাম। এখন আমার দরকার কাজ হাসিল করা।

নকুলের মুখটা বীভৎস লাগছে, কালো মুখের ওপর খোঁচা খোঁচা অনেকদিনের দাড়ি ও এলোমেলো রুক্ষ চুল, কোটরাগত চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, লাল ছোপ ধরা দাঁতগুলো বের করে আমাকে রাগী হনুমানের মত খিঁচোচ্ছে। অনেকদিনের স্নান না করা ময়লা শরীর আর পরনের জামাকাপড় থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরচ্ছে, নভেম্বরের শীতের হাওয়াতেও তার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বুনো ষাঁড়ের মত থ্রি টায়ার কামরার আটজন শোওয়ার খালি জায়গায় উথালপাথাল যা পারছে করছে। ওর নাচানাচির দাপটে আশেপাশের বাঙ্ক থেকে সবাই জিনিসপত্র নীচে নামিয়ে রেখেছি। এক একবার মনে হচ্ছে, ওর টানের চোটে বোধহয় দাঁড়িয়ে যাবে ট্রেন। মনে হচ্ছে, যদি ও দা জাতীয় কিছু এখন পেত তবে তা দিয়ে এক কোপে নিজের ডানহাতটা কেটে মু মুক্ত হয়ে আমার থেকে আফিংটা নেবার জন্য লাফিয়ে পড়ত। উসকে দেওয়ার জন্য চেটোর মধ্যে আফিংয়ের ডেলা রেখে মাঝে মাঝে বলছি, “বল, কেন মেরেছিলি? তাহলে আফিং দেব।”

ঘণ্টাখানেক একটানা অসুরের মত দাপাদাপি, চিৎকার আর গালাগালির পর নকুল হাঁপাতে হাঁপাতে বেঞ্চে ধপ করে বসে পড়ল, “বলছি, আগে দে, তারপর বলছি।' ব্যস, আমার কাজ শেষ, নকুলের প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। আমার পরীক্ষা সফল। আমি হাত সরিয়ে নিলাম, “না, আগে বল, তারপর দেব।”

নকুল বুঝল সব কথা না বলিয়ে আফিং দেওয়ার পাত্র আমি নই। ও তখন দম নিয়ে বলতে শুরু করল, “সেদিন গিন্নিমা আমায় সকাল থেকে অনেক বেশি কাজ করিয়েছে। আমি বললাম, আজ কিন্তু আমার চার টাকায় হবে না, আমাকে পাঁচ টাকা দিতে হবে। তো বলল, ঠিক আছে তোকে পাঁচ টাকাই দেব, মন দিয়ে কাজ কর। আমিও খুব খাটলাম। তিনটের সময় যখন টাকা চাইলাম, গিন্নিমা বলল, পাঁচ টাকা তো খুচরো নেই নকুল, তিন টাকা আছে। আজ এটা নে, কাল তোকে বাকিটা দিয়ে দেব। ওর কথা শুনে আমার মাথায় আগুন চড়তে লাগল। আমার তখন বেরনোর সময়, এত টালবাহানা ভাল লাগল না। তারপর গিন্নিমা বলল, তিন টাকা না নিবি তো ভাগ, আজ টাকাই দেব না। এত কি নেশা? সেই কথা শুনে আমার মাথায় খুন চেপে গেল। আমি রাগের মাথায় পাশে পড়ে থাকা নোড়া দিয়ে মেরে দিলাম ওর মাথায় এক ঘা, চিৎকার করে গিন্নিমা পড়ে গেল, আমি তখনও ওই নোড়া দিয়ে মুখের মধ্যে ঘা মেরেই চলেছি। তারপর ইঁট, কাঠ যা পেয়েছি তাই দিয়ে মেরেছি। মারতে মারতে দেখলাম, মরে গেল। ভাবলাম, আপদ গেছে।”

একটানা যেন ঘোরলাগা মানুষের মত কথাগুলো বলে নকুল চুপ করে গেল। আমার চোখের সামনে তখন ভাসছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ছবি। একটু আগে নকুলের যে নরঘাতক উন্মত্ততা দেখেছি তারই উলঙ্গ প্রকাশ নিউ আলিপুরের ওই ফ্ল্যাটে হয়েছিল, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই। আর সেই হিংস্রতার বলি হয়েছিলেন মহালক্ষ্মী দেবী। নকুল এখন চুপ করে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তারপর?” এবার নিস্তেজ গলায়

নকুল বলল, "তারপর আলমারি, দেরাজ খুলে গয়নাগাঁটি, জিনিসপত্তর গুছিয়ে বেঁধে আমি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম কালীঘাটের দোকানে। ওখান থেকে আফিং কিনে, কিছুটা খেয়ে চলে গেলাম হাওড়া। ওখান থেকে ট্রেনে চেপে দেশে।" আবার চুপ করে গেল নকুল। আমরাও চুপ। যা জানার জেনে নিয়েছি। এরপর শুধু স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যাচাই করে এগিয়ে যাওয়া।

একটু পরে নকুলই স্তব্ধতা ভাঙল, "এবার দে।" কি নির্লজ্জ লোকটা ! এর পরও আফিং চাইছে! রাগে তখন আমার শরীর কাঁপছে। গৌরাঙ্গবাবু পাশেই ছিলেন। আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। বললেন, "দাও একটু, নয়তো সারারাত চেল্লাচেল্লি করবে। একটু খেলে ঝিমবে, শান্তিতে ঘুমতে পারব আমরা।" গৌরাঙ্গবাবুর কথায় আমি নকুলকে আফিং দিতেই সে টক করে সেটা খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ পর থেকে ঝিমতে লাগল। সারা রাত একভাবেই বসে রইল।

পরদিন সকালে আমরা হাওড়ায় নেমে সোজা লালবাজার। সিনিয়র অফিসাররা জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। সবারই এক কথা, "তুমি কলকাতা পুলিশের মুখ উজ্জ্বল করেছ, মান বাঁচিয়েছ।"

আদালতে নকুলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। হাজতে আফিং না পেয়ে অসুস্থ হয়ে নকুল মারা যায়। জানি না মিঃ দত্ত আর তাঁর মেয়ে শেষ পর্যন্ত এতটুকুও সান্ত্বনা পেরেছিলেন কিনা।

১৯৬৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ তেতে উঠছিল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন আস্তে আস্তে নিরীহ আন্দোলনের থেকে ক্রমশ জঙ্গী রূপ নিচ্ছিল। খাদ্য আন্দোলনকে বলা যায় তার সূচনা। সুতরাং আমাদেরও ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছিল। ওই আন্দোলনের বীজ থেকেই জন্ম নিল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৭ সালে আবার একই আন্দোলনের অন্য একটি ধারা সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে মোড় নিল, যার ফল উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম। এই পটভূমিতে কলকাতায় একটা বড় মাপের ডাকাতি হয়। আটষট্টি সালের পয়লা জুলাই সকাল নটা নাগাদ পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের পূর্বদিকের গলির ভেতর পোস্টাল ভ্যান থেকে প্রায় চার লাখ টাকা ডাকাতি হল। ডাকাতরা একটা কালো ল্যান্ডমাস্টার গাড়ি করে ক্যামাক স্ট্রিট ধরে পালাল। এই ধাঁচের সশস্ত্র ডাকাতি কলকাতা তার আগে দেখেনি।

পোস্ট অফিস থেকে পার্ক স্ট্রিট থানা ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। ডাকাতি করে পালানোর পর পরই পুলিস অফিসাররা এসে হাজির। গোয়েন্দা দফতর থেকেও বড়-ছোট অফিসাররা দ্রুত পৌঁছলেন ঘটনাস্থলে। ওখানে পাওয়া গেল ডাকাতদলের ব্যবহৃত দুটি ছোট কাঠের বেঞ্চ ও একটা বেতের ছিপ। ছিপের মাথায় ছোট আঁকশি করা, আঁকশির তলায় ঝুলছে প্লাস্টিকের সুতো দিয়ে বানানো ছোট ব্যাগ। এছাড়াও পড়ে ছিল দুটো অদ্ভুত ধরণের প্যার্সেলের প্যাকেট। দুটো প্যাকেটই প্রায় ফুট দেড়েক লম্বা, চওড়ায় এক ফুট। প্যাকেট দুটোর আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে কেউ তার একদিক থেকে দু'খাবলা চেঁছে নিয়েছে। অদ্ভুত খাঁজ তৈরি হয়েছে সেখানে। কোরা কাপড় দিয়ে সুন্দর করে গালা মুড়ে লাগানো, ঠিকানা লেখা, টিকিটও সাঁটা রয়েছে। পাশে ছিল একটা মোটা লোহার রড। আর কিছু তখন পাওয়া গেল না।

ডাকাতরা পোস্টাল ভ্যানের রক্ষীদের দুটো বন্দুকও সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে। সব দেখে শুনে দেবীবাবু একজনের নাম করলেন, যাকে তিনি এই ডাকাতিটা সংগঠিত করেছেন বলে অনুমান করছেন। কিন্তু অনুমান আর প্রমাণ তো এক নয়, কিন্তু শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে কারোকে গ্রেফতার করা যায় না। আমাদের দফতরের যতরকম সোর্স ছিল সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হল ডাকাতির সূত্র খুঁজে বার করার জন্য। কিন্তু কোনদিক থেকেই কেউ আলোকপাত করতে পারছে না। যাকেই ধরে আনা হচ্ছে, দু এক ঘণ্টার মধ্যে প্রমাণিত হচ্ছে যে ভুল, একদম ভুল করে আমরা তাকে ধরে নিয়ে এসেছি।

কলকাতা পুলিশের মানসম্মান ধুলোয় লুণ্ঠিত হওয়ার অবস্থা। তবে একটা ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেল, এ কোনও সাধারণ ডাকাত দলের কাজ নয়। আমরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে খোঁজখবর করছি, তাতে একটা না একটা সূত্র ঠিক জানা যেত। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অন্য গ্রহ থেকে কোন দল এসে ডাকাতিটা করে ফিরে গেছে তাদের গ্রহে। তাছাড়া সাধারণ ডাকাতরা এত নিপুণ ছকে ডাকাতি করে না। ডাকাতির পর ডাকাত দলের ফেলে যাওয়া যে সব জিনিস নিয়ে এসেছি, তা কোনও সাধারণ ডাকাত দলের বুদ্ধিতে আসবে বলে মনে হয় না। এসব জিনিস কি কি কারণে তারা নিয়ে এসেছিল তাও আমরা চট করে বুঝতে পারিনি। কমিশনার সাহেব থেকে আমাদের দফতরের ছোট অফিসারদের পর্যন্ত মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলার অবস্থা। সূত্র কই? সূত্র! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইভাবে চলে যাচ্ছে। আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি অন্ধকারে।

আমাদের যখন এই অবস্থা, তখন গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত অক্টোবর মাসের বাইশ তারিখে ফের এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা ঘটল। সকালবেলায় সদর স্ট্রিটে এক সিগারেট সরবরাহী কোম্পানির লক্ষাধিক টাকা কর্মচারীরা ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। ছ সাত জনের এক সশস্ত্র ডাকাত দল তাঁদের ওপর হামলা করে টাকা নিয়ে গাড়ি করে পালিয়ে যায়। এরপরই পত্রপত্রিকায় আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইতে লাগল। সদর স্ট্রিট

ডাকাতির জট মাস দুয়েকের মধ্যে খুলে কিছুটা মুখ রক্ষা করতে পারলেও পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ডাকাতির কোনও কিনারা হল না।

এদিকে তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিনদিন অবনতি ঘটছে, অস্থিরতা বাড়ছে চারদিকে। আমরা সেদিকেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। এর মধ্যে আবার ডাকাতি হয়ে গেল। এবার ডাকাতিটা হল নিউ আলিপুরে ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে। মাঝেরহাট ব্রিজ যেখানে ট্যাঁকশালের দিকে নেমে গেছে তার পূর্ব কোণে বিরাট পেট্রল পাম্পের উল্টো দিকে ব্যাঙ্কটা। খোলে দুপুর সাড়ে বারোটায়। উনসত্তরের দোসরা এপ্রিল ডাকাতরা ঠিক ওই সময় ছদ্মবেশে ব্যাঙ্কে ঢুকে কর্মী ও কাস্টমারদের রিভলবার, পিস্তল, স্টেনগান দেখিয়ে কাউন্টার থেকে প্রায় লাখ দেড়েক টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গেল। ব্যাঙ্কের সামনে থেকে পাওয়া গেল নাইন, এম. এম. পিস্তলের ফায়ার করা কার্তুজের খোল। বেশ কিছু দূরের একটা গলি থেকে পাওয়া গেল একটা বেতের ঝুড়ি, যার মধ্যে ছিল একটা সোনালি রঙের পাগড়ি ও সর্দারজীদের দাড়ি বাঁধার কালো কাপড়, গাড়ির নাম্বার প্লেট। একটা কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়ি ডাকাতদের তুলে নিয়ে গেছে বলে জানা গেল। এই নতুন ডাকাতি আমাদের উত্তেজনার পারদ আরও চড়িয়ে দিল। এবারও সমস্ত সোর্স খবর দিতে ব্যর্থ। পোস্ট অফিসের ডাকাতির মত এই ডাকাতিরও কোনরকম সূত্র মিলছে না। অন্য তদন্ত মোটামুটি শিকেয় তুলে এই দুই ডাকাতির রহস্য উদ্ধারের জন্য আদা জল খেয়ে লাগলাম। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম বলে মনে হচ্ছে। তবু হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

এদিকে জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় পরপর পাঁচটা টাইম বম্ব ফাটল। কি উদ্দেশে এই বিস্ফোরণ তা বোঝা যাচ্ছে না। উদ্দেশ্য কি সন্ত্রাস সৃষ্টি করা? কারা চাইছে এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে? বোমাগুলো যে খুব জোরাল, তাও নয়। তবে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। গ্লোব ও লাইটহাউস সিনেমায় শো চলাকালীন ফাটল দুটো টাইম বোমা। দুটো ফাটল মার্কিন ভিসা অফিসে এবং আমেরিকান লাইব্রেরিতে। আর শেষটা বিবাদী বাগে জি পি ওতে একটা পোস্টাল ব্যাগের ভেতর। সিনেমা হল দুটোতে এবং ভিসা অফিসে টাইম বম্ব রাখা হয়েছিল মহিলাদের ব্যাগের ভেতর। আর লাইব্রেরি ও পোস্টাল ব্যাগে ফাটল বইয়ের ভেতর। ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর যখন বোমা ফাটল তখন ধরেই নেওয়া যায়, ব্যাগ নিয়ে কোন পুরুষ নয়, মহিলাই হলে ঢুকেছিল। পোস্টাল ব্যাগে যে বোমাটা ফাটল সেটা যে বইয়ের ভেতর রাখা ছিল তার টুকরো টুকরো কাগজগুলো কুড়িয়ে নেওয়া হল। বোঝা গেল বইটা পার্সেল করে পাঠান হচ্ছিল আমেরিকান লাইব্রেরিতে। টুকরো ঘেঁটে পাওয়া গেল একটা পাখির পায়ের ছবি। কাগজ ও ছাপা দেখে মনে হল এটা কোনও বিদেশি বইয়ের মলাট। লাইব্রেরিতে খোঁজ শুরু হল, কি বই ওটা? ওই বই কি লাইব্রেরি থেকে কেউ নিয়ে গিয়েছিল? যদি নিয়ে যায় তবে কে সে? অনেক জল ঘোলা করার পর জানা গেল, যে বইটার খোঁজ করা হচ্ছে, তার দুটো কপি আমেরিকা থেকে এসেছিল। একটা চলে যায় পাটনায় লাইব্রেরির এক শাখায়, অন্যটা কলকাতায় ছিল। সেই বইটা নিয়ে গিয়েছিলেন জনৈকা মিসেস মিত্র, তার ঠিকানাটা ভবানীপুরের। পাখির পায়ের ছবিটা মেলানোর জন্য পাটনা থেকে প্লেনে করে বইটার কপি আনিয়ে মেলানো হল হল। আমরা যখন একদিকে টাইম বম্ব রহস্যের কিনারায় ব্যতিব্যস্ত, অন্যদিকে পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিস ও নিউ আলিপুরের ব্যাঙ্ক ডাকাতদের খুঁজছি, তখনই যে ঘটনাটা ঘটল তাকে বলা যায় অকল্পনীয়। নিউ আলিপুরের সেই একই ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে পনেরই অক্টোবর ঠিক সেই দুপুর সাড়ে বারোটায় দ্বিতীয় বার ডাকাতি হয়ে গেল। একই ব্যাঙ্কে সাত মাসের ব্যবধানে দু দুবার ডাকাতিতে আমরা একেবারে হতবাক। এবারও ডাকাতরা স্টেনগান, রিভলবার, পিস্তল ব্যবহার করল। এক লক্ষ বারো হাজারের মত টাকা কাউন্টার থেকে নিয়ে সেই কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে পালাল। ডাকাতদের গড় বয়স পঁচিশ। এবার পাওয়া গেল একটা চটের নতুন থলি, স্টেনগান থেকে ছোঁড়া কার্তুজের খোল। সেগুলোই কুড়িয়ে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা নিয়ে গেলেন পরীক্ষার জন্য।

দূর, দূর, আমাদের নিয়ে দফতরের কালো অ্যাম্বাসাডরের ডাকাতরা যেন ছেলেখেলা করছে। আমাদের অফিসারদের মনের যা অবস্থা, ডাকাতদলের কাউকে পেলে যেন চিবিয়ে খাবে। ব্যর্থতায় রাগ বেড়ে যাচ্ছে আমাদের। সোর্সগুলোকে মনে হচ্ছে চরম অপদার্থ। এদিকে আমাদের প্রতিদিন তুলোধোনা করছে পত্রপত্রিকা। অন্যদিকে কিন্তু গোপনে আমরা টাইম বোমার রহস্য জাল আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনছি। ভবানীপুরে অনেক ঘুরে অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেল, মিসেস মিত্র ও মিস্টার মিত্রের আসল পরিচয় নয়। তাঁরা হচ্ছেন মিসেস রায় ও মিস্টার রায়। তাঁরা বহুদিন ধরেই ওইখানে আত্মগোপন করে আছেন। মিসেস রায়ের অফিস থেকে জানা গেল তিনি বেশ কয়েকমাস ধরে ছুটিতে আছেন।

জাল গোটানো প্রায় শেষ। এগারই নভেম্বর, ভাই ফোঁটার দিন ছিল। খবর এল, মিসেস রায় বেলগাছিয়ায় তাঁর ভাইকে ফোঁটা দিতে যাবেন। আমাদের দল সেই ভাইয়ের বাড়ির চারধার সাদা পোশাকে ঘিরে রাখল। ইতিমধ্যে বেলতলার মোটর ভিহিকেলস্ ডিপার্টমেন্ট থেকে বহু পরিশ্রম করে মিস্টার রায়ের ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটো যোগাড় করা হয়েছিল। তাতে রায়কে চিনতে আমাদের সুবিধে হয়েছিল। রাত নটা নাগাদ রায় দম্পতিকে দেখা গেল। খবর পাকা। ধরতে যেতেই ওঁরা আমাদের সঙ্গে তর্ক করে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে কেটে পড়ার ফন্দি করলেন। কিন্তু সেই সুযোগ না দিয়ে সোজা ওঁদের নিয়ে আসা হল লর্ড সিনহা রোডে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে। তারপর লালবাজার। একনাগাড়ে জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে শেষ পর্যন্ত দুজনেই স্বীকার করলেন যে তাঁরাই টাইম বোমাগুলো ফাটিয়েছেন। সন্ত্রাস সৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁরা নকশালদের সমর্থক, কিন্তু কোনও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নন। তাঁদের দীর্ঘ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে নভেম্বরের শেষ দিকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। টাইম বম্ব রহস্যের আবরন তো খোলা গেল, কিন্তু ডাকাতির রহস্য তখনও অন্ধকারেই।

উনসত্তরের বারোই ডিসেম্বর, শীতের সকাল। গোটা শহর ইডেন গার্ডেনমুখী। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ শুরু। অনেক দিন পর বাংলার কোন তরুণ খেলছিল ভারতীয় দলে। সেদিন ব্যাটসম্যান অম্বর রায়ের টেস্ট অভিষেক। সকাল দশটায় খেলা শুরু। আমরা সবাই পড়িমড়ি করে খেলা দেখতে গেছি। কারও কারও ওখানে ডিউটিও আছে। সাড়ে দশটাও বাজেনি, জায়গা মত বসেছি কি বসিনি, হঠাৎ ইডেনের মাইকে ঘোষণা ভেসে এল, লালবাজার কন্ট্রোল রুম থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে, মাঠে উপস্থিত গোয়েন্দা দফতরের সব অফিসাররা যেন এক্ষুণি লালবাজারে হাজির হন। সেই নির্দেশ শুনে যে যেখানে ছিল তড়িঘড়ি লালবাজারে ছুটল। শুনলাম, পার্ক স্ট্রিট আর রাসেল স্ট্রিট ক্রসিংয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় ব্যাঙ্ক খোলার সাথে সাথে ডাকাতি হয়ে গেছে।

আবার ব্যাঙ্ক ডাকাতি! ওখানে গিয়ে শোনা গেল, যখন ব্যাঙ্ক কর্মীরা ভল্টের থেকে টাকা বার করে ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই ডাকাতরা তড়িৎগতিতে ঢুকে পড়ে। একজন বন্দুকধারী নেপালী পাহারাদারকে গুলি করে খুন করে, অন্য একজন পাহারাদারকে আহত করে চার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ও বহু সিকিউরিটির কাগজপত্র নিয়ে চম্পট দেয় তারা। একটা স্টেশন ওয়াগন ছিল তাদের বাহন। চোদ্দ পনের জন অল্পবয়সী ডাকাত মিনিট দুয়েকের মধ্যে রাসেল স্ট্রিট ধরে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। স্টেশন ওয়াগনের সামনে ছিল একটা কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়ি, পেছনে ছোট একটা লরি। যাওয়ার সময় স্টেশন ওয়াগনের ড্রাইভারের সিটের দিকের জানালা দিয়ে লাল পতাকা ওড়াতে ওড়াতে তারা গেছে। ডাকাতরা ব্যাঙ্কের ভেতর ছড়িয়ে গেছে দশ বার পাতার ছোট বই আকারে তাদের ঘোষণাপত্র। শুধু তাই নয়, রাসেল স্ট্রিটের ওপর ব্যাঙ্কের মূল দরজার বাঁ দিকে ফুটপাতে যে সরু মত ফুলের বাগান আছে, তাতে রেখে গেছে একটা টেপ রেকর্ডার। তাতে ক্যাসেটে রয়েছে তাদের আগামী পদক্ষেপের ঘোষণা। আর পাওয়া গেল বড় একটা ছুরি, সাদা কাউন্টি ক্যাপ, একটা হুইসেল। ডাকাত দলের যে লরিটা স্টেশন ওয়াগনকে পেছন পেছন পাহারা দিয়ে নিয়ে গেছে, জানা গেল সেটা সকাল নটার আগে থেকে ব্যাঙ্কের সামনে পার্ক করা ছিল। নটার

পর থেকে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে লরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। যেই ডাকাত দল ব্যাঙ্কে ঢুকেছে, ঠিক তখনই লরির চালক স্টার্ট দেয়। পাশেই ক্রসিংয়ে ছিল একজন ট্রাফিক কনস্টেবল, সে লরি চালাতে বারণ করে। কনস্টেবল লরি চালকের কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স চাইলে সে পকেট থেকে সেটা বের করে নির্দ্বিধায় দিয়ে দেয়। আমরা পেলাম সেই লাইসেন্সটা, যা বলাই বাহুল্য নকল। লাইসেন্সের ফটোর সঙ্গে অবশ্য ড্রাইভারের চেহারার মিল ছিল।

এর কিছুক্ষণ পর এক পথচারী খুঁজে পেয়ে দিয়ে গেলেন ব্যাঙ্কের সিল করা দশ হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল। যেখানে রাসেল স্ট্রিট শেষ হয়ে লিটল রাসেল স্ট্রিট শুরু হয়েছে, সেখানে স্টেশন ওয়াগন থেকে ওই বাণ্ডিল পড়ে গিয়েছিল। ততক্ষণে ডাকাতির খবর রটে গেছে চারদিকে। তারপর দেখা গেল, সাউথ ক্লাবের উল্টো দিকে লী রোডে পড়ে আছে ডাকাতদের ব্যবহার করা তুঁতে রঙের পুরনো স্টেশন ওয়াগনটা। একসময় ওটা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার স্টাফ কার। স্টেশন ওয়াগনে পাওয়া গেল ব্যাঙ্কের তিনটে কালো রঙের ট্রাঙ্ক, তিনটেই ভাঙা। যেটাতে টাকা ছিল সেটা ফাঁকা। একটায় সিকিউরিটির কাগজ ভর্তি, অন্য যেটাতে কয়েন ছিল সেটাও ফাঁকা। আর পাওয়া গেল লাল পতাকা, দুটো ব্যাগ, একটা লোহার রড। ভ্যানের ভেতর দেখা গেল রক্তের ছাপ। তার মানে ডাকাতদলের কেউ আহত হয়েছে। তারপর সব বেপাত্তা।

লালবাজারে তখন বসে গেছে শলাপরামর্শ। ডাকাতদের ফেলে যাওয়া ঘোষণাপত্র পড়ে ও ক্যাসেট চালিয়ে জানা গেল, তাদের দলের নাম রেভল্যুশনারি কমিউনিস্ট কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। চৌ এন লাই যেমন চীনে সাংহাই শহরে অভ্যুত্থান করে সরকারি অস্ত্রাগার ও কোষাগার লুঠ করে হাজার হাজার মুক্তিসেনা নিয়ে গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিলেন বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশে, এরাও তেমনি ঠিক করেছে, কলকাতায় অভ্যুত্থান করে শহর দখল করে অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে চলে যাবে গ্রামে। আর তারই প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রয়োজন প্রচুর টাকা। সেই টাকা তারা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে যোগাড় করছে। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হল, এরা সাধারণ ডাকাত দল নয়। আর সেজন্যই এদের হদিস পেতে আমাদের এত বেগ পেতে হচ্ছিল।

পুরনো সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত দলগুলোর মতই এদের ক্রিয়াকলাপ হওয়া উচিত মনে হল। আমাদের ছোটবড় সব অফিসারদের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে, কিভাবে এদের সন্ধান পাওয়া যায়? হঠাৎ আমাদের মনে হব টাইম বম্ব মামলায় ধৃত মিঃ রায়ের স্বীকারোক্তিতে কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা আছে যা কিনা তাঁর কাজের জগতের বাইরের। নিয়ে আসা হল তাঁর সেই স্বীকারোক্তি। সেই স্বীকারোক্তি বারবার পড়ে দেখা হল, কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা মিঃ রায় দিয়েছেন, গুপ্ত সংগঠন এবং তাদের কাজের ধরণ সম্পর্কে ওঁর যা ধারণা, তা যেন মিলে যাচ্ছে আর. সি. সি. আইয়ের এই ঘোষণাপত্রের সাথে। রায় তখন প্রেসিডেন্সি জেলে বিচারাধীন বন্দী। সেদিনই একটা অন্য মামলায় কোর্টের নির্দেশ নিয়ে রায়কে জেল থেকে নিয়ে আসা হল লালবাজারে। তাঁকে প্রশ্ন করা হল স্বীকারোক্তির ওই সব কথার অর্থ কি? ছোটখাট দোহারা চেহারার রায় কিন্তু আমাদের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অকুল সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে তখন আমাদের খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা। একদিকে সরকারের প্রচণ্ড চাপ, অন্যদিকে খবরের কাগজ। পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই টানাটানি। সেই মরণপণ লড়াইয়ে মিঃ রায় কতক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারবেন? একসময় ভেঙে পড়লেন। রাত তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। তিনি স্বীকার করলেন, প্রথম থেকেই আর. সি. সি. আই দলের সদস্য ছিলেন। এমনকি দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও ছিলেন। দলের নেতা হচ্ছেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন খ্যাত অনন্ত সিং। তিনিই এই দল তৈরি করেছেন, পরিচালনাও করেন। দলের সভ্য সংখ্যা একসময় ছিল প্রায় ষাট জন। এখন কত আছে তা অবশ্য রায় জানেন না। পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসে ডাকাতির পরই তাঁর সঙ্গে

দলের পরিচালকদের রাজনৈতিক বিরোধ বাধে। নিউ আলিপুর গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে প্রথম ডাকাতির পর দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন কি অবস্থায় আছে দল তা তিনি জানেন না, তবে দলের সক্রিয় সদস্য এবং অনন্তবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠ কল্যাণ বসু ওরফে গোরার গড়িয়ার বাড়ি তিনি চেনেন। ওই বাড়িটা অনন্তবাবুর বাড়ির কাছেই।

গভীর রাত, আমি আর গৌরাঙ্গবাবু রায়কে নিয়ে দুটো প্রাইভেট গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম গড়িয়ার দিকে। রায়ের কাছে শুনলাম, দলের সব সদস্যই অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকলেও, গোরা বাড়ি ছেড়ে যায় না চট করে, কারণ বাবা-মার সে একমাত্র ছেলে। সে যে এই রকম একটা গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তাও তার বাবা মাকে কিছুতেই বুঝতে দিতে চায় না। সেইভাবেই সে চলাফেরা করে। যদিও গোরার মত বাবা মার একমাত্র ছেলেকে রিক্রুট করা অনন্তবাবুর পলিসি বিরোধী, তবু যে কারণেই হক, অনন্তবাবু গোরাকে দলে নিয়েছেন। গাড়ি ছুটছে কলকাতার একেবারে দক্ষিণ দিকে। আমার পাশে বসে আছেন রায়। আমি মনে মনে একবার ভাবলাম, জয় হোক মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক বিপ্লবের। নয়ত কি করে খুঁজে পেতাম ধারাবাহিক ডাকাতির সূত্র? মিঃ রায় দলছুট হয়ে এসে নিজের বিপ্লবীয়ানা দেখাবার তাগিদে টাইম বন্ধ ফাটিয়েছিলেন। তাঁর এই অতি বিপ্লবী মধ্যবিত্ত সুলভ রোম্যান্টিক কার্যকলাপের জন্যই তাঁকে আমরা ধরতে পেরেছি। তার অতিরিক্ত কথা বলার প্রবণতার স্বীকারোক্তিতে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন, যেখান থেকে সূত্রের সিঁড়ি পেয়ে ধরতে যাচ্ছি গোরাকে।

রায় গড়িয়াতে এসে একটা গলির মধ্যে গাড়ি ঢোকালেন, কিন্তু গোরার বাড়িটা নির্দিষ্ট করে দেখাতে পারলেন না। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় তখন বুঝতে পারলাম না। আমরা এলাম যাদবপুর থানায়। সেখানে এসে থানার অফিসারদের সাহায্যে বের করলাম গড়িয়ার ওই অঞ্চলের ভোটার লিস্ট। লিস্ট দেখতে দেখতে পেয়ে গেলাম গোরার নাম। ওই গলির ভেতরই থাকে। সেই বাড়ির ঠিকানা নিয়ে ছুটলাম আবার গড়িয়ায়।

যখন গোরার বাড়ির সামনে পৌঁছলাম তখনও সূর্য ভাল করে কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে মুখ বার করেনি। দরজার কড়া নাড়লাম। বেঁটে খাটো গোলগাল তেইশ চব্বিশ বছরের যুবক দরজা খুলল। হাফ প্যান্ট পরা, ঘুম থেকে উঠে এসেছে। ততক্ষণে গাড়িতে বসা মিঃ রায় ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন এই ছেলেটাই গোরা। গোরা শুধু আমাদের প্রশ্ন করেছিল, "কাকে চাই?" আমি বললাম, "তোমাকেই।" সোজা তুলে এনে গাড়িতে। গাড়ি ছুটল লালবাজার। খবর পেয়ে দেবীবাবু সমেত বড় বড় অফিসাররা সকালবেলাতেই দফতরে হাজির।

গোরাকে যতই জেরা করা হল, সে জানি না জানি না বলে এড়িয়ে যেতে লাগল। তা বললে কি চলে? আমরা তো মিঃ রায়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি, এবার ভুল নয়, আসল লোককেই এনেছি। আমাদের জানতেই হবে, দলের অন্য সদস্যরা কে কোথায় আছে, ডাকাতি করা টাকা, অস্ত্রশস্ত্র সব কোথায়? গোরা চার পাঁচ দিন প্রতিরোধ করল। তার অভিসন্ধি ছিল, তার ধরা পড়ার খবর শুনে দলের অন্য সদস্যরা যেন এই ফাঁকে সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু একদিন গোরা ভেঙে পড়ল। বলল, কল্যাণ রায়ের গোপন ডেরা চিনিয়ে দেবে। দলে অনন্ত সিংয়ের পরেই ছিল কল্যাণ রায়ের জায়গা। গোরাকে নিয়ে আমরা সে রাতেই বেরিয়ে পড়লাম। গোরা কাঁকুলিয়া রোডের একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল। তখনও ভোর হতে বেশ খানিকটা দেরি। আমরা বাড়ি ঘিরে রাখলাম। কাকভোরে বাড়ির মালিককে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল। কিন্তু তিনি যা বললেন, তাতে আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। দিন দুই আগে তাঁর ভাড়াটে একটা টেম্পোতে সব জিনিসপত্র তুলে স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে অন্য বাসায় চলে গেছে। কোথায় গেছে বলতে পারলেন না।

হিসেব করে দেখা গেল, গোরাকে যেদিন আমরা ধরেছি ঠিক তার পরদিন কল্যাণ রায় সপরিবারে পালিয়েছে। একদিক দিয়ে গোরার ফন্দি কাজে লেগে গেছে ওদের দলের সদস্যদের। কিন্তু আমাদের তো বসে থাকলে চলবে না। সূত্র যখন পাওয়া গিয়েছে তার

পেছনে আদাজল খেয়ে লেগে পড়তে হবে। এতদিন আমরা হাওয়ায় হাতড়ে মরেছি, কিন্তু এবার আমাদের হাতে কিছু মশলা আছে যা ধরে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা কালীঘাট, গড়িয়াহাট অঞ্চলের টেম্পোর ঘাঁটিগুলোতে গিয়ে ড্রাইভারদের সাথে বন্ধুত্ব করতে লাগলাম। জানতে হবে কোন টেম্পো ভাড়া করে কাঁকুলিয়া রোডের বাড়ি থেকে কল্যাণ রায় গিয়েছে। টেম্পো খুঁজে বার করার জন্য ছ সাত জন কনস্টেবল ও একজন অফিসারের একটা টিম করা হল। তারা দক্ষিণ কলকাতার যত টেম্পো ঘাঁটি আছে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভারদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া, বিড়ি সিগারেট চা খাওয়া চলতে লাগল। চার পাঁচ দিনের মাথায় পাওয়া গেল সেই টেম্পোর ড্রাইভারকে। সে জানাল, কাঁকুলিয়া রোড থেকে এক ভাড়াটেকে নিয়ে পাম অ্যাভিন্যুতে এক বাড়িতে সে ওই দিন দিয়ে এসেছে। তাকে বলতে সেই দিনই পাম অ্যাভিন্যুর বাড়িটা আমাদের দেখিয়ে দিল।

কল্যাণ রায়ের আস্তানা চেনার পর ঠিক হল, ওখানে প্রথমেই সরাসরি তল্লাশি করতে যাওয়া হবে না। প্রথমে বাড়ি ঘিরে রেখে দেখা হবে কে কে আসছে, সবাইকে চিনিয়ে দেবে গোরা। কারণ একবার যদি বাড়ি তল্লাশি করা হয় এবং কল্যাণ রায়কে না পাওয়া যায়, তবে সে সতর্ক হয়ে যাবে, তখন আবার পালিয়ে যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা একটা কোম্পানির ডেলিভারি ভ্যান যোগাড় করলাম। ভ্যানের ভেতর গোরাকে বসিয়ে রাখা হল। ভ্যানের ছোট্ট জাল দেওয়া জানালা দিয়ে গোরা রাস্তায় নজর রাখল, কল্যাণ এলেই জানান দেবে, আসামী হাজির। ভ্যানটা পাম অ্যাভিন্যুর সেই তিনতলা বাড়ির সামনে চাকা খুলে অচল করে রাখা হল। আমাদের অফিসাররা চারদিকে ছদ্মবেশে ঘুরতে লাগল সাধারণ পথচারীর মত। কেউ কারোকে চেনে না। বাড়িটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হল।

সকাল চলে গেল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাড়িটার কাছেই ছিল কড়েয়া থানা। সেখানে ঘাঁটি গেড়ে আমাদের পরিচালনা করছিলেন তখনকার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কল্যাণ চক্রবর্তী ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি. সি. অরুণ মুখার্জি। তাঁরা অন্য কোনও জুনিয়র অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, কড়েয়া থানার সামনের বাগান থেকে মুলো তুলে একটা চটের থলি করে বিকেল চারটের সময় পাঠিয়ে দিলেন পাম অ্যাভিন্যুর ওই বাড়িতে, দেখে আসতে ফ্ল্যাটে কল্যাণ রায় আছে কি না। কল্যাণ রায় তখন বাড়ি ফিরছিল, সে দূর থেকে দেখে বিকেল চারটের সময় একটি অচেনা লোক বাজার করে তার বাড়িতে ঢুকছে। দেখেই তার সন্দেহ হয়, শীতকালের পড়ন্ত বিকেলে কে সব্জি বাজার করে বাড়িতে আসবে? কল্যাণ রায় তক্ষুণি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আসলে বড় বড় অফিসারদের কাজ হল জুনিয়রদের কাজের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া। দায়িত্ব পাওয়ার পর দক্ষ জুনিয়র অফিসাররাই পরিস্থিতি বুঝে এগিয়ে যায়। হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিচুতলার অফিসারদের অনেক বেশি। কারণ তারাই মাঠে নেমে খেলে। আসলে প্রশাসন চালান আর তদন্ত চালান এক নয়। গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে শখের বা ছেলেমানুষীর কোন জায়গা নেই। চোখকান খোলা রেখে এগিয়ে যেতে হয়, কারণ অপরাধীরা ধূর্ত।

সন্ধের মুখে হঠাৎ গোরা বলে উঠল, "বাদল, বাদল।" বাদল হচ্ছে যাদবপুরের বিমল রায়চৌধুরীর ছদ্মনাম। ছিপছিপে, ফর্সা, ছ ফুটের মত লম্বা, মাথায় খুব অল্প চুল, টিকলো নাক, সাতাশ আঠাশ বছরের এক সুদর্শন যুবক পাম অ্যাভিন্যুর বাড়িতে ঢুকে পড়ল। আমরাও ওর পেছন পেছন তিনতলার ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। আটকে দিলাম ওকে। একবার যখন আমরা ফ্ল্যাটে ঢুকে নিজেদের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছি তখন আর বসে থেকে লাভ কি? বিমলকে একদিকে বেঁধে রাখা হল, শুরু হল খানা-তল্লাশি। ফ্ল্যাটে ছিল কল্যাণ রায়ের স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে। ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেল স্টেট ব্যাঙ্কের থেকে ডাকাতি করা পঞ্চাশ হাজারের ওপর টাকা, দলের গোপন কিছু কাগজপত্র, অস্ত্রের কিছু অংশ। আমরা যে ফ্ল্যাটের ভেতর আছি বাইরে কেউ জানে না। নিঃশব্দে কাজ হচ্ছে, কল্যাণ রায় যদি আসে সে টেরও পাবে না এমনভাবে ফাঁদ পাতা আছে। না, সে এল না। কল্যাণ রায় বিমলকে পাঠিয়েছিল টাকা নিয়ে আসতে। সে যখন আর ফিরে যায়নি, তখন ধরেই নিয়েছে কোনও

বিপদ হয়েছে, তাই বাড়ির দিকে আর পা বাড়ায়নি।

আমরা কল্যাণ রায়কে পেলাম না, কিন্তু বিমলকে পেলাম। তাকে নিয়ে রাত এগারটা নাগাদ ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলাম। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ, শীত জাঁকিয়ে বসেছে কলকাতার বুকে। রাতের ফাঁকা রাস্তা ধরে হু হু করে গাড়ি ছুটল লালবাজারের দিকে। ডেলিভারি ভ্যান ততক্ষণে ফের ঢাকা লাগিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। সেও গোরাকে নিয়ে হাজির। বিমল বেশি প্রতিরোধ করেনি। করবেই বা কি করে? সে তো কল্যাণ রায়ের ফ্ল্যাটে বামাল ধরা পড়েছে। ইতিমধ্যে পুরুলিয়ায় ধরা পড়েছে এই দলেরই সদস্য প্রলয়েশ মিশ্র আর অমিয় (সাগর) চ্যাটার্জি, সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা। ওরা ওখানে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। খবর পেয়ে আমরা তাদের লালবাজারে নিয়ে আসি।

বিমলের কাছ থেকে খবর পেয়ে যাদবপুরের একটা বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হল একটা সুটকেস। তাতে পাওয়া গেল কলকাতা মোটর ভিহিকেসের বহু রকম নকল রাবার স্ট্যাম্প, ড্রাইভিং লাইসেন্স বানানোর সবরকম সরঞ্জাম। সেসব দিয়ে যখন তখন যে কোনও নামে ওরা নকল লাইসেন্স বানিয়ে ফেলতে পারত, ট্রাফিক পুলিশের সাধ্য নেই চট করে চেনে। সেই সুটকেসের মধ্যে ওদের দলের দুই সদস্যের পাসপোর্ট সাইজ ফটো পাওয়া গেল। যখন তখন ভুয়ো নামে খুশীমত লাইসেন্স বানানোর জন্য রাখা ছিল। জানা গেল, একটা ফটো ভবানীপুর অঞ্চলের পাঞ্জাবী ছেলে টনি বা রূপে সিং সোধীর, অন্যটা বেহালার তরুণ নকশাল নেতা রাজারাম চৌধুরীর। ওদের দলের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী ফটোগুলো খুঁজে পাওয়ার কথা নয়, বিমলেরই ভুলে সেগুলো আমাদের হাতে এল। অনন্তবাবুর কড়া নির্দেশ ছিল, কোনও জায়গায় এমন কি নিজের বাড়ি বা আত্মীয়স্বজনের কাছেও যেন কোনও ফটো না থাকে। সব ফটো যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই নির্দেশ মেনে সদস্যরা কখনও ফটো তুলতও না, এমন কি পুরনো সব ফটো নষ্ট করে ফেলত। ফটো পেলে আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হয়, আসামীকে চিহ্নিত করা যায়। ফটো পাওয়ার দিন দশেকের মাথায় বেহালায় এক লন্ড্রি থেকে অরুণ মুখার্জির নেতৃত্বে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা রাজারামকে গ্রেফতার করল। ওকে গাড়িতে মুখার্জি সাহেব বারবার প্রশ্ন করছেন, "কল্যাণ রায় কোথায় এখন, বল?" ঠিক তখনই কিন্তু তারাতলার মোড়ে কল্যাণ রায় ও ওদের দলের এক সদস্যা কল্পনা বসু কথা বলতে বলতে গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে তারাতলা রোডের দিকে চলে গেল। গাড়ির মধ্যে রাজারাম নির্বিকার। পুলিশও ওদের চেনে না যে চট করে গিয়ে ধরবে। যাকে আমরা হন্যে হয়ে খুঁজছি, সেই-ই আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে চলে গেল। এমনই হয়, আর সেজনই আমাদের প্রয়োজন হয় সাহায্যকারী ব্রীজ, অর্থাৎ সোর্স। রাজারামের বাড়িতে আমাদের অন্য এক দল গেল তল্লাশি করতে। কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। ওর পকেটে অবশ্য পাওয়া গেল ভারি গাড়ি চালানর নকল ড্রাইভিং লাইসেন্স, যার ফটোটা আমাদের উদ্ধার করা ফটোর অন্য এক কপি। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেল। সুদর্শন ছাত্র রাজারাম আর পালাবে কোথায়?

রাজারামকে গ্রেফতারের চারদিন পর সত্তরের জানুয়ারি মাসের দশ তারিখে অনন্তবাবুকে তাঁর গড়িয়ার বরদা অ্যাভিনিয়ুর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হল। তাঁকে গ্রেফতার করা মোটেই সহজ ছিল না। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ততদিনে আমাদের হাতে এসে গিয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে কিছু নির্দিষ্ট প্রমাণ। সেগুলো আদালতে দাখিল করে আদালতের নির্দেশ নিয়ে এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হল। তাঁকে লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপে রাখা হলেও তাঁর বয়স এবং গুরুত্ব অনুযায়ী সবরকম সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়েছিল। এরপর আমাদের প্রায় মাস চারেক হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। কারণ ওদের দলের অন্য সদস্যদের গ্রেফতার করতে পারিনি। নতুন কোন যোগসূত্র পাওয়া যায়নি, ওরাও ভীষণ সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা হাল ছেড়ে দিইনি। নিউ আলিপুরের সাহাপুর ক্যাম্পের সামনে থেকে গ্রেফতার করলাম অনিল দত্তকে, যাকে পরে আমরা রাজসাক্ষী বানিয়েছিলাম।

তারপর আবার পুরুলিয়া, এবার সেখানে ধরা পড়ল বাবুল, সমরেন্দ্র ও স্বপন। এই তিন তরুণ ছাত্র কলকাতার দল ছেড়ে পুরুলিয়ায় চলে গিয়েছিল মূল নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃষকদের সাথে মিশে লড়াই করতে। তাদের নিয়ে আসা হল লালবাজারে। অনিল দত্তের কাছ থেকে খবর পেয়ে একদিন গভীর রাতে দমদমের এক বাড়ি থেকে ধরা হল রণজিৎ দেকে। ধরা পড়ল যাদবপুরের ছোট্টখাট্ট চেহারার নকশাল খোকন দাস। নামখানায় নদী পারাপারের সময় আমাদের ফাঁদে ধরা পড়ল বেহালার আর এক নকশাল নেতা খোকন ভট্টাচার্য। তার সূত্র ধরে ধরা হল অস্ত্রের কাস্টডিয়ান বেহালার নকশাল সুভাষ সাহাকে। তার থেকে উদ্ধার করা হল বিদেশী একটা স্টেনগান, একটা পিস্তল, একটা রিভলবার ও গ্রেনেড। এগুলো স্টেট ব্যাঙ্কে ডাকাতির সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। ডাকাতির পর সেগুলো মূল ঘাঁটিতে জমা না দিয়ে বেহালার খোকন আর রাজারামরা নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল। অবশ্য সুভাষের সঙ্গে ওই দলের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এদের সবাইকে গ্রেফতারের পর আমাদের সামনে দলের সম্পূর্ণ ছবিটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'৬৫-৬৬ সাল থেকেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে দলের বহু সদস্য ও সমর্থক দলের সঙ্গে সম্পর্ক আলগা করে ছোট ছোট উপদল তৈরি করেছিল, বিপ্লব করার উদ্দেশে। এইসব উপদলের সদস্যরা বিশ্বাস করত, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব কোনদিনই বিপ্লবের পথে যাবে না। তারা মুখে বিপ্লবের কথা বলে পার্টির সদস্যদের ভুলিয়ে রেখে সংসদীয় পথেই থাকবে। বিপ্লব করার জন্য যেভাবে পার্টিকে সংগঠিত করা দরকার তেমন কোনও পদক্ষেপও তারা নেবে না। এমনই একটা উপদল তৈরি করলেন অনন্ত সিং। তিনি পঞ্চাশের দশকেও “ওয়েজ” নামে একটা গুপ্ত দল তৈরি করেছিলেন। সেই দল ঊষা কোম্পানির ডাকাতি সমেত অনেকগুলো বড় ডাকাতি করেছিল, সেই টাকা তখনকার গুপ্ত পার্টির জন্য খরচ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই দল ভেঙে যায়। তাদের বানানো একটা অত্যাধুনিক বুলেটপ্রুভ আর্মার্ড কার বিবাদী বাগে নিজেদের ভুলে গাড়িতে রাখা নিজেদেরই বিস্ফোরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যায়। গাড়িতে দলের চারজন সদস্য ছিল, তারাও মারা যায়। তখন সেই দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিল কল্যাণ রায়। দল ভেঙে যাওয়ার পর সে চলে যায় আসানসোল-বার্নপুর অঞ্চলে, সেখানে সে সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে থাকে। হঠাৎ তার মনে হয় এইভাবে দেশে বিপ্লব আনা যাবে না। সে আবার এক দশক পর ফিরে আসে কলকাতায়, দেখা করে তার পুরনো নেতা অনন্ত সিংয়ের সঙ্গে। এবার তারা দুজনে মিলে গড়ে তোলে নতুন দল আর. সি. সি. আই। কল্যাণ রায় দলে নিয়ে আসে তার ছোট তিন ভাই সলিল, অশোক ও অমলকে। সলিল কলকাতার এক নামকরা কলেজে চাকরি করত, সে সেই চাকরি ছেড়ে পেশাদার বিপ্লবী হয়ে গেল। অনন্তবাবু তার দলের সদস্যদের তেমন ভাবেই নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যারা পেশাদার বিপ্লবী হতে রাজী আছে। যারা বাড়িঘর, মা, বাবা, আত্মীয়পরিজন ছেড়ে শুধুমাত্র বিপ্লবের জন্যই কাজ করতে প্রস্তুত তাদেরই দলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন অনন্ত সিং। এককালের স্বদেশী সন্ত্রাসবাদী অনন্ত সিং তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে কখনও সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করতে পারেন নি। কমিউনিস্ট পার্টির এককালের সক্রিয় নেতা পার্টিও ছেড়েছিলেন নিজের ভিতরে সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার জন্যই। তাঁর দল গঠন এবং পরিচালন নীতি ও কৌশল নির্ণয়ের মাধ্যমে বার বার পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সন্ত্রাসবাদ তাঁর রক্তে মিলে গিয়েছিল। তিনি দলের সদস্য হিসেবে নিতে থাকলেন তরুণ আদর্শবান ত্যাগস্বীকারে নির্ভয় সব ছেলেদের। এক এক করে, বহুদিন মিশে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দলে নেওয়া হত এদের। দলে প্রত্যেকের আলাদা ছদ্মনাম দেওয়া হত। এবং সেই নামেই সে দলে পরিচিত হত। যখন কোন সদস্য নতুন কারোকে দলে আনত সে এবং নতুন সদস্যটি দলের বাকিদের কখনও বলত না কোথায় তার বাড়ি কিংবা কি তার আসল পরিচয়। কেউ কারোকে করত না ব্যক্তিগত কোনও প্রশ্ন। কারণ সে যদি কখনও ধরা পড়ে তবে ইচ্ছা থাকলেও যেহেতু অন্য সদস্যের আসল পরিচয় সে জানে না তখন

পুলিশকে জানাতে পারবে না। প্রাণে বাচার জন্যও নয়, কারণ সে তো জানেই না এসব খবরাখবর। দল যখন গড়ে উঠছে তখনই ঘটে গেল উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িতে কৃষক অভ্যুত্থান। এই দলও সেই আন্দোলনের সমর্থক হয়ে গেল। তরুণ সদস্য পেতেও এদের বেশি কষ্ট করতে হয়নি। কারণ তখন সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, বিশেষ করে কলকাতায় ছাত্রদের মধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলন রীতিমত ঝড় তুলে দিয়েছিল। এই দলের সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগই নিজেদের অঞ্চলের সক্রিয় নকশাল নেতা বা কর্মী ছিল। অধিকাংশই ছিল বেহালা ও যাদবপুর অঞ্চলের, আর বাকিরা কলকাতা ও তার আশেপাশের মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ তরুণী। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ফলে তখন সি.পি.আই (এম)-এর বহু সদস্য ও সমর্থক প্রকাশ্যে পার্টির বিরোধিতা শুরু করল। এই আন্দোলনের মূল স্লোগান চীন বিপ্লবের অনুসরণে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা। প্রথমে গ্রাম মুক্ত করে শহর ঘিরে ফেলে পরে শহর দখলের কৌশল দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই কৌশলই আর. সি.পি.আই. দল গ্রহণ করল। অনন্তবাবু বললেন, গ্রাম দখলের জন্য দরকার রসদ। তাছাড়া নিজেদের তৈরি সৈন্য ছাড়া গ্রাম দখল করা যাবে না। সেই রসদ ও সৈন্যের জন্য চীনের সাংহাই শহর অভ্যুত্থানের মত কলকাতা অভ্যুত্থান করে গ্রামে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে হবে। অভ্যুত্থান করতে হবে ছেষট্টি সালের খাদ্য আন্দোলনের মত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায়। সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে। এই প্রস্তুতির জন্য চাই টাকা ও অস্ত্র আর চাই কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সমস্ত ইউনিয়ন ও ফ্রন্টে ন্যাচারাল নেতাদের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক সম্পর্ক। এই ন্যাচারাল নেতারা হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁদের ডাকে শয়ে শয়ে কর্মী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বড় বড় পার্টিগুলোর নেতাদের চালাকি ও পলায়নী মনোবৃত্তিকে তুচ্ছ করে যেন তারা বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ন্যাচারাল নেতাদের অধীনে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীরাই মুক্তি ফৌজ। সেই মুক্তি ফৌজকে নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম মুক্ত করে এগিয়ে গিয়ে শহরগুলোকে ঘিরে ফেলতে হবে। অবশেষে দখল করে ফেলতে হবে শহর।

অনন্তবাবুর এই চমকপ্রদ থিওরি দলের সদস্যরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত। সেই পথে এগিয়ে যেতে প্রথম প্রস্তুতি হিসেবে টাকার প্রয়োজন এবং সেইজন্যই ডাকাতি। কিন্তু ডাকাতির প্রস্তুতির জন্যও চাই টাকা। ন্যূনতম অস্ত্র ও একটা গাড়ির তো প্রয়োজন আছে। তাছাড়া আছে দৈনন্দিন খরচ। অনন্তবাবু সেই উপায়ও বের করলেন। দলের ছেলেরা প্রাথমিক খররের জন্য শুরু করল ছোটখাট চুরি। সাইকেল, রেডিও, টেপ রেকর্ডার নিজের ও বন্ধুবান্ধবদের বাড়ির থেকে চুরি করে আনত তারা। কেউ কেউ বাড়ির নগদ টাকা ও সোনাদানাও চুরি করে দলের তহবিলে দিল। অধিকাংশই ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের, তবু শুধুমাত্র বিপ্লবের তাগিদে তারা চুরি করে দলের প্রাথমিক তহবিল গড়ে তুলল।

ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছে পার্ক স্ট্রিটে পোস্ট অফিসের গলির ভেতর পোস্টাল ভ্যানে ডাকাতি করা হবে। সেই অনুযায়ী তারা তৈরি হতে লাগল। ডাকাতি হবে মাসের প্রথম দিন। কারণ পয়লা তারিখ ভ্যানে করে বেতনের টাকা জি পি ও থেকে আসে। বি. বা. দী বাগ থেকে ভ্যান প্রথম পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসে আসে, তারপর যায় এলগিন রোড পোস্ট অফিসে। এক এক করে পোস্ট অফিসে টাকা নামাতে নামাতে ভ্যান এগিয়ে যায়। পুরো টাকাটা পেতে হলে পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসে ভ্যান এলে সেখানেই ডাকাতি করতে হবে। যদিও ওখানে পোস্ট অফিসের কাছেই থানা, তবু বেশি টাকা পেতে গেলে সেই ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

ডাকাতির প্ল্যান হওয়ার পর তিনটে গ্রুপ করে আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিয়ে রিহার্সাল দিতে লাগল অনন্ত সিংয়ের দলের ছেলেরা। একটা গ্রুপ দায়িত্ব নিল সিগন্যালের। ভ্যান জি. পি. ও. থেকে ছাড়লেই সিগন্যাল দিতে শুরু করবে পরপর চেইন-ওয়াইজ এবং তা পৌঁছে যাবে পোস্ট অফিস পর্যন্ত। একজন নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়াবে। প্রথম জন তার হাতে রাখা কোনও জিনিস দিয়ে সংকেত দিলেই পরের জন বুঝে যাবে যে ভ্যান আসছে, তারপর সেও

একইভাবে পরের জনকে দেবে সংকেত। এইভাবে পরপর সিগন্যাল পেয়ে মূল গ্রুপ, যারা পোস্ট অফিসের গলিতে অপেক্ষা করছে ডাকাতির জন্য, তারা জেনে যাবে ভ্যান আসছে। ভ্যান ছিল দুরকমের, বড় আর ছোট। বড় ভ্যানগুলোর পেছনের জানালা অনেকটা উঁচু, নিচে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না ভ্যানের ভেতর কত জন আছে। তাদের আত্মসমর্পণ করতেও বলা যায় না। তাই দরকার উঁচুতে দাঁড়ান। সেজন্যই তারা নিয়ে গিয়েছিল কাঠের দুটো বেঞ্চ। আর যে দুটো অদ্ভুত দর্শন খাঁজকাটা পার্সেল আমরা পেয়েছিলাম, তা ছিল ভ্যান পৌঁছনর সাথে সাথে সামনের ও পেছনের চাকার তলায় গুঁজে দেওয়ার জন্য, যাতে ড্রাইভার ভ্যান দাঁড় করানর পর কিছুতেই গাড়ি এগিয়ে বা পিছিয়ে না নিয়ে যেতে পারে। লোহার রডটা ছিল ভ্যানের পেছনের তালা এক চাপে খুলে ফেলার জন্য। আর ছিপসমেত আঁকশিটা দিয়ে ভ্যানের ভেতরের একটা জায়গা থেকে চাবির ঝোলানো তোড়াটা জানালা দিয়ে টেনে নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ার জন্য। আর টানার সময় যাতে নিচে না পড়ে যায় সে জন্যই আঁকশির তলায় প্লাসটিকের নেট ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তৃতীয় গ্রুপটার দায়িত্ব ছিল থানা থেকে পুলিশ বা কোনও টহলদারী ভ্যান যদি সেখানে পৌঁছে যায় তবে বোমা ও গ্রেনেড মেরে তাদের আটকে দেওয়া যাতে মূল দল ডাকাতির টাকা নিয়ে ঠিকঠাক পালাতে পারে। এরা হচ্ছে পেছনের গার্ড গ্রুপ। আপাতদৃষ্টিতে এই গার্ড গ্রুপের কোনও সক্রিয় ভূমিকা না বোঝা গেলেও এদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এদের ভূমিকাটা অনেকটা রক্ষাকর্তার। পুরো ডাকাতির ছকটাই অনন্তবাবুর।

সেদিন ছোট পোস্টাল ভ্যান এসেছিল। তাদের আর বেঞ্চ ব্যবহার করতে হয়নি। নিচে দাঁড়িয়েই দুই বন্দুকধারী পাহারাদারকে আত্মসমর্পণ করত বাধ্য করে, মিনিট খানেকের মধ্যে টাকা ও বন্দুক নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ান কালো ল্যান্ডমাস্টার গাড়িতে উঠে পড়ল তারা। গাড়িটা সেদিন ভীষণ অসুবিধের সৃষ্টি করেছিল, কারবোরেটর ফুটো হয়ে জল পড়ে যাচ্ছিল। বারবার লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে জল আটকে গাড়ি চালাতে হয়েছিল। পালানর সময় এই বিপত্তি, ভাবা যায়! গাড়ি চালিয়েছিল কল্যাণ রায় নিজে।

পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসে ডাকাতির পর দলকে ঢেলে সাজান হল। দলের ভেতর পাঁচ ছজন করে ছোট ছোট গ্রুপ ভাগ করা হল, একজন করে গ্রুপ লিডার দলের কেন্দ্রের সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগ রাখত। তার মাধ্যমেই অনন্তবাবুর নির্দেশ আসত। গ্রুপের সদস্যরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিজেরা মিলত, রাজনৈতিক আলোচনা, পর্যালোচনা, পড়াশুনো করত। এরা কলকাতার বিভিন্ন পার্কে, ময়দানে নিজেরা মিলিত হত। তাছাড়া ওরা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট অফিস ঘর ভাড়া করেছিল, সেখানে চেয়ার টেবিল বসিয়ে অফিসের মত সাজিয়ে নিয়েছিল। সেই সব অফিসে গ্রুপ মিটিং বসত। লোকের তাতে কোনও সন্দেহ হত না। পার্ক স্ট্রিট ডাকাতির পর দলের সদস্যদের গুরুত্ব অনুযায়ী রাহা খরচ দেওয়া হত। তিনশো, পাঁচশো, সাতশো এবং বিবাহিতদের এক হাজার করে টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হত। তাছাড়া যারা বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে চলে এসেছিল তারা ছোট ছোট ঘর এবং ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল আত্মগোপন করে থাকবার জন্য। সেসব ঘরের ভাড়া আলাদা ভাবে দেওয়া হত। বেশির ভাগই ছিল দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতায়। ষড়যন্ত্রমূলক বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে ওরা গড়ে তুলছিল নিজেদের সংগঠনকে। সদস্যদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সততা, সাহস, রাজনৈতিক শিক্ষা এবং চরিত্র ছিল প্রশ্নাতীত। পরবর্তীকালের নকশাল ও অন্য পার্টির সদস্যদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলে সামগ্রিকভাবে এই দলের সদস্যরা কয়েক কদম সবসময়ই এগিয়ে থাকবে। তবে অতীতের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এদের চরিত্রের বহু জায়গায় মিল ছিল।

পার্ক স্ট্রিট ডাকাতির পর ওরা আর একটা ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল। সেটা ছিল সাউথ ইস্টার্ন রেলের ক্যাশ ভ্যান। এই ক্যাশ ভ্যানটা বি. বা. দী বাগের হেড অফিস থেকে বেরিয়ে ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম দিকে গঙ্গার পাশ দিয়ে মেরিন হাউসের সামনের রাস্তা ধরে সোজা মুন্সীগঞ্জের দইঘাট ব্রিজ পার হয়ে চলে যেত বি. এন. আরের মূল কেন্দ্রীয় অফিসে।

মাসের প্রথম দিন সেই ক্যাশ ভ্যান মাইনের প্রায় চোদ্দ পনের লাখ টাকা নিয়ে যেত। ক্যাশ ভ্যানের নিজস্ব দুজন বন্দুকধারী পাহারাদার ছাড়াও রাস্তায় ভ্যানটা পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত কলকাতা পুলিশের এক লরি রাইফেলধারী কনস্টেবল। পুরো রাস্তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওরা ঠিক করল, মেরিন হাউসের সামনে পৌঁছনর কিছুটা আগে ভ্যান দাঁড় করাবে। সেই অনুযায়ী তৈরি করল। তাতে দেখা গেল ওদের প্রয়োজন দুটো লরি। একটা লরি হেস্টিংস থানার দিকের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে ক্যাশ ভ্যানের সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়াবে। অন্য লরিটা পাহারাদার পুলিশের লরির পেছন দিকে দাঁড়াবে। যেখানে ক্যাশ ভ্যান ওরা দাঁড় করাবে ঠিক করল, তার থেকে হেস্টিংস থানার দূরত্ব বেশি নয়। তাই ঠিক হল, একটা প্রাইভেট গাড়ি থানার সামনের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। পুলিশের ভ্যান বা অন্য কোন গাড়ি বের হলেই ওই প্রাইভেট গাড়ি থেকে গ্রেনেড বা ডিনামাইট ভর্তি সেল ছুঁড়ে গাড়ি উড়িয়ে দেবে।

ওরা ততদিনে ওদের আগের ঝরঝরে কালো ল্যান্ডমাস্টার গাড়িটা বিক্রি করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কিনে সেটাও কালো রঙ করে নিয়েছিল। এই কালো রঙের মধ্যেও একটা বিশেষত্ব ছিল। ওরা তখন কলকাতায় রাস্তায় পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিল যে অ্যাম্বাসাডর গাড়ির মধ্যে অধিকাংশই কালো রঙের। হাজার হাজার কালো গাড়ির ভিড়ে তাদের একটা গাড়িও সহজেই মিশে যেত। সাধ্য কি পুলিশের রঙ ধরে গাড়ি খুঁজে বের করার? তাছাড়া ওরা কখনও নম্বরহীন বা ভুয়ো নম্বর প্লেট গাড়িতে লাগিয়ে ডাকাতি করত না। এই নম্বর খুঁজে বের করতে অবশ্য ওদের অনেক পরিশ্রম করতে হত। এমন একটা নম্বর খুঁজে ওরা বার করত, যে গাড়িটা অন্তত ডাকাতির দিন রাস্তায় বের হবে না। আর গাড়ির মালিক ও আত্মীয় পরিজন, যারা ওই নম্বরটার সাথে পরিচিত, তারাও ডাকাতির জায়গায় ও আশেপাশে যাবে না। হঠাৎ যদি তারা দেখে যে তাদের গাড়ির নম্বারটা অন্য একটা গাড়িতে লাগান আছে, তবে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সন্দেহ করবে। নিজে বাঁচার জন্য সাথে সাথে পুলিশে খবর দেবে, আর পুলিশ এসে ধরবে নকল নম্বর প্লেট লাগান অর্থাৎ ডাকাতি করতে আসা গাড়িটাকে। অনেক অনুসন্ধানের নিজেদের গাড়ির মডেলের নম্বর অনুযায়ী খুঁজে সেই নম্বর তারা ডাকাতির সময় ব্যবহার করত। ওদের প্রতিটি কাজই ছিল নিখুঁত।

রেলের ক্যাশ ভ্যান ডাকাতির পরিকল্পনায় একটা সমস্যা দেখা দিল। ভ্যান দাঁড় করালেও পুলিশ এবং রক্ষীদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে কি করে? নিজেরা লরি থেকে অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের রাইফেল গর্জে উঠবে। সুতরাং রাস্তায় নামার আগেই পুলিশকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে হবে। তাছাড়া আরও একটা আশঙ্কা ছিল। লরি দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ গুলি চালাতে পারে। কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান আছে। ওরা লরি দুটোকেই স্টিলের মোটা পাত দিয়ে মুড়ে সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু বডি করে আমার্ড কার তৈরি করে ফেলল। রাইফেলের বুলেট তা ভেদ করতে পারবে না। লরির সামনের দিকটা কিন্তু বুলেট প্রুফ করা গেল না, তাই ওরা ঠিক করল লরি দুটো দাঁড় করাবে আড়াআড়ি ভাবে যাতে ইঞ্জিনের দিকে পুলিশ গুলি চালাতে না পারে। আবার অন্য ভয়ও আছে, আড়াআড়ি দাঁড় করালে পুলিশ গুলি করে টায়ার পাংচার করে দিতে পারে। তাহলে তারা লরিতে পালাতে পারবে না। তাই এমন একটা অতিরিক্ত স্টিলের পাত বড়ির ভেতর রাখল, যাতে লরি দাঁড় করানর সঙ্গে সঙ্গেই লক খুলে দিলে সেটা লরির চাকা সমেত নিচের একদিকটা ঢেকে দেবে। এতে গুলি লাগবে না, আবার চলাফেরার কোনও অসুবিধেও হবে না। এ তো গেল আত্মরক্ষার ব্যাপার। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তো তা নয়। পুলিশদের আত্মসমর্পণ করিয়ে ডাকাতি করে পালাতে হবে। তখন ওরা ঠিক করল প্রথমে মাইকে পুলিশকে আত্মসমর্পণ করতে অনুরোধ করবে, কাজ না হলে আর্মার্ড কার থেকে অ্যাসিড স্প্রে করা হবে পুলিশের দিকে। অ্যাসিড একবার গায়ে পড়লেই পুলিশ বাধ্য হবে আত্মসমর্পণ করতে। তখন ওরা নিচে নেমে ক্যাশ ভ্যান লুঠ করে পালাবে। এই ডাকাতির পরিকল্পনা যখন চলছে তখন দলের ভেতর রাজনৈতিক সংঘাত দেখা দিল। একদল বলল,

ডাকাতি করে অস্ত্র যোগাড় করে কলকাতা অভ্যুত্থানের দরকার নেই। সোজাসুজি গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের নিয়ে সংগ্রাম করে, কৃষকদের ফৌজ তৈরি করে, শহর ঘিরে ফেলতে সি.পি.আই (এম-এল) দলের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিলেই চলবে। অন্য দল আগের পথই আঁকড়ে থাকল। বিরোধ তুঙ্গে উঠে গেল। দল ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল। ততদিনে পার্ক স্ট্রিটের ডাকাতির টাকা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এতগুলো ছেলের রাহাখরচ, বাড়ি ভাড়া, তার ওপর দুটো পুরনো লরি কিনে তাকে আর্মার্ড কার বানানো, দুটো অ্যাম্বাসাডর গাড়ি কেনা। এছাড়াও নতুন অনেক স্টেনগান, পিস্তল, রিভলবার এবং বিস্ফোরক পদার্থ কেনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে প্রচুর টাকা লেগেছিল। শুনেছি বিহারের কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতাকে সংগঠনের কাজের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছিল। এতেই ওদের প্রথম ডাকাতির টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে দল দ্বিধাবিভক্ত হওয়াটা চূড়ান্ত হয়ে গেল। তখন ঠিক হল একটা ছোট ডাকাতি করে ডাকাতির টাকা ও দলের অস্ত্রশস্ত্র দুভাগ করে দুদল নিয়ে নেবে। একদল চলে যাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে, অন্য দল কলকাতায় থেকে আগের মত কলকাতা অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে।

সেই অনুযায়ী অল্পদিনের প্রস্তুতিতে তারা নিউ আলিপুরের ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে ডাকাতি করল। টাকা ও অস্ত্র দুভাগ হয়ে গেল। গ্রামে কৃষক সংগঠন করতে চলে গেল দীপক বসু, কাজল পাল, প্রলয়েশ, অমিয় সমেত প্রায় তিরিশ জন। বাকিরা রয়ে গেল কলকাতায়। যারা রয়ে গেল তাদের সবাইকে নিয়ে একটা মিটিং হল ডায়মন্ড হারবারে। সেই মিটিংয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হল আর একটা ডাকাতি করা হবে এবং সেটার পরিমাণ হবে এক কোটি টাকা। এই ডাকাতিটাই হবে ওদের দলের শেষ ডাকাতি। ওই এক কোটি টাকার তহবিল থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে কলকাতা অভ্যুত্থানের। তাছাড়া গণআন্দোলনের বিভিন্ন ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন মত সাহায্য করা হবে ওই তহবিলের টাকা দিয়ে। কিন্তু একসঙ্গে এক কোটি টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

অমলেন্দু সেন খবর আনল, পাওয়া যাবে। অমলেন্দু আগে দুর্গাপুরের স্টিল প্ল্যান্টে চাকরি করত। ওই প্ল্যান্ট থেকেই বিশেষ ট্রেনিংয়ের জন্য তাকে পশ্চিম জার্মানিতে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু সে ফিরে এসে আর চাকরিতে যোগ না দিয়ে আর. সি. সি. আইতে যোগ দিয়ে পেশাদার বিপ্লবী হয়ে গেল। দুর্গাপুর অমলেন্দুর পরিচিত জায়গা। সে জানাল অত টাকা পাওয়া সম্ভব দুর্গাপুরে স্টেট ব্যাঙ্কের শাখায়। ওই ব্যাঙ্কে মাসের পয়লা তারিখে স্টিল প্ল্যান্টের ও অন্যান্য কতগুলো বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাইনের টাকা আসে, যার পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশি। স্টেট ব্যাঙ্কের শাখাটা একটা অদ্ভুত জায়গায়। জি. টি. রোড ধরে কলকাতা থেকে আসানসোল যেতে ওয়ান ওয়ে টামলা ব্রিজ ছিল। তার একটু আগে বাঁ দিকে জনবসতিহীন একটা বিরাট সরকারি জমির ওপর আছে দুর্গাপুর কোর্ট আর অন্যান্য সরকারি অফিস। সেখানে যাতায়াত করতে হলে দুটো কালভার্টের যে কোন একটা দিয়ে যেতে হয়। পুবদিকের প্রথম কালভার্ট পার হলেই একটা বিরাট খোলা মাঠ। মাঠের দক্ষিণ দিকে পিচের রাস্তা, সেই রাস্তার ওপর বিরাট একতলা বাড়ি, বাড়ির সামনে টানা বারান্দা। সেই বিরাট বাড়ির পুবদিকের কোণে স্টেট ব্যাঙ্ক আর বাড়ির শেষদিকে পশ্চিমপ্রান্তে সি.আর.পি. অফিস। অফিসের সামনে সব সময় প্রহরায় থাকে দুজন রাইফেলধারী সি.আর.পি. সিপাই, আর অফিসের ভেতর থাকে আরও ছজন। কোন গণ্ডগোলের আভাস পেলেই ওই সব সিপাই মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে। ব্যাঙ্ক এবং ছোটখাট সরকারি অফিসে সামনের বারান্দাটা প্রায় ফাঁকাই থাকে, ফলে সি.আর.পি. সিপাইরা পরিষ্কার ব্যাঙ্কের সামনের বারান্দাটা পরিষ্কার দেখতে পায় ৷ ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে পেছনে যাওয়ার রাস্তা। রাস্তাটা পুব থেকে পশ্চিমে গিয়ে তারপর দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। ব্যাঙ্কের পেছনেই পোস্ট অফিস। আর দক্ষিণ দিকের রাস্তায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের শাখা, রাজ্য পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের বিরাট ব্যারাক। সবসময় ওখানে পাঁচ ছটা ভ্যান, লরি থাকে। তাছাড়া আছে কোর্ট। এমন একটা আপাত দুর্ভেদ্য ব্যাঙ্কই ওরা বেছে নিল ডাকাতি করার উদ্দেশে।

প্রথমে ওরা ঠিক করল রাতে ডাকাতিটা করবে। রাতে ডাকাতি করলে সংঘর্ষ এড়ানর সম্ভাবনা বেশি। আবার রাতে ডাকাতি করলে ব্যাঙ্কের বন্ধ ভল্ট খুলে টাকা বের করতে হবে। প্রথমেই হৈ চৈ না করে খুলতে হবে ব্যাঙ্কের দরজা, যাতে নিঃশব্দে ব্যাঙ্কে ঢোকা যায়। এতটুকু শব্দ হলেই বেরিয়ে আসবে সি.আর.পি. জওয়ানরা আর বাতের প্রহরী আটজন রাইফেলধারী রাজ্য পুলিশের সিপাই। প্রয়োজনে পেছনের রিজার্ভ ফোর্সকে ডাকবে ওরা। সুতরাং যতক্ষণ না টাকা নিয়ে সরে পড়া হবে ততক্ষণ যেন কেউ জানতে না পারে, ডাকাতি হচ্ছে।

সেটা কি করে সম্ভব? সম্ভব হয় যদি ভেতর থেকে কেউ ব্যাঙ্কের দরজা খুলে দেয় এবং ওরা অন্ধকারে বিনা বাধায় ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকতে পারে। কিন্তু কে খুলে দেবে ব্যাঙ্কের সদর দরজা? রাতে ব্যাঙ্কের ভেতর থাকে দুই বন্দুকধারী দারোয়ান। তবু অসম্ভবকে সম্ভব করতেই হবে, ভেতর থেকেই খুলতে হবে দরজা। ওরা প্রথমেই ব্যাঙ্কের পাশে একটা দরমা দিয়ে ঘেরা চা, বিস্কুটের দোকান খুলল। ওখানে অনেক দরমা আর হোগলা ও টালির ছাউনি দেওয়া চা-খাবারের দোকান ছিল। নতুন একটা দোকান গজিয়ে উঠতে কারও কোনও সন্দেহ হল না। দোকান চালাতে লাগল রণজিৎ, সমরেন্দ্র আর খোকন দাস। সাধারণ গরিব চায়ের দোকানীর মত ওরা চলাফেরা রপ্ত করে ফেলল। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা একজন দুজন করে ওদের দোকানে চা ও অন্যান্য খাবার খেতে শুরু করল। আর খেয়েই আশ্চর্য হয়ে যেতে লাগল, এত ভাল চা আর খাবার এত সস্তায়?

খদ্দের আর অন্য দোকানে যায় না। যাবে কি, ওরা তো দার্জিলিং চা পাতা কলকাতা থেকে অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যেত। সেই চা ওখানে অন্য দোকানীরা পাবে কেমন করে? আর দামও অন্য দোকানের থেকে কম। সুতরাং ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারীই দিন পনেরর মধ্যে ওদের খদ্দের হয়ে গেল। ম্যানেজার থেকে দারোয়ান সবার সাথেই ওদের পরিচয় হল। চা নিয়ে, খাবার নিয়ে ব্যাঙ্কের ভেতরে গিয়ে ওরা পরিবেশন করত। অবাধ গতি, সবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা, এমন হয়ে গেল যে ওদের ছাড়া ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের চলে না। কোনও একজন যদি "দেশে যাচ্ছি" বলে কলকাতায় দু-এক দিনের জন্য আসত, তাহলেই সবাই বারবার খোঁজ নিত।

দোকান খোলার মাসখানেকের মধ্যেই দারোয়ানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের ওরা বোঝাল, ওই দোকানঘরে রাতে তাদের তিনজনের থাকতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। যদি রাতে অন্তত একজনকে ও ব্যাঙ্কের ভেতর শুতে দেয় তবে ওদের সমস্যাটা কিছুটা কমে। দারোয়ানরা সরল বিশ্বাসে তাদের "ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের" ব্যাঙ্কের ভেতর তাদের পাশে শুতে দিল। প্রথমে একজন, কদিন পরে দুজন ব্যাঙ্কের ভেতর শুতে শুরু করল। এটাই তো ওদের উদ্দেশ্য, ডাকাতির দিন যাতে ঠিক সময় মত ভেতর থেকে নিঃশব্দে খুলে দেওয়া যায়, আর তখন ভেতরে ডাকাতির জন্য ঢুকে পরবে তাদের সাথীরা। দারোয়ানরা যাতে ডাকাতির রাতে কোনরকম সন্দেহ না করতে পারে সেজন্য ওরা প্রতি রাতে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার নামে ব্যাঙ্কের দরজা খুলে বেরিয়ে আবার একটু পরে ঢুকে শুয়ে পড়ত। ওদের ওপর বিশ্বাসের ভিতটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, ডাকাতি করার উদ্দেশে

দলের অন্যান্য ছেলেরা দুর্গাপুরেই ভাড়া করা বাড়িতে থাকত। করঙ্গপাড়া, সাগরডাঙ্গা, বেনাচিতি, শ্যারপুর কলোনি ও লিঙ্ক রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল ওরা। কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিল অ্যাম্বাসাডর গাড়ি ও লরি। লরি নিয়ে যাতায়াত করত টনি, মানব ও রাজারাম। এরা তিনজনেই দলের বড় গাড়িগুলো চালাত। ছোট গাড়ি চালাত অন্যরা। রাতে ডাকাতির জন্য ছদ্মবেশ নিতে ওরা শিয়ালদার চোরাইবাজার থেকে আর্মির পুরনো ইউনিফর্ম ও জুতো কিনল। ওগুলো পরলে রাতে ওখানে কেউ দেখলে চট করে সন্দেহ করবে না। ভাববে সি.আর.পি বা সেনাবাহিনীর জওয়ান। ঠিক হল, ডাকাতির পর ব্যাঙ্কের সামনে থেকে ওদের তুলে নিয়ে আসবে একটা লরি ও অ্যাম্বাসাডর গাড়ি।

কিন্তু এত টাকা তারা কলকাতায় নিয়ে আসবে কি করে? ডাকাতি করে বেরিয়ে আসার

পর জানাজানি হয়ে গেলেই ওয়ারলেসে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়বে। দুর্গাপুর থেকে পালানর দুটোই মাত্র রাস্তা। একটা জি. টি. রোড, অন্যটা রেলপথ। ব্যাঙ্কের থেকে রেল অনেক দূর, আর ট্রেনে করে অত টাকা তো নিয়েও আসা যাবে না। ওই দুটো পথে পুলিশ গাড়ি ও ট্রেন তল্লাশি শুরু করবে। তাই অনন্তবাবু বুদ্ধি দিলেন বড় লরিটাকে তেলবহনকারী ট্যাঙ্কার তৈরি করতে। ওরা লরিকে ট্যাঙ্কারে পরিণত করল। প্রথম পুলিশ যখন লরিগুলো রাস্তায় থামিয়ে তল্লাশি শুরু করবে, তখন ট্যাঙ্কারে খুব একটা ঝামেলা করবে না কারণ সাধারণভাবে ট্যাঙ্কার নিয়ে কেউ ডাকাতি করে না। আর যদি তল্লাশি করেও তাহলে ট্যাঙ্কারের পর পর তিনটে আলাদা ঢাকনা খুললে পেট্রোলই দেখবে। এমনকি রড জাতীয় কিছু তেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখলেও তেলই পাবে। এরকমভাবেই তৈরি হয়েছিল সেই ট্যাঙ্কার।

কিন্তু এতেও বিপদ থেকে যাচ্ছে। তেলের মোটা নলের পাশে লুকনো চেম্বার করা হল, যাতে টাকা রাখা যায়, কিন্তু কোনও লোক যদি দেখে ফেলে ডাকাতি করে এসে ডাকাতরা তেলের ট্যাঙ্কারে টাকা লুকিয়ে রাখছে, তাহলে সমূহ বিপদ। তাই এমন একটা জায়গা বাছতে হবে, যেখানে লোকজন সচরাচর আসে না। ওদের দুটো দল দুর্গাপুরের মধ্যে ও তার চারপাশটা এক সপ্তাহ ধরে তন্নতন্ন করে দেখল। এরা একটা জায়গা নির্দিষ্ট করল যেখানে ডাকাতির টাকাটা ট্যাঙ্কারে লুকিয়ে ফেলা যায়, কাকপক্ষীও টের পাবে না। এ তো গেল একদিক। অন্য দিকটা হচ্ছে, রাতে নিঃশব্দে ভল্টটা খুলবে কি করে? ভল্টের একটা চাবি থাকে ম্যানেজারের কাছে, অন্যটা অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে। দুটো চাবি একসাথে না হলে ভল্ট খোলা যাবে না।

দুজন সেই ব্যাঙ্কে নকল নামে অ্যাকাউন্ট খুলল। আস্তে আস্তে ম্যানেজার ও অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে পরিচিত হল। বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য মাঝে মধ্যেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার পর হঠাৎ নিজেদের গাড়ি নিয়ে ব্যাঙ্কের সামনে হাজির হয়ে যেত। ম্যানেজার ও অ্যাকাউন্টেন্টকে গাড়িতে তুলে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিত। ম্যানেজারের বাড়ির কাছেই ওদের বেনাচিতির ফ্ল্যাটটা ছিল। একজন দুজন আড্ডা মারতে, ম্যানেজারের স্ত্রীকে এটা সেটা উপহার দিতে ম্যানেজারের বাড়িতে চলে যেত প্রায়ই। সম্পর্কটা পুরো পারিবারিক করে তুলেছিল। ওরা ডাকাতির দিন ওদের গাড়িতে উঠে কোন জায়গায় চলে গেলে কেউ যেন সন্দেহ করার অবকাশ না পায়। ওরা ঠিক করেছিল, ডাকাতির দিন এমনি করেই ব্যাঙ্ক ছুটির পর ম্যানেজার ও অ্যাকাউন্টেন্টকে গাড়িতে তুলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে যাবে লিঙ্ক রোডের বাড়িতে। বাড়িটা ছিল নির্জন অঞ্চলে, একটা খালের ধারে। ওখানেই ওদের বেশিরভাগ ছেলে থাকত। সারাদিন কাজকর্মের পর তারা বড়বড় চটের বস্তায় শরীরটা ঢুকিয়ে মুখটা বের করে শুয়ে পড়ত। সেই বাড়িতে ওরা দুটো কাঠের খাঁচা তৈরি করেছিল। ম্যানেজার ও অ্যাকাউন্টেন্টকে নিয়ে এসে আলাদা আলাদা ঘরে দুটো খাঁচায় ওদের আটকে রেখে, মুখ বেঁধে, চাবি নিয়ে চলে যাবে, এরকমই ঠিক ছিল। দুজনের বাড়িতে ওদের লোক খবর দিয়ে দেবে যে বাড়িতে ফিরতে রাত হবে, তারা পার্টিতে গেছে। বাড়ির লোকও বিশ্বাস করবে, কারণ সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুরাই তো খবরটা দিয়ে গেল। সুতরাং কোথায় গেল ওরা কেউ খোঁজ করবে না।

এদিকে তাদের থেকে দুটো চাবি হাতিয়ে ততক্ষণে ভল্ট খুলে নিয়ে নেবে এক কোটি টাকা অনন্তবাবুর দলের ছেলেরা। ওদের প্রত্যেকের কাছেই ছিল দুটো করে ট্রেনের টিকিট, একটা কলকাতার দিকের, অন্যটা আসানসোলের দিকের। যে ট্রেন আগে পাবে, তাতেই উঠে যেদিকে পারবে চলে যাবে, দুর্গাপুর অঞ্চল থেকে প্রথম সুযোগেই উধাও হতে হবে।

কিন্তু যদি কোনও কারণে তেলের ট্যাঙ্কার ধরা পড়ে যায়, তবে কি হবে? এতদিনের পরিশ্রম পুরোপুরি ব্যর্থ! তাই ওরা ঠিক করল কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে যাবে। কিন্তু কি করে? কারণ স্টেশনে স্টেশনে তল্লাশির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং নিজেদের কাছে টাকা রাখা যাবে না। ঠিক হল, বাচ্চা কোলে বিবাহিতা মহিলারা টাকা নিয়ে যাবে ট্রেনে। বাচ্চা

সমেত গিন্নিবান্নিরা ডাকাতি করে ফিরছে এরকম ধারণা পুলিশের দল নিশ্চয়ই করবে না। বাচ্চার দুধের টিনের ভেতব, ভেজা কাঁথা ও তোয়ালের ভেতর টাকা নিয়ে যাবে তারা।

পরিকল্পনা যখন চূড়ান্ত, তখনই ওদের মাথায় বাজ পড়ল। ব্যাঙ্কের দুই দারোয়ানের মধ্যে একজনের অল্পবয়সী স্ত্রী উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে হাজির। তাকে নিয়ে দারোয়ান রাতে ব্যাঙ্কের ভেতর থাকে, ফলে বাড়তি দুজনের শোওয়ার জায়গা হল না। অনেক বলে কয়ে অন্য এক দারোয়ানের সাথে একজন শোওয়ার জায়গা পেল। দুজনের বদলে কমে একজন হয়ে গেল। তাও না হয় একরকম, কিন্তু বিপদ বাড়ল অন্য জায়গায়। রাজ্য পুলিশের যে সাত-আটজন রাইফেলধারী সিপাই ওখানে রাতে পাহারার দায়িত্বে থাকত, এতদিন তারা টহল না দিয়ে ব্যাঙ্কের পেছনে একজায়গায় বসে আড্ডা দিত। ওদের পরিকল্পনা ছিল, ডাকাতির সময় ওরা আচমকা অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে সিপাইদের ঘিরে ফেলবে। সিপাইরা পাশে রাখা রাইফেল তোলারও সময় পাবে না। সেসময় ওরা রাইফেল তুলে নিয়ে সিপাইদের নিরস্ত্র করে ফেলত। কিন্তু দারোয়ানের স্ত্রী আসার পর অন্য ঝামেলা শুরু হল। ব্যাঙ্কের যে ঘরে দারোয়ান তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকত, ওই ঘরের জানালা দিয়ে সিপাইরা উঁকি দিতে লাগল। মাঝেমধ্যেই আড্ডা বাদ দিয়ে ঘুরে ঘুরে টহল দিতে লাগল। তারা টহল দেওয়ার ফলে অনন্তবাবুর ছেলেদের অসুবিধা হল। কারণ একটা জিনিস স্থির হলে তাকে ভাঙা বা ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা করতে যত সুবিধা, একটা চলমান শক্তিকে ভাঙা বা ভেঙে ফেলা খুব কঠিন। ছ সাতজন সিপাই বসে থাকলে স্টেনগান, পিস্তল দিয়ে ঘিরে ফেলে কাবু করা খুব কঠিন নয়, কিন্তু যদি তারা টহল দিতে শুরু করে তাহলে তাদের রূপ গেল সম্পূর্ণ পাল্টে। এবার ওদের কোথায় ধরা বা কিভাবে ধরা হবে? কখন ধরা হবে, কারণ ওরা তো স্থির নয়, এই এখানে আছে, পরক্ষণেই বেশ খানিকটা দূরে চলে যাচ্ছে, রাইফেলও থাকছে হাতে। অংক কষে যারা যুদ্ধ করে তাদের কাছে এমন শত্রু আকাঙ্ক্ষিত নয়। তাই ওরা রাতের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে এবার দিনে ডাকাতির ছক করল। চায়ের দোকান যেমন চলছে, তেমনই চলতে লাগল।

ব্যাঙ্কে মাসের প্রথম দু-একদিনই বেশি টাকা থাকত। তারপর সেই টাকা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চলে যেত। সুতরাং ডাকাতি করতে হলে ওই দুদিনের মধ্যেই করতে হবে। না পারলে ফের একমাস বসে থাকতে হবে। দিনে ডাকাতিটা কখন হবে? ঠিক হল, ব্যাঙ্ক বন্ধের সময় যখন ম্যানেজার ও অ্যাকাউন্টেন্ট সমস্ত হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ভল্ট খুলে টাকা পয়সা ঢুকিয়ে রাখেন, তখন ডাকাতিটা করতে হবে। তাহলে আর ভল্ট খোলার ঝামেলা নিজেদের নিতে হবে না। ভল্টটা কখন খোলা-বন্ধ হচ্ছে তা জানার জন্য তো চায়ের দোকানের তিনজন নিজেদের ছেলে আছেই। যারা অবাধে ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকছে আর বের হচ্ছে।

দিনে ডাকাতি করার জন্য ওদের প্রয়োজন হল নিজেদের গাড়ি ছাড়াও একটা লরি আর একটা অ্যাম্বাসাডর। লরি যোগাড় করার দায়িত্ব পড়ল বিমল, টনি ও মানবের ওপর। এক লরির ড্রাইভারকে ধরল তারা, তাকে বলল, "তোমার গাড়ি রোজ ভাড়া নেওয়া হবে, যদি একটু সস্তায় দাও।" ড্রাইভার দেখল, প্রতিদিনের ভাড়া যদি এক জায়গায় থেকে পাওয়া যায় তাহলে খুবই সুবিধা। সে রাজি হতে টনি আর মানব ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে তার লরি চালিয়ে দেখে নিল ঠিক আছে কিনা। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই লরিতে নিজেদের হাতটা অভ্যস্ত করে নেওয়া। এর পর একদিন ড্রাইভারকে বলল, "চল, - আমাদের স্টিল প্ল্যান্টের অফিসারের সাথে কথা বলে আসবে।" টনি আর মানব লরি নিয়ে স্টিল প্ল্যান্টের বিরাট বিল্ডিংটার সামনে সময়মত হাজির। স্যুটেড বুটেড বিমল আগে থেকেই ওই বিল্ডিংয়ের চারতলায় উঠে গিয়েছিল। সে নিচে লরির আগমন দেখেই লিফটে নেমে এসে টনিদের জিজ্ঞেস করল, "কোথায় লরি?" টনিরা গাড়িটা দেখিয়ে দিল। অফিসার বিমল গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল, "গাড়ি ঠিক আছে তো? না কি যখন তখন বসে যাবে?" ড্রাইভার খুবই কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "না স্যার, আমার গাড়ি কোনরকম অসুবিধে করবে না।" বিমল টনিদের দেখিয়ে ড্রাইভারকে বলল, "ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলে নিও। কবে থেকে তোমার

গাড়ি নেওয়া হবে, ওরা জানিয়ে দেবে।” বিমল হাতে রাখা একটা ফাইল খুলে ড্রাইভারের নাম, ঠিকানা, গাড়ির নম্বর লিখে নিল। লরির ব্লু বুক ড্রাইভারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিল। এগুলো সবই করল লোকটার বিশ্বাস অর্জনের জন্য। তারপর ড্রাইভারকে বলল, “ঠিক আছে এখন যাও, ওরা খবর দেবে।” ড্রাইভার বিমলকে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে চলে গেল।

অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা যোগাড় করার দায়িত্ব ছিল রাজারামের ওপর। রাজারাম একদিন একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া নিল। অল্পবয়সী ড্রাইভারকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল, তার সঙ্গে গল্পগুজব করতে লাগল, তারপর সন্ধের মুখে গাড়ির ভাড়া ছাড়াও কুড়ি টাকা বখশিস দিয়ে আবার পরের দিন তৈরি থাকতে বলল। রাজারাম সকালে গ্যারেজে হাজির, ড্রাইভারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ দুর্গাপুরের এ অফিস ও অফিস অকারণে ঘুরে বেড়াল। তারপর হঠাৎ ড্রাইভারকে বলল, “তুমি পাশে বস, আমার হাতটা কেমন দেখ তো।” রাজারাম নিজে গাড়ি চালাতে লাগল। আসলে রাজারাম বোঝাতে চাইছিল ড্রাইভারকে, তার হাত রীতিমত পাকা। এইভাবে দুচারদিন চলার পর ড্রাইভারকে একদিন বলল, “তুমি গাড়িতে থাকলে আমার ব্যবসার অসুবিধে হচ্ছে।” ড্রাইভার একটু অবাক, “কেন স্যার?” রাজারাম বোঝাল, “অফিসাররা গাড়িতে একে ওকে তুলে ফুর্তি করতে যাবে, তুমি থাকলে ওদের অসুবিধে হবে।” ড্রাইভার বলল, “ঠিক আছে, কাল থেকে আমাকে কোথাও নামিয়ে আপনি গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন। আপনি যখন যেখানে থাকতে বলবেন, আমি সেখানেই সময়মত থাকব।”

এই তো চাই। পরদিন থেকে রাজারাম যখন খুশি গাড়ি নিয়ে চলে যেত, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে সময়মত ফিরে এসে গাড়ি ড্রাইভারের হাতে দিয়ে দিত। ভাড়া ও বখশিস হাতে নিয়ে সে নিশ্চিন্তে চলে যেত গ্যারেজে। কিছুদিনের মধ্যেই রাজারাম তার বিশ্বাসযোগ্যতা এমন স্তরে নিয়ে গিয়েছিল যে ড্রাইভারকে গ্যারেজ থেকে আর গাড়ি বেরও করতে হত না। মালিকই রাজারামকে চাবি দিয়ে দিত। রাজারাম নিজেই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে নিয়ে যেত। কোথায় যেত, সারাদিন গাড়ি নিয়ে সে কি করত কোনওদিন কেউ তাকে প্রশ্নই করেনি। রাজারাম কিন্তু লুকিয়ে ড্রাইভারকে আলাদা বখশিস দিত, যাতে ড্রাইভার তার বিরুদ্ধে মালিককে কখনও খারাপ কিছু না বলে। সে তো জানে গাড়িতে রাজারাম অফিসারদের ফুর্তি করাতে নিয়ে যাচ্ছে। সেটা শুনে মালিক আর গাড়ি নাও ছাড়তে পারে। তাহলেই ঝামেলা। আর গ্যারেজটাও ছিল সুবিধেমত জায়গায়, দুর্গাপুর স্টেশনের কাছে। পরিকল্পনা ছিল, ডাকাতির পর ওরা চার-পাঁচ জন ওই গাড়ি নিয়ে সোজা গ্যারেজে এসে গাড়ি জমা দিয়ে চলে যাবে স্টেশনে, তারপর ট্রেন ধরে উধাও। গ্যারেজ থেকে ব্যাঙ্কের দূরত্ব অনেক, ওরা পৌঁছনর আগে কিছুতেই ডাকাতির খবর সেখানে পৌঁছনর সুযোগ ছিল না।

দুটো গাড়ি ওরা না কিনে, ছিনতাই না করে সুকৌশলে যোগাড় করে ফেলল। এবার অন্য দিক। দিনে ডাকাতি করতে হলে ব্যাঙ্কের কাছেই টামলা ব্রিজ বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে আসানসোলের দিক থেকে কোনও লরি বা গাড়ি এসে ওদের পালিয়ে যাওয়ার পথ আটকে না দিতে পারে। পেছন পেছন তাড়া করা বা পুলিশ আসার আশঙ্কাও কমে যায় তাহলে। সেজন্য ওরা ঠিক করল, ডাকাতি শুরু করার মুহূর্তেই টামলা ব্রিজের মুখে একটা বড় গ্যাস বম্ব ফাটাবে। বোমা থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে সরু ব্রিজটা সম্পূর্ণ অন্ধকার করে দেবে, বড় জ্বলন্ত বোমা দেখে কেউ সাহসও করবে না সামনে যাওয়ার। ওদিকে আসানসোলের দিক থেকে গাড়ির পর গাড়ি এসে রাস্তায় জট পাকিয়ে ফেলবে, কেউ আর চট করে ব্রিজ পার হয়ে কলকাতার দিকে যেতে পারবে না। বোমা থেকে ঘণ্টাখানেক ধোঁয়া বেরবে। ততক্ষণে ওরা ডাকাতি সেরে, দুর্গাপুর ছেড়ে বহু দূরে চলে গিয়েছে।

ওরা ডাকাতি করে জি. টি. রোড ধরে পুবদিকে অর্থাৎ কলকাতার দিকে আসবে, ঠিক ছিল। ব্যাঙ্ক অঞ্চলে জি. টি. রোড থেকে ঢুকতে কিংবা বেরতে দুটো সিমেন্টের কালভার্ট

পড়ে। দুটোই জি. টি. রোডের ধারে, শুকনো কিন্তু বেশ চওড়া নর্দমার ওপর। একটা পুব দিকে, অন্যটা টামলা ব্রিজের কাছে পশ্চিম দিকে। ওরা ঠিক করল, ডাকাতির শুরুতেই পশ্চিম দিকের কালভার্টটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবে। ডাকাতি করে ফেরার সময় শেষ অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা পুবদিকের কালভার্টটা উড়িয়ে দিয়ে চলে আসবে, যাতে ওদের পেছনে রাজ্য পুলিশের রিজার্ভ ফোর্স ভ্যান বা লরি নিয়ে তাড়া করতে না পারে। কালভার্ট উড়িয়ে দিলে পুলিশ আর ওই অঞ্চল থেকে গাড়ি নিয়ে বেরতেই পারবে না।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে জি. টি. রোড ধরে গাড়িতে কলকাতার দিকে এলেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গান্ধী মোড়ের কাছে ফরিদপুর পুলিশ ফাঁড়ি। ফাঁড়িতে সবসময় রাইফেলধারী দশ-পনের জন সিপাই ও অফিসার থাকে। ডাকাতি করে ওই ফাঁড়ির সামনে দিয়ে জি. টি. রোড ধরে আসতে, হবে, অন্য কোনও রাস্তা নেই। ততক্ষণে ব্যাঙ্ক থেকে টেলিফোনে ফাঁড়িতে পৌঁছে যাবেই খবর। তাহলে কি উপায়? ফরিদপুর ফাঁড়ির সিপাইদের বেরতেই দেওয়া চলবে না। তাই ওরা ঠিক করল, ফাড়ির উল্টো দিকে যে জঙ্গল মত জায়গা আছে, সেখানে গাদাকামান বসিয়ে রাখবে। সিপাইরা রাস্তায় বেরোনোর চেষ্টা করলেই উল্টোদিকের জঙ্গলের থেকে গাদাকামান গর্জে উঠবে আর তার ঝাঁকঝাঁক স্পিংটারে ধরাশায়ী হয়ে যাবে সিপাইরা। গাদা কামান ওরা নিজেরাই বানাত, লোহার দু-আড়াই ইঞ্চি মোটা পাইপের মধ্যে গান পাউডার ও জালের কাঠি ভরে। ফাটাত ব্যাটারি চার্জ করে ডেটনেটর দিয়ে।

দিনে ডাকাতির পরিকল্পনা যখন পাকা, তখন হঠাৎ ব্যাঙ্কে এল মহাত্মা গান্ধীর ছবি ছাপা একশ টাকার নতুন নোট। তখনও সেটা বাজারে চালু হয়নি। ওরা ঠিক করেছিল শুধুমাত্র একশ টাকার নোট নিয়ে যাবে, ছোট নোট নেবে না। কিন্তু এবার সমস্যা হল, এক কোটি টাকার নতুন একশ টাকার নোট ডাকাতি হয়ে গেলে সরকার থেকে ওই টাকা বাতিল করতে পারে। তখন এক কোটি টাকার অনেক মূল্য ছিল আর বাতিল ঘোষণা করার সুবিধা ছিল, কারণ গান্ধীজীর ফটো সমেত নোট তখনও চালু করা হয়নি। সুতরাং ডাকাতির দিন পিছিয়ে গেল কিছুদিনের জন্য।

একমাস পর সেই দিনটা এল। সকাল পর্যন্ত সব ঠিকঠাক, হঠাৎ সি.পি.আই পার্টি থেকে পোস্ট অফিস ঘেরাও করে বসল বিকেল চারটে নাগাদ। ব্যাঙ্কের পেছনেই পোস্ট অফিস, ওখানে প্রচণ্ড ভিড় জমে গেল। ব্যাঙ্কের চারপাশে তো লোক গিজগিজ করতে লাগলই, এমন কি সামনের ও পেছনের রাস্তাও লোকে লোকারণ্য। ডাকাতি করার কোন সুযোগই রইল না। আবার পিছিয়ে গেল অপারেশন।

একমাস পর ফের নির্দিষ্ট দিনে ওরা তৈরি হয়ে নিল। ব্যাঙ্কে চলে এসেছে টাকা। হঠাৎ দুপুরবেলা দেখা গেল ওদের ট্যাঙ্কারের সেল্ফ স্টার্টার খারাপ হয়ে গিয়েছে, গাড়ি ঠেলা ছাড়া স্টার্ট নিচ্ছে না। সেটা ঠিক করে ব্যাঙ্কে ঢুকতে ঢুকতে ম্যানেজার ভল্ট বন্ধ করে চাবি নিয়ে চলে যাবে। সুতরাং সেদিনও হল না। অপেক্ষা আরও একমাস। না, সেদিনও হল না। সেদিন ছোট লরিটা, যেটা ওদের গার্ড দিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল, তার ব্যাটারি একেবারে ডাউন। তখন দুপুরবেলা, দুর্গাপুরে এমন কোনও ব্যাটারির দোকান পাওয়া গেল না, যেখান সাথে সাথে চার্জ দিয়ে দেবে, এমনকি কোথাও ব্যাটারি ভাড়াও পাওয়া গেল না।

এবার ঠিক হল, আর একমাস অপেক্ষা নয়, পরদিনই ডাকাতি করা হবে। কোটি টাকা পুরো না পাওয়া গেলেও কাছাকাছি তো থাকবে। যথারীতি রাত শেষ হওয়ার আগেই টামলা ব্রিজের কাছে কালভার্টের নিচে দুটো ডিনামাইট বসিয়ে দেওয়া হল। ডাকাতি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ডিনামাইটের ডেটনেটরের তার ব্যাটারির সঙ্গে লাগিয়ে কালভার্ট উড়িয়ে দেবে। আর ওই অন্ধকারের মধ্যেই ফরিদপুর ফাঁড়ির উল্টো দিকে ফাঁড়ির দিকে মুখ করে কয়েকটা গাদা কামান জঙ্গলে বসিয়ে দিয়ে এল। আসলে ওরা ডাকাতির দিন ভোর হবার আগেই ডিনামাইট আর গাদাকামান লাগাত। ডাকাতি না হলে আবার রাতে গিয়ে সেগুলো তুলে নিয়ে আসত। সেদিনও তাই করেছিল। কিন্তু ভোরবেলা সি.আর.পি.র এক সিপাই কৌটোয় জল নিয়ে প্রাকৃতিক কাজ সারতে গেল ওই কালভার্টের তলায়। সাধারণত ওখানে ওই কাজে

কেউ যায় না। সে দেখে কালভার্টের তলায় নতুন ইলেকট্রিক তার ঝুলছে। তার ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখে ডিনামাইট। ডিনামাইট দুটো খুলে সাথে সাথে ছুটল অফিসে খবর দিতে। বড় বড় অফিসাররা হাজির সাতসকালে। কে লাগাল ওখানে ডিনামাইট? কি মতলব? চারদিকের কালভার্টের তলায় খোঁজা শুরু হল। পুব দিকের কালভার্টের নিচে ওরা ডিনামাইট বসাত না কারণ ওই কালভার্টের মাঝখানে একটা তিন ইঞ্চি মোটা গর্ত ছিল। ওরা ঠিক করেছিল ফেরার পথে শেলের ভেতর ডিনামাইট দিয়ে গর্তে ঢুকিয়ে ওই কালভার্ট উড়িয়ে দেবে।

অন্য কালভার্টের তলায় কিছু না পাওয়া গেলেও, ফরিদপুর ফাঁড়ির উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে গাদা কামানগুলো পুলিশ পেল। কিন্তু কারা ওগুলো বসিয়েছে, সেব্যাপারে পুলিশের ধারণা পরিষ্কার হল না। পুলিশের ধারণা হয়েছিল, দিনকয়েক আগে দুর্গাপুর রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ফরিদপুর ফাঁড়ির পুলিশের যে গণ্ডগোল হয়েছিল, তারই জেরে ওই সব বসিয়েছে কোনও ছাত্রগোষ্ঠী। ওখানকার পুলিশ অফিসাররা একবার ভেবেও দেখল না, সাধারণ ঘরের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসা ছেলেরা ডিনামাইট, ডেটনেটর কোথায় পাবে? কি উদ্দেশ্যেই বা ওরা একটা গুরুত্বহীন কালভার্টের তলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তা বসাতে যাবে? কি উদ্দেশ্যেই বা একটা কালভার্ট তারা উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করবে? বুদ্ধিমান অফিসাররা কিন্তু তাদের কথা চিন্তা না করে অন্য চিন্তা করত এবং দুর্গাপুর থেকে আসা-যাওয়ার রাস্তায় প্রচণ্ড নজর রাখত। তাতে কিছু কাজ হলেও হতে পারত।

পুলিশ ডিনামাইট খুঁজে পাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যে অনন্তবাবুর দলের ছেলেদের কাছে খবর পৌঁছে গেল। এবার ওরা ঠিক করল আর নয়। দুর্গাপুর স্টেট ব্যাঙ্কে ডাকাতির পুরো পরিকল্পনাই বাতিল করে গাড়ি, লরি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছেলেরা ফিরে এল কলকাতায়। চায়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেল। ছ-ছবার ওরা ডাকাতির দিন নির্দিষ্ট করে ব্যর্থ হল। দুর্গাপুরের ওই স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতি সত্যিই হলে আমাদের দেশে ডাকাতির ইতিহাসে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত। এখনও পর্যন্ত অত বড় ডাকাতি আর হয়নি। কলকাতায় যখন ফিরল, তখন ওদের তহবিলের সব টাকা শেষ। মাসের পর মাস দুর্গাপুরে কুড়ি-পঁচিশজন ছেলের থাকা-খাওয়া, বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, আর ডাকাতির পরিকল্পনায় হাত একেবারে শূন্য। কি করা যায়?

ওরা দুর্গাপুর থেকে ফিরে এসেই সপ্তাহখানেকের মধ্যে নিউ আলিপুরের ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে দ্বিতীয়বার ডাকাতি করল। ওরা দেখল ওই ব্যাঙ্কের পুরো ব্যাপারটাই ওদের জানা, নতুন করে আর ব্লু প্রিন্ট করতে হবে না। যেন নিজেদের বাড়ির আলমারিতে টাকা রাখা আছে। গিয়ে নিয়ে এলেই হল। ঠিক তাই-ই করল।

গেল, কাউন্টার থেকে লক্ষাধিক টাকা তুলল, পালিয়ে গেল। এই টাকা থেকে ওরা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পুরনো স্টাফ কার ডজ ভ্যান কিনল কিছু অস্ত্রও কিনল। তার মধ্যে ছিল একটা কারবাইন স্টেন মেশিন গান। ওরা শেষ ডাকাতির পরিকল্পনা করল রাসেল স্ট্রিটের স্টেট ব্যাঙ্কে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠ, চিড়িয়াখানায় ওরা ডাকাতির রিহার্সাল দিতে শুরু করল। কোথা দিয়ে পালাবে, কখন কিভাবে কে ডাকাতির সময় কি কি কাজ করবে তার পুরো রিহার্সাল দিয়ে উনসত্তর সালের বারই ডিসেম্বর টেস্ট ম্যাচ শুরুর দিন ঠিক সকাল দশটায় ওরা ডাকাতি করে চলে গেল।

ওদের ছড়িয়ে যাওয়া ঘোষণাপত্র ও ক্যাসেট থেকে প্রথম জানতে পারলাম কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়ির ডাকাতদল আসলে একটা রাজনৈতিক দল। অন্য একটা চিন্তাও অবশ্য কাজ করছিল মাথায়, হয়ত আমাদের বিপথে চালিত করার জন্য এটা ডাকাতদের কোনও কৌশল। তবু আমরা রাজনৈতিক দলের অনুসন্ধানেই প্রথমে নামলাম। তখন আমাদের হাতে আছে মিঃ রায় প্রেসিডেন্সি জেলে। আর তাঁরই সূত্র ধরে এবার আমাদের অভিযান। একজনের পর একজন গ্রেফতার হতে লাগল। ওদের দল ছত্রখান হয়ে গেলেও দলের বহু সদস্য তখনও বাইরে। তাদের ধরা যায় কি করে? ইতিমধ্যে বিহারে নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য ধরা পড়েছিল দীপক, কাজল ও হারু। তাদের নিয়ে আসা হল কলকাতায়।

ওদের ধরাটা অত সহজ ছিল না। অনন্তবাবুর দলের ছেলেদের রণকৌশল ছিল দুরন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত। অনন্তবাবুর ওপর আমরা পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসে ডাকাতির পরই নজর রাখতে শুরু করেছিলাম। ওই ডাকাতির ঢঙ দেখেই দেবীবাবু অনুমান করেছিলেন, এত নিপুণ পরিকল্পিত অপারেশনের পেছনের মাথাটা অনন্তবাবুর ছাড়া আর কারও নয়। তাঁর মত ডাকাতির বুদ্ধি শুধু কলকাতায় কেন, ভারতবর্ষে বোধহয় আর কারও ছিল না। যদিও পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসে ডাকাতির দিন তিনি মুম্বাই ছিলেন, জানতাম এটাও পরিকল্পিত। কারণ তিনি জানতেন ডাকাতির ধাঁচ দেখেই লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে সন্দেহ করবে। তাই তিনি নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্য চিকিৎসার অজুহাতে মুম্বাই গিয়ে বসে ছিলেন।

তিনি ফিরে আসার পর থেকে তাঁর ওপর আমরা নজর রাখলাম ঠিকই, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। পারব কি করে? তাঁর গাড়ি এত ধীরে ধীরে চলত যে, অত ধীরে পেছন পেছন আমাদের গাড়ি গেলেই বোঝা যেত যে পেছন থেকে একটা গাড়ি তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। ইচ্ছে করেই তিনি ড্রাইভারকে ওভাবে চালাতে নির্দেশ দিতেন, যাতে বুঝতে পারেন পেছনে কেউ তাঁকে সত্যিই নজর রাখছে কিনা। এমনিতে তাঁর চোখে হাই পাওয়ারের চশমা ছিল। কিন্তু কেউ তাঁকে নজর করলেই সেটা ঠিক বুঝে ফেলতেন।

দুএকবার তিনি আমাদের ফাঁদে ফেলারও চেষ্টা করেছেন। যেমন হঠাৎ করে গাড়ি থেকে নেমে কোনও পরিচিত লোককে একটা প্যাকেট দিয়ে দিলেন, যাতে পরে আমরা গিয়ে সেই লোকটাকে ধরি এবং প্যাকেট খুলে দেখি তাতে কি আছে। ওইসব প্যাকেটে যে তিনি কোনও বেআইনী জিনিস দেবেন না, সেবিষয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম, তাই তাঁর ফাঁদে পা দিইনি। গোপন, ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন চালাতে তাঁর ধারে কাছে আর কারোকে দেখিনি। তিনি তাঁর দলের সদস্যদেরও সেইভাবে চলাফেরা করতে শিখিয়েছিলেন। তখন দলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আর অনন্তবাবু ও তাঁর ডানহাত গোরা আমাদের কাছে। বাকিরা কি আরও বেশি সতর্ক হয়ে চলবে না?

আগে ওদের বেশিরভাগ গোপন আস্তানা আর যোগাযোগ ছিল দক্ষিণ কলকাতা আর ওদিকের শহরতলিতে। দলের বেশ কিছু সদস্য গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর ওরা সেটা পাল্টে উত্তর কলকাতা ও তার শহরতলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আমাদের কাছে যা যা খবর ছিল তার আর মূল্য রইল না। সত্তর সালের মার্চ মাসে একদিন ওরা ইডেন গার্ডেন্সের কাছ থেকে একটা নৌকো ভাড়া করে হুগলি নদীর ওপর দিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত গেল, ফের ফিরে এল। নৌকোয় বসে ওরা একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে নিল, এবং তারই ফলস্বরূপ তারা চলে যায় দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরে তারা দিন পনের ছিল, কিন্তু যে উদ্দেশে সেখানে যাওয়া তার কিছুই সম্ভব হয়নি। আসলে উদ্দেশ্য ছিল কিছু ঘটনা ঘটান।

দুর্গাপুরে সুবিধে করতে না পেরে, সেখানকার মানুষের কোনও সাহায্য না পেয়ে তারা ফিরে আসে কলকাতায়। অনন্তবাবুর গ্রেফতারের পর দল পরিচালনা করত কল্যাণ রায়। কিন্তু তার ততখানি ক্ষমতা ছিল না যে অতগুলো রাজনীতি সচেতন ছেলেকে সঠিকপথে চালনা করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কলকাতায় ফিরে কল্যাণ রায় সদস্যদের বলল, বিহারে জঙ্গল এলাকায় চলে যেতে হবে। সেখানে আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে মুক্তাঞ্চল গড়তে হবে। তার নির্দেশ অনুযায়ী দলের সদস্যরা আরও নতুন নতুন ছেলেদের দলে টেনে নিল।

মে মাসের প্রথম দিকে চেতলার এক গ্যারেজ থেকে ওরা একটা বাস কিনল। মে মাসেই আমাদের কাছে খবর এল, অমলেন্দু সেনের ব্রিটিশ নাগরিক স্ত্রী মেরি টেলার কলকাতায় আসছে। আমরা মেরির একটা ফটো যোগাড় করে ফেললাম। খবর অনুযায়ী হাওড়া স্টেশনে আমি আর লাহিড়ী মেরির ওপর নজরদারী করতে গেলাম। স্টেশনে দেখলাম অমলেন্দুর এক ভাই এসেছে, সে মেরিকে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে কফি হাউসে কফি খেতে গেল। আমরাও ঢুকলাম। আমরা ভেবেছিলাম ওরা ট্যাক্সি নিয়ে

অমলেন্দুর বাড়িতে যাবে। কিন্তু ট্যাক্সিতে না গিয়ে তারা বাসে উঠল, আমরাও আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাসে উঠলাম। ওরা বেহালায় নামল, আমরাও নামলাম। এভাবে ওদের ওপর নজর করতে করতে অমলেন্দুর বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া হল। তিনদিন ওখানে মেরি ছিল। তিনদিনই আমাদের নজরদাররা দিন রাত ওখানে পাহারায় ছিল, যদি মেরির যোগসূত্র ধরে অমলেন্দুকে পাওয়া যায়। চারদিনের মাথায় মেরিকে অমলেন্দুর ভাই জামশেদপুর যাওয়ার টিকিট কেটে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। আমরা সেই টিকিটের নম্বর ও ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট বিহার পুলিশকে জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা মেরির ওপর নজর রাখে। এর চার পাঁচ দিনের মাথায় তিরিশে মে খবর পেলাম, জামশেদপুরের কাছে যদুগোড়ায় রুয়ামের পাহাড়ী জঙ্গলে সি.আর.পি.র হাতে ধরা পড়েছে কল্যাণ রায়, অমলেন্দু, মেরি সমেত বাহান্ন জন। অর্থাৎ অনন্তবাবুর আর. সি. সি. আই. দলের পুরনো ও নতুন সমস্ত সদস্য।

এই যদুগোড়ায় একসঙ্গে ধরা পড়াটা আমার মনে হয়েছে পরিকল্পিত আত্মসমর্পণ। কল্যাণ রায় যখন আর দল পরিচালনা করতে পারছিল না, আমাদের নাগপাশ ছাড়িয়ে আত্মগোপন করে থাকাও সম্ভব ছিল না, অথচ জনগণের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছিল তারা, তখনই চূড়ান্ত অ্যাডভেঞ্চারের রাস্তায় চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। নয়ত বাসে সব সদস্যদের নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার আগে ঘাটশিলার মৌভাণ্ডারে কেন থানা আক্রমণ করে পুলিশকে জানান হল তারা কোথায় যাচ্ছে? বিহার পুলিশ ও সি.আর.পি. থানা আক্রমণকারীদের পেছন পেছন ধাওয়া করে গিয়ে রুয়াম জঙ্গল ঘিরে তাদের এক এক করে গ্রেফতার করল। গুলি বিনিময় অবশ্য কিছু হয়েছিল। কিন্তু তাতে কেউ হতাহত হয়নি। কল্যাণ রায় কি জানত না, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কতগুলো অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকলেই বিপ্লব হয় না? আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি জানতেন, তবু তার কিছুই করার ছিল না। একটা বাসে করে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন, আর একটা জালালাবাদ?

আত্মসমর্পণ হোক আর যাই হোক, একসঙ্গে সবাই ধরা পড়াতে আমাদের সুবিধেই হল। ওদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল স্টেনগান, কারবাইন, রিভলবার, বন্দুক ও প্রচুর গোলাবারুদ। আর ছিল স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতির ষাট হাজার টাকা।

আমরা আগস্ট মাসে বিহার পুলিশের কাছ থেকে মামলার জন্য নিয়ে এলাম সতের জনকে। বাকিদের সঙ্গে কলকাতার মামলার কোন সম্পর্ক নেই। তারা হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে রয়ে গেল। আমরা নিয়ে এলাম, কল্যাণ রায়, অমল, অমলেন্দু, গৌরীশংকর, টনি, কল্পনাকে। টনিকে আমরা দ্বিতীয় রাজসাক্ষী বানালাম। এই দলে টনি আর অনিল দত্ত ছাড়া প্রত্যেকেই একনিষ্ঠ ও সৎ ছিল। টনি আর অনিলের চারিত্রিক দোষ ছিল। আমরা সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তাদের রাজসাক্ষী বানিয়ে দিলাম। আবার উল্টোদিকে রাজারামকে দেখেছি স্টেট ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর গাড়ি নিয়ে পালানর সময় ওর সাথে যে দেড় লক্ষ টাকা চলে এসেছিল, তা অবলীলায় দলকে ফেরত দিয়ে দিতে। সেই টাকা সে নিয়েও নিতে পারত। কিন্তু তার থেকে এক পয়সাও সে খরচ করেনি, অথচ তার বাড়ির আর্থিক অবস্থা কিন্তু মোটেই ভাল ছিল না। এমনই সৎ ছিল ওই দলের প্রায় প্রতিটা ছেলে। অনন্তবাবুর এই দলটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল পেশাদারি বিপ্লবী হবার চেষ্টা প্রতিটি ছেলেমেয়ে মধ্যে। তাই ওদের সব কাজ ও ডাকাতির পরিকল্পনাগুলো ছিল একেবারে নিখুঁত। পরবর্তীকালে আমরা বহু ডাকাতির রহস্যের সমাধান করেছি, ডাকাত ধরেছি, কিন্তু সেইসব ছক অনন্তবাবুর দলের কাছে কিছুই না।

এক এক করে আদালতের মধ্যে সব মামলাগুলো গেঁথে ওদের বিচারের জন্য গঠিত হল আলিপুর চতুর্থ ট্রাইবুনাল কোর্ট। বিচার শুরু হল। বিচার চলাকালীন একাত্তর সালের মাঝামাঝি প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকের পাঁচিল টপকে পালিয়ে গেল খোকন ভট্টাচার্য, বাবুল, সমরেন্দ্র, স্বপন, খোকন দাস সমেত মোট আটজন নকশাল বন্দী। আমরা সবাইকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করতে পারলেও খোকন ভট্টাচার্যকে আর

পাওয়া যায়নি। শুনেছি, বেহালার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে চোংগার বনে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে ছিল এবং সেখানেই এক রাতে সি.আর.পি.র গুলিতে মারা যায়। ওদের দলের আরও একজন মারা যায় একাত্তরের নভেম্বরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। অমিয় (সাগর) চ্যাটার্জি, এক সময় বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির সি. পি আই (এম) কমিশনার ছিল। লম্বা চওড়া, সুদর্শন অমিয় সি.পি.আই (এম) ছেড়ে নকশাল হয়েছিল। অনন্তবাবুর দলের সক্রিয় সদস্য ছিল সে। তাকে ও অন্য আরও সাতজন নকশালকে একই দিনে জেলে স্রেফ ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলা হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর এসেছিল। অথচ জেল কর্তৃপক্ষ প্রচার করেছিল তারা নাকি জেল ভেঙে পালাতে চেষ্টা করেছিল, তাই মারা হয়েছে। আমাদের কাছে আরও খবর এসেছিল, জেল ভাঙার ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য জেল প্রাচীরের ভেতর লোহার ফেন্সিং এক জায়গায় নিজেরাই খুলে রেখেছিল জেলকর্মীরা। যদি পালানরই চেষ্টা করে থাকত, তবে নিশ্চয়ই ওরা জেলের পাহারাদারদের ওপর চড়াও হত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আহত হত। সাহায্যের জন্য বাইরে থেকে অন্য নকশালরা বোমা গুলি দিয়ে আক্রমণ করত। তেমন কিছুই কিন্তু হয়নি। জেল থেকে পালনোর চেষ্টা করলে জেলরক্ষীরা ওদের রাইফেল থেকে গুলি চালাত। এমন প্রমাণও মেলেনি। যদি জেল কর্তৃপক্ষের বলা গল্প সত্যি হত, তাহলে কোথায় সেই পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট? নিশ্চয়ই পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে বলা থাকবে ওরা গুলিতে মারা গেছে। না, তেমন কিছু হয়নি। অবশ্য মমিনপুর মর্গে ইচ্ছেমত পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট লেখান যেত। মৃতদেহগুলি ওখানে মাতাল ডোমরা কাটাছেঁড়া ও সেলাই করে। ডাক্তার দূর থেকে মাঝেমাঝে তাকিয়ে দেখে। তারপর মৃতদেহের আত্মীয়স্বজনের সাথে বন্দোবস্তে পোষালে তেমনভাবে রিপোর্ট লিখে দিত। অন্যদিকে পুলিশের ইচ্ছা অনুযায়ী রিপোর্ট তো হতই।

একজন ডাক্তারকে দেখেছি, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট লেখার বিস্তারিত বিবরণী লেখা বই বগলের তলায় নিয়ে ঘুরতেন। দরদস্তুর পাকা হলে বই খুলে ফর্ম ভর্তি করে ছেড়ে দিতেন। এই রকম এক ডাক্তারকে বরখাস্ত হতে দেখেছি সুতরাং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের নিহত বন্দীদের পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে যা লেখা হয়েছে, তা নিতান্তই মূল্যহীন। যারা ওই ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে দেখিনি কোনও ব্যবস্থা নিতে, বা কেউ তাদের দিকে আঙুল তুলে বলেনি, "ওরা খুনী।"

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সেদিনের ঘটনায় অনন্তবাবুর দলের প্রলয়েশ মিশ্র দারুণভাবে আহত হয়েছিল। তার সারা শরীর, বিশেষ করে মাথা থেঁতলে গিয়েছিল। কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও, তার মস্তিষ্ক আর ঠিকঠাক কাজ করত না। সে আর সুস্থ মানুষের মত চলাফেরা করতে পারত না। আমি জেলের সোর্সের দেওয়া এই খবর আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে জানিয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে ওই ব্যাপারে আর অগ্রসর হতে বারণ করে, নিজেরা দেখছি বলে আমাকে এবং আমার সোর্সের খবরকে ধামাচাপা দিয়ে দেন।

আলিপুরে ওদের বিরুদ্ধে চতুর্থ ট্রাইবুনালে আট বছর ধরে মামলা চলেছিল। অনন্তবাবুর দলের ছেলেদের আমরা সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করতাম, তাই নিয়ম ভেঙে জেলের গেটের ভেতর পুলিশের ভ্যান ঢুকিয়ে তাদের তুলে আবার জেল গেট খুলে কোর্টে আনা হত। কোর্টে অনন্তবাবুর কাছে বহুবার দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর বন্ধু স্নেহাংশু আচার্য, যিনি জ্যোতিবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সি.পি.আই (এম) পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন। অনন্তবাবু ওই পার্টির প্রতীক নিয়ে উনসত্তর সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে চৌরঙ্গি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের কাছে খুব অল্প ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন।

আট বছর ধরে মামলা চলার পর সাতাত্তর সালে প্রথম বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। সেই সময় ওদের বিরুদ্ধে মামলাও সরকার পক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হয়। অনন্তবাবু ও তাঁর দলের ছেলেরা ছাড়া পেল। সাধারণত

ডাকাতি মামলার আসামী ছাড়া পেলে, পরবর্তী সময়ে অন্য কোন ডাকাতির তদন্তে আমরা তাদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করি। সূত্র খুঁজে বার করার জন্য কিন্তু অনন্তবাবুর ছেলেদের আমরা আর কোনওদিন ধরিনি বা কোন ডাকাতির সূত্র খোঁজার জন্য জিজ্ঞাসাবাদও করিনি। এমনকি, আশির দশকে যখন কলকাতা ও তার আশেপাশে পরপর নটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেল, তখনও নয়। যাতে যথেচ্ছভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিভিন্নরকম রাসায়নিক বোমা ব্যবহার হয়েছিল। যার সূত্র খুঁজতে খুঁজতে একটা ছেলেকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেছি। তখনই সেই ছেলেটা দমদম এলাকায় এক পরিত্যক্ত বাড়িতে তখন পর্যন্ত আমাদের অজানা এক বিস্ফোরকে মাংসের কিমা বানানার মত উড়ে গেছে। সেই সময়ও কিন্তু আমরা অনন্তবাবুর দলের ছেলেদের ধরে কোনও প্রশ্ন করিনি। অথচ তখন আমরা ও রাজ্য পুলিশ হন্যে হয়ে ডাকাতিগুলি কিনারা করার জন্য সূত্র খুঁজছি। যাকে পারছি তাকে ধরেই জেরা করছি। কলকাতা ও উত্তর ও দঃ চব্বিশ পরগনায় গোপনে চিরুনি তল্লাশি করছি। পরবর্তীকালে যখন আমরা সেই সব ডাকাতির রহস্য উন্মোচন করেছি, তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, আমাদের সিদ্ধান্তই সঠিক। অনন্তবাবুর ছেলেরা আর কোনওদিন ডাকাতি করবে না। তারা বুঝে গিয়েছে যে ডাকাতির রাজনীতিটা ভুল। আর সেই ভুলের মাশুল তাদের জীবন দিয়ে দিতে হয়েছে।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার বছর খানেকের মধ্যে অনন্তবাবু মারা যান। শেষ হয় ভারতবর্ষের পঞ্চাশ বছরব্যাপী এক সন্ত্রাসবাদী ইতিহাসের নায়ক বা খলনায়কের অধ্যায়। যা কিনা তাঁর বিভ্রান্তিকর রাজনীতির এক বিয়োগান্ত করুণ পরিণতি!

আজ যখন অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাচ্ছি, তখন কত কথা, কত ঘটনা আর চরিত্রের ছবি সামনে এসে যাচ্ছে। আবার কত কিছু মিলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। ঘটনা, ঘটনা আর ঘটনার অবিরত হানায় সাতষট্টি থেকে সাতাত্তর সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ যেমন কেঁপেছে, কেঁপেছে তার রক্ষীবাহিনীও। আমি তো ছিলাম তাদেরই একজন।

সে ইতিহাসের এক দুর্বার অধ্যায়, অগ্নিগর্ভ ইতিহাসের অধ্যায়। নকশাল আন্দোলনের রক্ত ঝরানোর ইতিহাসের অধ্যায়। আমি ইতিহাসবিদ নই। ইতিহাস আমি লিখব না। সে কাজ করবেন ইতিহাসবিদগণ। আমি আগামী প্রজন্মের গবেষকদের জন্য রেখে যাব কিছু তথ্য আর বর্তমান প্রজন্মকে শুনিয়ে যাব কিছু "আনটোল্ড স্টোরি", স্টোরি নয়, নেপথ্যের প্রকৃত ঘটনা।

ঘটনা বলতে গেলে আগে ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা বলতে হবে। আলাপ ছাড়া যেমন মার্গীয় সঙ্গীত জমে না, তেমনই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি না জানা থাকলে ঘটনার স্বাদ পাওয়া যায় না।

অথচ মুশকিল হচ্ছে, আমি রাজনীতিবিদ নই, রাজনীতি আমি কোনও দিন করিনি। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা বলতে গেলে রাজনীতি এসেই যাচ্ছে, সেটা বাদ দিয়ে রাজনীতির মোড়কে মোড়া ঘটনাকে বর্ণনা করা যায় না। তাই ঘটনা বলতে গিয়ে যতটুকু রাজনীতি আসবে তা তো বলতেই হবে।

অবশ্য যেটুকু আমি বলব, সেই রাজনীতির ব্যাখ্যা কোনও ব্যক্তিবিশেষে বিরুদ্ধে আক্রমণ নয়। বিচারকের ভূমিকা তো নয়ই, এমনকি রাজনৈতিক বিশ্লেষণও নয়, বরং বলা যায় কিছুটা গল্পকারের ভূমিকায়। কে সঠিক ছিল, কে বেঠিক সে বিচারের ভার বিচারকদের অর্থাৎ আপনাদের। আমি শুধু আপনাদের আদালতে পেশ করব কিছু প্রামাণ্য তথ্য। যদিও জানি আপনাদের হাতে আছে অনেক তথ্য। আমার পেশ করা তথ্যগুলি তাতে কিছু নতুন মাত্রা যোগ করবে। আপনারা সেগুলি দেখবেন, শুনবেন, বুঝবেন আর আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যাবেন আপনাদের আদালতের রায়। সে রায়ের নির্যাস হবে আগামী সব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আলোর দিশারী।

ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের পরই পশ্চিমবঙ্গ আস্তে আস্তে উত্তাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, এর পেছনে একদিকে ছিল তখনকার কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতা, অন্যদিকে চৌষট্টিতে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগ হয়ে যায়, তখন সেই দুই পার্টির নিচুতলার কর্মীদের চরিত্রগত অমিল। আজকের মত দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রায় সব স্তরে মিল ছিল না। তখন সি.পি.আই (এম)-এর নিচুতলার কর্মী ও সমর্থকদের চাপে নেতাদেরও নিজেদের বিপ্লবী ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে জঙ্গী খাদ্য আন্দোলনে সামিল হতে হয়েছিল। সেই গণআন্দোলনের ফলেই সাতষট্টির নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারের পতন আর প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের জন্ম।

আবার সাতষট্টিতেই দার্জিলিং জেলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল নকশালবাড়িতে হঠাৎ এক স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে জন্ম নিল নতুন ধরনের জঙ্গী কমিউনিস্ট সংগ্রাম।

এখনও আশ্চর্য হয়ে ভাবি, যখন নকশালবাড়ির কৃষকেরা আন্দোলন করল, তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার, বিশেষ করে দুই কমিউনিস্ট পার্টি কেন তাকে "বালখিল্যের আন্দোলন" বলে তাচ্ছিল্য করল? কেন রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করল না? উল্টে বাবা যেমন ছোট ছেলে দুষ্টুমি করলে কান ধরে পিঠে দু ঘা দিয়ে দেয়, ঠিক তেমনভাবে আন্দোলন দমন করতে গেল। ফল হল উল্টো। যে নকশালবাড়ির আন্দোলন শুধুই একটা সীমাবদ্ধ কৃষক আন্দোলন ছিল, তা ব্যাপক রাজনৈতিক চরিত্র পেয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে। যখন ওখানকার নেতারা নিজেরাই জানেন না এরপর কোন পথে নিয়ে যাওয়া উচিত

আন্দোলনকে, তখন সরকারের চরম দমননীতির ফলে সবার চোখ গিয়ে পড়ল নকশালবাড়ির ওপর। জন্ম হল এক নতুন মতাদর্শের, যারা নিজেদের বলতে লাগল চীনপন্থী কমিউনিস্ট। ফল দাঁড়াল- যে প্রশ্নে একবার চৌষট্টি সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগ হয়েছিল, সেই একই প্রশ্নে সাতষট্টি সালে পার্টি আবার ভাগ হতে লাগল। সি.পি.আই (এম) পার্টি থেকে তাদের পুরো দার্জিলিং জেলা কমিটিকে বহিষ্কারের পর সেই কমিটির সদস্যরাই এই আন্দোলনের পুরোধা হয়ে গেলেন। সি.পি.আই (এম) থেকে ব্যাপকহারে নিচুতলার কর্মী বেরিয়ে এসে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়াল। আবার বেজিং রেডিও থেকে নকশালবাড়ির আন্দোলনকে সমর্থন করায় তা পেয়ে গেল এক আন্তর্জাতিক রূপ। একদিকে তখন ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সশস্ত্র প্রতিরোধ অভিযান, অন্যদিকে ভারতের প্রতিষ্ঠিত দুই কমিউনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নকশালবাড়ির নতুন ডাক। দারুণ উত্তেজনায় আবেগতাড়িত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক, তরুণ-তরুণী কোনরকম চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ঝাঁপ দিল সেই আন্দোলনে। বাঙালির বুকের মধ্যে নেচে উঠল রোমান্টিসিজমের ভূত। প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় সি.পি.আই (এম) পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট নেতারা কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে সংগঠিত হতে লাগল, যে যার মত আন্দোলন করতে শুরু করল। প্রায় সব আন্দোলনই জঙ্গী চরিত্রের। কোনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই। শুধুমাত্র তারুণ্যের উন্মাদনায় ভেসে যেতে লাগল সেইসব নকশাল তরুণ-তরুণীরা। নামকাওয়াস্তে একটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ছিল, কিন্তু সেইসব নেতাদের অভিজ্ঞতা, তাত্ত্বিক গভীরতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এমন পর্যায়ে ছিল না যাতে তারা এই যুব শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। উল্টে তারাই সেইসব রোমান্টিক ছাত্র-যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে গা ভাসিয়ে দিল। রোমান্টিকতার চাপ সহ্য করে বাস্তব পথে আন্দোলনকে নিয়ে যাওয়ার বদলে নিজেরাই আবেগের শিকার হয়ে গেল। তাছাড়া সেই বল্গাহীন পাগলা ঘোড়াকে বশ করে ছোটানর মত সঠিক দিশা তাদের কাছেও ছিল না। সমাজের পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত সব বাঁধনকেই তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোনও রাজনৈতিক দলই ওদের সামনে কোনও বিকল্প আদর্শ দেখাতে পারল না। রাজনৈতিক ডামাডোল চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। আমাদের. তখন রোজকার কাজই নকশালদের ট্রাম-বাস পোড়ান আর মিটিং-মিছিল সামলানো, কংগ্রেস, সি.পি.আই (এম) কর্মীদের সাথে তাদের সংঘর্ষের মোকাবিলা করা। এমন কোন দিন যেত না, প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে নকশাল ছাত্র-যুবকদের হাঙ্গামা দমন করতে যেতে হয়নি। ওই সময়েই নকশালদের অনেক নেতা ও কর্মীকে আমরা চিনেছি। তবে শুধু কলেজ স্ট্রিট এলাকা নয়, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী প্রায় সব অঞ্চল জুড়েই নকশালদের তাণ্ডব উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

সাতষট্টির যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল। আবার নতুন করে অন্তর্বর্তী নির্বাচন জিতে ওই যুক্তফ্রন্ট সরকারই উনসত্তরে ক্ষমতায় এল। তবে ক্ষমতায় এলেও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আগের মত সবারও আদর্শগত সামঞ্জস্য ছিল না। একমাত্র কংগ্রেস-বিরোধিতার সাধারণ ঐক্য ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোনও দৃঢ় নীতিগত মিল ছিল না।

সে সময় এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নকশালরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। তখনও পর্যন্ত আন্দোলন সর্বনাশা ভয়াল রূপ নেয়নি। ঝড়ের আভাস পাওয়া গেল যখন উনসত্তরের পয়লা মে শহীদ মিনার ময়দানে কানু সান্যাল ঘোষণা করলেন তাঁরা সি.পি.আই(এম.এল) পার্টি তৈরি করেছেন। কয়েকজন নকশাল নেতা মিলে গোপনে ওই পার্টি তৈরি করে ফেলেছিলেন।

তবে আসল সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে এল যখন চারু মজুমদার পার্টির মধ্যে তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। সুশীতল রায়চৌধুরীর মত কিছু নকশাল নেতা চারু মজুমদারের লাইনের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তা ব্যাপক ব্যক্তিপূজার অন্ধ আবেগে ভেসে গেল।

ফলে সত্তর সালের প্রথম দিক থেকেই চারু মজুমদারের "খতমের লাইন" ওদের পার্টির একমাত্র কর্মসূচী হয়ে দাঁড়াল। শুরু হল রাজনীতির এক অন্ধকার অধ্যায়। চারু মজুমদার বিপ্লবের নামে চূড়ান্ত সন্ত্রাসবাদ চালু করলেন। হিরো সাজার নেশায় খতমের এই "শর্টকাট মেথড" কে নকশাল তরুণ-তরুণীরা আগু পিছু কিছু না ভেবেই শিরোধার্য করল। চারদিকে এলোপাথাড়ি খুন জখম শুরু হল। তারা চারু মজুমদারকে ভগবানের আসনে বসিয়ে দিল। "পার্সোনাল কাল্ট"কে অনেকেই ঘৃণা করলেও চারুবাবুর লাইনের বিরোধিতা করার সাহস ওদের পার্টির মধ্যে কেউ দেখাতে পারল না। কারণ বিরোধিতা করার অর্থ পার্টি থেকে শুধু বহিষ্কার নয়—পরিণামে মৃত্যু। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল, সন্ধে ছটার মধ্যে সমস্ত মানুষজন পড়িমরি করে বাড়ির দিকে ছুটত। সকালে যখন সবাই স্কুল-কলেজ-অফিসে যেত, তখন জানত না আদৌ সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরবে কি না। অন্ধকার নামলেই চারদিকে শুরু হয়ে যেত দাঙ্গাহাঙ্গামা। বোমার শব্দে থরথর করে কাঁপত মানুষের বুক। চেনা এবং ঘনিষ্ঠ লোকজনের সাথে ছাড়া অচেনা অন্য লোকজনের সাথে কথাবার্তা পর্যন্ত সবাই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। গোটা দেশময় ভয়, সন্দেহ এমনভাবে থাবা গেড়ে বসল যে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ-তরুণীরা তখন অন্য প্রদেশে চাকরি পর্যন্ত পেত না। অন্য প্রদেশের লোকেরা সন্দেহ করত, পশ্চিমবঙ্গের সব তরুণ-তরুণীই বোধহয় নকশাল, মানে জঙ্গী। সন্ধের পর অনুষ্ঠান, সভাসমিতি একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা হলগুলোতে নাইট শোতে দর্শক প্রায় হতই না। অনেক হল নাইট শো বন্ধই করে দিয়েছিল।

নকশাল আন্দোলনের প্রথম দিকে আমরা বহু তরুণ-তরুণীকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি, কেউ ফিরে এসেছে, কেউ ফেরেনি। কেউ ফিরতে চাইলেও অন্য নকশালদের চাপে পড়ে ফিরতে পারেনি। তেমনই একটা পরিস্থিতির শিকার হল সিঁথির আটাপাড়া লেনের পুতুল মুখার্জি।

পুতুলের বাবা ছিলেন রেল কর্মচারী। ধানবাদের পাশে রেলওয়ে ভুলি ট্রেনিং স্কুলের ইন্সট্রাকটর। সেখানেই থাকতেন। মা দুই মেয়ে আর এক ছেলেকে নিয়ে আটাপাড়া লেনের বাড়িতে থাকতেন। পুতুলই ভাইবোনদের মধ্যে বড়। তখন তার আর কত বয়স হবে? বড়জোর ষোল-সতের। হায়ার সেকেন্ডারির ছাত্রী। চেহারাও বেশ সুন্দর। আমাদের কাছে খবর ছিল, আটাপাড়ার এক নকশাল তাত্ত্বিক ডি. চক্রবর্তী ওখানে একটা গ্রুপ পরিচালনা করে। সেই গ্রুপের ছেলেমেয়েদের পরিচয়ও আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম। চক্রবর্তীর বোন মীনা সেই গ্রুপের সদস্য। তারই অতি উৎসাহে পুতুল দলে যোগ দেয়। এছাড়া ছিল গোখনা, বাপী, বিপাশা, শঙ্কু, চিটকে।

একদিন সন্ধেবেলা দেবীবাবু, আমি আর অন্য দুই অফিসার আটাপাড়ায় গেলাম, ওদের বোঝাতে। কিন্তু কারোকে পেলাম না। তখন গেলাম পুতুলের বাড়ি। তার বাবা-মাকে বললাম, "আপনাদের মেয়ে সর্বনাশা পথে চলেছে, ওকে আপনারা ফিরিয়ে আনুন। আমরাও আপনাদের সাহায্য করব।" ওঁরা আশ্চর্য হয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন। আমরা তখন বললাম, "আপনারা বরং আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ পুতুলকে নিয়ে লালবাজারে আসুন, আমাদের সঙ্গে দেখা করুন। কোনও ভয় নেই, আমরাই ওকে বুঝিয়ে বলব, যাতে আগুন নিয়ে খেলার রাস্তায় সে না যায়।" পুতুলের বাবা আমাদের কথা দিলেন, তিনি পরদিনই লালবাজারে পুতুলকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু পরের দিন, তারপরের দিন, তারপরের দিন, তারপরের দিন, এইভাবে দিনের পর দিন চলে গেল, কোথায় পুতুল?

খোঁজ নিয়ে জানলাম, যেদিন আমাদের সাথে তার দেখা করার কথা, সেদিনই ভোরবেলা গোখনা, বাপী, শঙ্কু পুতুলের বাড়ি যায়। তারপর পুতুলের বাবার বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে বলে, "খবরদার মেয়েকে লালবাজারে পাঠাবেন না। তাহলে আমাদের সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে। আমরা পুতুলকে নিয়ে যাচ্ছি। কোনও কথা বললে উড়িয়ে দেব।" পুতুলকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই গোখনরা তুলে নিয়ে চলে গেল। ওরা খবর পেয়েছিল, আমরা পুতুলের বাড়ি গিয়ে তার বাবা-মাকে কি বলেছি। ওরা ভাবল, ওদের গোপন খবর জানার

জন্যই আমরা পুতুলকে লালবাজারে আসতে বলেছি। তখনও পর্যন্ত ওরা কিন্তু তেমন কোন বড় অপরাধ করেনি যে জন্য ওদের আমরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াব। যদি খবরাখবর জানারই দরকার হত তবে সেদিন রাতেই তো পুতুলকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসতে পারতাম। সে তো আত্মগোপন করেনি।

বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর পুতুল দেখল, এইভাবে এতগুলো ছেলের মাঝখানে সে দিনরাত থাকতে পারবে না। গোখনার আগের থেকেই পুতুলের দিকে নজর ছিল, কিন্তু পুতুল আমল দেয়নি। পরিস্থিতি পাল্টে যেতে, পুতুলই এবার গোখনাকে চাপ দিল তাকে বিয়ে করতে। গোখনা সেই সুযোগে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে পুতুলকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করল। বুঝলাম না, যারা ঈশ্বরে একেবারেই বিশ্বাসী নয়, তারা কেন মা কালীকে সাক্ষী রেখে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বিয়ে করবে? অনেক নকশাল তরুণ-তরুণী তো শুনেছি তখন মাও সে-তুঙের রেড বুক সাক্ষী রেখে, সেই বই ছুঁয়ে শপথ করে বিয়ে করেছিল। আসলে নকশালদের একাংশের এই দ্বৈত চরিত্রই তাদের ভেতরকার আদর্শগত দুর্বলতাকে বুঝিয়ে দেয়। মুখে এক, কাজে অন্যরকম। গোখনা ছিল ওয়াগন ব্রেকার, লুম্পেন। ডি. চক্রবর্তীর উদ্যোগে সে নকশাল হয়েছিল। আসলে নকশাল হওয়া তখন খুব সহজ হয়ে পড়েছিল। নকশালদের খাতায় একবার নাম লেখাতে পারলেই এলাকায় দাদাগিরি করা যেত সহজে। যাবতীয় কুকর্ম করে অবাধে ঘোরা যেত এবং সেইসব অপরাধ আড়াল করা যেত “বিপ্লবী আন্দোলনের” আড়ালে। গোখনা ছিল হঠাৎ হওয়া নকশাল, কোনও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে রাজনীতি করতে আসেনি। আমরা দেখেছি, যারা দীর্ঘ আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে হঠাৎ হওয়া নকশালদের তফাৎ ছিল বিরাট। যারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নকশাল হয়েছিল তাদের চরিত্রের মধ্যে একটা আদর্শবোধ, নীতি ছিল কিন্তু হঠাৎ হওয়া নকশালদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। এরা ছিল চরম উচ্ছৃঙ্খল, চিন্তাশূন্য, একবগ্গা, চারুবাবুর “খতমের লাইনের” দাওয়াই খাওয়া অন্ধ সন্ত্রাসবাদী। বহুক্ষেত্রে চরিত্রহীনও। নকশাল আন্দোলন যে অকালে শেষ হয়েছিল, তার প্রধান কারণ কিন্তু এইসব হঠাৎ হওয়া নকশালরা। এদের কর্মকাণ্ডের জন্যই দ্রুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যে প্রভাব নকশালরা ফেলেছিল তা সরতে শুরু করেছিল।

এই সমাজ ও সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিলই, আছে এবং থাকবেও আর তার মুখপত্র হিসাবে সব সময়ই দেখা দিয়েছিল মধ্যবিত্তরা। সেই সব বিক্ষোভকে চটকদারী শ্লোগান দিয়ে নকশালরা মধ্যবিত্তের মধ্যে নিজেদের একটা জায়গা করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে যেমন দেখেছি এই রাজ্যে সর্বভারতীয় প্রাচীন দক্ষিণপন্থী এক রাজনৈতিক দলের সাধারণ এক কর্মীকে দারুণ জনপ্রিয় হতে, একই কায়দায়। মধ্যবিত্তের চরিত্রের মধ্যেই রয়ে গেছে ছটফটে ভাব, তাঁরা সবসময়ই চায় এক্ষুণি, আশু সমাধান। হাজার হাজার বছর ধরে সমাজের ভেতর শিকড়-উপশিকড় ধরে যা গেঁথে আছে 'তাকে কি ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? কিন্তু চঞ্চল চিত্তের মধ্যবিত্তরা তাই-ই চায়। আর এই অস্থির মনোবৃত্তির আঁতুড় ঘরেই জন্ম নেয় সন্ত্রাসবাদ। আর সব জায়গাতেই সন্ত্রাসবাদের শিকার হয় ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতীরা। নকশাল আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সত্তর সালের প্রথম দিক থেকে সিঁথি অঞ্চলে প্রতিদিনই নকশালদের সঙ্গে সি.পি.আই (এম) ক্যাডারদের সংঘর্ষ হত। সংঘর্ষে দুপক্ষের অনেকেই মারা গিয়েছিল কিংবা আহত হয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সি.পি.আই (এম) ক্যাডারদের কাছে বোমার প্রচুর মশলাপাতি ও অন্যান্য অস্ত্র থাকাতে নকশালরা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছিল। ওরা তখন ষড়যন্ত্র করল এক ঢিলে দুই পাখি মারার। সেইমত একদিন সন্ধেবেলায় নকশালরা সি.পি.আই (এম) ক্যাডারদের সাথে হাঙ্গামা বাধাল, বোমাবাজী শুরু করল। কাশীপুর থানার ইন্সপেক্টর প্রদ্যুৎ মুখার্জির নেতৃত্বে সাব-ইন্সপেক্টর প্রশান্ত সেননিয়োগী পনের কুড়ি জনের ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছল। প্রশান্ত তার জিপে বসে ছিল। নকশালরা পরিকল্পনা মত প্রশান্তর জিপ লক্ষ্য করে পর পর বোমা ছুঁড়তে, গুলি চালাতে শুরু করল। পেট্রোল বোমার আঘাতে

প্রশান্ত জিপের ভেতরেই লুটিয়ে পড়ল। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল জিপে। প্রশান্ত জিপ থেকে নেমে আসার কোনও সুযোগই পেল না, জিপের ভেতরেই অসহায়ভাবে পুড়ে যেতে লাগল।

অন্য জিপে প্রদ্যুৎ মুখার্জিও বোমার আঘাতে আহত হলেন। নকশালদের দলে ছিল গোধনা, বাপী, শ্যাম, কেলো ও বাবু। ওরা ওদের কাজ সেরে পালাল। সিপাইরা বালতি বালতি জল ঢেলে জিপের আগুন নিভিয়ে ফেলল। কিন্তু ততক্ষণে প্রশান্তর ঝলসান দলা পাকানো দেহটা দেখে তাকে আর চেনার কোন উপায়ই নেই। ওয়ারলেসে কাশীপুর থানায় খবর পৌঁছনর সাথে সাথে আরও ফোর্স গেল সেখানে। শুরু হল ব্যাপক তল্লাশি। সি.পি.আই (এম) না নকশাল, কাদের বোমার আঘাতে প্রশান্ত মারা গিয়েছে তা তো জানা নেই। দুপক্ষের এলাকাতেই কাশীপুরের পুলিশ আসামী ধরতে নেমে পড়ল। সি.পি.আই (এম) ক্যাডাররাও তখন এলাকা ছেড়ে বেপাত্তা। কারোকে ধরা গেল না।

নকশালদের আসল পরিকল্পনা ছিল, যখন সি.পি.আই (এম)-কে নিজেরা তাড়াতে পারছি না তখন পুলিশ দিয়ে তাড়াও। তারা জানত, দুপক্ষের বোমা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে পুলিশকে খুন করতে পারলে পুলিশ দুপক্ষকেই ধরার চেষ্টা করবে। তখন সি.পি.আই (এম) ক্যাডাররাও বাধ্য হবে এলাকা ছেড়ে পালাতে। প্রশান্ত মারা যেতে নকশালদের এই এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা সফল হল।

এসবই অবশ্য আমরা পরে জেনেছি। তখন জানলে সি.পি.আই (এম) কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান নাও চালাতে পারতাম। তাহলে নকশালদের হয়ত সি.পি.আই (এম)-এর সঙ্গে লড়াই করে এলাকায় টিঁকে থাকতে হত। যারা মুখে এবং আলোচনা ও ঘোষণাপত্রে গ্রাম মুক্ত করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার পরিকল্পনা করেছিল, তারা কার্যক্ষেত্রে কিন্তু শুধু শহরেই বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটিয়ে নিজেদের বিপ্লবীয়ানা জাহির করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

তবে শহর থেকে নকশালরা কোন না কোন সময় অনেকেই গ্রামে গিয়েছিল কৃষকদের সংগঠিত করে বিপ্লব করার ইচ্ছায়। কিন্তু কজন তাদের মধ্যে টিকে থাকতে পেরেছিল? কজন কৃষকদের চরম দরিদ্র জীবনের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিল! উল্টে গ্রামের কিছু জোতদার, ধনী চাষী, নিরীহ লোককে খুন করে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল মানুষের থেকে। পালিয়ে আসতে হয়েছিল তাদের শহরে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার নকশালরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শহরের আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারেনি। আর নকশাল নেতারা ওইসব তরুণ-তরুণীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই শহরের গণ্ডির মধ্যে যে যার ইচ্ছেমত কাজ "শ্রেণীশত্রু" খতম ও অন্যান্য কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

ওদিকে গোখনা পুতুলকে বিয়ে করে তার পুরনো ওয়াগন ব্রেকার বন্ধু তপন চন্দ, কালা, অমল মুখার্জির কাছে নিয়ে গেল। একসময় অমল সি.পি.আই করত, তার বাড়ি বঙ্গলক্ষ্মী নপাড়ায়। গোখনা আর পুতুল অমলের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল।

ইতিমধ্যে এক রাতে নীলু সেনগুপ্ত, মুকুল ও আরও দুজন নকশাল ইজ্জত কলোনির কাছে মিলিটারি কনভয়ের ওপর গ্রেনেড চার্জ করল। কনভয়ের কিছু হল না। গ্রেনেডগুলো বেশিরভাগই ফাটেনি। কেন ফাটেনি দেখার জন্য একটা গ্রেনেড মুকুল রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনতে গেল। তুলতেই সেটা বিকট শব্দে ফেটে মুকুলের ডান হাত উড়িয়ে দিল, পায়েও আঘাত লাগল। প্রাণে বেঁচে গেলেও মুকুলকে তারপর থেকে খুঁড়িয়ে চলতে হত।

একদিকে মিলিটারি আর পুলিশের ওপর ঘনঘন আক্রমণ, সি.পি.আই (এম)-এর সঙ্গে প্রতিদিন সংঘর্ষ নকশালদের, অন্যদিকে পুলিশের তাড়ায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মানুষজন বাড়িঘর ছেড়ে, এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করল। সিঁথির নকশালরাও বেশিরভাগ বেদিয়া পাড়ার দিকে গিয়ে আশ্রয় নিল। বেদিয়া পাড়ার দিকে যাওয়ার আগে নকশালরা একদিন ভর দুপুরে সি.পি.আই (এম) মহিলা সংগঠনের কর্মী বীথি দেকে খুন

করল। বীথি ছিলেন ডিভোর্সি, আটাপাড়ায় ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। সেদিন সকালে বেরিয়েছিলেন কিছু কেনাকাটার জন্য। বাড়ি ফেরার সময় ৩০এ বাস থেকে নয়া রাস্তার মোড়ে নামতেই বাপী, বিপাশা, অমিত, চিটকে ওঁকে ঘিরে ধরে। তারপর টানতে টানতে আটাপাড়ার কাছে রেললাইনের ধারে নিয়ে এসে চিত করে ফেলে দিয়ে ভোজালি আর ছুরি দিয়ে বীথির বুকে, পেটে অনবরত কোপ্প দেয়। বীথির চিৎকারে কোনও মানুষ সেদিন সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। ওর লাল ব্লাউজের সাথে রক্ত মাখামাখি হয়ে রেললাইনের পাথর, মাটি সব লালে লাল হয়ে ভিজে যেতে লাগল। দশ মিনিট ধরে বাপীরা ওঁকে কোপাল, তারপর প্রাণহীন দেহটা ফেলে পাশের একটা পুকুরে গিয়ে ভোজালি আর ছুরি ধুয়ে চলে গেল। "বিরাট বিপ্লব হয়েছে", এই আনন্দে নাচতে নাচতে।

বাপীর মস্তিষ্কের ডানদিকে একটা রোগ ছিল। মাঝেমাঝেই সে হিংস্র 'অপ্রকৃতস্থ হয়ে যেত। এমনিতেই খুনের নেশায় বাপী, শঙ্কু ও চিটকে সবসময় পাগল হযে থাকত। সারাদিনের মধ্যে কারোকে খুন করতে না পারলে রাতের দিকে রাস্তার কুকুর হলেও মেরে হাতের সুখ করত। চারুবাবু শিখিয়েছিলেন, "শত্রুর রক্তে হাত না রাঙালে বিপ্লবী হওয়া যায় না।" চাকবাবুর এই কথা নকশালরা জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছিল। রাস্তার কাগজ কুড়ানিওয়ালা, ভুজিয়াওয়ালা, ফেরিওয়ালা, যাকে খুশি তাকেই পুলিশের নজরদার কিংবা গুপ্তচর বানিয়ে খুন করে বিজয় উল্লাসে ঘুরে বেড়াত। "শ্রেণীশত্রুর রক্তে" হাত রাঙিয়ে বিপ্লব করত। যে নকশাল সেদিন কোন খুন করতে পারেনি, তাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত অন্যরা, যেন খুন করতে পারেনি বলেই দেশের মুক্তি পিছিয়ে গেল। প্রতিদিন রক্ত হাতে না মাখলে সে আবার কিসের বিপ্লবী? কিসের চারুবাবুর সুযোগ্য শিষ্য? তারা ভাবত, খুন করতে না পারার পেছনে রয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা, চারুবাবুর আদর্শে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ না করার পলায়নী মনবৃত্তি। তাই ওদের চোখে এরা ছিল দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর বিপ্লবী, কিছুটা অপাংক্তেয়।

নকশালরা একাত্তর সালের প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের বুকে এমন একটা আঘাত হানল, যাতে সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত, নির্বাক হয়ে গেল।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধহয় কিছু অভিজ্ঞতা হয় যার স্মৃতি সারা জীবন সে বয়ে বেড়ায়। হেমন্ত বসু খুন হওয়ার সময় যে আর্তনাদ করেছিলেন, সেই অসহায় জিজ্ঞাসা যেন আজও আমার পিছু ধাওয়া করে। "আমায় তোমরা মারছ কেন? আমি তোমাদের কি ক্ষতি করেছি? আমায় তোমরা মেরো না, মেরো না।" খুন হওয়ার মুহূর্তে হেমন্তবাবু খুনীদের প্রতি এই আবেদনটা আমার বুকে সব সময় বাজে।

একাত্তর সালের বিশে ফেব্রুয়ারি, সকাল এগারটা হবে। বিধান সরণি ও শ্যামপুকুর স্ট্রিটের মোড়ে হেমন্তবাবুকে নকশালরা খুন করল। তখন তিনি তাদের কাছে চীৎকার করে বারবার ওই কথাগুলি বলেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে পরে আমরা শুনেছি। আর তখন থেকেই আমার মনের ভিতর গেঁথে আছে হেমন্তবাবুর মৃত্যু মানুষ হিসেবে আমাকে যে এতটা নাড়া দিয়ে গিয়েছিল, তার অবশ্য একটা কারণ আছে। ছোটবেলা থেকে আমি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভক্ত। সেই নেতাজীর তৈরি করা পার্টির চেয়ারম্যান হেমন্ত বসুকেও আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করতাম। সেই অকৃতদার, উদার, জনগণের প্রকৃত বন্ধুকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। তাই তাঁর অন্তিম কথাগুলো আমাকে আজও তাড়া করে বেড়ায়। যে সত্যিকারের দেশপ্রেমী সারাজীবন জনগণের সেবায় ব্রতী ছিলেন, তিনি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা দুদিনের তথাকথিত বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিলেন। এটা কোনদিনও মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। আমার মনে হয়, দেশের কোনও সুস্থমস্তিষ্ক, সৎ চিন্তাধারার নাগরিকই হেমন্ত বসু হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারেননি। আজও দেখি পশ্চিমবঙ্গে কোন রাজনৈতিক দল তাঁর খুনের ঘটনা বর্ণনা করে, জনগণের সেন্টিমেন্টে নাড়া দিয়ে নিজেদের ভোটের বাক্স ভর্তি করতে চায়। ওঁর মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষের হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা আর কতদিন চলবে জানি না। এটা দিয়ে অবশ্য প্রমাণিত হয় যে তিনি বর্তমান বেশিরভাগ নেতাদের মত অসৎ ছিলেন না। যারা শহীদ দিবস পালন করে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্য।

ব্যক্তিহত্যার ডাকের পাশাপাশি একাত্তরে সাধারণ নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছিল নকশালরা। ততদিনে খতমের লাইনে হেঁটে তারা চূড়ান্ত সন্ত্রাস কায়েম করতে পেরেছে এ রাজ্যে। তখন মানুষের মনে আতঙ্ক ছাড়া আর কোনও বোধ কাজ করত না, মানুষের বেঁচে থাকার যন্ত্রণা মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। খতমের লাইনের সঙ্গে এবার ভোট বয়কটের লাইন মিশে যেতে সাধারণ নাগরিক বুঝে গেল, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও নকশালরা কেড়ে নিল। অন্যদিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো নকশালদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। সাধারণ মানুষকে অভয় দেওয়ার কোনও চেষ্টাই তারা করেনি। বরং তারা নিজেদের ঘর গোছাতেই ব্যস্ত ছিল। টালমাটাল পরিস্থিতিতে শহরে মধ্যবিত্তের একাংশ নকশালদের সমর্থক হয়ে পড়েছিল। যেসব অঞ্চলে বামপন্থী আন্দোলনের তেমন কোনও ধারাবাহিকতা বা ঐতিহ্য ছিল না, সেসব অঞ্চলেও নকশালরা ঘাঁটি গাড়তে পেরেছিল। উত্তর কলকাতায় নকশালদের দৌরাত্ম্য তাই এত বেড়েছিল। শ্যামপুকুর অঞ্চলকে নকশালরা তাদের দুর্গে পরিণত করেছিল।

হেমন্তবাবু খুন হওয়ার অনেক আগেই লালবাজার হেড কোয়ার্টার থেকে তাঁকে দেহরক্ষী নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। নকশালদের ভোট বয়কটের স্লোগান ও প্রার্থীদের খুন করার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ওঁর নিরাপত্তা জোরদার করা দরকার বলে মনে করছিল পুলিশ। তাছাড়া, কিছুদিন আগে নকশালরা ওই শ্যামপুকুর মোড়েই খুন করেছিল সার্জেন্ট মনোরঞ্জনকে। সকালবেলায় মনোরঞ্জন বাজার করতে যাচ্ছিল, নকশালরা ওকে ঘিরে ধরল। তারপর গুলি করে ও ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন। আমরা তারপর থেকে শ্যামপুকুর এলাকাটাকে উপদ্রুত এলাকা বলে চিহ্নিত করেছিলাম। তাই হেমন্তবাবুকে সাবধান হতে বলা হয়েছিল, তাঁকে দেহরক্ষী দিতে চেয়েছিল পুলিশ থেকে। কিন্তু তিনি হেসে প্রত্যাখ্যান

করেছিলেন, বলেছিলেন, “আরে আমাকে ওরা মারবে কেন? আমি তো ওদের কোনও ক্ষতি করিনি।” হেমন্তবাবু হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন, অজাতশত্রুরও শত্রু আছে। পশুর কাছে খাদ্যটাই আসল, কিসের খাদ্য, কার খাদ্য এসব বিশ্লেষণ তাদের কাছে নিরর্থক।

হেমন্তবাবু যেদিন খুন হলেন, সেদিন সকালে তিনি বিধান সরণির ওপর সুভাষ কর্নারে নির্বাচনী মিটিং সেরে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ লেনের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী মোহন বিশ্বাস। একে অনাথ শিশু হিসেবে কুড়িয়ে পেয়ে হেমন্তবাবু নিজে হাতে বড় করে তুলেছিলেন। সঙ্গে আরও ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির সদস্য রবি চৌধুরী। হেমন্তবাবু একাত্তর সালের নির্বাচনে শ্যামপুকুর কেন্দ্র থেকে সংযুক্ত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। উনি বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম করে আবার বেরিয়ে পড়েছিলেন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য। সঙ্গে ছিলেন সেই মোহন বিশ্বাস, রবি চৌধুরী, জয়দেব ও সাঁওতালি যুবক ডমরু। তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে শ্যামপুকুর বিধান সরণির মোড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ট্যাক্সি ধরে মিটিংয়ে যাবেন। কিন্তু যেখানটায় তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে কোনও ট্যাক্সি পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে মিটিংয়ের দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি রবি চৌধুরীকে নির্দেশ দিলেন বিধান সরণির দিক থেকে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ধরে আনার জন্য। রবির ট্যাক্সি আনতে দেরি হচ্ছে দেখে হেমন্তবাবু শ্যামপুকুর মোড়ের দিকে সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। শ্যামপুকুর মোড়ের থেকে দশ বারো মিটার দূরে মিত্র বাড়ির গেটের কাছে এসে পৌঁছলেন ওঁরা। এমন সময় রবি একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির। ট্যাক্সিটাকে ঘুরিয়ে রবি হেমন্তবাবুকে ট্যাক্সিতে তুলতে গেল। এমন সময় “আরে এ ব্যাটাও ইলেক্‌শনে দাঁড়িয়েছে আমাদের কথা না শুনে, শালা ইলেকশানে দাঁড়িয়েছে, মার, মার শালাকে” বলে চিৎকার করতে করতে হেমন্তবাবুর দিকে তেড়ে এল তরোয়াল, রিভলবার, ভোজালি হাতে ছ’সাতজন ছেলে। লম্বা মত একটা ছেলে তেড়ে এসে হেমন্তবাবুর ঘাড়ের ওপর তরোয়াল চালিয়ে দিল। হেমন্তবাবু চিৎকার করে উঠলেন, “আমাকে তোমরা মারছ কেন? আমি তোমাদের কি করেছি?” এই আর্তনাদের মধ্যে তাঁর বুকে এসে লাগে গুলি, ঘাড়ে ফের এসে পড়ে তরোয়ালের কোপ।

তখন হেমন্তবাবুর আকুতি শুনবে কে? তখন ওরা চারুবাবুর “শ্রেণীশত্রু খতমের” আদা-জল খাওয়া উন্মাদ। ছিয়াত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ হেমন্তবাবুর রক্তে নিজেদের হাত রাঙিয়ে নিল ওরা। বিপ্লবী হওয়ার এতবড় সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? এদিকে হরির লুটের মত বোমা পড়তে লাগল। ভয়ে আতঙ্কে হেমন্তবাবুর সঙ্গীরা পালাল। ট্যাক্সি ড্রাইভারও হাওয়া। রক্তাপ্লুত হেমন্তবাবু পড়ে আছেন। চারদিকে দোকানপাট ঝটপট বন্ধ হয়ে গেল। সকাল এগারটাতেও রাস্তা জনমানবহীন। খুনীরা নিশ্চিন্তে পালাল। হেমন্তবাবুর নিথর দেহ তখনও একইভাবে পড়ে আছে রাস্তায়, যেন তখনকার পশ্চিমবঙ্গের প্রতীক ছবি হয়ে।,

খবর এল লালবাজারে। আমরা বাকরুদ্ধ। বিরাট বাহিনী নিয়ে হাজির হলাম ঘটনাস্থলে। শুরু হল আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ। জানতে পারলাম, খুনীরা সংখ্যায় ছিল ছসাতজন, তারা হেমন্তবাবু ওখানে আসার প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে থেকে অপেক্ষা করছিল। হেমন্তবাবু ট্যাক্সিতে উঠবার সময় তাঁর ওপর ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে খুন করে পালায়। আমরা হেমন্তবাবুর সঙ্গীদের খোঁজ করলাম, তাঁদের কথাও আমাদের পাওয়া প্রাথমিক তথ্যের সঙ্গে মিলে গেল।

তখন রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাজ্য শাসনের দায়িত্বে ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তিনি নির্বাচনের মুখে রাজনৈতিক খেলা শুরু করলেন। তিনি দেখলেন সারা ভারতবর্ষের মানুষ হেমন্তবাবুর খুনের খবরে স্তম্ভিত, মর্মাহত এবং খুনীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে উদগ্রীব, পত্রপত্রিকাগুলো নিন্দায় সোচ্চার। তখন তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সি.পি.আই (এম)-এর ওপর হেমন্তবাবুর খুনের দায় চাপাতে উঠে পড়ে লাগলেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তকে

নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি হেমন্তবাবুর খুনীদের ধরে চার্জশিট দিতে। সিদ্ধার্থবাবুর কথা মানতে গিয়ে তদন্তের ক্ষতি হল, তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তড়িঘড়ি আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চ গ্রেপ্তার করল বাগবাজার এলাকা থেকে কয়েকজনকে। তারা আদৌ খুনের ঘটনায় জড়িত ছিল না। এদের হেমন্তবাবুর খুনের আসামী সাজিয়ে কোর্টে চালান করা হল।

এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল গোয়েন্দা দফতারের বম্ব স্কোয়াডের ইন্সপেক্টর রঞ্জিত আদিত্য চৌধুরীকে। এতে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ খুনের তদন্ত ও মামলা চালান কিংবা নকশাল আন্দোলনের মোকাবিলা সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। অথচ মার্ডার সেকশনের কোন অভিজ্ঞ অফিসারকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল না। হেমন্তবাবুর মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির খুনের তদন্ত ও মামলার ভার এমন একজন অফিসারের ওপর ছাড়া হল, যিনি ঐ ব্যাপারে পারদর্শী নন। এই ছেলেখেলাটা তখন কি না করলেই চলত না? ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হেমন্তবাবুর খুনটাকেই বাছতে হল। যে মানুষটা সারা জীবন রাজনীতি করেও নোংরামির ঊর্ধ্বে ছিলেন, তাঁকেই মৃত্যুর পর চোরাবালিতে বলি হতে হল। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পরিহাস !

চার্জশিট দেওয়ার সময় দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হল, কোনও প্রমাণ না থাকায়। কয়েকজনের নাম আত্মগোপনকারী হিসেবে দেখান হল। শেষ পর্যন্ত বন্দী একজনকে নিয়ে মামলা শুরু হল। জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার এই প্রচেষ্টা খানিকটা সফল হলেও, আমরা কেউ কেউ বিভিন্ন সোর্স থেকে, বিশেষ করে প্রতক্ষ্যদর্শী মোহন বিশ্বাস, রবি চৌধুরীর কাছ থেকে গোপনে খবর পেলাম, যাদের ধরা হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে, তারা কেউই আসল খুনী নয়। এরা সবাই আগে কট্টর সি.পি.আই (এম) সদস্য ছিল, পরে নকশালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারা খুন করেনি। ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির ভেতরেও এ নিয়ে যথেষ্ট 'আলোচনা হতে লাগল।

কিন্তু আমরা নিরুপায়। দায়িত্ব যাদের হাতে, তারা যদি তেতো ওষুধ চুপচাপ হজম করতে বাধ্য হয়, অন্যদের কিই বা করার থাকতে পারে? আমরা তো আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি, আসল খুনীরা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ধরবার জন্য কোনও উদ্যোগ নেই আর যারা নির্দোষ তারা খুনের মামলায় ফেঁসে অযথা জেলে পচছে। প্রায় দুবছরের মাথায়, ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ভক্তিভূষণ মণ্ডল হাইকোর্টে রিট আবেদন করলেন, হেমন্ত বসু খুনের নতুন করে তদন্ত করা হোক, প্রয়োজনে সি. বি. আইকে ওই তদন্তের ভার দেওয়া উচিত। কারণ হিসেবে বলা হল, সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনে করছে ওই খুনের তদন্ত ঠিকভাবে হয়নি, আসল খুনীরা ধরা পড়েনি। আমি একদিন তখনকার কমিশনার সাহেব সুনীল চৌধুরীকে বললাম, "স্যার, আমাদেরও একটা সুযোগ দিন, নতুন করে হেমন্ত বসু খুনের তদন্ত শুরু করি।" তিনি রাজি হলেন, তাঁর কথামত আমরাও হাইকোর্টে আবেদন করলাম। নতুন করে তদন্ত শুরু করবার জন্য। মাননীয় হাইকোর্ট সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে নতুন করে তদন্তের আদেশ দিলেন এবং তার ভার দিলেন কলকাতা পুলিশকেই।

আমরা নতুন করে তদন্তে নামলাম। কিন্তু ঘটনা ঘটার পর পরই তদন্ত শুরু করা একরকম, আর ঘটনা ঘটার দুবছর পর অন্যরকম। প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি, ঘটনার সময়কার পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা, সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছাড়াও অনেক ছোটখাট তথ্য কালের দীর্ঘসূত্রতায় বেশীরভাগ সময়ই মিলিয়ে যায়। দুবছরের মধ্যে অনেক খুন, অনেক অপরাধ এ শহরের বুকের ওপর হয়ে গেছে। অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবঙ্গ আমাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। বিভীষিকার কালো রাত অক্লান্ত যুদ্ধ শেষেও পার করতে পারছি না। তার ওপর নতুন করে এই জটিল খুনের তদন্ত। তবু হেমন্তবাবুর মত শ্রদ্ধেয় নেতার আসল খুনীরা ধরা পড়ুক, শাস্তি পাক, সমগ্র ভারতবাসীর মত আমরাও চেয়েছিলাম। না পারলে, সেই ব্যর্থতার দায় পুলিশের এবং তা শুধু লজ্জা আর লজ্জা !

নতুন করে তদন্তের আদেশ পেলেও কি করে, কোনখান থেকে শুরু করা যায় ভাবতে সময় লাগছিল। একদিন জানতে পারলাম, আলিপুর স্পেশাল জেল থেকে জামিনে ছাড়া পাচ্ছে প্রমথ নামে এক তরুণ নকশাল। জেলের ভেতরের খবরাখবর জানার জন্য তাকে আবার আমি জেল গেট থেকে গ্রেফতার করলাম। তখন আলিপুর স্পেশাল জেলটা অল্পবয়সী কিংবা ছোটখাট মামলায় ধৃত ও মিসায় আটক নকশালদের রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। প্রেসিডেন্সি, আলিপুর সেন্ট্রাল, দমদম জেলে রাখা হত গুরুতর মামলার আসামীদের ও বড়মাপের নেতাদের। প্রমথকে স্পেশাল জেলের গেটে যখন গ্রেফতার করলাম, সে কেঁদে উঠে বলল, "আমায় ছেড়ে দিন রুণুদা, আমায় ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিলে আমি আপনাকে একটা খুব বড় খবর দেব।' আমি বললাম, "তোমার বড় খবরটা শুনি, তারপর ছাড়ব না রাখব সেটা ভেবে দেখব।" প্রমথকে গাড়িতে তুলে লালবাজারের দিকে ছুটলাম। দেখা যাক সে কি বড় খবর দেয়। জেল পালানর পরিকল্পনা করছে না কি কেউ? না কি আবারও কোনও খুনের চেষ্টা?

প্রমথকে নিয়ে লালবাজারে আমাদের দফতরের একটা ঘরে বসলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "এবার বল, তোমার বড় খবরটা কি?" প্রমথর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম, "দাদা, হেমন্ত বসু মার্ডার কেসে যাদের ধরা হয়েছে তারা কেউ আসল খুনী নয়।" যে সূত্র খুঁজছি তা যেন অযাচিতভাবে ধরা দিচ্ছে। নিজের ভেতরের উত্তেজনা চেপে ওকে বললাম, "সে তো আমরাও জানি, এ আর নতুন খবর কি? তুমি বল, কে কে আসল খুনী।" প্রমথ বলল, "আমি জানি না, সব জানে মিলন।" জানতে চাইলাম, "কোন মিলন?" প্রমথ বলল, "বাগবাজারের, এখন মিসায় স্পেশাল জেলে আছে।" প্রমথর কথায় আমার মনে পড়ল মিলনকে। সে বাগবাজার অঞ্চলের নকশালদের তাত্ত্বিক নেতা ছিল। আমি প্রমথকে জেরা করলাম, "মিলন যে জানে, তুমি জানলে কি করে?" প্রমথ বলল, জেলে সে মিলনের সাথে থাকত। একদিন কথায় কথায় মিলন তাকে বলেছে, "যাদের বিরুদ্ধে হেমন্ত বসুর খুনের মামলা চলছে, তারা কেউ আসল খুনী নয়। আসলদের আমি চিনি।" প্রমথ ফের কাকুতি মিনতি করতে লাগল, "এর বেশি আমি আর কিছু জানি না। এবার আমায় ছেড়ে দিন।" আমি ওকে বললাম, "তোমার খবরটা ভাল, তবে যতক্ষণ না সত্যি কিনা তা যাচাই করতে পারছি ততক্ষণ তোমাকে লালবাজারে থাকতে হবে। সত্যি হলে তক্ষুণি ছেড়ে দেব।" প্রমথকে লালবাজারেই রেখে দিলাম।

প্রমথর খবর শুনে ঠিক করলাম, মিলনকে স্পেশাল জেল থেকে নিয়ে এসে জেরা করব। ওকে একটা মামলায় জড়িয়ে পরদিন কোর্টের নির্দেশ নিয়ে জেল থেকে সোজা লালবাজারে নিয়ে এলাম। ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, "হেমন্তবাবুকে কে খুন করেছে বল, কে কে ছিল?" হঠাৎ ওরকম একটা প্রশ্ন শুনে মিলন প্রথমে থতমত খেয়ে গেল, তারপর পাকা অভিনেতার মত ধাক্কা সামলিয়ে বলল, "এ ব্যাপারে আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি কিছু জানি না।" ওর কথা শুনে মনে মনে বললাম, "কিছু জানো না তাতো হয় না বাবা, তুমি জান, সেই জানাটাই আমার জানতে হবে। হেমন্তবাবুর খুনের রহস্যের কপাট খুলতেই হবে। আসল খুনীদের ধরে শাস্তি দিতে হবে।' আমার প্রশ্নের মুখে পড়ে মিলনের থতমত খাওয়াটা আমি দেখে নিয়েছি, আর মিলন যে খুনের ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানে সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। তাই ওর কথায় কোনও গুরুত্ব না দিয়ে একটু কড়া গলায় বললাম, "দেখ বাপু, আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। তাড়াতাড়ি বলে ফেলো, তোমাকে তো মুখ দেখতে নিয়ে আসিনি।" এবারও মিলন বলল, "বিশ্বাস করুন আমি জানি না।" আমি এবার প্রমথকে মিলনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, "এবার বল, তুই জানিস না কি জানিস না?" মিলন ওখানে প্রমথকে দেখবে ভাবতেই পারেনি। বুঝল আর অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এবার খুব আস্তে বলল, "জানি।" ওর "জানি" কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতর থেকে যেন নিঃশব্দে একটা ভার নেমে গেল, এতদিন পর হয়ত আমরা হেমন্তবাবুর খুনের আসল রহস্য জানতে পারব। আমি প্রমথকে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম।

মিলনের সামনে বসে বললাম, “বল এবার সব ঘটনা, কিছু লুকোবি না। লুকোলেই কিন্তু আমি বুঝে ফেলব।”

মিলন জানাল, হেমন্ত বসুকে খুন করার কোনও পরিকল্পনা নকশালদের ছিলই না। এমন কি তাঁকে খুন করবে বলে ঘটনাস্থলে খুনীরা যায়ওনি। খুন করার পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেসের প্রার্থী গোলকপতি রায়কে। সেই ষড়যন্ত্রের জন্য যে মিটিং হয়েছিল সেখানে মিলনও হাজির ছিল। গোলকপতি রায় বিশে ফেব্রুয়ারি সকালে শ্যামপুকুর মোড়ে নির্বাচনী সভা করতে আসবেন, এই খবরটা তারা কংগ্রেসের ভেতর থেকেই পেয়েছিল। সেই খবরের ভিত্তিতেই ওরা ওকে খুন করার ছক কষেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে গোলকপতি রায় ওই সভা বাতিল করে দিয়েছিলেন, তিনি আসেনইনি। জনসভা যে বাতিল হয়েছে, এই খবরটা নকশালরা পায়নি। তাই আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের একটা দল গোলকপতি রায়কে খুন করার জন্য অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করতে করতে ওরা অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। শিকারীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে হঠাৎ চলে এলেন হেমন্তবাবু। গোলকপতি রায়ের বদলে আর এক নির্বাচন প্রার্থীকে পেয়ে গিয়ে তারা আর কোনও কিছু চিন্তা না করেই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর হেমন্তবাবুকে খুন করে বোমা ফাটাতে ফাটাতে পালিয়ে গেল। মিলন জানাল, গোলকপতি রায়কে খুন করার চক্রান্তের মিটিংয়ে সে উপস্থিত থাকলেও ঘটনার দিন দলের সাথে ছিল না। কারা কারা ছিল তাদের নাম বলল, কিন্তু তারা সবাই এখন কে কোথায় তা সে কিছুই জানে না। তাদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ নেই, আর যেহেতু সে মিসায় আটক হয়ে জেলে আছে, তাই যোগাযোগ হওয়ার সুযোগও নেই।

আসল খুনীদের নাম তো পেলাম। কিন্তু কোথায় তারা? তাদের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সবচেয়ে অসুবিধে হল, এদের কারোকে আমরা চিনি না। তাদের কোনও ফটোও নেই আমাদের কাছে। মিলনের দেওয়া খবর অনুযায়ী আমাদের সোর্সদের তৎপর হয়ে খুঁজতে বললাম। কিন্তু কোনও সোর্সই কোনও আলো দেখাতে পারল না। এর মধ্যেই একদিন খোঁজ পেলাম, প্রধান আসামীদের একজন শ্যামপুকুর এলাকারই বাসিন্দা। তাকে ঘটনার পর থেকেই আর এলাকায় দেখা যায়নি, এমন কি তার পরিবারের লোকজনও ঘটনার পরদিন থেকে উধাও। নিজেদের বাড়ি ফেলে তারা কোথায় চলে গেছে আশেপাশের কেউ জানে না। খুঁজতে খুঁজতে সেই আসামীর বাবার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে পেলাম, বয়স তেষট্টি চৌষট্টি হবে, তিনিও ওই এলাকারই বাসিন্দা। একদিন তাঁকে ধরে বন্ধুর খোঁজ করাতে তিনি জানালেন, কোন হদিসই তাঁর কাছে নেই। তবে তিনি বললেন, তাঁর বন্ধু নরেন্দ্রপুর অঞ্চলের এক আশ্রমের মহারাজের শিষ্য। সেখানে আগে খুবই যাতায়াত করত, তবে বর্তমানে সেখানে যায় কিনা তা তিনি বলতে পারলেন না।

তদন্ত ব্যাপারটা অনেকটা পাহাড়ে চড়ার মত। একটু অসতর্ক হলেই পা পিছলে পতন। এখানে আশ্রমের খোঁজ পেয়ে মনে হল একটু উঠলাম, কিন্তু কতটুকু? চুড়োয় পৌঁছলে বোঝা যাবে। না হলে শুধুই ধোঁয়াশা। আশ্রমের খোঁজ পেলেও কি করে জানা যাবে আসামীর বাবা ওখানে কোন কোন দিন তাঁর গুরুদর্শনে আসেন? তিনি দেখতেই বা কেমন? অনুমানের ওপর ঝপ করে কারোকে ধরা যাবে না। তিনি একবার যদি জানতে পারেন আমরা তাঁর খোঁজ করছি, তবে সাবধান হয়ে যাবেন, আশ্রমে আসাও বন্ধ করে দেবেন। অতিরিক্ত সতর্ক বলেই না তিনি কোনও ঝুঁকি না নিয়ে শ্যামপুকুরের বাড়িঘর ফেলে পুরো পরিবার নিয়ে পালিয়ে গেছেন। একদিন নরেন্দ্রপুরে গিয়ে বাইরে থেকে আশ্রমটা দেখে এলাম। প্রাচীর ঘেরা বেশ বড় বাগানের ভেতর আশ্রম। সামনে গেট।

আশ্রম দেখে আসার পর লালবাজারে একদিন হঠাৎ সেই বাচ্চা ছেলেটি এল। ছেলেটি প্রায়ই আমার কাছে আসে। ডন বস্কোর ক্লাস টেনের ছাত্র। দমদমে থাকে, বাড়ির অবস্থা ভাল। এই বয়সেই তার মাথায় ভূত চেপেছে সে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হবে। এ ব্যাপারে আমার সাহায্য চায়। আমি তাকে নিরাশ না করে রোজই বলি, “হবে, তুমি ডিটেকটিভই হবে, এখন মন দিয়ে পড়াশুনো কর, তারপর তুমি গোয়েন্দাগিরি করবে। বড় গোয়েন্দা হতে

গেলে প্রচুর জানতে হয়, পড়াশুনোটা এখন মন দিয়ে না করলে তুমি জানবে কি করে? বড় গোয়েন্দাই বা হবে কিভাবে?" ছেলেটি প্রতিদিনই আমার কথা শুনে মনমরা হয়ে চলে যায়, আবার কিন্তু কদিন বাদে আসে। জানি, এই বয়সের ছেলেদের মনে এমনিতেই অ্যাডভেঞ্চারের স্বর্ণালী স্বপ্ন বাসা বেঁধে থাকে, তার ওপর আছে অতিরিক্ত রহস্য উপন্যাস, ইংরেজি থ্রিলার, শার্লক হোমস, আগাথা ক্রিস্টির বই পড়া, সিনেমা দেখা। সেদিন ছেলেটি যখন আমার কাছে এল, আমি তাকে বসতে বললাম। ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকালাম। সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা"র তোপসের মতই স্মার্ট। ওকে বসতে বলেই আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এল। বললাম, "এই যে আগামীদিনের ফেলুদা, তোমায় যদি আমি একটা বড় দায়িত্ব দিই, তুমি কাজটা পারবে করতে?" সে ঝটপট উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই পারব, আপনি দিয়েই দেখুন না।" আমি ওর জবাব শুনে বেশ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার প্রশ্ন করলাম, "পারবে তো? বিরাট বড় কাজ।" ছেলেটি এবারও বলল, "পারব।" এবার আমি একটা ঝুঁকি নিয়ে নিলাম। ছেলেটিকে আমি নরেন্দ্রপুর আশ্রমের কথা বললাম, আমি ওখানে যাঁর খোঁজ করছি তাঁর নামও বললাম। সেই ভদ্রলোক যে সেখানে মাঝেমধ্যে গুরুদর্শনে আসেন তাও জানালাম। তারপর বললাম, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভদ্রলোক কবে কবে ওই আশ্রমে আসেন এবং কোথায় থাকেন, এইসব খবর আমার চাই।" ছেলেটি আমার কথা মন দিয়ে শুনে চলে গেল। ও চলে যাওয়ার পর ভাবতে লাগলাম, এতবড় একটা ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হল? ওইটুকু একটা পুঁচকে ছেলেকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়াটা উচিত হল? অতি উৎসাহে বেফাঁস কিছু কথা বেরিয়ে গেলে সব পণ্ড হবে। দুশ্চিন্তায় দুটো দিন পার হয়ে গেল। তিনদিনের মাথায় ছেলেটি আমার কাছে এল। ওর খুশিখুশি চোখমুখ দেখেই বুঝলাম, কিছু একটা খবর এনেছে

খবর শুনে আমারও খুব ভাল লাগল। ছেলেটি দারুণ করিৎকর্মা, এই দুদিনের মধ্যেই সে ওই আশ্রমের মহারাজের শিষ্য হয়ে গেছে। আশ্রমের মধ্যেই থাকতে শুরু করেছে। সবচেয়ে বড় কথা যাঁর খোঁজে পাঠিয়েছিলাম, তাঁর খোঁজ এনেছে। সেই ভদ্রলোক স্ত্রী ও এক মেয়েকে নিয়ে আশ্রমেরই একটা ঘরে থাকেন। তবে ওঁদের সঙ্গে কোনও ছেলে থাকে না। আমার ছোট ফেলুদা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছে, তাঁর ঘরে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে। আমি খুদে গোয়েন্দার কৃতিত্ব দেখে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, "বাঃ, খুব ভাল খবর এনেছ, তোমার হবে। ওদের সাথে লেগে থাক, দেখবে, আরও দরকারি খবর পাবে। খবর পেলেই তুমি আমায় দিয়ে যাবে।" ছেলেটি উৎসাহে টগবগ করতে করতে চলে গেল।

চারদিনের মাথায় সে আরও খবর আনল। তাকে নিয়ে সেই ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে কাছেই এক পোস্ট অফিসে গিয়েছিলেন মানি অর্ডার করতে।

মানি অর্ডারটা করা হয়েছে আসামের কোনও এক আশ্রমে, তবে ঠিকানাটা ছেলেটি দেখতে পায়নি। আমি ওকে বললাম, "হুঁশিয়ার, কিছু যেন বুঝতে না পারে, দেখবে ঠিক পেয়ে যাবে যা আমি চাই।" সে বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি খুব সাবধানে চলছি, খবর ঠিক পেয়ে যাব। ওরা বুঝতেই পারবে না।" দেখলাম, ছেলেটি রীতিমত আত্মবিশ্বাসী। সেদিনের মত সে ফিরে গেল আশ্রমে। তারপর থেকে শুরু হল আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা, একটা একটা করে দিন চলে যাচ্ছে, কোনও খবর পাচ্ছি না। চাতক পাখির মত বসে আছি খবরের আশায়, কখন আসে আমার ফেলুদা। কি নতুন খবর শোনায়? দিন কুড়ি পর গোয়েন্দা কিশোর এল। তাকে দেখেই আমি তাকে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার? কোনও খবরই পাচ্ছি না!" ছেলেটি আমার প্রশ্ন শুনে হেসে বলল, "আপনার কাজ বোধহয় হয়ে গেছে।" আমি জানতে চাইলাম, "কি রকম?" সে বলল, "ওই ভদ্রলোক আজ আর নিজে পোস্ট অফিসে না গিয়ে আমাকেই আড়াইশো টাকা দিলেন মানি অর্ডার করতে। আমি মানি অর্ডার করে সোজা চলে এসেছি আপনার কাছে।" তারপর একটা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই নিন ঠিকানাটা।"

ইউরেকা, ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল। কাগজটা বারবার দেখছি, এই তো আসামীর নাম, শুধু তার পদবির জায়গায় লেখা আছে "ব্রহ্মচারী"। আমার মনে কোনও সন্দেহই রইল না, যাকে খুঁজছি সেই ব্যক্তিই এই ব্রহ্মচারী বাবাজী। ঠিকানাটা আসামের করিমগঞ্জের এরই শাখা এক আশ্রমের। আগামীদিনের ফেলুদার দিকে তাকিয়ে রইলাম, কি ভাষায় আমি ওর কাজের প্রশংসা করব? শুধু বললাম, "তুমি অসম্ভব ভাল কাজ করেছ, একশতে একশ। ওখানে তোমার কাজ শেষ। তবু আর একবার আশ্রমে যাওয়া দরকার। মহারাজের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যাও। কেউ সন্দেহ না করতে পারে যে তুমি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ওখানে ছিলে। আর মানি অর্ডারের অরিজিনাল রিসিটটা ওই ভদ্রলোককে দিয়ে দেবে।" আমি রিসিটটা জেরক্স কপি করিয়ে নিলাম। আমার ছোট্ট ফেলুদা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ঠিকানা পাওয়ার পর আর দেরি নয়, করিমগঞ্জ যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করলাম। পরদিন আমি আর লাহিড়ী প্লেনে শিলচর গেলাম। ওখানে পৌঁছে আর এক বিপদ। দেখি, সেদিন শিলচর বন্ধ। কি করি? আমাদের তো করিমগঞ্জ যেতেই হবে। আমরা দুজন তখন কাছেই একটা থানায় গিয়ে ওখান থেকে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আর এস.পি.র সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। এস.পি. সাহেব আমাদের ওখানেই অপেক্ষা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পর ওঁরা এলেন। আমরা তাঁদের বললাম, এক গুরুত্বপূর্ণ খুনের আসামীকে ধরতে আমরা করিমগঞ্জ যেতে চাই। ওঁরা আমাদের কথা শুনে একটা জিপের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা করিমগঞ্জের দিকে রওনা দিলাম।

আশা নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে আমরা করিমগঞ্জের দিকে চলেছি, রাত দশটা নাগাদ পৌঁছলাম। পৌঁছেই করিমগঞ্জ থানায় গেলাম। থানায় তখন বড়বাবু ছিলেন না, তিনি বাড়িতে ছিলেন। খবর দিতে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই থানায় এলেন। বললাম, "আমরা দেরি করব না, আজ রাতেই সেই আশ্রমে যেতে চাই।" উনি আমাদের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সে কি, সে তো এখান থেকে অনেক দূর, একেবারে বাংলাদেশের সীমান্তে। এখন সেখানে যাওয়ার কোনও গাড়িও পাবেন না। হেঁটে যেতে হবে।" একটুও না দমে বললাম, "হেঁটেই যাব, আপনি আমাদের ফোর্স দিন।" একটু পরেই ফোর্স নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলাম। সঙ্গে করিমগঞ্জ থানার কজন সিপাই। বর্ষাকাল, আকাশে মেঘের আনাগোনা। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাঝেমধ্যে ফুটে উঠছে তারা। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি। দূরে দূরে দুচারটে বাড়ির জানালা থেকে উঁকি মারা আলোর রশ্মি জানান দিচ্ছে ওখানে মানুষ আছে। আমি আর লাহিড়ী আবোলতাবোল বকতে বকতে চলেছি। সামনে সামনে চলেছে ফোর্সের সেপাইরা। ওরাই আমাদের আশা-ভরসা। ওরা যে পথে নিয়ে যাচ্ছে সেপথেই চলেছি। তার ওপর ভাষার সমস্যা, কাজ চলার মত যা পারছি তাই বলছি।

রাত তখন প্রায় দুটো, বারো তেরো কিলোমিটার পথ ততক্ষণে হাঁটা হয়ে গিয়েছে। আমরা এসে পৌঁছলাম খরস্রোতা এক নদীর ধারে। চওড়া বেশি নয়, কিন্তু দুরন্ত ঢেউ। বর্ষার পাহাড়ী নদী কিশোরী মেয়ের মত অকারণ আনন্দে খলখলিয়ে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলেছে। আমরা তার পাড়ে দাঁড়িয়ে স্রোত দেখতে লাগলাম। মনে মনে বললাম, "হে সুন্দরী, ঘুঙুরের তালে তালে তোমার এই মেহফিল জমান নাচ দেখতে খুবই ভাল লাগছে। কিন্তু আমরা যে এসেছি সেই সুদূর কলকাতা থেকে বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার নাচ দেখলে তো চলবে না, আজ রাতেই ওপারে যেতে হবে।" সঙ্গের এক সিপাই আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, রাত আটটার মধ্যে খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। আমি অসহায়ভাবে জানতে চাইলাম, "তবে কি উপায়?" "দাঁড়ান, একটা উপায় বার করছি, আমি একটু আসছি," এই বলে সে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার ঢেউয়ের খেলা দেখতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর সেই সিপাই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে একটা লোক। দুজনের কাঁধে কটা কাটা

কলাগাছ। তারপর কিছু না বলে, সিপাই আর সেই লোকটি মিলে দ্রুত একটা ভেলা বানিয়ে ফেলল।

কলাগাছের ভেতর বাঁশের চাঁচরি ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে ভেলা তো বানাল, কিন্তু এই ভেলা নিয়ে আমরা পার হব কি করে ওই খরস্রোতা নদী? ওরা কিন্তু কোন কথা বলছে না। আমরা সাহস করে ওদের কিছু জিজ্ঞেসও করছি না। দেখলাম, ওরা দুজন একটা মোটা লম্বা দড়ি বার করে নদীর পাড়ে রাখল। ভেলাটা দুজনে মিলে ধরে জলে নামাল। লোকটি ভেলাতে চড়ে দড়ির একটা দিক কোমরে বেঁধে বাঁশ দিয়ে জল ঠেলতে ঠেলতে যেন ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরে নদীর ওপারে যেতে লাগল। লোকটার ওস্তাদি দেখে আমরা বোবা হয়ে গেলাম। সে ওপারে পৌঁছে গেল। ভেলাটা ঠেলে নদীর ধারে একটা পাথরের খাঁজে এমনভাবে রাখল যাতে ঢেউয়ের তোড়ে না ভেসে যায়। তারপর দড়ির প্রান্তটা একটা গাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে দিল। এদিকে সিপাই তার আগেই অন্য প্রান্তটা এপারে বেঁধে দিয়েছে। লোকটি দড়ি বেঁধে ভেলা নিয়ে চলে এল আমাদের কাছে। এবার আমরা তিনজন করে দড়ি ধরে ধরে ভেলায় দাঁড়িয়ে পার হতে লাগলাম, সেই লোকটিই ভেলা নিয়ে পারাপার করতে লাগল। ভেলায় পার হতে গিয়ে জলে আমাদের জুতো, ট্রাউজার্সের তলার দিকটা ভিজে গেল। সবাই পার হয়ে যেতে, আমি অসমের কোন এক অখ্যাত গ্রামের সেই অজানা বন্ধুটিকে একশ টাকা দিলাম। যদিও জানি, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যে কাজ সে করেছে, এই পারিশ্রমিক তার কাছে কিছুই নয়। সে গ্রাম্য সিলেটি ভাষায় কিছু বলল, তার হাসি দেখে বুঝলাম, সে আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

নদী পার হয়ে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর একজন সিপাইকে বললাম, “আমাদের এখানকার পোস্টমাস্টারের বাড়ি নিয়ে চল।” আমি ভাবলাম, আমরা তো আসামীকে চিনি না, কিন্তু পোস্টমাস্টার কিংবা তাঁর পিওন নিশ্চয়ই চেনেন, কারণ প্রতি মাসে মানি অর্ডার পৌঁছে দিতে হয় তার হাতে। মানি অর্ডারের টাকাটা সেই ব্রহ্মচারীকে পৌঁছে দেন। নদী পার হওয়ার পর আরও দু কিলোমিটার মত হাঁটলাম। পোস্টমাস্টারের বাড়ি এসে গেছে। দেখলাম, পোস্ট অফিসেরই একটা ঘরে পোস্টমাস্টারবাবু থাকেন! আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোর পোস্ট অফিসের যেমন চেহারা এটারও তাই।

রাত তখন তিনটে। একজন সিপাই সেই পোস্টমাস্টারের নাম ধরে ডাকতে লাগল। পোস্টমাস্টার এত রাতে কেউ ডাকছে শুনে বোধহয় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, একটু পর কোনক্রমে ঘরের দরজা ফাঁক করে পুলিশ আর অচেনা লোকজন দেখে ঘাবড়ে গেলেন। আমি তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, “কদিন আগে কলকাতা থেকে এই ব্রহ্মচারীর নামে যে মানি অর্ডার এসেছে, তা কি দিয়ে আসা হয়েছে?” আমার কথা শুনে পোস্টমাস্টার কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে উত্তর না দিয়েই তাড়াতাড়ি তাঁর অফিসঘর খুললেন। আমরাও তাঁর পেছন পেছন অফিসে ঢুকলাম। হ্যারিকেনের আলো, তার মধ্যে মানি অর্ডারের লেজার খুলে দেখা গেল, গত দুমাস ধরে ব্রহ্মচারীর নামে যে মানি অর্ডার এসেছে তার সব টাকাই পোস্টমাস্টার নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আমরা তার কাণ্ড দেখে হতবাক। এবার আমরা ওর দুষ্কর্মের সুযোগ নিলাম। ওকে বললাম, “কেন টাকা দেননি? এই রকম কতজনের টাকা নিজের কাছে রেখেছেন?” পোস্টমাস্টার চুপ। আবার আমি ধমক দিলাম, “সব টাকা বোধহয় সুদে খাটান?” আমাদের প্রশ্নের তোড়ে পোস্টমাস্টারের প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়। আসলে উনি ভেবেছেন, ওর বিরুদ্ধে কোন গোপন খবর পেয়ে আমরা তদন্ত করতে এসেছি। এবার ধরা গলায় বললেন, “স্যার, আমার চাকরিটা খাবেন না, আমি মরে যাব।” বললাম, “ঠিক আছে, ব্রহ্মচারীকে টাকা দেবেন চলুন।” পোস্টমাস্টার দ্বিরুক্তি না করে তাড়াতাড়ি মানি অর্ডারের ফর্ম আর টাকা নিয়ে অফিস বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে রওনা হলেন। আমাদের সুবিধেই হল, যাকে ডেকে উনি টাকা দেবেন তাকেই আমরা ধরব। ভোর চারটে বাজে, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে চলেছি, পাথরকুচি ছড়ান কাঁচা পাহাড়ী রাস্তায় ধুলো উড়ছে পায়ে পায়ে। আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটছে। দূরে দূরে পাহাড়, নিঝুম

চরাচর, বর্ষাভেজা প্রকৃতি। দেখছি কত নাম-না-জানা গাছগাছালি, শুনছি কতরকম পাখির ডাক। পোস্টমাস্টার বকবক করতে করতে চলেছেন। কতটুকুই বা মাইনে, তাতে সংসার চলে না। আমাদের অবশ্য সেদিকে মন নেই। তখন আমাদের একমাত্র চিন্তা আসামীকে ধরতে পারব তো?

অন্যদিকে চোখের সামনে কবিতার মত প্রকৃতি। প্রায় তিন চার কিলোমিটার হাঁটার পর ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম আশ্রমের কাছে। দেখলাম, সবুজ মাথা এক টিলার মাথায় বাগান ঘেরা আশ্রম। আমরা আস্তে আস্তে টিলার ওপর উঠতে লাগলাম। আশ্রমের দক্ষিণ দিকে টিলার নিচেই বাংলাদেশের সীমান্ত, শ্রীহট্ট জেলা। টিলার ওপর থেকে পরিষ্কার ওদিকের সব কিছুই দেখা যায়। আশ্রমটা আত্মগোপন কিংবা অবসর যাপনের আদর্শ জায়গা। আমরা বাড়িটার কাছে পৌঁছে গিয়েছি। কোনও লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি না। পোস্টমাস্টারবাবুকে এগিয়ে দিলাম। তিনি আশ্রমের সবই চেনেন, একদিকে গিয়ে ব্রহ্মচারীর নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িটার পেছন দিকে সিপাইরা আছে। ওখান দিয়ে পালানর রাস্তা আছে, তাই ওদের ওখানে রেখেছি। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পর ঘুম চোখে দরজা খুলতে খুলতে ব্রহ্মচারী বলল, “মাস্টারবাবু এত সকালে, টাকা এসেছে বুঝি?” পোস্টমাস্টার জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, মানি-অর্ডার দিতে এসেছি।” ব্রহ্মচারী দরজা খুলে বলল, “আরে এত তাড়া কিসের? বেলা হলেও আসতে পারতেন।”

ততক্ষণে দুধ সাদা কৌপিন পরা ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি এদিকে পড়েছে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমাদের দেখে আবার দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে। এবার আমি গলা চড়িয়ে বললাম, “ব্রহ্মচারীর খেলা শেষ কর পাণ্ডবেশ্বর মুখার্জি, পালানোর চেষ্টা কোরো না। কলকাতা থেকে তোমার ওই সাদা কৌপিনটা নিয়ে যেতে আসিনি। যে সাধুকে খুন করে এখানে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে বসে আছ, তাঁর আত্মার শান্তির জন্য তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।” কথা বলতে বলতেই ওকে আমরা ধরে নিয়েছি। পাণ্ডবেশ্বর শুধু একবার বলতে চেষ্টা করল, “আমি কারোকে খুন করিনি।” উত্তরে লাহিড়ী বলল, “অনেক খাটনি গেছে, তোর কীর্তন পরে শুনব।” ওকে টানতে টানতে আমরা নিয়ে চললাম। আমাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে আশ্রমের দু চারজন উঠে পড়েছে দেখলাম, তারা এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। এদিকে পোস্টমাস্টারের মুখটা তখন দেখার মত, একদম থ হয়ে গেছেন। হাঁটতে হাঁটতেই একটু ধাতস্থ হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, “স্যার, মানি-অর্ডারের টাকাটার কি হবে?” আমার হাসি পেল, বললাম, “টাকার আর দরকার হবে না, ওটা আপনি সুদে খাটান, জেল খেটে ও যদি ফিরে আসে তখন নয় ওর টাকা ওকে দিয়ে দেবেন, তবে সে সম্ভাবনা খুব কম।” ওর মুখে হাসি ফুটল।

সকাল হয়ে গেছে। পাণ্ডবেশ্বরকে মাঝখানে রেখে হাঁটতে হাঁটতে সেই নদীর পাড়ে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, খেয়া পারাপার শুরু হয়ে গেছে। এবার নদী পার হতে আর জীবনের ঝুঁকি নিতে হল না। খেয়ার মাঝখানে পাণ্ডবেশ্বরকে জাপটে ধরে বসে রইলাম, যাতে সে নদীতে ঝাঁপ না দিতে পারে। পার হয়ে আবার হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে সকাল এগারটা নাগাদ করিমগঞ্জ থানায় পৌঁছলাম। থানার গারদে ওকে রেখে চলে গেলাম অসম সরকারের এক অতিথিশালায়। থানাতেই আমাদের জেরার মুখে পাণ্ডবেশ্বর স্বীকার করেছে, হেমন্তবাবুকে তরোয়াল দিয়ে সেই মেরেছিল।

গেস্ট হাউসে রাঁধুনীকে মুরগির ঝোল আর ভাত রাঁধতে বলে আমরা দুজন স্নান করেই সোজা বিছানায়। মনে অদ্ভুত তৃপ্তি। হেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের আসল আসামীকে ধরতে পেরেছি। ক্লান্তিতে শরীরের যা অবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ঘুমের অতলে। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছি কি ঘুমইনি, মনে হল কে যেন আমায় ঠেলছে। চোখ না খুলেই বিরক্তিতে আমি তার হাতটা সরিয়ে দিলাম। তবু আবার সে ঠেলতে শুরু করল, আবার আমি হাতটা সরিয়ে দিলাম। এবার একটা গলা শুনলাম, “আরে আমি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, আসামীর জন্য রিমান্ড নেবেন না?” কথাগুলো আবছাভাবে গভীর ঘুমের মধ্যে কানে পৌঁছল বটে, কিন্তু মর্ম

বুঝলাম না। এবার শুনতে পেলাম, “আমি চলে গেলে আরও দুদিন আপনাদের এখানে থাকতে হবে।” কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। দেখি ধোপদুরস্ত এক ভদ্রলোক। তিনি আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন। অন্য খাটে লাহিড়ী তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছে। ভদ্রলোক এবার কেটে কেটে বললেন, “আমি ম্যাজিস্ট্রেট, রিমান্ড নেবেন না?” আমার তখনও ভাল করে ঘুম কাটেনি। উনি সেটা বুঝে খাটের একধারে বসলেন, “এখানকার অবস্থাই এমনি। আসামী ধরা পড়লে, আমাদের এখানে এসে রিমান্ড অর্ডার নিয়ে যেতে হয়। দিনে দুটো বাস যাতায়াত করে। আজ আমি চলে গেলে আবার দুদিন পর এখানে আসব, সে পর্যন্ত আপনারাও এখানে আটকে থাকবেন। রিমান্ড ছাড়া তো আসামী নিয়ে যেতে পারবেন না। থানা থেকে আমাকে খবর দেওয়াতে চলে এলাম।” এবার আমি ব্যাপারটা বুঝলাম। বললাম, "আমি ভীষণ লজ্জিত, বুঝতে পারিনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আপনাকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি সেজন্য মাপ করবেন।” উনি হেসে বললেন, “আপনাদের সব খবর শুনেছি, ঘুম তো স্বাভাবিকই।” আমি তাড়াতাড়ি লাহিড়ীকে ঠেলে তুললাম। লাহিড়ী উঠে বসে ভুরু কুঁচকে বলল, “কি হয়েছে?” আমি বললাম, “ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে এসেছেন রিমান্ড দিতে। একটা কাগজ নাও আমি বলছি, তুমি ড্রাফট লেখ।” লাহিড়ী তাড়াতাড়ি একটা সাদা কাগজ নিয়ে বসল।

আমি বলছি, লাহিড়ী লিখছে। লেখা শেষ হলে কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি কাগজটা নিয়ে হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না। লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকালাম, চোখভর্তি ঘুম নিয়ে সেও আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আমি আবার কাগজটার দিকে তাকালাম, কি লিখেছে লাহিড়ী! কাগজ জুড়ে কতগুলো হিজিবিজি দাগ, যেন আরশোলার ঠ্যাঙে কালি লাগিয়ে কাগজের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। লাহিড়ী তখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমি হেসে ফেললাম, “যাও, চোখেমুখে জল দিয়ে এস।” লাহিড়ী উঠে বাথরুমে গেল। ফিরলে কাগজটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, “দেখ, কি লিখেছ।” কাগজটা হাতে নিয়ে এবার লাহিড়ীও হেসে ফেলল। তাড়াতাড়ি অন্য একটা কাগজ নিয়ে নতুন করে লিখতে শুরু করল। কলকাতার অ্যাডিশনাল চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পাণ্ডুবেশ্বরকে হাজির করানর ফরমান। লেখা হলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাতে সই সাবুদ করে দিলেন। তাঁর ফেরার বাসের তখনও বেশ কিছুটা দেরি, আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটালেন।

উনি চলে গেলে আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে গেলাম করিমগঞ্জ থানায়। দারোগাবাবু আমাদের জন্য একটা জিপ যোগাড় করে রেখেছিলেন। বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিলাম। প্লেনে পাণ্ডুবেশ্বরকে বসিয়ে আমি আর লাহিড়ী দুদিকে বসলাম। বিমান সেবিকার কফি খেতে খেতে পাণ্ডুবেশ্বরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। কলকাতায় পৌঁছনর আগেই পাণ্ডুবেশ্বর সমস্ত কথা স্বীকার করল। গোলকপতি রায়কে খুন করার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে হেমন্তবাবুকে খুন করা পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে সে আমাদের বলল। দমদমে নেমে পাণ্ডুবেশ্বরকে নিয়ে সোজা চলে এলাম লালবাজারে। সেখানে বসে পাণ্ডুবেশ্বরের দেওয়া বিবৃতি লিখে ফেললাম।

পাণ্ডুবেশ্বরের স্বীকারোক্তির ফলে আমাদের খুব সুবিধে হল। ওর কাছ থেকেই জানতে পারলাম কে হেমন্তবাবুকে গুলিটা করেছিল। এবার তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা শুরু করলাম। অন্যদিকে পাণ্ডুবেশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে তা যাচাই করার জন্য তার দেওয়া বর্ণনার খুঁটিনাটি সব মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। অনেক সময়ই দেখেছি আসামী ভুল তথ্য দিয়ে পুলিশকে বিপথে চালিত করে। আবার এরকমও দেখেছি, বেকার যুবক, খাওয়া থাকার কোনও ঠিক নেই, কোনও অপরাধের দায় স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে জেলে ঢুকে যায়। কিছুদিনের জন্য হলেও বেঁচে থাকার সমস্যা থেকে তো মুক্তি পেল। এর ফল মারাত্মক। যে কিনা প্রকৃত দোষী, সে দিব্যি বুক ফুলিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, নতুন নতুন অপরাধ করে। তাই ধৃত ব্যক্তি সঠিক অপরাধী কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। যা হোক

একজনকে গ্রেফতার করে তাকে মামলায় জড়িয়ে দায়িত্ব পালন করার আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায় হয়ত, কিন্তু তাতে পুলিশের কর্তব্য করা হয় না।

আলিপুরে এক গভীর রাতে ফরাসী কনসাল জেনারেল ও তাঁর স্ত্রী নিজেদের শোয়ার ঘরে খুন হয়ে গেলেন। ছুরি, ভোজালি দিয়ে খুন করা হয়েছিল। বাড়ির সিকিউরিটির গার্ডরা বা কাজের লোকজন কেউ টের পায়নি। কেন চিৎকার বা আওয়াজ কিছুই শোনা যায়নি। খুনী সম্ভবত বাড়ির পেছন দিকের জলের পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে তাঁদের ঘরে ঢুকে খুন করে পালিয়েছে। কিন্তু কিজন্য ওঁরা খুন হলেন? কে বা কারা ওঁদের খুন করতে পারে? এই সব প্রশ্নে তখন চারদিক তোলপাড়। পত্রপত্রিকায় ছবি ও ঘটনাস্থলের চারপাশের ম্যাপ সমেত বড় বড় খবর প্রকাশিত হতে লাগল। এটা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপার। বিদেশে আমাদের বদনাম হওয়ার আশঙ্কা।

মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে, অথচ খুনীর চরিত্র বা খুনের ব্যাপারে কোনও সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না। যে অফিসার ওই তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি এক নেপালি যুবককে হঠাৎ গ্রেফতার করলেন। নেপালী যুবক সেই অফিসারের সোর্সকে বলেছিল যে সেই খুন করেছে। কিভাবে খুন করেছে তার বর্ণনাও দিয়েছিল। গোয়েন্দা অফিসার ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই নেপালী যুবককে গ্রেফতার করে আদালতে মামলা শুরু করে দিলেন। কিন্তু পরে তদন্ত করে জানা গেল, নেপালী ছেলেটির সব কথাই একদম বাজে, ওই খুনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই। সে জেলে ঢুকবার অছিলায় নিজে খুনের দায়িত্ব নিয়েছিল। খবরের কাগজ পড়ে ও ঘটনাস্থলের আশেপাশের লোকজনের কাছ থেকে বর্ণনা শুনে সেসবই আমাদের অফিসারকে বলেছিল। কিন্তু ঘটনার খুঁটিনাটি অনেক কিছুই সে জানত না। তাই সেসম্পর্কে যুবকটি কিছুই বলতে পারেনি। কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণও খুঁজে পাওয়া যায়নি, কেন সে ওই দম্পতিকে খুন করবে? আসলে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল বলে তাকে দুম করে আসামী বানিয়ে জেলে পাঠান হয়েছিল। মুশকিল হল, জেরা শুরু করার সময় কোনও পূর্ব-সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করলেই ভুল পথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা একশ ভাগ থেকে যায়। তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক চাপ, নিজের কেরামতী দেখানর লোভে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করার তাগিদ থেকেই ভুল হয়। তদন্তে অনুমানকে বড় করে দেখলে চলে না। তদন্তের সঠিক পদ্ধতি হল, সমস্ত সম্ভাবনার সূত্র ধরে একে একে সবকটির শেষ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেখা। সহজে বলতে গেলে, তদন্তের সময় হয় ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আসামী পর্যন্ত পৌঁছন যায়, আবার এর উল্টোটিতে করা যায়। পাণ্ডবেশ্বরকে গ্রেফতারের পর যেমন দ্বিতীয় পদ্ধতিই নিতে হল। আসামীর দেওয়া বর্ণনা মিলিয়ে দেখা শুরু হল। পাণ্ডবেশ্বরের বিবৃতির সঙ্গে সবই মিলে যেতে লাগল।,

ইতিমধ্যে আমরা জেনে গিয়েছি হেমন্তবাবুকে যে গুলি করেছিল সে বাঙালি নয়, ওড়িশাবাসী। তবে তার পরিবার বহু বছর কলকাতায় থাকার ফলে প্রায় বাঙালি হয়ে গিয়েছে। তার বাড়ি ছিল মুচিপাড়া থানা এলাকায় হিদারাম ব্যানার্জি লেনের কাছে। সেখান থেকে সে প্রতিদিন শ্যামপুকুরে আড্ডা মারতে যেত। সে ছিল শতকরা একশ ভাগ লুম্পেন, তার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক ছিল না। শ্যামপুকুরে আড্ডা মারতে মারতে হঠাৎ সে নকশাল হয়ে গিয়েছিল।

তার বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সে বহুদিন বাড়িতে নেই, পাড়াতেও আসে না প্রায় বছর দুয়েক। সময়টা মিলিয়ে দেখলাম, হেমন্তবাবুর খুনের পর থেকে সেও উধাও। তারা ছিল আট ভাই। আমরা সব ভাইদের পেছনে সোর্স লাগিয়ে দিলাম। সেসব সোর্সের মাধ্যমেই জানতে পারলাম, খিদিরপুরের এক বস্তি অঞ্চলে তার মত একটা ছেলে কয়েকদিন ধরে আছে। একদিন রাতে পুলিশের এক বিশাল বাহিনী বস্তি ঘিরে ফেলল। বস্তির ভেতর এদিক ওদিক সরু সরু অসংখ্য গলি, গলির মধ্যে ঘরও একটার গায়ে একটা ঘেঁষাঘেঁষি। কোন ঘরটায় সে আছে নির্দিষ্টভাবে খবর পাইনি। তাই সাবধানে একটার পর একটা ঘর আমাদের

লোকেরা দেখতে লাগল। সবচেয়ে বড় অসুবিধে, পুলিশের কেউ ওকে চেনে না। ওর কোন ফটোও আমাদের কাছে নেই। আমাদের তল্লাশির মধ্যেই সে পালাল, এক সিপাইয়ের ক্ষণিক গাফিলতির সুযোগ নিয়ে। সিপাইটা যে গলির মুখে পাহারায় ছিল, সেখানে বস্তি থেকে বেরনর একটা দরজা ছিল। গ্রামের হাঁস-মুরগী রাখার ঘরের দরজার মত অনেকটা। পাতলা কাঠের ছোট ডালা মত, টেনে ওপর দিকে তুলতে হয়, মাথা গলিয়ে কোনমতে গলিতে বেরন যায়। সিপাইটা সেই দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছিল। ভোর হয়ে এসেছিল, সিপাইটা দরজার সামনে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছেলেটা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আস্তে দরজা ওপর দিকে টেনে তুলে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজা এমনভাবে ওপরে আটকে রেখেছিল যাতে নিচে পড়ে গিয়ে শব্দ না হয়। সিপাইটা টেরই পায়নি। বরং ছেলেটা যাওয়ার সময় সিপাই ঘুমের মধ্যেই ছড়ানো পাটা একটু গুটিয়ে নিয়েছিল, যাতে "পথিকের" কোন কষ্ট না হয়। আমাদের অফিসাররা পরে ওই দরজাটা খোলা দেখেই বুঝেছিল চিড়িয়া ভেগেছে! ইতিমধ্যে অবশ্য অনেক খোঁজাখুঁজি করে জানা গিয়েছিল সেই ছেলেটা কোন ঘরে আত্মগোপন করেছিল। আরও জানা গিয়েছিল, সেইদিনই দিনের বেলায় ছেলেটার ভগ্নিপতি তার সাথে ওখানে দেখা করে গেছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছে। এভাবে আসামী আমাদের হাত ফস্কে পালাতে ভীষণ আফশোস হয়েছিল।

তখন আর কি করা? আমরা ওর ভগ্নিপতির বাড়ি চিনতাম, সেদিন তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এলাম। সে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। সুতরাং কিছু সাবধানতা অবলম্বন করে তাকে শালার খোঁজের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। সে কিন্তু ঘাড় শক্ত করে রইল। শালার সাথে যে তার ভাল যোগাযোগ তাও সে অস্বীকার করতে থাকল। এই জেদের অর্থ দাঁড়ায় বস্তি থেকে পালিয়ে তার শালা কোথায় গিয়েছে সেটা সে জানে। দুদিন ধরে সে আমাদের জেরার জবাবে কোন কিছুই বলল না। তিনদিনের দিন ভেঙে পড়ল, স্বীকার করল যে সে সব জানে। তার শালা আমেদাবাদ যাওয়ার উদ্দেশে আগের দিন সন্ধেবেলা হাওড়া থেকে ট্রেনে দিল্লির দিকে যাত্রা করেছে। বুঝলাম, শালাকে নিশ্চিন্তে আমেদাবাদের পথে রওনা করিয়ে দেওয়ার জন্য সে কৌশলে দুদিন আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছিল। জানা গেল ছেলেটা একটা লাল রঙের জামা ও কালো রঙের প্যান্ট পরে গিয়েছে। আমেদাবাদে থাকবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাড়িতে। সেটাও ঠিক করে দিয়েছিল এই ভগ্নিপতি। সে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এই বন্দোবস্তটা করেছিল।

দিল্লির ট্রেন ছাড়া ও পৌঁছনর সময় দেখে বুঝলাম, ট্রেনে করে ওর পিছু ধাওয়া করা যাবে না। দিল্লিতে আমাদের প্লেনে যেতে হবে। অন্যদিকে আমি আমার স্ত্রীকে বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে পাঠিয়ে আমেদাবাদের ঠিকানা যোগাড় করে ফেললাম। আমার স্ত্রীর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, সেই সুযোগটাই নিলাম। পরদিন সকালে, প্লেনে এবারও লাহিড়ীকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি পৌঁছে গেলাম। সেখানে আর দেরি না করে প্লেন ধরে সোজা আমেদাবাদ। গেলাম আমেদাবাদ স্টেশনে, কোনও লাল জামা - কালো প্যান্ট পরা ছেলে ট্রেনে আসছে কিনা দেখা দরকার। না, তেমন কাউকে দেখতে পেলাম না। আর অপেক্ষা না করে অটো রিক্সা নিয়ে ঢুকে পড়লাম আমেদাবাদ শহরে। প্রথমেই একটা হোটেলে গিয়ে ঘর ভাড়া করে আমাদের জিনিসপত্র রাখলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম। ওখানকার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ যে থানার অধীনে, সেই থানার খোঁজে। দারোগাবাবুকে বললাম, কেন এসেছি। তিনি আমাদের কথায় কোনও গুরুত্বই দিলেন না, তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, যা বলার মুন্সীবাবুকে গিয়ে বলুন, তিনি লিখে নেবেন। মুন্সীবাবু হচ্ছেন ডায়েরি-লিখিয়ে। আমরা তো অবাক। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে থানার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ভাবছি,

কি করা যায়? এমন সময় দেখলাম থানার সামনে একটা জিপ এসে দাঁড়াল। যিনি নামলেন, তাঁকে দেখেই থানার সমস্ত কর্মচারী তটস্থ হয়ে গেল। কাছে দাঁড়ান এক সিপাইকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি কে? সে জানাল, উনি আমেদাবাদ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার

গোলাম গার্ড। আমরা ঠিক করলাম, ওঁকেই বলব আমাদের ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা। গোলাম গার্ড ভারতীয় দলের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার। আমরা সরাসরি তাঁকে আমাদের পরিচয় দিয়ে বললাম, "আমরা আপনার সাহায্য চাই, একটা খুনের আসামীকে ধরতে আমরা এখানে এসেছি।" উনি আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সব কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোন হোটেলে উঠেছেন?" আমরা হোটেলের নাম জানাতে উনি বললেন, "ঠিক আছে, আপনারা ওখানেই থাকুন, আমি ঠিক রাত আটটার সময় হোটেলে পৌঁছব। আপনাদের তুলে নিয়ে সোজা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে যাব। রাত সাড়ে আটটায় সঙ্ঘের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ওখানে যারা থাকে তারা আটটার মধ্যেই ফিরে আসে। আপনাদের আসামীও বাইরে থাকলে ওই সময়ের মধ্যে চলে আসবে। এখানে কারোকে কিছু বলবেন না।"

আমরা ভরসা পেয়ে হোটেলে ফিরে এসে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। গোলাম গার্ড ঠিক সময় মত এলেন। আমরাও প্রস্তুত ছিলাম, জিপে উঠে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দিকে রওনা দিলাম। উনি সঙ্গে করে বেশ বড় ফোর্স এনেছিলেন, তারা অন্য গাড়িতে আমাদের পেছন পেছন আসতে থাকল। ঠিক সাড়ে আটটার সময় যখন সঙ্ঘের দরজা বন্ধ হব হব করছে, আমরা পৌঁছলাম। গার্ড সাহেব সোজা রিসেপশনে গিয়ে জানতে চাইলেন দু-এক দিনের মধ্যে কোনও ছেলে কলকাতা থেকে ওখানে এসেছে কি না। জানা গেল এসেছে, কিন্তু আগামীকালই সে চলে যাবে, সে নাকি একটা এখানকার মিলে চাকরি পেয়েছে। জানতে চাইলাম, "সে এখন কোথায় আছে?" রিসেপশনিস্ট বললেন, "ঘরেই আছে।"

সঙ্ঘেরই একজন আমাদের পথ দেখিয়ে সেই ঘরের সামনে নিয়ে এলেন। ঘরের দরজা ভেজান ছিল, ঠেলা দিতেই খুলে গেল। দেখলাম, একটা ছেলে ঘুমচ্ছে। গার্ড সাহেবই প্রথম ঘরে ঢুকে ওকে ডেকে তুললেন। ছেলেটা আমাদের দেখেই বোবা হয়ে গেছে, ওকে যা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাতেই খালি গলা দিয়ে, "আঃ-আঃ" শব্দ বেরচ্ছে। আর অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চাইছে আমাকে অযথা কেন ঘুম থেকে ওঠালে ! ওর অভিনয় দেখে গার্ড সাহেব একটু দোটানায় পড়ে গেলেন মনে হল। আমি তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে টেনে নিয়ে ওর পেটে মারলাম এক গোঁত্তা। ছেলেটা "ও বাবা গো" বলে পেটে হাত দিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। আমি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললাম, "কি রে উড়ে ধীরেন, ভেবেছিলি বোবা সেজে পার পেয়ে যাবি, তাই না? হেমন্তবাবুকে গুলি করার সময় তোর রিভলবার কি বোবা হয়ে ছিল?" আমার কথা শুনে বীরেন চুপ পরে রইল। বীরেনকে সবাই উড়ে বীরেন বলেই ডাকত।

ততক্ষণে লাহিড়ী বীরেনের ব্যাগ থেকে লাল জামা আর কালো প্যান্ট বের করে ফেলেছে। আমরা আর ওখানে অপেক্ষা না করে ওকে নিয়ে সোজা থানায় এসে লক আপে পুরে দিলাম। গার্ড সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। দুজনের মনেই তখন দারুণ ফূর্তি, হেমন্তবাবুর খুনের আসল দুই আসামীকেই ধরা গেল।

আমরা ঠিক করলাম, একটু সেলিব্রেট করা যাক। কিন্তু গুজরাট তখন "ড্রাই" অঞ্চল, ওই রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা ভেবে দেখলাম, আমেদাবাদে যারা পুরোদস্তুর মাতাল ছিল, তারা কি নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়াতে মদ্যপান পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে? তা তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই গোপনে মদ বিক্রি হয়, সেখান থেকে তারা কিনে প্রাণধারণ করে আছে! আমরা দুজনেও ওরকম কোন গোপন ঠেক খুঁজে বার করবই। রাস্তার দুদিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চোখে পরীক্ষা করতে করতে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় আধঘণ্টা ঘোরার পর হঠাৎ দেখি একটা গলি থেকে এক সিপাই টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে। ওকে দেখে আমাদের প্রাণে জল এল। আমরা সিপাইটাকে ইশারায় ডেকে জানতে চাইলাম, কোথায় পাওয়া যাবে? সে জিজ্ঞেস করল, "ক্যায়া, দারু?" আমরা সোৎসাহে বলে উঠলাম, "হ্যাঁ।" সে বলল, "মিলেগা।" তারপর ঝট করে একটা চলন্ত অটো রিক্সা দাঁড় করিয়ে আমাদের তাতে উঠতে বলে, নিজেও উঠে বসল। অটো চলছে, আমাদের মন খুশিতে ভরপুর। ঠিক করলাম, বোতল কিনে এই অটোটা চড়েই হোটেলে ফিরে যাব, সেখানে নিজেদের ঘরে বসে

আরামসে খাব।

মিনিট দশেকের মধ্যেই দেখি অটো সেই থানার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, যেখানে আমরা বীরেনকে রেখে এসেছি। সিপাইটা অটো থেকে নেমেই আমাদের বলল, "আইয়ে।" আমরা বিপদ বুঝে তাড়াতাড়ি অটো থেকে নেমে পড়লাম। আমি পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সিপাইটার হাতে গুঁজে দিলাম। সে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে নোটটা ফিরিয়ে দিল, "ইসমে নেহি হোগা, এ কলকাত্তা কা পুলিশ নেহি যো পাঁচ-দশ রুপায়া মে খরিদ করনে সেকেগা। এ আমেদাবাদ হ্যায়, কমসে কম শ চাইয়ে।" ঘুষেও কলকাতার অপবাদ ! সম্মান বাঁচাতে আমি আর বাক্যব্যয় না করে একটা পঞ্চাশ টাকা ওর হাতে দিলাম। খুব একটা মনঃপূত না হলেও একটু নরম হল, একটা টাল সামলে বলল, "যাইয়ে, লেকিন ইঁহা কভী দারুকি নাম মৎ লেনা।" আমরা কোনমতে " নেহি, নেহি" বলতে বলতে ওর সামনে থেকে সরে গেলাম। ফিরে এলাম হোটেলে।

পরদিন সকালে সব কাগজে দেখি উড়ে বীরেনের গ্রেফতারের খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছে। দিল্লি, মুম্বাই, আমেদাবাদ সব জায়গার পত্রিকাতেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল খবরটা। গোলাম গার্ড সাহেব পি. টি. আইকে খবরটা দেওয়াতে সারা দেশেই পৌঁছে গেছে। হেমন্তবাবু সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন, গুরুত্ব পাওয়ারই কথা। আমরা তৈরি হয়ে নিলাম, বীরেনকে নিয়ে কোর্টে যেতে হবে, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে তবেই কলকাতা যাওয়া যাবে। থানাতেও সবাই প্রস্তুত ছিল। বিশাল এক বাহিনী সঙ্গে, আমরা কোর্টে বীরেনকে নিয়ে হাজির হলাম। ম্যাজিস্ট্রেট বীরেনকে জিজ্ঞেস করলেন সে হেমন্তবাবুকে খুন করেছে কিনা। অস্বীকার করা তো দূরের কথা, বীরেন জানাল, শুধু হেমন্তবাবুকে নয়, আরও পাঁচ ছটা খুন সে করেছে। সেই কথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চমকে গিয়ে আমাদের বললেন, "একে আর গুজরাটেই রাখবেন না, আজই নিয়ে চলে যান, প্রয়োজনীয় সব নির্দেশ আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

সেদিনই রাতে আমরা দিল্লির ট্রেনে বীরেনকে নিয়ে উঠলাম। বীরেন ও তার পাহারাদার আমেদাবাদ পুলিশের ছজন সিপাই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় উঠল। আমি আর লাহিড়ী প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠলাম।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আমি আর লাহিড়ী প্যানট্রি কারে গিয়ে বসলাম। একটু পরে একটা অল্পবয়সী ওয়েটার আমাদের কাছে এসে জানতে চাইল কি খাব? আমরা বললাম, "দূর, খাবারের কথা পরে হবে, তুমি কি আমাদের জন্য একটু দারু-টারুর ব্যবস্থা করতে পারবে, গতকাল থেকে খুঁজছি।" সে মাথা নাড়ল, "এখন তো পাবেন না স্যার, এখনও গুজরাট চলছে। তবে গুজরাট-রাজস্থান সীমান্তের কাছে একটা লেভেল ক্রসিং আছে, সেখানেই পরের জংশন স্টেশনের আউটার সিগন্যাল। এই ট্রেনটা সন্ধেবেলায় সেখানে পৌঁছবে। প্রায় রোজই সেখানে একবার দাঁড়ায়। আজ যদি দাঁড়ায় আমি দৌড়ে চলে যাব। ওখানে দোকান আছে। তারপর জংশনে ট্রেন পনের কুড়ি মিনিট দাঁড়ায়। কি ব্র্যান্ড আনব?" বললাম, "যে কোনও ব্র্যান্ড হলেই চলবে। শোন, তুমি অন্য কোথাও যেও না, অন্যদের কাজ করে যত বখশিস পাবে, আমরাই সেটা তোমাকে দিয়ে দেব।" তারপর একটা একশ টাকার নোট বার করে ওকে দিয়ে বললাম, "দুটো পাঁইট নেবে।" ছেলেটা সেটা পকেটে পুরে চলে গেল।

সন্ধে হয়ে আসছে, ছেলেটার দেখা নেই। না এলে কোথায় খুঁজব? আমরা উদগ্রীব হয়ে বসে আছি। হঠাৎ উদয় হল, বলল, "স্যার, লেভেল ক্রসিং আসছে।" আমি আর ছেলেটা কামরার দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়ালাম। ট্রেন কিন্তু ছুটছেই। একটু পরে ছেলেটা চিন্তিত গলায় বলল, "স্যার, কি ব্যাপার, আজ দাঁড়াচ্ছে না কেন? এখানেই লেভেল ক্রসিংয়ে রোজ দাঁড়ায়! আজ বেরিয়ে যাচ্ছে।" ওর কথা শুনে বুঝলাম, যে কোনও কারণেই হোক আজ দাঁড়াবে না। তার মানে, আমাদের আশা পূরণ হবে না। আমি আর কালক্ষেপ না করে ঝট করে পাশের বাথরুমে ঢুকে চেন টেনে দিয়ে আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ট্রেন ঝক ঝক শব্দ করতে করতে থামছে। ছেলেটা উত্তেজিত, "দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে।" তারপর

ঝপ করে লাফিয়ে নেমে উধাও হয়ে গেল।

আমিও নেমে পড়লাম, যেন কিছু জানি না এমন ভাব করে যে কামরায় বীরেনরা আছে, সেদিকে চলতে লাগলাম। দেখছি গার্ড সাহেব, সঙ্গে আরও কিছু লোক, হন্তদন্ত হয়ে চেন টানার কারণ জানতে সরেজমিন তদন্তে চলেছেন। গজগজ করতে করতে এদিক ওদিক দেখছেন গার্ড। আমি ধীরেনদের দেখে ফিরে আসার একটু পরে গার্ড সাহেব বাঁশী বাজিয়ে দিলেন। জংশন স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল। আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছি, মিনিট দশেক পর ছেলেটাকে দেখতে পেলাম, আসছে। কাছে এসে বলল, "স্যার জিন পেয়েছি।" আমার প্রাণ নেচে উঠল, "তাতেই হবে।" ছেলেটাকে নিয়ে আমাদের কামরায় আসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। সে কোমরের কাছ থেকে দুটো পাঁইট বের করে বলল, "ব্লু বুল জিন, আগে দেখেছেন তো?" মনে মনে বললাম, বাপের জন্মে এমন নাম শুনিনি, দেখা তো দূরের কথা। মুখে বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি খুব ভাল জিনিস এনেছ। এই নাও আরও একশ টাকা। তুমি আমাদের জন্য ডবল ডিমের ওমলেট আর পাঁউরুটি নিয়ে এস।" একটা পাঁইট দুজনে মিলে খেয়ে, রাতের খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম। একজন ওপরের বাঙ্কে, অন্যজন নিচে। দুনম্বর পাঁইট পরের রাতে জন্য ওপরের বাঙ্কের এককোণে রেখে দিলাম।

ট্রেনের দোলায়, জিনের নেশায় একটুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের দিকে চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে দেখি, ট্রেন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে হৈ হৈ করে প্রচুর ছাত্র ট্রেনটায় উঠছে। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, সংরক্ষিত কামরা, কিছুই মানছে না। আমাদের কামরাতেও অনেক ছাত্র উঠল। তারা আমাদের জায়গা দখল করে নিল। ওপরের বাঙ্ক থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হলাম। ছেলের দল সেটাও দখল করে নিল। ভোরের হাওয়ায় জানালার ধারে বসে আছি, চোখের সামনে দিয়ে সরে যাচ্ছে ধূ ধূ প্রান্তর, কানে সারাক্ষণ বাজছে কমবয়সী কলকল হাসি। মন্দ লাগছে না! নয়াদিল্লি স্টেশনের আগে একটা স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়াল। ছাত্ররা আমাকে আর লাহিড়ীকে হরেকরকম গুডবাই, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নেমে গেল। আমরাও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওদের বিদায় জানালাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। একটু পরে আমরা উঠলাম, নামার আগে একটু গুছিয়ে নিতে হবে। গোছাতে গিয়ে প্রথমেই দেখলাম, ওপরে রাখা জিনের পাঁইটটা পুরো ফাঁকা। বুঝলাম, ছাত্ররা কিসের প্রভাবে এত গুডবাইয়ের ঝড় বইয়ে দিয়ে গেল। কি আর করা যাবে?

নয়াদিল্লি স্টেশনে নেমে পড়লাম। বীরেনকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে কালকা মেলে চড়ে বসলাম।

পাণ্ডবেশ্বর ও বীরেন ছাড়া এই হত্যাকাণ্ডের আর যারা প্রধান আসামী ছিল, তাদের মধ্যে একজন কাশীপুরের বিশু। ওকে আমরা বহুদিন ধরে খুঁজছিলাম, কারণ সে সিঁথি অঞ্চলে নকশাল আন্দোলনের বড়সড় নেতা ছিল।

একবার সিঁথিতে আমরা রুটিন তল্লাশিতে গেছি। সেখানে গিয়ে শুনলাম, নকশালরা একটা মাঠে আছে। ছুটলাম সেই মাঠের দিকে। গিয়ে দেখি, মাঠ শূন্য, কেউ কোথাও নেই। আমরা ফিরে আসছি, হঠাৎ পেছন থেকে কাতর কণ্ঠে একটা ডাক শুনতে পেলাম। আওয়াজ যেদিক থেকে আসছিল তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি, যে আমাদের ডাকছিল, তার দেহটা বুক পর্যন্ত মাটির তলায় পোঁতা, বাকিটা ওপরে। সারা চোখ ও মুখে অত্যাচারের চিহ্ন, রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত। আমরা তাড়াতাড়ি তাকে ওপরে টেনে তুললাম। তার কাছ থেকে শুনলাম, নকশালরা তাকে পুলিশের গুপ্তচর ভেবে মাটির তলায় অর্ধেক পুঁতে অত্যাচার চালিয়েছে। পুলিশ ওই এলাকায় এসেছে শুনে তারা ওকে ফেলে পালিয়ে যায়, নয়ত পুরোই মেরে ফেলত। এই অত্যাচারের মূল নায়ক ছিল বিশু। তখন থেকেই আমরা বিশুকে খুঁজছি। সিঁথি অঞ্চলে সে যে আর নেই তা ঠিক। সিঁথিতে আমাদের যত সোর্স ছিল, তাদের খবর তাই বলে। কিন্তু বিশুকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

একদিন বিশুর বাড়িতে গেলাম। তার বাবা-মা খুবই ভদ্র। বললাম, "বিশু যদি

আত্মসমর্পণ করে, ওকে আমি বাঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।" ওঁদের বোঝালাম, "আন্দোলন তো এমনিতেই শেষ হয়ে গেছে, নেতারা প্রায় সবাই ধরা পড়েছে, নয় মারা গেছে। বাকি যারা আছে তাদের বেশির ভাগই লুম্পেন। বিশুকে বলুন আত্মসমর্পণ করতে। আমাদের কথায় কান দিলে ভাল, নয়ত যদি কোনখান থেকে গ্রেফতার করতে পারি, তখন কিন্তু ওকে কোনও সুযোগই দেব না। আর তেমন কিছু হলে আপনারাও আমাদের দায়ী করবেন না।"

এর কিছুদিন পর লালবাজারে বাবা ও মাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বিশু আত্মসমর্পণ করল। 'আমরা নতুন করে চার্জশিট দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করলাম। আগে একবার চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল, মামলা কিছুটা এগিয়েও ছিল। সরকারি তরফের উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথম চার্জশিটের সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে নতুনভাবে চার্জশিট দেওয়ার ব্যবস্থা হল। প্রথম চার্জশিটে আসল অপরাধীদের মধ্যে শুধু পাণ্ডবেশ্বরের নাম ছিল, তাকে আত্মগোপনকারী হিসেবে ঘোষণা করে মামলা শুরু করা হয়েছিল। এবার যুক্ত হল বীরেন, বিশু ও আরও দুজনের নাম। বিশু রাজসাক্ষী হয়েছিল।,

মামলা জোর কদমে শুরু হল। কিন্তু প্রথম চার্জশিট থেকেই মামলায় কিছু গলদ থেকে গিয়েছিল। তার ওপর আমাদের দুই ডি.সি.র চাপান উতোর, টানাপোড়েনের জন্য মামলা আরও দুর্বল হয়ে গেল। ঘটনাস্থল নিয়ে অযথা জট পাকিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিল। আদালত থেকে "সন্দেহের অবকাশের" ভিত্তিতে আসামীরা খালাস পেয়ে গেল। আমরা দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করলাম। অবশ্য এই মামলার আসামীরা দায়রা আদালত থেকে খালাস পেলেও জেল থেকে ছাড়া পায়নি কারণ তাদের বিরুদ্ধে আরও অনেকগুলো খুন ও দাঙ্গা হাঙ্গামার মামলার বিচার চলছিল।

সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সঙ্গেই ওরা ছাড়া পেয়ে যায়। দুর্ভাগ্য, সরকার আইনকে তার নিজের পথে চলতে দিল না। নৃশংস খুন কি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় রঙ বদলায়? রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে আইন ও তার ব্যাখ্যা হঠাৎ কি পাল্টে যায়? সাধারণ মানুষের চোখে যারা খুনী তারা কি হঠাৎ বিপ্লবী বনে যেতে পারে? নেতারা ভাবেন, জনগণের স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল, তাই একাত্তরের খুনের কথা সাতাত্তরে আর কারও মনে নেই, ঝাপসা হয়ে গেছে। "আদর্শের অন্ধ বিশ্বাসে অপরাধ করে ফেলেছে" এই সিদ্ধান্তের আড়ালে হেমন্তবাবুর খুনীরা বিনা সাজায় মুক্তি পেয়ে গেল !

শুধুমাত্র সত্তর সালে এই কলকাতা শহরেই নকশালদের হাতে সতের জন পুলিশ খুন হয়ে গেল। ফলে নিচুতলার পুলিশকর্মীদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক ছড়িয়ে গিয়েছিল। সন্ধে হতেই কলকাতার রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের ডিউটি বন্ধ হয়ে গেল। চূড়ান্ত অরাজকতা একাত্তরের আগেই পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছিল। যে সব লুম্পেনরা নকশালদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তারা সাধারণ নাগরিকদের ভয় দেখিয়ে যখন তখন চাঁদা তুলতে লাগল। মানুষ ভয়ে কোনও প্রতিবাদ করতে পারত না। প্রতিবাদ করলেই যদি চারুবাবুর "শ্রেণীশত্রু"র তালিকায় নাম উঠে যায়! আতঙ্কে, অত্যাচারে বহু লোক বাড়ি-সম্পত্তি ছেড়ে পালাতে লাগল। আর সেইসব অঞ্চলে গুণ্ডারা খেয়ালখুশি মত রাজত্ব করতে লাগল। বিদেশী পর্যটক তো দূরের কথা, প্রবাসী বাঙালিরা পর্যন্ত ভয়ে বছরান্তে এরাজ্যে বেড়াতে আসা প্রায় বন্ধ করে দিল।

চারুবাবু তাঁর "লাইনের" কবর নিজেই খুঁড়ে দিলেন। তিনি দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে "বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা" বলে ঘোষণা করলেন। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজকে ভেঙে ফেলতে, পুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত মনীষীদেরই, কারোকে ব্রিটিশের দালাল, কারোকে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ, কারোকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করে তাঁদের মূর্তি ভেঙে ফেলতে বললেন। নকশালরা "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" নামে শুরু করল স্কুল কলেজ পোড়ান, মনীষীদের মূর্তি ও সরকারি অফিস ভাঙচুর। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো জলাঞ্জলি দিয়ে হাতেখড়ি দিতে লাগল এসব কাজে। এগুলো করলে তবেই মূল দলে ঢোকার ছাড়পত্র মিলত। শহুরে মধ্যবিত্তের সমর্থন পুরোপুরি হারাল নকশালরা। শ্রমিকদের মধ্যে নকশালদের প্রভাব কোনদিনই বেশি ছিল না। যেটুকু ছিল তা ওই আবেগতাড়িত মধ্যবিত্তের মধ্যেই। বাস্তবের শিলনোড়ায় পিষে গিয়ে তাদের স্বপ্নের ধোঁয়াশা মিলিয়ে গেল। নকশালরা এই সময় থেকেই পায়ের তলার জমি হারাতে শুরু করেছিল।

হেমন্তবসুর খুনের রেশ কাটতে না কাটতেই মার্চ মাসের তিরিশ তারিখে দুপুর বারোটা চল্লিশ নাগাদ কংগ্রেসের এম. এল. এ. নেপাল রায়কে তাঁর চিৎপুর রোডের অফিসে ঢুকে পাইপগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল নকশালরা। বোমা মেরে উড়িয়ে দিল অফিস।

পয়লা এপ্রিল সাঁইত্রিশ বছরের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার, অমৃতবাজার পত্রিকার ডিরেক্টর সুচারুকান্তি ঘোষ খুন হলেন। ভোর ছটা নাগাদ নিজের গাড়ি করে উত্তর কলকাতার পঞ্চাননতলা লেন দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনও জানতেন না এটাই তাঁর জীবনের শেষ এপ্রিল ফুল ! যখন জানলেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, নকশালরা ততক্ষণে ওঁর গাড়ি ঘিরে ধরে ওঁকে টেনে নামিয়ে বুকে, পেটে, পিঠে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। আর. জি. কর হাসপাতালে ভর্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁর দেহ নিষ্প্রাণ হয়ে গেল।

ছয় এপ্রিল সকাল দশটা পনের মিনিটে কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি কিরণলাল রায়কে অভয় মিত্র লেনে তাঁর বাড়ির সামনে পাইপগান দিয়ে আক্রমণ করল নকশালরা। পরদিন রাত এগারটায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আঠেরই মে শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা অজিত বিশ্বাসকে রাত সাড়ে আটটায় বিডন স্ট্রিটে রিভলবার দিয়ে গুলি করল নকশালরা। তিনি তখন একটা বাড়িতে পার্টির মিটিং সেরে রাস্তায় দাঁড়ান জিপে উঠতে যাচ্ছিলেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা গেলেন।

মধ্য কলকাতার যুব কংগ্রেসের সভাপতি নারায়ণ করকে বেলেঘাটা মেন রোডে তাঁর বাড়িতে ঢুকে নকশালরা রিভলবার দিয়ে গুলি করে খুন করল। উত্তর কলকাতাতে বিখ্যাত খেলোয়াড় জ্যোতিষ মিত্রকে ন্যশংসভাবে খুন করল নকশালরা।

দশই আগস্ট বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সেন্ট্রাল এক্সাইজের প্রশাসনিক অফিসার এন. কে. পালকে ক্লাইভ রোতে তাঁর পাঁচ তলার অফিস ঘরে বীভৎস ভাবে গলা ও পেট ছুরি দিয়ে কাটা অবস্থায় মৃতদেহ পাওয়া গেল। ওই অফিসের কর্মচারীদের ড্রয়ার ও অন্যান্য জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গেল চারুবাবুদের “দেশব্রতী” পত্রিকা।

হত্যার রাজনীতির পরিণামে নকশালদের হাতে শুধু কলকাতায় নয়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বহু বিখ্যাত ও সাধারণ মানুষ, পুলিশ, হোমগার্ড নির্বিচারে খুন হতে থাকল। খুন হয়ে গেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেনসহ আরও অনেক নামকরা ব্যক্তি। এই একাত্তর সালেই শুধুমাত্র কলকাতা শহরে নকশালরা খুন করেছিল কংগ্রেসের সতের জন, সি.পি.আই (এম)-এর পঁচিশ জন, সি.পি.আইয়ের একজন, পি. এস.পি.র একজন, হোমগার্ড সাতজন, ব্যবসায়ী ছজন, পুলিশ ষোলজন, অন্যান্য মানুষ সাঁইত্রিশ জন- সব মিলিয়ে একশ আঠের জনকে। একাত্তরে সারা সিঁথি অঞ্চল জুড়ে হত্যালীলা চালায় নকশালরা। পনেরই জানুয়ারি হোমগার্ড প্রদীপ চক্রবর্তী, দমদম রোডে অসীম ভৌমিক খুন হয়ে গেল। দুদিন পর হিমালয়ান পেপার মিলের ঠিকাদার রামবিলাস সিংকে জি. টি. রোডে তাঁর গাড়ি থামিয়ে নকশালরা গুলি করে মারল। তাঁর কাছে খুনের আগের দিন টাকা চেয়েছিল শঙ্করা, তিনি দিতে অস্বীকার করেছিলেন, আর তারই পরিণতিতে মৃত্যু। একমাস পরে ৩০বি বাসের কর্মচারি সি.পি.আই (এম) সমর্থক অশোক দাসকে বাস থেকে টেনে নামিয়ে বুকে, পেটে ছুরি বসিয়ে খুন করল নকশালরা।

ইতিমধ্যে কালীচরণ শেঠ লেনে পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে কটা ভিখিরিকে খুন করে ওরা। মার্চ মাসের তেইশ তারিখে কালীচরণ শেঠ লেনেই খুন করল হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী স্বরূপবিকাশ শেঠকে। পরদিনই খুন হলেন চিনি ব্যবসায়ী পুরিন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। তাঁর গাড়িতে গুলি চালিয়ে, বোমা মেরে তাঁকে খুন করল নকশালরা, ড্রাইভার বেঁচে গেল কোনমতে। একত্রিশ তারিখে তারিণীচরণ স্কুলের মাস্টার মদনমোহন চৌধুরীকে গোখনারা ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে, গুলি করে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে চলে গেল। এপ্রিলের চার তারিখে কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর নির্মল চক্রবর্তী কাশীপুরের রাজাবাগান লেনে নকশালদের বোমা, পাইপগানের মুখে মারা গেল। সেদিনের সংঘর্ষে আহত সিপাই বীরেন চ্যাটার্জি কদিন পর মারা গেল হাসপাতালে। ওরা ওখানে ইন্সপেক্টর মুখার্জির নেতৃত্বে গিয়েছিল একটা তদন্ত করতে। শঙ্কু, সমীর, অমূল্য, আনসারিরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খুন করে চলে গেল। চব্বিশ তারিখ রাতে পাহারাদার হরিপ্রসাদ সরকারকে পুলিশের নজরদার সন্দেহে খুন করল ওরা। ছাব্বিশ তারিখ সকালে কলকাতা সশস্ত্র পুলিশের সিপাই মুক্তিপ্রসাদ দেকেকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিল, সে তখন ডিউটিতে যাচ্ছিল।

তার পরের কমাস ধরে ওরা খুন করল এলোপাথাড়ি। হোমগার্ড সমীর ভট্টাচার্যকে বাড়ির সামনে থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল শঙ্কু ও নীলেরা। ৩০বি চলন্ত বাস থেকে জোর করে টেনে নামিয়ে খুন করল সিপাই প্রবীরকুমার ঘোষকে। পুলিশের এক গাড়ির ড্রাইভার জীবন সিং রতনবাবু রোডে নকশালদের হামলায় মারা গেল। রুস্তমজী পার্সি লেনে শ্যামল, শঙ্কুরা পরপর কটা কাগজকুড়ানিকে পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে খুন করে ফেলল। সি.পি.আই (এম)-এর বিশ্বস্তর সরকারকে বেদিয়াপাড়া লেন থেকে নিয়ে এসে রামকৃষ্ণ ঘোষ রোডে খুন করল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সি.পি.আই (এম) সমর্থক বনমালী

নিয়োগীকে সিঁথির মোড়ের কাছে হেম দে লেনে প্রথমে ছুরি দিয়ে মেরে, তারপর গুলি করে হত্যা করল।

খুনের পর খুনের মালা সাজিয়ে ওরা পুরোপুরি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। দু-একটা ক্ষেত্রে বদলার ঘটনাও যে ঘটেনি তা নয়। সি.পি.আই (এম)-এর ছেলেরা নকশাল বলে চোদ্দ বছরের বাচ্চা ছেলে বিক্রমজিৎকে খুন করল। ফলে বেদিয়াপাড়ার দিকের মানুষেরা সি.পি.আই (এম)-এর থেকে বেশি নকশাল সমর্থক হয়ে গেল। একাত্তরের প্রথম দিক থেকেই সিঁথি অঞ্চলে তল্লাশি ও ধরপাকড়ের চাপ বেড়ে গেল। একদিন চিরুনি তল্লাশির মধ্যে 'গুলে' নামে এক তরুণ নকশাল সি.আর.পি. বোঝাই লরিতে বোমা ছুঁড়ে মারল। বোমার আঘাতে দুজন সি.আর.পি. জওয়ান আহত হল। সি.আর.পি.র পাল্টা গুলিতে গুলে রাস্তার ওপরেই লুটিয়ে পড়ে মারা গেল।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পোস্ট অফিসেই বেশি আক্রমণ করেছিল নকশালরা। তাই বেশিরভাগ পোস্ট অফিসে পুলিশ থেকে গার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সিঁথির ফকির ঘোষ লেনের পোস্ট অফিসেও তেমন ব্যবস্থা ছিল। সেখানে একজন রাইফেলধারী সিপাই পাহারাদার হিসেবে থাকত। একদিন সকালবেলা শ্যাম, গোখনা আর বাপী ওই সিপাইকে খুন করার ষড়যন্ত্র করল। ছোটবেলা থেকেই শ্যামের বন্দুকে ভীষণ ভাল নিশানা ছিল। শ্যাম উচ্চবিত্ত পরিবারের বখে যাওয়া ছেলে। এমনিতে সে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল, কিন্তু পড়াশুনো না করে খুব অল্প বয়সেই সে পাখিমারা বন্দুক নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত, গুণ্ডামি করত। নকশালদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর দাদাগিরির ভাল সুযোগ পেয়ে সে নিজেও নকশাল হয়ে গিয়েছিল। ওই শ্যামই পোস্ট অফিসের সিপাইকে মারার মূল ছকটা করেছিল।

ডাকঘরের পাশেই একটা পাঁচিল ঘেরা খাটাল ছিল। পুরনো পাঁচিলের জায়গায় জায়গায় ইঁট খসে গিয়ে বহু গর্ত তৈরি হয়েছিল। ছক অনুযায়ী শ্যাম, গোখনা ও বাপী খাটালের ভেতর ঢুকে পড়ল। শ্যামের হাতে একটা রাইফেল। গোখনা আর বাপীর কাছে গ্রেনেড আর বোমা। ওদের দেখে খাটালের গোয়ালারা ভয়ে পালাতে চেষ্টা করল। না, নকশালরা ওদের পালাতে দিল না, একটা জায়গায় আটকে রাখল। তারপর শ্যাম পাঁচিলের গর্ত দিয়ে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে দিল। উল্টো দিকে পোস্ট অফিসে একটা টুলে বসে সিপাই তখন পাহারা দিচ্ছে। তার কল্পনাতেও নেই ভাঙা গর্ত দিয়ে বেরিয়ে আসছে তার মৃত্যুর পরোয়ানা। ও বেচারা জানে না ভারতবর্ষের "মুক্তির" জন্য তার মৃত্যুটা বড় বেশি জরুরী। দড়াম, দড়াম, দুটো গুলির শব্দে চারদিক হৈ হৈ করে মানুষজন ছোটাছুটি করতে শুরু করল। কোনখান থেকে রাইফেলের গুলি ছুটে এল কিছুই বুঝতে পারছে না। ওদিকে তখন পোস্ট অফিসের ভেতর সেই সিপাইয়ের বুকে গুলি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে, লুটিয়ে পড়েছে সে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। একটু পরই নিথর, নিস্পন্দ হয়ে গেল তার শরীর। না, ওকে কেউ কোনদিন শহীদ বলবে না, ওর নামে কোনও বেদীও তৈরি হবে না, সে তো "শ্রেণীশত্রু"। মুর্শিদাবাদের যে গরিব চাষীর ঘর থেকে সে এসেছিল চাকরি করতে, বৃদ্ধ বাবা মা যারা তার মানি-অর্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকত সারা মাস, তারা জানতেও পারল না, তাদের "শ্রেণীশত্রু" সন্তান সিঁথির পোস্ট অফিসের মেঝেতে চারুবাবুদের "বিপ্লবের" প্রয়োজনে বুকে গুলি খেয়ে শুয়ে পড়েছে চিরকালের জন্য। অন্যদিকে শ্যাম, গোখনা, বাপীরা সেই "বিপ্লবের" পতাকা তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে রায়পাড়ার দিকে চলে গেল।

এর কিছুদিনের মধ্যে আমরা পরপর অভিযান চালিয়ে অনেক রাইফেল, পাইপগান, বোমা উদ্ধার করলাম। কিন্তু বড়সড় কোনও নকশালকে ধরতে পারলাম না। আসলে পুলিশের সোর্সগুলো ঠিকমত কাজ করছিল না। ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি শেঠবাগানের এক তরুণী ডি. ব্যানার্জি সেখানকারই এক সি.পি.আই (এম) সদস্যার চোখে মুখে ব্লেড দিয়ে আঘাত হেনে "বিপ্লবী হিংসার" পরীক্ষায় উতরে সিঁথির মূল নকশালদের দলে যোগ দিয়েছে।

ডি. ব্যানার্জি দলে যোগ দেওয়ার আগেই বাপী বিয়ে করে ফেলেছিল বিপাশাকে। কালীবাড়ির পুরোহিতের মেয়ে ও তার ভাই কেলো আগের থেকেই মূল দলে ছিল। কেলো এই সুযোগে বিয়ে করে ফেলল বিপাশার ছোট বোনকে। নকশালদের এক প্রবীণ নেতা একবার এসব দেখেশুনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলে ফেলেছিলেন, "এ কি প্রজাপতির অফিস হয়ে গেল নাকি?" সে রকমই এরা করে ফেলেছিল। বিপ্লবের নামে এত অবাধ সুযোগ লুম্পেনরা আর কোথায় পাবে? এক সমর্থকের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার নাম করে ঢুকে এক বড় নকশাল নেতা তার স্ত্রীকে নিয়েই ভেগে গিয়েছিল। স্বদেশী আমলের সন্ত্রাসবাদীদের চরিত্রগত যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা মূল্যবোধ ছিল, নকশালদের বেশির ভাগের মধ্যেই তার ছিটেফোঁটাও ছিল না।

একদিন সকালে খবর পাওয়া গেল, শ্যাম কালীতলায় নিজের বাড়িতে এসেছে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বাড়ি ঘিরে ফেলা হল। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যাম দোতলা বাড়ির ছাদে উঠে গিয়েছিল। ওখান থেকেই পিস্তল দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর, খুব সম্ভবত শ্যামের পিস্তলের গুলি শেষ হয়ে গেল। সে আর উপায় না দেখে নিজের বাড়ির ছাদের রেলিং উপড়ে ফেলে পাশের বাড়ির ছাদে লাফ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করল। আর তখনই পুলিশের বন্দুক গর্জে উঠল। শ্যামের বিশাল সুঠাম দেহটা লুটিয়ে পড়ল ছাদের ওপর।

নকশালরা সিঁথির সব রাস্তার আলো সন্ধের পর থেকেই নিভিয়ে রেখে দিত। পুরোপুরি ব্ল্যাক আউট। একদিন সন্ধেবেলায় রায়পাড়ার মুখে আর্মির একটা জিপ হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। জিপে ড্রাইভার ছাড়া সেনাবাহিনীর তিনজন ছিলেন। তাঁরা জিপটা ঠেলে রাস্তার একধারে নিয়ে এলেন। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার মধ্যেই তাঁরা ইঞ্জিন খুলে দেখতে লাগলেন, কি গণ্ডগোল হয়েছে। নায়েক মোহন সিং গাড়ি সম্পর্কে কিছু বোঝেন না। তাই একটু দূরে শিবনাথ স্মৃতি সংঘের ক্লাব ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। ড্রাইভার ও অন্য দুজন জওয়ান মিলে গাড়ি ঠিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্ধকারে তাদের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। সাথে টর্চও নেই। আশেপাশের বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ, তারই ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প আলো বেরিয়ে আসছে, তাই ভরসা। ধারেকাছে কোনও দোকানও খোলা নেই যে মোমবাতি কিনে আনা যাবে। অগত্যা ওঁরা মাঝে মাঝে দেশলাই জ্বালিয়ে, কাগজ পুড়িয়ে ইঞ্জিনের ভেতরটা দেখছেন।

একটু দূরে রায়পাড়ায় একটা গলির ভেতর বসেছিল গোখনা, পুতুল, বিপাশা, কেলো, শঙ্কু। অন্য কোথাও গিয়েছিল বাপী। সে তার কমরেডদের কাছে ফিরে আসতে গিয়ে দেখতে পেল মোহন সিংকে। ক্লাবঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর দেখল রাস্তার ধারে জিপ নিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে জওয়ান দুজন। চারদিক জনমানবশূন্য। মাঝে মধ্যে দু-একটা লরি হুস হুস করে চলে যাচ্ছে। লরির হেডলাইটের আলো সরে যেতেই আবার গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে চারদিক। সন্ধে তখন সবে মাত্র সাতটা-সাড়ে সাতটা। দূর থেকে ভেসে আসছে বোমার বিকট আওয়াজ, হয়ত অন্য কোনখানে অন্য কোন নকশাল দল "শ্রেণীশত্রু" খতম করছে। বাপীর রক্ত নেচে উঠল, সামনেই রয়েছে শিকার। বাপী গোখনাদের কাছে এসে বলল, "এক্ষুণি দেখে এলাম, ক্লাব ঘরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে একটা মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। আমি মালটাকে খতম করে দিয়ে আসছি, তোরা আমার পেছনে থাকবি, যাতে কেউ এসে পড়লে বোমা মারতে পারিস।" শঙ্কু, গোখনারা তো একপায়ে খাড়া।

বাপী অন্ধকারের মধ্যে হাতে একটা মাংস কাটার চপার নিয়ে বেড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল। একটু তফাতে পেছন পেছন আসতে লাগল গোখনা, শঙ্কু, বিপাশারা। মোহন সিং টেরও পাচ্ছেন না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক অক্লান্ত কর্মী, বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। তিনি কি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন এই কলকাতার অলিতে গলিতে লুকিয়ে আছে আততায়ীরা? যাদের নিশ্চিন্তে বাঁচার জন্য বহিরাক্রমণের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় তাদের ভিতরই রয়েছে পরম শত্রু, সে অত সব বোঝেনি, বুঝলে, একান্তভাবে ক্লাবঘরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে তার সাথীদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে জীপ সারানোর কাজ দেখত না। বাপীর বিড়ালের মত চোখ, হরিণের মত ক্ষিপ্রতা, হায়নার মত রক্তে হিংস্রতা। মোহন সিংয়ের একেবারে কাছে গিয়ে বাপী শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁই করে গলা লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল চপার। দ্বিতীয়বারের কোপ সামলানর জন্য মোহন সিং একবার ডানহাতটা তোলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছোট্ট একটা আঃ শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা গেল না। ধুপ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। ততক্ষণে বাপীর চপার তাঁর গলায় আরও দুবার আঘাত করে ফেলেছে। লুটিয়ে পড়া মোহনের দেহটা বাপী পা দিয়ে ঠেলে দেখে নিল, "মহান" কর্তব্য পুরোপুরি পালন করতে পেরেছে কিনা। হয়েছে, মোহন আর বেঁচে নেই, গলা থেকে শরীর প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। "শ্রেণীশত্রু" মোহন সিং খতম। বাপীর এই নিষ্ঠা নিদর্শন হিসেবে দেখিয়ে আগামীকালই হয়ত তাদের "শ্রদ্ধেয় নেতা" চারু মজুমদার লিখে ফেলবেন আগুনঝরা প্রবন্ধ, যা লিফলেটের মত পার্টির মধ্যে বিলি হয়ে গিয়ে কমরেডদের উদ্বুদ্ধ করবে। বাপী তার সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকে গেল রায়পাড়ার ভেতর। ওদিকে মোহনের সঙ্গী অন্য জওয়ানরা জানতেও পারেনি, তিনি ক্লাব ঘরের সামনে খুন হয়ে শুয়ে আছেন রক্তাক্ত মাটির বিছানায়। জিপ সারানর পর ওরা মোহনকে ডাকতে লাগল। ডাকাডাকিতে কোনও সাড়া না পেয়ে ওরা ক্লাব ঘরের সামনে চলে এল, আবিষ্কার করল গলা কাটা মোহনকে। ওরা হতবাক। কলকাতার বুকে বিনা প্ররোচনায়, বিনা শত্রুতায় মোহন সিং এইভাবে খুন হয়ে যাবেন এ তো চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। ওরা জওয়ান, সদা সতর্ক, মোহন কি নিহত হওয়ার আগে এতটুকুও আভাস পাননি আততায়ী আসছে? জিপ নিয়ে তাড়াতাড়ি ওরা চলে গেল কাশীপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে তুলে নিয়ে এল মোহন সিংয়ের মৃতদেহ।

সিঁথির নকশাল মেয়েরা যথেষ্ট নারীবাদী ছিল। বাপীর একক প্রচেষ্টার এই সাফল্যে তারা উৎসাহ পেল। নারীরা যে পুরুষদের সমান "বিপ্লবী", তা হাতেনাতে দেখান দরকার বলে হঠাৎ মনে হল তাদের। বিপাশা, ডি. ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা মিলে শিকার ঠিক করল। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর প্রদীপ ভট্টাচার্য। সে পেয়ারাবাগান-রাজাবাগানের মোড়ের কাছে সরু গলির ভেতর বিধবা মাকে নিয়ে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে থাকত। বহু বছর ধরে ওরা ওখানে আছে। সবাই ওকে চেনে, তাই নকশালদের মুক্তাঞ্চল হিসেবে কুখ্যাত হলেও পাড়া ছেড়ে উঠে যাওয়ার গরজ দেখায়নি। যতই ওরা পুলিশ খুন করুক, সে কখনও নিজে পাড়ার মধ্যে পরিচিত কারও হাতে খুন হতে পারে, সেটা স্বপ্নেও ভাবেনি।

প্রতিদিনের মত সেদিনও প্রদীপ সকালবেলা মায়ের রান্না করা ভাত খেয়ে ডিউটিতে যাচ্ছিল। একটু দেরি হয়ে গেছে, তাই দ্রুত পা চালিয়ে যাচ্ছে বাস রাস্তার দিকে। সেভেন ট্যাঙ্কস লেনের মোড়ে আসতেই পেছন থেকে মাথার ওপর পড়ল লোহার রডের বাড়ি। প্রদীপ আছাড় খেয়ে পড়ল রাস্তায়। উঠতে চেষ্টা করল একবার, কিন্তু আবার মাথায় আঘাত, তারপর ক্রমাগত চপার আর তরোয়ালের ঝড়। প্রদীপের দেহ থেকে বেরিয়ে গেছে প্রাণ। তবু বিপাশা, ডি. ব্যানার্জিরা প্রদীপের মাথাটা খাসী কাটার কায়দায় চপারের এক কোপে বিচ্ছিন্ন করে দিল দেহ থেকে। রাস্তায় পড়ে রইল প্রদীপের মুণ্ডুহীন দেহ। কিছুটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে মায়ের সাজিয়ে দেওয়া টিফিন কৌটোটা। বিপাশারা সবাই মিলে প্রদীপের রক্ত নিজেদের পায়ে আলতার মত পরে নিল। তারপর প্রদীপের কাটা মাথাটা নিয়ে উল্লাসে লোফালুফি খেলতে লাগল। হাতে মুখে যত ছিটকে ছিটকে রক্ত লাগল তত ওদের উল্লাস বাড়তে থাকল।

চারপাশের লোকজন বিস্ময়ে হতবাক। নকশাল তাণ্ডবে তাঁরা অভ্যস্ত, কিন্তু বাঙালি তরুণীরা এমন কাজ করতে পারে এটা স্বপ্নের অতীত ছিল। চারদিকের বাড়ির দরজা জানালা দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল। নকশাল তরুণীদের স্লোগানে স্লোগানে ঝরে পড়ছে বিপ্লবের বীভৎস

রস। এরপর ওরা নিয়ে এল একটা প্লাস্টিকের তারের ব্যাগ। সেই ব্যাগের ভেতর প্রদীপের কাটা মাথাটা ঢুকিয়ে পাড়ার মধ্যে মিছিল করে ঘুরল। তারপর একটা লাইটপোস্টের মাথায় প্রদীপের মুণ্ডু সমেত ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল রায়পাড়ার দিকে নিজেদের গোপন আস্তানায়। খবর পেয়ে প্রদীপের মা ছুটতে ছুটতে এসে পাগলের মত আছড়ে পড়লেন প্রদীপের বিকৃত দেহে, হাহাকার করতে করতে বারবার চোখ তুলে দেখতে লাগলেন, ঝোলান মুণ্ডুটা কি সত্যিই তাঁর ছেলের? অভাগিনী মায়ের শেষ আশা, যদি ওটা প্রদীপের না হয়ে অন্য কারও হয়।

এরপর গোপালের পালা। পাইকপাড়ার গোপাল শীল সি পি এম করত। তাই ওর ওপর রাগ ছিল নকশালদের। সিঁথির নকশাল নেতা শ্যামল চৌধুরী একদিন পাইকপাড়ায় গিয়েছিল কোন কাজে। দেখল, গোপাল অন্য একটা বাড়ি থেকে বেরচ্ছে, তার মানে বোঝা গেল সেই বাড়িতে সে রাতে গোপনে থাকে। খবরটা চিটকে, বিপাশাদের দিল শ্যামল। তারপর তারা শুরু করল পরিকল্পনা কিভাবে গোপালের মত "শ্রেণীশত্রুকে" খতম করা যায়। পাইকপাড়ার নকশাল পার্থকে ডাকা হল কারণ সে ওই দিককার সব গলি ঘুপচি চেনে। ঠিক হল, ভোরবেলায় বিপাশা গোপালকে বাড়িতে গিয়ে ডাকবে। গোপাল বাড়ি থেকে বেরলে বিপাশা ইনিয়ে বিনিয়ে তাকে বলবে, নর্দার্ন অ্যাভিন্যুয়ের দিকে যাওয়ার সময় কটা ছেলে তাকে ধরবার চেষ্টা করছিল, কোনমতে পালিয়ে এসেছে। গোপাল যেন ওকে একটু এগিয়ে দেয়। গোপাল কোনরকম সন্দেহই করবে না, বিপাশাকে গোপাল ভালভাবে চেনে। গোপালকে নিয়ে বিপাশা একটা পয়েন্টে পৌঁছলেই শ্যামল, চিটকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ছক অনুযায়ী একদিন কাকভোরে বিপাশা গোপালের বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতে শুরু করল, "গোপালদা, গোপালদা।" গোপাল মেয়েলি গলার ডাক শুনে বেরিয়ে এসে বিপাশাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, "কি ব্যাপার বিপাশা, এত ভোরে এখানে? আর আমি এই বাড়িতে থাকি তুমি জানলেই বা কি করে?" বিপাশা ভয়ার্ত গলায় বলল, "আমি প্রায়ই রাতের দিকে এদিকে আসি, আপনাকে দেখি এই বাড়িতে ঢুকতে, তাই। গতরাতেও এসেছিলাম, আজ ফেরার পথে শীতলা মন্দিরের কাছে কতগুলো ছেলে আমাকে তাড়া করল। আমি কোনওমতে পালিয়ে এসেছি। আপনি যদি একটু এগিয়ে দেন, খুব ভাল হয়।" গোপাল সরল বিশ্বাসে বলল, "চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।" গোপাল আর বিপাশা নর্দান অ্যাভিন্যু ধরে এগিয়ে শীতলা মন্দিরের সামনে আসতেই শ্যামল, চিটকে, পার্থ তরোয়াল আর ছুরি নিয়ে গোপালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পেটে, বুকে, গলায় কোপের পর কোপ। গোপালের গলার স্বর নর্দার্ন অ্যাভিন্যুয়ের কোনও বাড়িতে পৌঁছনর আগেই সে লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। কাজ শেষ। পাশেই রাস্তার কলে শ্যামলরা ধুয়ে নিল তরোয়াল, ছুরি, হাতের রক্ত। তারপর সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল সিঁথির দিকে। ভোরবেলা পাইকপাড়ার মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল শীতলা মন্দিরের সামনে পড়ে আছে রক্তাক্ত এক দেহ। মুখে মুখে প্রশ্ন, মন্দিরের সামনে বিংশ শতাব্দীর শেষে কে দিয়ে গেল নরবলি?

বেদিয়াপাড়াতে পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে সি. পি আই (এম) ক্যাডার বাচ্চা নামে একটা অল্পবয়সী ছেলেকে গোখনা, বাপীরা নৃশংসভাবে খুন করল। সন্ধেবেলা তার বাড়ির সামনে জাপটে ধরে, কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বুকে পিঠে পরপর ছুরি চালিয়ে খুন করে চলে গেল।

সি.পি.আই (এম)-এরই সদস্য ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানির কর্মী শক্তিপদ মজুমদারকে রতনবাবু রোডে ধরে একটা গলির ভেতর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে নীলুরা খুন করল।

সাউথ সিঁথি রোডে কুণ্ডু ফার্মাসির কাছে শঙ্কু, বাপী মিলে খুন করল সিপাই সাহিন্দার সিংকে। পুলিশের গুপ্তচর বানিয়ে নাইটগার্ড সলিল দেকে খুন করল নকশালরা।

সিঁথি ও কাশীপুর অঞ্চলে নকশালদের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে প্রতিদিনই আমাদের অভিযান

চালাতে হত। কোনদিন কারোকে ধরতে পারতাম, কোনদিন শূন্য হাতে ফিরতে হত। কোনদিন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারতাম, কোনদিন পারতাম না। সিঁথির বেণী কলোনি, বিশ্বনাথ কলোনি, অপূর্বকৃষ্ণ লেন, রামকৃষ্ণ ঘোষ লেনের সবচেয়ে বেশি মানুষ বাড়ি-সম্পত্তি ফেলে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। যারা ওখানেই রয়ে গিয়েছিল, তাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি রাখতাম না।

আগস্ট মাসের এক রাতে কাশীপুরে একটা ঝোপঝাড় ভরা এলাকায় তল্লাশি চালাতে গেছি, হঠাৎ দেখি একটা সরু গলির ভেতর থেকে তিনটে ছেলে ছুটে আসছে। চারপাশে পুলিশ ঘিরে রেখেছে বুঝতে পেরে এলোপাথাড়ি বোমা মারতে শুরু করল। আমরাও গুলি চালালাম। বোমা গুলির শব্দে সারা এলাকা কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ পর রণে ভাঙ্গ দিল ওরা। গলির ভেতর এগিয়ে দেখি তিনজনের মধ্যে দুজন পালিয়েছে, একজন পড়ে আছে। সে সিঁথির নকশাল নেতা শ্যামল চৌধুরী।

সিঁথির কিছু বাড়ি সেসময় ফাঁকা পড়ে থাকত। আসলে বাইরে থেকে দেখলে মনে হত ফাঁকা, কিন্তু নকশালরা ওখানে আত্মগোপন করত। সেইসব ফাঁকা বাড়িতে দিনে অভিযান চালাতাম আর মাঝে মধ্যে কিছু সিপাই রেখে আসতাম, যাতে নকশালরা রাতে আত্মগোপন করতে এলে আমাদের ফাঁদে ধরা পড়ে। রাতে আবার আমরা ওই এলাকায় অপারেশন চালাতে গেলে সিপাইরা বেরিয়ে আসত।

আমাকে হত্যা করার জন্য গোধনারা একবার পরিকল্পনা করল। আমি সাধারণত জিপ নিয়ে যেতাম। কোনদিক দিয়ে ঢুকব, আগে থেকে নিজে চিন্তা করে রাখলেও কারোকে সেটা বলতাম না। একদিন ওরা রায়পাড়ার মুখে ৩০বি বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে, কালীতলার মোড়ে ও বেদিয়াপাড়ার মোড়ে মূল তিনদিকের রাস্তাই পুরো খুঁড়ে রেখে দিল। সন্ধের আগেই রাস্তার সব আলো খুলে ফেলে এলাকায় কার্ফু জারি করে দিল, যাতে কোনও সাধারণ লোক ওই দিকে না আসে। আশেপাশের দোকানগুলো এমনিতেই সন্ধেবেলায় বন্ধ হয়ে যেত, সেদিন ওরা আরও আগে বন্ধ করে দিল। এলাকার বাড়িগুলোতে আলো জ্বালাতে ধারণ করে দিল। তারপর তিনটে ট্রেঞ্চেরই দুদিকে বোমা, গ্রেনেড, রাইফেল, পিস্তল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন আমি আর অন্যান্য অফিসাররা যাই। ট্রেঞ্চের ওপর দরমা জাতীয় জিনিস দিয়ে তার ওপর মাটি ছড়িয়ে দিয়েছিল, যাতে দূর থেকে জিপের হেডলাইটে বোঝা না যায় ওখানে রাস্তা কাটা আছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর একটা জিপ গিয়ে বেদিয়াপাড়ার ট্রেঞ্চের মুখে উল্টে পড়ল। "বাপরে বাপ" বলে চিৎকার করে ড্রাইভার আর এক মাতাল আরোহী ছিটকে রাস্তায়। ওদের দেখে গোখনাদের কেমন সন্দেহ হল। ওরা বোমা না মেরে, টর্চ জ্বালিয়ে দেখে নিল পুলিশ কিনা। না, পুলিশ নয়, আর যাকে মারার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে সে তো নয়ই। গালাগালি দিয়ে তাড়াতাড়ি দুজনকে তুলে আটকে পড়া জিপটা ট্রেঞ্চ থেকে ঠেলে রাস্তা পার করিয়ে দিয়ে আবার অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। সেদিন অবশ্য ওখানে আমি যাইনি, গেলে যে আর ফিরে আসতে পারতাম না সেবিষয়ে পরও আমি নিশ্চিত। নকশালদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। এরকম বহুবারই আমি নকশালদের হাতে খুন হতে হতে অদ্ভুতভাবে বেঁচে গিয়েছি।

একবার কুমোরটুলি অঞ্চল ঘেরাও করে সারারাত ধরে তল্লাশি চলছিল। ভোর চারটে নাগাদ সি.আর.পি. বাহিনী চলে যাওয়ার পরও আমরা টহল দিচ্ছিলাম। আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। ফিরে যাব লালবাজারে। আমি আর কনস্টেবল শচীন চক্রবর্তী অন্যদের থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমি নর্দমার দিকে এগচ্ছি, একটু দূর থেকে একটা ছেলেকে ঠোঙায় মুড়ি খেতে খেতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। এত ভোরে ওইভাবে মুড়ি খেতে দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল, আমি শচীনকে বললাম ছেলেটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে। ছেলেটা একটা ঠোঙা বাঁ হাতের তালুতে রেখে ডান হাত দিয়ে ঠোঙা থেকে অল্প অল্প মুড়ি নিয়ে চিবতে চিবতে আমাদের পেরিয়ে চলে গেল। শচীনও ঠিক খেয়াল রেখেছে, ছেলেটার পেছন পেছন যেতে লাগল।

আমার থেকে বিশ মিটার মত এগিয়ে ছেলেটা মুড়ি খাওয়া থামিয়ে ঠোঙাটা আমার দিকে ছুঁড়তে যেতেই শচীন এক লাফে ওর হাত ধরে ফেলল ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজে কুমোরটুলি কেঁপে উঠল। দেখি শচীনও নেই, ছেলেটাও নেই। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। আমি রাস্তার পাশে একটা বাড়ির দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধোঁয়া না কাটলে কিছুই বোঝা যাবে না। আমার অনুমান তবে ঠিকই ছিল, ছেলেটা মুড়ির ঠোঙার তলার দিকে বোমা রেখে, তার ওপরে মুড়ি ভরে খেতে খেতে আসছিল। আমিই যে তার আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলাম তাও ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি। অন্য কারোকে মারতে হলে সে আমাদের অতিক্রম না করে দূর থেকেই বোমাটা ছুঁড়ে দিতে পারত। কিন্তু তা দেয়নি। আমাকে পেরিয়ে গিয়ে ভালভাবে দেখে নিশ্চিত হয়ে তবেই বোমাটা ছুঁড়তে গিয়েছিল। ধোঁয়া অল্প হাল্কা হতেই দেখলাম, শচীন আর ছেলেটা দুজনেই রাস্তায় পড়ে আছে, কাতরাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে শচীনকে তুললাম। শচীনের ডান হাতটা প্রচণ্ড জখম হয়েছে, এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত। বোমার আওয়াজে আমাদের লোকেরা গাড়ি নিয়ে দেখতে এসেছে কি হয়েছে। সবাই মিলে শচীন আর আহত ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে হাসপাতালের দিকে ছুটলাম। হাসপাতালে শচীনকে বহুদিন থাকতে হয়েছিল। আর নকশাল গৌরের একটা হাত উড়ে গিয়েছিল।

মধ্য কলকাতায় নকশালদের ভেতরে আমার এক ভাল সোর্স ছিল। একদিন সে লালবাজারে এসে খবর দিল, রামকান্ত মিস্ত্রি লেনের একটা বাড়িতে পরের দিন সন্ধেবেলায় নকশালরা মিটিং করবে। সেই খবর অনুযায়ী আমি অন্য কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে গেলাম। রামকান্ত মিস্ত্রি লেনের সরু গলির মধ্যে ঢুকে বাড়িটার খোঁজ করতে শুরু করলাম। নকশালরাই আগে থেকে এলাকাটা অন্ধকার করে রেখেছিল। আমরা গলির ভেতর একটা তিনতলা বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়লাম। দরজাটা ভেজান ছিল, আস্তে খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বোমা পড়তে শুরু করল। আমরা চারজন গলির ভেতর ছিলাম। বোমা পড়ার শব্দে চোখের পলকে বাড়ির ভেতর ঢুকে সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম। বুঝলাম, আমাদের মিটিংয়ের খবর দিয়ে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। তখন বোমার আওয়াজে কানে তালা ধরার অবস্থা, গলির ভেতর সমস্ত বাড়ি কাঁপছে। ভাবছি বোমার শব্দ পেয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়ান আমাদের ওয়ারলেস ভ্যান থেকে লালবাজারে নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা রামকান্ত মিস্ত্রি লেনে আক্রান্ত। উঠতে উঠতে আমরা চারজন ততক্ষণে বাড়িটার ছাদে উঠে গিয়েছি। বাড়িটার দু-একটা ঘরে আলো জ্বালান দেখেছি। কিন্তু কোনও লোক দেখতে পাইনি। সবাই বোমার ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা ছাদে উঠে উঁকি মেরে দেখলাম নকশালরা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। আমরা যে এখানে আছি সেটা ওদের বুঝতে দেওয়া চলবে না। সেজন্য ছাদ থেকে ওদের লক্ষ্য করে গুলিও ছুঁড়তে পারছি না। একবার জানতে পারলে ওরা ছাদের ওপরই বোমা ছুঁড়বে। একটু পর দেখলাম আমাদের ফোর্স গলির মধ্যে ঢুকে রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। নকশালরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পিছু হটছে। এই সুবর্ণ সুযোগ। আমরাও ছাদ থেকে ওদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগলাম।

ওদিকে লালবাজার থেকে এসে গেছে আরও ফোর্স। তারা ঢুকে পড়েছে গলির ভেতর। নকশালরা বোমা ছোঁড়া অব্যাহত রেখেছে। পাল্টা গুলি চলছে আমাদের দিক থেকেও। নকশালরা এবার পালাতে শুরু করেছে। থেমে গেছে বোমা বৃষ্টি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা ছাদ থেকে নেমে এলাম। যাঁদের আশ্রয়ে আমরা বেঁচে গেলাম, আমাদের জন্য যাঁদের বাড়ি বোমার আঘাতে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল, সেই লোকেদের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা অভদ্রতা মনে হল। আমরা দোতলার একটা ঘরে কয়েকজন বাসিন্দাকে পেয়ে গেলাম। মোট চারজন ছিলেন। তাঁরা সবাই ঘরে ঢুকে একটা কাঠের চৌকি ঘরের দেওয়ালে আড়াআড়িভাবে ঠেস দিয়ে তার পেছনে বসে কাঁপছিলেন। আমরা যেতে তাঁরা বেরিয়ে এলেন বটে, কিন্তু কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না কেউই। ভয়ে, বিস্ময়ে বোবা হয়ে

গিয়েছিলেন। আমি বললাম, "আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের বাড়িতে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম বলে আমরা বেঁচে গেলাম। আপনাদের বাড়ির বোধহয় অনেক ক্ষতি হয়েছে, সেজন্য আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।" চারজনের মধ্যে যিনি একটু বয়স্ক তিনি কোনমতে একটু বিড়বিড় করলেন, বোধহয় বোঝাতে চাইলেন ধন্যবাদ গ্রহণ করেছেন।

আমরা দ্রুত গলিতে নেমে এলাম, দেখলাম বাড়িটার অল্প দূরেই পড়ে আছে তিনটি তরুণের মৃত দেহ। নিহত তিন তরুণের নাম অনুপ, অশোক ও বাবলু। এদের প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে ছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা। ওরা আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেইমত আমার সোর্সকে দিয়ে মিটিংয়ের ভুয়ো খবর পাঠিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলে বোমায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি ঠিক গলিতে গিয়েও ভুল বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি দেখে, ওরা ধৈর্য হারিয়ে বোমা মারতে শুরু করেছিল। ভাবা যায় শুধু এই কারণেই আমি বেঁচে গিয়েছি !

এই ঘটনার থেকে আমি একটা শিক্ষা পেলাম। সোর্সকে কখনও লালবাজারে বা কোনও থানায় ডেকে খবর জানা উচিত নয়, তাহলে তার চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে। তখন সোর্স সঠিক খবর আনতে ব্যর্থ হয়। সোর্সকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করতেই হবে, তার কোন বিপদ যাতে না হয় সে খেয়ালও রাখতে হবে। আমার সেই নকশাল সোর্স অতি উৎসাহে লালবাজারে চলে আসত, তাই সে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল, নকশালরা সেই সুযোগ নিয়ে মিটিংয়ের ভুল খবর পাঠিয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিস্ত্রি লেনের ঘটনার পরদিনই আমার সেই সোর্সকে নকশালরা গলা কেটে কুপিয়ে হত্যা করল। ছুরি দিয়ে বুক ও পিঠের মাংস খাবলে খাবলে তুলে নিল ব্যর্থতার জ্বালায়। আমি একটা দিন সময় পেলেই তাকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু সে সুযোগ আমাকে নকশালরা দিল না। "বিশ্বাসঘাতককে" খুঁজে বের করে সাথে সাথেই খুন করে দিল।

ঠিক এই রকম না হলেও আরও একবার আমি নকশালদের ফাঁদে পা দিয়েও অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি। সেদিন গভীর রাতে একটা খবর পেয়ে পটলডাঙায় নকশালদের আস্তানায় হানা দিতে গিয়েছি। আমি, একজন অফিসার আর আমাদের দফতরের তিনজন সিপাই জিপে করে পটলডাঙ্গার মোড়ে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গেই শুনলাম কাছাকাছি কোথাও প্রচণ্ড জোরে বোমা পড়ল। আমরা জিপটা কিছুটা দূরে রেখে নেমে পড়লাম। এগিয়ে গিয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই, কতগুলো অল্পবয়সী ছেলে এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছে। আমরাও তাদের পেছন পেছন একজন দুজন করে ছুটতে লাগলাম। আমি যার পেছনে ছুটছিলাম সে একটা ভীষণ সরু গলির মধ্যে ঢুকে গেল। তার ডান হাতে ধরা রিভলবার। আমিও হাতে রিভলবার নিয়ে ছুটছি।

গলিটা এত সরু যে একজনের বেশি যাওয়া যায় না, উল্টো দিক থেকে কেউ এলে দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে একজনকে সরে দাঁড়াতে হবে। গলির মধ্যে আবার ডাইনে বাঁয়ে শাখাপ্রশাখা, তস্য গলি। চারদিক নিঝুম, রাত প্রায় আড়াইটে হবে। দু একটা নেড়ি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে এদিক থেকে ওদিক দৌড়ে পালাচ্ছে। আমি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছি, অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গলির ভেতর যাচ্ছি তো যাচ্ছি, আমার সামনে যে দৌড়চ্ছে, তার জুতোর আওয়াজ পাচ্ছি। সামনে একটা বাড়ি, দুদিকে গলির দুটো শাখা চলে গেছে।

আমি গলির মুখটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোনদিকে গেছে ছেলেটা, বাঁদিকে না ডানদিকে? জুতোর আওয়াজও আর শুনতে পাচ্ছি না, সে কি জুতো খুলে ফেলল পা থেকে? নাকি অন্ধকারে কোনও বাড়িতে চট করে ঢুকে পড়েছে? আমি গলির মুখটায় একটা বাড়ির দেওয়ালে পিঠ দিয়ে রিভলবার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কি করব, ফিরে যাব? ফিরতে গেলে পেছন থেকে আততায়ী এসে আমাকে গুলি করে দিতে পারে। পেছনে আততায়ী রেখে ফিরে যাওয়াটা বুদ্ধিমান গোয়েন্দার কাজ নয়। দু এক মিনিট দাঁড়িয়ে ভাবলাম।

বেশিক্ষণ ভাবার সময় কোথায়? এখানে এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ আততায়ীকে বেশি সুযোগ দেওয়া। সেও নতুন কৌশল ভেবে আমাকে আক্রমণ করবে। তার ওপর সে এই অঞ্চলের ছেলে, এখানকার সমস্ত গলি ঘুপচি তার নখদর্পণে। তাছাড়া যে কোনও বাড়িতে সে সুযোগমত ঢুকে পড়তে পারে, তারপর জানালা দিয়ে বা দরজার কোণে লুকিয়ে থেকে আমাকে গুলি করার সুযোগ নিতে পারে। আবার ঝট করে এখান থেকে বেরতেও পারছি না। বাঁ না ডান, গলির কোন দিকে সে আছে? হঠাৎ বাঁ দিকে জুতোর আওয়াজ পেলাম। শুনশান রাতে সেই অল্প শব্দটাই ভয়ঙ্কর হয়ে কানে বাজল। সারা কলকাতা ঘুমচ্ছে। এখানে ডুয়েল লড়ব আমি আর সেই ছেলেটা। পৃথিবীর কেউ তা জানে না, দেখছে না। পটলডাঙার মোড় থেকে হঠাৎ পরপর দুটো বোমার আওয়াজ পেয়ে বোধহয় কিছুটা চঞ্চল হয়েছিল। জুতোর খটমট শব্দ শুনেই আমি রিভলবার উঁচিয়ে নিমেষে বাঁ দিকের গলির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই দেখি ছেলেটা হাত পাঁচেক দূরে রিভলবার উঁচিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। এবার দুজনে দুজনের মুখোমুখি, সামনাসামনি। কারও পালানর পথ নেই, হয় আমি মরব, নয়তো সে। অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তি। দুজনেই একসঙ্গে গুলি ছুঁড়লাম। ছেলেটা আর্তনাদ করে টলতে টলতে পড়ে গেল। তার হাত থেকে খসে গেল রিভলবার। আমি দাঁড়িয়ে আছি। ছেলেটার রিভলবার থেকে খট করে একটা আওয়াজ হয়েছিল শুধু, গুলিটা খারাপ ছিল, ফাটেনি। আর দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেপার আগেই আমার রিভলবারের গুলি তার শরীর ছুঁয়ে ফেলেছে। ধাতস্থ হয়ে, আস্তে আস্তে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কে এই ছেলেটা যে আমাকে মারতে চেয়েছিল? অন্ধকারে আমি ঝুঁকে পড়ে তার মুখটা দেখলাম। দেখেই চমকে উঠলাম, এ তো শেখর, নকশাল নেতা শেখর গুহ। যাকে আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজছি। ডানহাতটা তুলে নাড়ি দেখলাম, কোনও সাড়া নেই, মনে হচ্ছে বেঁচে নেই। নাকের সামনে হাত নিলাম, নাঃ প্রাণের কোনও স্পন্দনই নেই। ওর রিভলবারটা তুলে নিয়ে পেছন ফিরলাম।

আশ্চর্য, কেউ কোথাও নেই। এত সরু গলির ভেতর গুলির শব্দে কোনও বাড়ির একটা জানালা থেকেও কেউ উঁকি মেরে দেখল না, এখানে কি হয়ে গেল। তখন কলকাতার মানুষ বোমা, গুলির শব্দে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে বিশেষ কোনও ভাবান্তর হত না। এই রাতে বিছানা ছেড়ে কে উঠে দেখবে গলির ভেতর কি ঘটছে? অথচ ওরাই পরের দিন, গল্প আর গল্পের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে গুজব ছড়িয়ে ছড়িয়ে বলতে থাকবে, "এই" ঘটনাটা "এই" ভাবে হয়েছে, আমি তখন "এই" করছিলাম, একদম চোখের সামনে ঘটনা ঘটল। আর সেই গল্পই প্রচার হয়ে এমন একটা আকার ধারণ করবে যে ওদের মিথ্যা গুজবটা একদিন সত্যে পরিণত হবে। এবং সত্যে পরিণত হওয়ার পর সাধারণ মানুষ সেই কথাটাই বিশ্বাস করবে। না, দোষ দিচ্ছি না, কে আর গোলাগুলির সামনে এসে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘটনার সাক্ষী হতে চায়? তার ওপর ওই গভীর রাতের অন্ধকারের ভেতর। আমি পটলডাঙার মোড়ে আমার সঙ্গীদের ডাকতে চললাম।

সত্যি কথা বলতে কি এভাবে কাউকে আমি মারতে চাইনি। এমনকি বহু খুনের ফেরারী নকশাল নেতা শেখরকেও নয়। কিন্তু উদ্যত রিভলবারের সামনে পরস্পরের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে দাঁড়িয়ে দুজনের যে কোনও একজনকে মরতেই হত। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মরিনি, সে মারা পড়ল। আমার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা তো ছিল না যে তাকে আমি গুলি করে মারব।

লালবাজারে বসে দুচারদিনের অনুসন্ধানেই জানতে পারলাম, শেখরই আমাকে মারার জন্য রামকান্ত মিস্ত্রি লেনে মিটিংয়ের খবর পাঠিয়ে ফাঁদ পেতেছিল। বোমা মেরে আমাকে উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় সে পরদিনই আমার সোর্স বাবুরামকে খুন করেছিল। কিন্তু তারপরও সে চুপ করে বসে থাকেনি, আবার আমাকে খুন করার ছক কষতে শুরু করেছিল। এবার মিটিংয়ের খবর না পাঠিয়ে গোপন আস্তানার খবর পাঠিয়েছিল, যাতে আমি ওদের ওখানে হানা দিয়ে গ্রেফতার করতে যাই। এই ছকে শেখর

সফল প্রায় হয়েই গিয়েছিল। আর একটু ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেই আমি ওদের ঠিক করা বাড়িতে ঢুকে যেতাম। বোমার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে রামকান্ত মিস্ত্রি লেনেই শুয়ে থাকত আমার শরীর। কিন্তু হাতের কাছে শিকার পেয়ে, সেটা ফস্কে যাওয়ার আশঙ্কায় ওদের মধ্যে কেউ ধৈর্য হারিয়ে প্রথম বোমাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। প্রথম বোমাটা যখন ছোঁড়া হয়েই গেছে, তখন আর অপেক্ষা করা অর্থহীন ভেবে পরপর ওরা আমাদের লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু প্রথম বোমাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই আমরা দ্রুত তিনতলা বাড়িটার মধ্যে ঢুকে শেলটার নিয়েছিলাম।

আর দ্বিতীয়বার শেখর ব্যর্থ হল নিজেরই ভুলে। যখন আমাকে ফাঁদে ফেলে গলির পর গলিতে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল তখন কেন সে একা আমাকে খুন করার দায়িত্ব নিল? তার সঙ্গে আরও দুতিনজনকে নিতে পারত। হয়ত সেই পরিকল্পনাই সে করেছিল, কিন্তু আমাদের তাড়ায় তার সঙ্গীরা এদিক ওদিক ছিটকে যায়। ফলে আমি আর শেখর ডুয়েল লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হই। কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ, রিভলবারের গুলিটা ফাটল না, পরিস্থিতি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আমি অক্ষত রইলাম, শেখর শুয়ে পড়ল। এভাবে বহুবার আমি ও আমার আরও অনেক সহকর্মী বেঁচে গেছি। কিন্তু এতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও কখনও আমরা ভয়ে পালিয়ে যাইনি। বরং প্রতিবারই নতুন জীবন পেয়ে নতুন উদ্যমে আবার যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে মৃত্যুর মুখোমুখি তো দাঁড়াতেই হবে, মৃত্যুও বরণ করে নিতে হবে। এটা চিরকালের সত্য। নকশালরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছিল, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার ইচ্ছায়। আর যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা "বিপ্লব" শুরু করেছিল, তার ক্ষমতায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই "বধূবরণের" মত তাঁদের বরণ করে নিজেদের ক্ষমতা তাদের হাতে দিয়ে বাড়ি চলে যাবেন না। তাঁরা তাঁদের রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে অভ্যুত্থান বা বিপ্লব দমন করবেন, এটাই নিয়ম, এটাই প্রক্রিয়া। আর ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র পরিচালকরা রাষ্ট্রের রক্ষীবাহিনীকে দিয়েই বিপ্লব কিংবা বিদ্রোহকে দমন করে। সুতরাং রক্ষীবাহিনীর অনেককে যেমন মৃত্যুবরণ করতে হয়, তেমনি যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ইচ্ছায় যুদ্ধ শুরু করে তাদেরও মৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে হয়। আমরা যারা রাষ্ট্রের রক্ষীবাহিনীতে চাকরি করি, তারা পালাই কি করে? যদি পালিয়েই যেতাম, তবে কি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কাজের দায়িত্বে থেকে সেই কাজটা না করার অভিযোগে অভিযুক্ত হতাম না? তাঁদের সাথে সেটা কি বিশ্বাসঘাতকতা হত না? আমরা যারা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নকশালদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিলাম, তারা কিন্তু কখনও মা-বাবা, স্ত্রী, পরিজনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেনি। আমাদের যেসব সহকর্মী সেদিন নকশালদের হাতে খুন হয়েছিলেন, সরকার কিন্তু তাঁদের পরিবারের জন্য প্রায় কিছুই করেননি। জানি, আমরা মারা গেলেও আমাদের পরিবার একইভাবে ভেসে যেত। তবু আমরা পালিয়ে যাইনি, দায়িত্ব এড়িয়ে যাইনি। সেই সময় কলকাতা পুলিশের কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ও সুনীল চৌধুরীর দক্ষ নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ চালিয়েছি। দিন নেই, রাত নেই, কখনও লালবাজারে, কখনও রণক্ষেত্রে। বাড়ির লোকেরা আতঙ্কে দিন কাটাত, বেঁচে আছি শুধু এটুকুই জানত, খুন হলে তো খবর আসবেই !

গোখনারা আমার জন্য ফাঁদ পেতে সারারাত অপেক্ষা করল, আমিও গেলাম না, লালবাজার থেকে সেদিন অন্য কেউও গেল না। ভোরবেলা ওরা মন খারাপ করে চলে গেল। ট্রেঞ্চ কাটার পরিশ্রমই মাঠে মারা গেল। সকালে স্থানীয় লোক মাটি ফেলে ট্রেঞ্চগুলো বন্ধ করে দিলে আবার গাড়ি চলাচল শুরু হল।

সিঁথি অঞ্চলে নকশালদের নেতৃত্ব দিত শ্যামল চৌধুরী, ডি. চক্রবর্তীরা। কিন্তু ওই সব অঞ্চলে ওদের পার্টির দায়িত্বে থাকা সোমনাথ ও দিলীপ ব্যানার্জিই ছিল আসল নেতা। এরা সিঁথিতে থাকত না, অন্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে থাকত। পার্টির নির্দেশ এদের মাধ্যমেই আসত। ওরা একাত্তরের জুলাইয়ের শেষদিকে গোখনাদের বলল, "শুধুমাত্র সি.পি.আই (এম) এর বিরুদ্ধে লড়াই করলেই চলবে না, কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই করতে

হবে। ওরাও আমাদের সমান শত্রু।” আর নকশালদের লড়াই মানেই খুন। এতদিন অন্য অঞ্চলে কংগ্রেসী নেতাদের নকশালরা খুন করলেও সিঁথির নকশালরা কিন্তু কংগ্রেসীদের ওপর খুব একটা হামলা চালায়নি। গোখনারা নেতাদের নির্দেশ মত ক্যুরিয়ার ডলির মারফৎ চারদিকে খবর পাঠিয়ে দিল। কংগ্রেসী নেতাদের গতিবিধির খবর নিতে হবে আগে।

খবর আসতে লাগল, কিন্তু সবই ছোটখাটো কর্মীদের। গোখনাদের ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না। দুএকদিনের মধ্যে সৎচাষী পাড়ার বাবলু আর স্বপন গোখনাদের খবর দিল, কংগ্রেসের নেতা নির্মল চ্যাটার্জি প্রতিদিন সন্ধেবেলা কাশীপুর রোড ও রতনবাবু রোডের সংযোগস্থলে নবজীবন সংঘের কাছে চায়ের দোকানে আসেন। ওখানে বসে আড্ডা দেন, গল্পগুজব করেন, লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। নির্মল চ্যাটার্জি ওই এলাকার খুবই জনপ্রিয় “ন্যাচারাল লিডার” ছিলেন। গোখনারা এবার শিকার পেয়ে গেল।

স্বপন ও বাবলুকে নিয়ে তারা আগস্টের প্রথমে একদিন সন্ধেবেলায় চায়ের দোকানে বসা নির্মল চ্যাটার্জিকে দূর থেকে দেখে এল। তারপর খুনের পরিকল্পনা শুরু করল। একাত্তর সালের বারই আগস্ট সন্ধে সাতটা নাগাদ গোখনা, শঙ্কু, বাপী, চিটকে, কেলো আলাদা আলাদা ভাবে নবজীবন সংঘের কাছে জড় হল। প্রত্যেকের কাছেই রয়েছে বিভিন্ন রকম আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা, ছুরি, চপার ইত্যাদি। ওদিকে নির্মলবাবু নিশ্চিন্তে চা খেতে খেতে আড্ডা মারছেন। হঠাৎ পরপর গুলির আওয়াজ, বোমা পড়ছে, নির্মলবাবু কিছু বোঝার আগেই চায়ের দোকানের সামনে লুটিয়ে পড়লেন। লোকজন সব ভয়ে পালিয়ে গেল। নকশালরা স্লোগান দিতে দিতে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহে আরও দুবার গুলি করে ছুটে পালিয়ে গেল।

নকশালরা চলে যেতেই চারদিক থেকে হৈ হৈ করে লোকজন এসে পড়ল। নির্মলবাবুর দেহ দেখে থমকে দাঁড়াল জনতা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা, নির্মলবাবু নেই, শুধুমাত্র প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে তাঁর সাধের নবজীবন সংঘের সামনে।

নির্মলবাবুর মৃত্যুসংবাদে কাশীপুর-সিঁথি অঞ্চলে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। শত ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা কাশীপুর থানায় গিয়ে পুলিশের “নিষ্ক্রিয়তার” অভিযোগ তুলে তুমুল হট্টগোল করল। কিন্তু আসল ঘটনা ঘটল তার পরদিন। অতীতের কংগ্রেস নেতা গণপতি শূরের ছেলের নেতৃত্বে শত ঘোষের দলের লোকেরা ও নবজীবন সংঘের ছেলেরা শ্রীচক্রবর্তীর পরিচালনায় সাধারণ মানুষকে ডাক দিল নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার জন্য। কাশীপুর-সিঁথি অঞ্চলে শুধু নকশাল বা তাদের পরিবার নয়, নকশাল মনোভাবাপন্ন তরুণ ও সমর্থকদের ওপরও ব্যাপক হামলা শুরু হল। সি.পি.আই (এম) ক্যাডারদেরও মারধর করল কংগ্রেসীরা। নকশাল সন্ত্রাসে ওই এলাকার মানুষজন এমনিতেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, ফলে কংগ্রেসীদের ওই হামলাকে তারা পূর্ণ সমর্থন তো জানালই, এমনকি তারা নিজেরাও “নকশাল তাড়াও, নকশাল মার” স্লোগানে মেতে উঠল। মানুষ “গণধোলাইয়ে” সামিল হয়ে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করল। সেই ঢেউ বরানগর অঞ্চলেও আছড়ে পড়ল। আর সেখানে কংগ্রেসীদের সাথে হাত মিলিয়ে সি.পি.আই (এম) ক্যাডাররা নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের এলাকা থেকে তাড়াতে লাগল। বেশ কিছু নকশাল সমর্থক তরুণ কাশীপুর - সিঁথি- বরানগরের এলাকায় কংগ্রেস-সি.পি.আই. (এম) এবং সাধারণ মানুষের সশস্ত্র হামলায় মারা গেল। এই অভিযান দুদিন ধরে চলেছিল।

যারা এই গণরোষের শিকার হয়েছিল, তার মধ্যে একমাত্র বাবলু বিশ্বাস ছাড়া আর কেউ কট্টর নকশাল ছিল না। সেই চোদ্দ পনের জন ছেলে অল্পবিস্তর নকশাল সমর্থক ছিল হয়ত। কিন্তু যাদের কার্যকলাপে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তারা ঠিকই নিজেদের লুকিয়ে রাখল গোপন আস্তানায়। পরবর্তীকালে যেসব নকশাল নেতা কুম্ভীরাশ্রু ঝরিয়েছে, তারাই কি ওই সব নকশাল সমর্থক তরুণদের মৃত্যুর জন্য প্রকৃত অর্থে দায়ী নয়? তাদের কর্মফলই কি নিরপরাধ যুবকদের ভোগ করতে হয়নি? তাদের “ব্যক্তিহত্যার রাজনীতির” পরিণতি

হিসেবেই কি দেখা যায়নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পাল্টা সন্ত্রাস? জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু ভবঘুরে লুম্পেনের কীর্তিকলাপের জন্যই কি এই অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি? আর ওই সব লুম্পেনদের তাণ্ডবকে যারা "রাজনৈতিক মতাদর্শের" মুখোশ পরিয়ে "বিপ্লবী কর্মকাণ্ড" বলে চালাতে চাইছিল, তারা কি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কোনদিন সচেতন ছিল? তারাই কি কাশীপুর -সিঁথি-বরানগরের দাঙ্গার জন্য দায়ী নয়? আগামী দিনের ইতিহাস কিন্তু তাদের কখনও ক্ষমা করবে না। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষে যতই গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে ভোটের বাজার তারা মাত করার চেষ্টা করুক না কেন, যতই দেশ আর জনগণকে প্রতারণা করে নিজের পিঠ বাঁচিয়ে তথাকথিত প্রগতিশীলতার ঢাক বাজাক না কেন তারা, ইতিহাসের চাকাকে নিজের অনুকূলে কখনও কেউ আনতে পারেনি, আগামীদিনেও পারবে না। এই আদিম সত্যটাকে অস্বীকার করবে কে? মৃত্যুর কারবারীরা নিজের মৃত্যু দেখে ভয় পাবে কেন?

নির্মল চ্যাটার্জিকে খুন করে নকশালরা নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই জড়িয়ে পড়েছিল। নির্মল চ্যাটার্জি কাশীপুর অঞ্চলে এত জনপ্রিয় ছিলেন যে কংগ্রেসীরা তাঁর মৃত্যুকে পুরোপুরি কাজে লাগাল। ওই অঞ্চলের জনসাধারণকে নকশালদের বিরুদ্ধে তাতিয়ে তুলতে তাদের কোনও অসুবিধাই হয়নি। নির্মলবাবু মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি কখনও রাজনৈতিক দলের ছাপ দেখে মানুষকে বিচার করতেন না, সবার পাশেই দাঁড়াতেন। ফলে তাঁর খুনটাই নকশালদের বিপক্ষে সাধারণ মানুষকে লেলিয়ে দেওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে কংগ্রেসীরা নিয়েছিল। আর সেই আবেগে এলাকার মানুষ ভেসে গিয়ে বেশ কিছু নকশাল সমর্থক তরুণকে হত্যা করে, এলাকা ছাড়া করে দিল। সেই গণ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রথমেই পুলিশের আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রথমদিকে পুলিশও দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। সেই ভাবটা কাটিয়ে প্রচণ্ড লড়াই করে দুদিনের মধ্যে গণরোষকে স্তিমিত করা গেল। কলকাতা পুলিশ কখনও চায়নি সাধারণ নাগরিক নিজের হাতে আইন তুলে নিক, কারোকে হত্যা করুক। তাই কলকাতা পুলিশ নিজেদের এলাকা ঘিরে রেখেছিল, দুর্ঘটনা যা ঘটার তা প্রায় সবই হয়েছিল কলকাতা পুলিশের এলাকার বাইরে। বেদিয়া পাড়ায় বাপী, গোখনা, পুতুলেরা একটা বহু পুরনো বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিল। সেখানে একরাতে আমরা অতর্কিতে হানা দিলাম। পালানর সময় পুরনো বাড়ির পাঁচিল ভেঙে বাপীর ডান পা জখম হল। গোখনারা বাপীকে নিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে গেল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুয়ের একটা নার্সিং হোমে রেখে এল তাকে।

একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই সিঁথি অঞ্চলে নকশালদের শক্তি ক্রমশ কমে আসছিল। কিন্তু তখনও ওরা মাঝেমধ্যে নানা জায়গায় হানা দিতে লাগল আমরা অভিযান চালালেই ওরা রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রেল লাইন পার হয়ে দমদমের দিকে চলে যেত। আবার আমরা ফিরে গেলে ক্যুরিয়ার মারফৎ খবর নিয়ে ফিরে আসত সিঁথি অঞ্চলে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমরা ঠিক করলাম, যেভাবেই হক সিঁথির আসল হার্ডকোর নকশালদের ধরে ওই অঞ্চলে তাদের রাজত্ব বন্ধ করব।

তিরিশে সেপ্টেম্বর বেদিয়া পাড়া, রায় পাড়া ঘিরে ফেললাম। রেল লাইন পার হয়ে যেদিক দিয়ে নকশালরা পালায় সেদিকে থমসন মেশিন গান নিয়ে লাহিড়ী আর রাজকুমার চ্যাটার্জি অন্যান্যদের সাথে একটা কাঠগোলায় লুকিয়ে রইল। ওরা দুজন সিঁথি দিয়ে না গিয়ে দমদমের দিক দিয়ে চাদরের ভেতর মেশিন গান নিয়ে ওখানে গেল। আমরা সিঁথির মূল রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন আরও কয়েকজন অফিসার ও সেপাই, তাছাড়া ছিলেন পরবর্তীকালের আই. পি. এস অফিসার রজত মজুমদার। তিনি তখন পুলিশেই চাকরি করতেন না। একটা বিশেষ মামলার সূত্রে তাঁর সঙ্গে লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের অনেক অফিসারের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি একটু অ্যাডভেঞ্চারাস্ ধরনের ছিলেন, তাই যখন শুনলেন আমরা ওই রাতে সিঁথিতে নকশালদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানে যাচ্ছি, তিনিও জোর করে আমাদের সঙ্গী হয়ে গেলেন। গুলিগোলার মধ্যে তাঁকে যেতে

আমরা অনেক নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি কোন কথাই কানে না তুলে আমাদের গাড়িতে উঠে বসলেন।

আমরা তল্লাশি করে করে এগিয়ে চলেছি, রাত প্রায় দুটো নাগাদ একটা গলির ভেতর থেকে একটা ছেলে আমাদের দিকে পরপর দুটো বোমা ছুঁড়ে মারল। আমাদের গাড়ির কিছু হল না। ছেলেটা বোমা ছুঁড়েই গলির ভেতর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমাদের সেপাইদের রাইফেল গর্জে উঠল। ছেলেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। চিনতে পারলাম না। বুলেট তার শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। পরে জেনেছিলাম তার নাম বেনু, হার্ডকোর নকশাল। বহু অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। সে যদি না তার আস্তানা থেকে বেরিয়ে আমাদের বোমা নিয়ে আক্রমণ করত, তবে ওইভাবে মারা পড়ত না। মৃত্যুই বোধহয় তাকে টেনে এনেছিল, নয়ত কেউ শুধু দুটো বোমা নিয়ে এত বড় ফোর্সের বিরুদ্ধে লড়তে আসে?

আমরা আরও এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু না, কোন নকশাল ডেরা থেকে বেরই হল না, কারোকেই গ্রেফতার করতে পারলাম না। দমদমের দিকে রেল লাইন পার হয়ে কেউ পালানর চেষ্টাও করল না। মনে হল, আমরা যে ওদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাব এবং ওদের পালানর রাস্তাতেও যে আমরা পাহারা বসিয়ে রাখব, 'সেই খবরটা ওরা আগেই পেয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা আসার আগেই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। এদিকে ভোর হয়ে আসছে, আমরা লালবাজারে ফিরে আসব ঠিক করেছি। হঠাৎ কেদারনাথ দাস লেনের একটা বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। আমাদের থেকে বাড়িটা পঁচিশ তিরিশ মিটার দূরে। দরজা খুলে প্রথমে বেরিয়ে এল একটা ছেলে, তার পেছন পেছন একটা মেয়ে। মেয়েটা ছেলেটার আড়ালে হাঁটছে। ছেলেটা আমাদের দেখেই একটু থমকে গিয়ে কোমরে গোঁজা রিভলবার চট করে বার করে গুলি চালাতে গেল। না, তার হাত ট্রিগারে পৌঁছনর আগেই আমাদের রিভলবার আর রাইফেলের গুলি ওকে বিদ্ধ করল। ছেলেটার হাত থেকে রিভলবার মাটিতে পড়ে গেল। মেয়েটা চিৎকার করে ওকে জাপটে ধরার চেষ্টা করল, পারল না। ছেলেটা মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল। আমরা ততক্ষণে এগিয়ে গেছি। মেয়েটাকে আমার চেনা চেনা লাগছে। এই সেই আটাপাড়া লেনের মেয়েটা না, পুতুল? যার বাবা আর মাকে দেবীবাবু আর আমি গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম, মেয়েকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে, যাতে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারি আগুন নিয়ে না খেলে সাধারণ জীবনযাপন করতে? মেয়েটা তখন হাউমাউ করে কাঁদছে। গুলির আওয়াজে, মেয়েটার চিৎকারে, ওই বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক উঁকি দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, “ওই ছেলেটার নাম গোখনা তো?” ভদ্রলোক বললেন, “হ্যাঁ, কিন্তু মাপ করবেন, আমার বাড়িতে গতরাতে ওরা জোর করে ছিল, ভোরবেলা চলে যাবে বলেছিল, কথা মত বেরিয়েও যাচ্ছিল, সেই সময় এই কাণ্ড।” জানতাম, তখন নকশালরা নিজেদের সব গোপন ডেরা হারিয়ে বাধ্য হয়ে রাতের দিকে বিভিন্ন বাড়িতে জোর করে ঢুকে যেত, ভোরবেলায় বেরিয়ে আসত। অনেক সময় বাড়ির মেয়েদের বিছানায় ঢুকে পড়ত যাতে তল্লাশিতে ছাড় পেয়ে যায়। সেই রাতে গোখনারা ওই বাড়িতে ঢুকেছিল। আমরা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়ি তল্লাশি করলাম, পেলাম একটা রাইফেল, যা গোখনাই রেখেছিল।

পুতুলের কাছে এগিয়ে এলাম, বললাম, “চল, এখন লালবাজারে যেতে হবে।” গোখনার মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমে পাঠিয়ে দিয়ে, পুতুলকে লালবাজারের সেন্ট্রাল লক আপে ঢুকিয়ে সেদিনের মত অভিযানের ইতি টানলাম।

গোখনা আর বেনু একই দিনে মারা যেতে সিঁথির হার্ডকোর নকশাল বাহিনী ভেঙে গেল। তার আগেই কংগ্রেসীদের আক্রমণে এবং কিছু কিছু জায়গায় সি.পি.আই (এম) ক্যাডারদের সহযোগিতায় অন্যান্য নকশালরা কেউ মারা গিয়েছিল, কেউ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। নকশাল আন্দোলন সিঁথি-কাশীপুর অঞ্চলে প্রায় বন্ধই হয়ে আসছিল। যারা বেঁচে ছিল তারাও এদিক ওদিক ছিটকে লুকিয়ে ছিল।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর বিপাশার ছোট বোনকে যে নকশাল ছেলেটা বিয়ে করেছিল, সেই কেলো একদিন বিপাশার বাবার কাছে পাঁচ হাজার টাকা দাবি করল। বিপাশার বাবা জামাইকে বললেন, "আমার কাছে অত টাকা নেই। তুমি যখন তখন আমার কাছে আসবে আর টাকা চাইবে, তা হতে পারে না।" কেলোর তখন মাথা আগুন, জুয়া খেলে সব হেরে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে টাকা চাইতে এসেছিল। আবার জুয়া খেলতে যাবে, সে কোন কথা শুনতে নারাজ। ধমক দিয়ে বলল, "আমি কোন কথা শুনব না, এক্ষুনি আমার টাকা চাই-ই চাই।" ভদ্রলোক বোধহয় একটু রেগেই উত্তর দিয়েছিলেন, "নেই, বলছি তো নেই।" কেলো তার মুখের ওপর "এতবড় কথা" শুনে, বুকের ভেতর লুকনো রিভলবার বার করে ভদ্রলোকের মাথা লক্ষ্য করে ছটা গুলিই চালিয়ে দিল। ভদ্রলোক এতক্ষণ খেতে খেতে কেলোর কথার উত্তর দিচ্ছিলেন, লুম্পেন নকশাল জামাইয়ের হাতে গুলি খেয়ে থালার ওপরেই লুটিয়ে পড়লেন। শ্বশুরকে হত্যা করে কেলো ওখান থেকে পালাল। কিন্তু বেশিদিন সে পালিয়ে থাকতে পারেনি। শ্বশুর হত্যা মামলায় তার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত নকশাল আন্দোলনের মত এত বড় ঝড় পশ্চিমবঙ্গ দেখেনি। আর আমাদের কাঁধে ছিল সেই ঝড়ের মোকাবিলা করার গুরুদায়িত্ব। এমন কোনও দিন বা রাত ছিল না, বোমা গুলির আওয়াজ ছাড়া কেটেছে। আমরা শুধু ছুটেছি আর ছুটেছি। পুরো বাহিনীই যন্ত্রের মত হয়ে গিয়েছিল। কখনও কখনও অবশ্য হঠাৎ থমকে যেত ছোটা, যখন আমাদের সোর্সগুলো ঠিকমত কাজ করত না। নকশালদের মধ্যে যেসব সমাজবিরোধী লুম্পেন ঢুকে পড়েছিল, তারাই ছিল আমাদের সোর্স। আসলে নকশাল পার্টিটা অনন্ত সিংয়ের দলের মত ঠাস বুনোট ছিল না। বরং ছিল অগোছাল, অপরিপক্ক, আলগা। তাই অনেক ভাল ভাল শিক্ষিত ছেলেমেয়ের সঙ্গে সমাজবিরোধীরাও পার্টিতে জায়গা করে নিয়েছিল। এইসব সমাজবিরোধীদের অনেককেই আমরা আগের থেকে চিনতাম। সোর্সগুলো খবর পাঠাতে ব্যর্থ হলে যেখানে সেখানে "ছাই" উড়িয়ে "অমূল্য রতন" খুঁজতে হত। শিকারীদের মত ফাঁদ পেতে বসে থাকতে হত। শিকারীরা ফাঁদ পাতে কোথায়? যেখানে তার শিকার আসার সম্ভাবনা আছে সেখানে। যেখানে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যবস্তু হাতে আসতে পারে সেখানে। আমরাও আমাদের লক্ষ্যবস্তু আমাদের ফাঁদে পা দেওয়ার সম্ভাবনা যেখানে যেখানে আছে, সেইসব জায়গাতে ফাঁদ পেতে রাখতাম। সেই সব জায়গা কলকাতা আর তার পাশ্ববর্তী অঞ্চল যেখানেই হোক না কেন। সেই সময় নকশালরা অনেক জায়গাকেই তাদের মুক্তাঞ্চল ভাবত। সিঁথি, বরানগর, বেলেঘাটার কিছু কিছু এলাকা এইসব মুক্তাঞ্চলের মধ্যে পড়ত। আসলে এখানকার অনেক বাসিন্দাই বোমা গুলির উৎপাত, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাড়িঘর ছেড়ে অন্য নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়েছিল। তারা অনেকেই আমাকে তাদের বাড়ির চাবি দিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে এমন এক-দেড়শ চাবি ছিল। এইসব অঞ্চল যেমন নকশালদের বিচরণভূমি ছিল তেমন আমাদেরও ছিল তাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের যুদ্ধক্ষেত্র। এলাকায় সাধারণ নাগরিক নেই বললেই চলে, যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে আদর্শ পটভূমি। ওরা যেমন আমাদের গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করত, আমরাও পাল্টা আক্রমণ করতাম। আর যুদ্ধক্ষেত্রে যা হয়, দুপক্ষেরই ক্ষয়, এখানেও তাই হয়েছিল। আমিও আমার বহু সহকর্মীকে হারিয়েছি।

সিঁথির এক তথাকথিত "মুক্তাঞ্চলে" একদিন আমরা ফাঁদ পাতলাম। অন্যদিনের মত সেদিনও সন্ধেবেলায় আমরা সেখানে তল্লাশি চালাতে গেলাম। ঢুকলাম একটা খালি বাড়িতে, সে বাড়ির। আশেপাশের অনেক বাড়িই খালি পড়ে ছিল। সেই বাড়িতে তল্লাশির অভিনয় করে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলাম। ভেতরে রেখে এলাম আমাদের আট জনকে। তারা বাড়ির ভেতর বিভিন্ন জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে রইল যাতে নকশালরা ওখানে ঢুকলে ধরা যায়। নকশালরা ওই বাড়িতে প্রায়ই রাত এবং ভোরের দিকে মিটিং করতে আসত। আমরা বাড়ির বাইরে তালা লাগাবার নাটক করে ওই অঞ্চল থেকে চলে এলাম।

আমাদের আটজন বাড়ির ভেতর বসে রইল। নিশ্চুপ। প্রহরের পর প্রহর চলে যেতে লাগল। চারদিক থেকে ভেসে আসছে গুলি আর বোমার আওয়াজ। ওরা দম বন্ধ করে বসে রইল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিড়ি-সিগারেট টানার প্রশ্ন নেই। এমনকি উপায় নেই প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার। রাত প্রায় দুটো বাজে, টুক করে একটা শব্দ। বেড়াল টেড়াল না কি নকশালরা এল? না, একটা লোক। ছোট্ট একটা টর্চ জ্বালিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। আমাদের লোকেরা বুঝতে পারল না ওই লোকটা ওদের দলের কিনা! একটু পরে ওর গতিবিধি লক্ষ্য করে যখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল সে এই বাড়ির কেউ নয় তখন ওরা লোকটাকে জাপটে ধরে একটা ঘরে বেঁধে রেখে আবার অপেক্ষা করতে লাগল। তখন ভোরের দিকেই নকশালরা বেশি আসত। কিন্তু ভোর হয়ে গেল, আর কেউ এল না। লোকটাকে নিয়ে পুলিশেরা চলে এল লালবাজারে। অনেক জেরা করে নিশ্চিন্ত হলাম, সে একটা চোর। চুরি করতেই সে ওই বাড়িতে ঢুকেছিল। আমাদের এত আশার ফাঁদে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল কিনা একটা চোর। বাঘ ধরতে গিয়ে পেলাম একটা ইঁদুর! চোরটার নাম আবার মহাদেব !

আমরা কিন্তু সেই ইঁদুরকে কাজে লাগিয়েই একদিন ধরেছিলাম এক বড়মাপের নকশাল বাঘকে। ওদের পরিভাষায় বলতে গেলে "কাগুজে বাঘ" !

মহাদেবের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, এ তো সাধারণ চোর নয়। অসাধারণ চোর তো, ধরা পড়ল কেন? আপনারা ভাবছেন, অসাধারণ চোর তো তারাই হয়, যারা ধরা পড়ে না। এ তো ধরা পড়ে গেছে, তাহলে আর অসাধারণ হল কই? আসলে ওর অসাধারণত্ব ছিল অন্যখানে, যেখানটা আমাদের কাজে লেগে গেল।

মহাদেবকে বললাম, "বাবা মহাদেব, তুমি তো যা তা চোর নও। তোমার নাম-মহিমাই বলছে তুমি বিরাট শক্তিধর।"

মহাদেব কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "না স্যার, আমি খুব গরিব, চুরি করা ছাড়া আর কোন কাজই আমার নেই।"

আমি বললাম, "তা তো ঠিকই, কিন্তু তুমি একটু আলাদা। যেখানে আমরাই একা খালি হাতে ঢুকতে ভয় পাই, সেখানে তুমি দিব্যি রাতের বেলা চুরি করে বেড়াচ্ছ আর নকশালরা তোমায় কিছু বলছে না, এটা আমায় বিশ্বাস করতে বল?"

মহাদেব চুপ করে রইল। অচেনা, অজানা, সন্দেহভাজন কোন লোক "নিজেদের এলাকায়" দেখলেই নকশালরা তাকে ধরে জেরা করত। ঠিকমত প্রশ্নের জবাব দিতে না পারলে তাকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিত। ধরেই নিত এ পুলিশের চর। কত নিরীহ কাগজকুড়ানী আর ফুটপাতবাসী যে তাদের হাতে এভাবে মারা গেছে তার ঠিক নেই। পুলিশ আর ওরকম আদ্যিকালের গুপ্তচরগিরিতে বিশ্বাসীই নয়। একমাত্র বাংলা সিনেমাতেই দেখা যায় এদের। যেখানে তাদের দলের ভেতর থেকেই আমরা খবর পাচ্ছি, অযথা একটা বাইরের লোককে কেন মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে যাব? রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে একটা লোক কি খবরই বা নিয়ে আসবে? তার থেকে সরষের মধ্যে ভূত ঢুকিয়ে দেওয়ার সূত্রটাই প্রয়োগ করেছি। তাতে হাতে নাতে ফলও পেয়েছি। সারা পৃথিবীর পুলিশই ভূত কেনা বেচা

করে। আমরা বাদ যাব কেন? ভাবি, যারা দেশে বিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার স্বপ্ন দেখেছিল, তারা এই সামান্য জিনিসটাই তখনও বুঝতে পারল না কেন? পারলে, নিরীহ কিছু লোককে ওই ভাবে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হত না। তাই মহাদেব যতই বোঝানর চেষ্টা করুক না কেন সে সামান্য একটা চোর, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করলাম না। শেষমেষ সে স্বীকার করল, সে সিঁথি অঞ্চলের নকশালদের চেনে আর তাদের সাথে তার ভালই যোগাযোগ আছে। তারপর ঠিক করলাম, ওকে সোর্স হিসেবে ব্যবহার করব। ও রাজি হল। ওই শর্তে ওকে আমি ছেড়ে দিলাম। তারপর থেকে মহাদেব আমাদের অনেক খবর দিতে লাগল। আমরা সেইসব খবরকে ভিত্তি করে ওই অঞ্চলের নকশালদের ছত্রভঙ্গ করতে শুরু করলাম। বিনিময়ে মহাদেবকে টাকাপয়সা দিতাম, যাতে ওকে আর চুরি করে খেতে না হয়।

মহাদেবের খবরে আমাদের অনেক উপকার হলেও বড় ধরনের কোন নকশাল নেতা বা গ্রুপকে তখনও আমরা সিঁথি অঞ্চল থেকে ধরতে পারিনি। এভাবেই কেটে গেল তিন-চার মাস। কিন্তু ওর কাজে আমি পুরোপুরি খুশি হতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এই ফাঁকটা ধরতে পারলেই কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারি। তবে এটুকু বুঝলাম, মহাদেবকে নকশালরা শুধুমাত্র ছোট একটা চোর ভাবে না, তার থেকে কিছুটা অন্যরকম। এই অন্যরকমটা কি এবং কেন? সে যে অবাধে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারছে, তা কি শুধু সে আজ নকশালের ভেক ধরেছে বলে নাকি এমন কিছু আছে যা আমরা এখনও জানি না?

গোপন সূত্র থেকেই জানলাম, মহাদের তার মার সঙ্গে থাকে। তার বাড়িতে আর কেউ নেই। মহাদেব তার মাকে খুব ভালবাসে। সেখানেই ওর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। প্রত্যেক মানুষেরই কোথাও না কোথাও দুর্বলতা থাকে, তা সে টাইসন কিংবা অরণ্যদেব যেই হোক না কেন। সেই দুর্বলতাটা জানতে পারলে আর সেটা ধরে ঠিকমত নাড়া দিতে পারলে অতি বড় শক্তিধর মানুষও নরম পুতুল হয়ে যায়। মহাদেবের দুর্বলতাটা জানি। ভাবলাম ওকে একটু নাড়া দিয়ে দেখি ফাঁকটা ভরাট করা যায় কিনা। একদিন মহাদেবকে ধরে নিয়ে এলাম। স্পষ্ট করে বললাম, "দেখ মহাদেব, তুমি আমার কাছে এমন কিছু গোপন করেছ যা তোমার উচিত হয়নি। সেই গোপন কথাটা যদি তুমি আমায় না বল তাহলে তোমার মাকে আমরা ধরে নিয়ে আসতে বাধ্য হব, তখন কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যাবে।"

মহাদেবের দুর্বলস্থানে ঘা দিয়েছি। মাকে ধরে নিয়ে আসব শুনেই ও ভেঙে পড়ল। এতদিন যেসব কথা আমাদের বলেনি, তা বলে ফেলল। মহাদেব বলল, সে কোনদিনই নকশাল ছিল না। কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশত শুধু নিজের চুরির পেশাটা ঠিকমত চালানর জন্য। এই সুবিধেটা সে পেয়েছিল তার দিদি সঞ্জু নকশাল বলে।

মহাদেবকে ছাড়লাম না। এতদিনে পেয়েছি ফাঁক ভরাটের সেতু, তার দিদি সঞ্জুর নাম। স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে খবর নিয়ে জানলাম, ঠিকই, সঞ্জু নামে একটা মেয়ে নকশাল নেত্রী। সিঁথি অঞ্চলে অনেকদিন ধরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। তার নামে অনেকগুলো মামলাও আছে। মহাদেবকে বললাম, "সঞ্জু এখন কোথায় ঠিক করে বল। তাকে আমাদের চাই।" মহাদেব বলল, তাকে দুদিন সময় দিতে হবে। তার মধ্যে সে খবর এনে দেবে। আমি ওকে শাসালাম, "ঠিক আছে, দুদিনের মধ্যে সঠিক খবর নিয়ে আসবে, নয়ত ফল খুব খারাপ হবে।"

ঠিক দুদিন পর মহাদেব ফিরে এল। জানাল, সঞ্জু এখন আছে বিহারের দেওঘরে। আমি জানতে চাইলাম, সঞ্জুর সাথে আর কে কে সেখানে গেছে? মহাদেব বলল, তা সে জানে না, তবে সঞ্জু সেখানে গেছে নকশালদের এক বড় নেতার সঙ্গে মিটিং করতে। তাকে নিয়ে যদি আমরা দেওঘরে যাই তবে সে দেখিয়ে দিতে পারবে সঞ্জু ঠিক কোথায় আছে। আমরা ভাবলাম, সঞ্জু নিশ্চয়ই একা দেওঘরে যায়নি, তার সাথে আরও অনেকে গেছে। কিন্তু কারা? আর নেতাটাই বা কে? একমাত্র দেওঘরে গেলেই পুরোটা বোঝা যাবে। সিদ্ধান্ত নিলাম, যাব।

মহাদেবকে সঙ্গে করে কুড়ি-পঁচিশ জনের দল হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে বসলাম। নামতে হবে যশিডি। হাওড়া থেকে কোনও ট্রেন সোজা দেওঘর পর্যন্ত যায় না। ট্রেনে উঠে আমাদের কি ফুর্তি! পিকনিক পিকনিক ভাব। এমনিতে তো আর ছুটিছাটা পাই না। এমন চাকরি যে মনের সব দুয়ার বন্ধ করে শুধু ছুটতে হয়। বাড়িঘর, সংসার, মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সমাজ, অনুষ্ঠান কিচ্ছু নেই। শুধু দৌড়। মাঝেমাঝে মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। নিয়েছি দায়িত্ব, চাকরি করছি সরকারের। জনসাধারণের পয়সায় মাইনে হয় আমাদের। তাদের কাছে তাই দায়বদ্ধ।

আজ যেন ছুটি। সবাই তারিয়ে তারিয়ে সেটা উপভোগ করছে। আমাদের মধ্যে কে যেন গান ধরেছে, "যাব না, যাব না, যাব না ঘরে"। হাসি ঠাট্টায় সবাই মশগুল। যেন ভুলে গেছে কি কাজে যাচ্ছে।

আমাদের ভোরবেলায় নামতে হবে যশিডি। ওখানেই আমরা থাকব। কলকাতার এক নামজাদা ভদ্রলোকের বাগানবাড়িতে। বাংলার রেনেসাঁস ও তার পরবর্তী যুগের তাবড় তাবড় বাঙালিরা গিরিডি, শিমুলতলা, ঝাঁঝা, যশিডি, মধুপুর, দেওঘর ঘিরে একটা ছোটখাট উপনিবেশ তৈরি করেছিলেন। একে বলা ভাল বাগানবাড়ির উপনিবেশ। আগে বাঙালি পরিবার এইসব স্বাস্থ্যকর জায়গায় লোটাকম্বল নিয়ে বছরে অন্তত একবার মাসখানেকের জন্য বেড়াতে যেত শরীর মন চাঙ্গা করার উদ্দেশে। বাগানবাড়ির কনসেপ্টটা যদিও "বাবু কালচারের" মধ্যে পড়ে, তবু আমার ভালই লাগে। সে আমলের বাগানবাড়ির কর্তারা অনেকেই রুচিশীল, সংস্কৃতিবান, সুশিক্ষিত ও অভিজাত ছিলেন। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন আমি একটু হেসে ফেলেছি। পাশে বসে ছিল শচী কিংবা সুকমল। জিজ্ঞেস করল, "স্যার, হাসছেন যে?"

আমি বললাম, "আমাদের ড্যানচিবাবু সেজে নামতে হবে, তাই।"

"ড্যানচি কি স্যার?" তার প্রশ্ন।

সাঁওতাল পরগনার গিরিডি, মধুপুর, যশিডি, দেওঘর ইত্যাদি জায়গায় আগে যখন বাঙালিবাবুরা চেঞ্জে যেত, সকালবেলায় দল বেঁধে বাজার করতে যেত। যে কোনও জিনিসের দাম কলকাতার তুলনায় এত কম মনে হত যে, বাঙালিবাবুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলত, "ড্যাম চিপ" "ড্যাম চিপ"। ইংরেজি "ড্যাম চিপ"-এর অর্থ আদিবাসীদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। আদিবাসীরা ওই "ড্যাম চিপ"টাকে "ড্যানচি" করে নিয়েছে। বাঙালিবাবুরা বাজারে ঢুকলেই ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, ওই যে "ড্যানচি বাবু" এসে গেছে। তাই আমি ভাবছিলাম এবার এতগুলো পুলিশ অফিসারকে পরিচয় গোপন করে ড্যানচিবাবু" হয়ে যেতে হবে।

এরকম টুকটাক গল্প করতে করতে আমি কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলায় যশিডি আসতে সঙ্গের কেউ আমাকে জাগিয়ে দিল। আমরা সবাই "ড্যানচিবাবু" সেজে যশিডি স্টেশনে নামলাম। যেন ট্যুরিস্ট, হাওয়া বদলে এসেছি। এমন কি মহাদেবকেও খুশিখুশি লাগছিল। সব বাঙালির মনের মধ্যেই একটা ছুটন্ত, ঘুরন্ত, উড়ন্ত "ড্যানচিবাবু" বাস করে। সুযোগ পেলেই ডানা মেলে বেরিয়ে পড়ে। হোক না সে চোর কিংবা লালবাজারের পুলিশ অফিসার।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম খোলা হাওয়ায়। কলকাতায় এর ভীষণ অভাব। তারপর অন্য ভ্রমণবিলাসী মানুষের মত আমরাও রিক্সায় চড়ে বসলাম। যে উদ্দেশে এসেছি তা কতটা সফল হবে জানি না, আপাতত এই চমৎকার ভোরবেলা তো প্রাণভরে উপভোগ করা যাক। দুর্গাপুজো গেছে, সামনে কালীপুজো। এখানে এখন বাতাসে বেশ ঠাণ্ডার আমেজ। যশিডির প্রায় শেষ প্রান্তে আমাদের গন্তব্যস্থল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম। গাছগাছালিতে ভরা, প্রাচীরঘেরা এক বিরাট বাড়ি। আগের থেকে বলা ছিল আমরা আসব, তাই কাজের লোকজন ঠিক করা আছে দেখলাম।

বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম, যে ভদ্রলোক শখ করে বাড়িটা বানিয়েছিলেন, তিনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন একদিন কলকাতার পুলিশ অফিসাররা এসে সেখানে শিবির গেড়ে বসবে? ইতিহাসের চাকা কখন কাকে কোথায় নিয়ে যায় কে জানে। সুন্দর করে সাজানো বড় বড় অয়েল পেন্টিং। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু! আমি ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। হায়রে বাঙালি! দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। ধসে গেছে অর্থনৈতিক কাঠামো। সমাজে শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। বাংলার এই মুখই কি দেখেছিলেন জীবনানন্দ !

"স্যার, চা।”

যেন স্বপ্নের থেকে জেগে উঠে বললাম, “দাও।” মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল কি কাজে এসেছি এখানে। মহাদেবকে ডেকে এনে বললাম, “চল মহাদেব আমাদের দেখিয়ে দাও কোথায় আছে সঞ্জু।” মহাদেবকে নিয়ে কয়েকমিনিটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম দেওঘর-বৈদ্যনাথধামের উদ্দেশে। তীর্থ ভ্রমণ ট্রমণ তো আর আমাদের কপালে নেই, ভাবলাম, এক কাজে দুকাজই হয়ে যাবে! বাবা বৈদ্যনাথ যেন আমাদের মুখ রক্ষা করেন!

দেওঘরে পৌঁছে মহাদেব বেশ কিছুটা ঘুরিয়ে আমাদের একটা বাড়ি দেখাল। বলল, “ওই বাড়িতেই সঞ্জু আছে। এখানেই বোধহয় এক বড় নকশাল নেতার সাথে মিটিং করছে।” বাড়ি দেখে আমরা মহাদেবকে আমাদের যশিডির আস্তানায় ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। যারা যশিডিতে ছিল তারা মহাদেবকে রান্নাবান্নার দায়িত্ব দিয়ে চলে এল। আমরা ওই বাড়ি রেড করব। কজন নকশাল ভেতরে আছে তা জানি না। তাই যত বেশি সম্ভব ফোর্স নিয়ে আক্রমণ করব। নকশালদের কাছে আধুনিক অস্ত্র নিশ্চয়ই আছে। তাই আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। আগের থেকে বুঝতে দিলে চলবে না। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের গ্রেফতার করতে হবে। নিয়মমত স্থানীয় থানায় গিয়ে আমাদের পরিচয় জানালাম। কি উদ্দেশে আমরা কলকাতা থেকে দেওঘর এসেছি তা বলার পর ওঁরা আমাদের সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন বেশ কিছু কনস্টেবল এল আমাদের সঙ্গে।

ওই বাড়ি ও তার চারপাশ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে ছক করতে লাগলাম কিভাবে, কখন, কোনখান থেকে আমরা আক্রমণ করব। বাড়িটা এমনভাবে ঘিরে রাখলাম যেন কেউ বুঝতে না পারে আমরা ওই বাড়ির ওপর কড়া নজর রেখেছি। কেউ ঢুকছে বা বেরচ্ছে কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখা হল। অন্যদিকে স্থানীয় সিপাইদের সাহায্যে আশেপাশের লোকজনের কাছ থেকে খবর যোগাড় করতে লাগলাম, বাড়িতে কে কে থাকে, কতজন থাকে, বাইরের কেউ সম্প্রতি এসেছে কিনা, এইসব।

যে বাড়িটা নিয়ে আমাদের এত কর্মব্যস্ততা, সেই একতলা বাড়িটা কিন্তু নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরের কোন কথাবার্তার বা জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার আওয়াজ কিছুই বাইরে থেকে পাচ্ছি না। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল।

অবশেষে জানা গেল, একটা আদিবাসী কাজের লোক ছাড়া ওই বাড়িতে আর কেউ নেই। এমন কি বাড়ির মালিকও প্রায় দু-তিনমাসের মধ্যে কলকাতা থেকে আসেননি। সারাদিনের পরিশ্রম তো বৃথা গেলই, উল্টে ওখানকার পুলিশের কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। ভাবছি, মহাদেব আমাকে এত বড় ধোঁকা দিল? প্রচণ্ড রেগে গেলাম মহাদেবের ওপর। কি আর করব, সন্ধেবেলায় ফিরে এলাম যশিডি।

সারাদিন আমাদের কারও কিছু খাওয়া হয়নি। আগে খেয়ে তারপর ঠিক করব কি করা যায়। রান্না হয়েছে কি না দেখি। মহাদেবকে ডাকলাম। কিন্তু কোথায় মহাদেব? উনি তখন মহাযোগ করে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে। আসলে আমরা সবাই দেওঘর চলে যেতেই ও কাজের লোককে দিয়ে মহুয়া আনিয়েছে। তারপর সবাই মিলে খেয়ে ব্যোম ভোলানাথ হয়ে শুয়ে আছে। কোথায় রান্না? চাল, ডাল, বাজার যেমন আনা হয়েছিল তেমনই পড়ে আছে। এদিকে সবার পেটে ছুঁচোতে ডন মারছে। তার ওপর যে কাজে এসেছি তার কোন হদিস

নেই। একদিকে কলকাতায় ফিরে বড়সাহেবদের কি কৈফিয়ৎ দেব তার চিন্তা, অন্যদিকে খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছি। মহাদেব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমচ্ছে। আমাদের আর উপায় কি? হাত লাগালাম রান্নায়। ছোটবেলায় পিকনিকে দু-একবার শখ করে নুনছাড়া মাংস কিংবা পোড়া বেগুনি রেঁধেছি। সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লেগে গেল যশিডির সে রাতের পিকনিকে ! মহাদেবকেও জাগিয়ে সেবা করালাম। সেই এখন আমাদের হাতের পাঁচ, ওকে চটালে চলবে না।

ভুরিভোজের পর মহাদেবকে বললাম, "ব্যাপারটা কি? তুমি আমাদের এত দূর নিয়ে এলে ইয়ার্কি মারতে? যে বাড়িতে কেউ থাকে না তেমন একটা বাড়ি দেখিয়ে এখানে এসে মহুয়া খেয়ে ঘুমচ্ছ?" মহাদেব নির্বিকার মুখে বলল, "না স্যার, আসলে আমি আপনাদের দিনেরবেলায় বাড়ি দেখিয়েছি তো, তাই গুলিয়ে ফেলেছি, চিনতে পারিনি। রাতেরবেলায় নিয়ে চলুন, ঠিক চিনিয়ে দেব। দিনেরবেলায় আমার সব ওলোটপালোট হয়ে যায়।" হাসব না রাগব? ভাবলাম, আমাদেরই গোড়ায় গলদ। ব্যাটা চোর। দিনেরবেলাটা ওর ঘুমের সময়, রাতটা কাজের। রাতেই জেগে ওঠে। রাতই তো ওর দিন।

তাই হোক। মহাদেবের কথা শিরোধার্য করে রাত দশটা নাগাদ আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে যশিড়ি থেকে দেওঘরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

দেওঘরে পৌঁছে দেখলাম, মহাদেবের চোখ দুটো বেড়ালের মত জ্বলছে। নানা রাস্তা ঘুরিয়ে একটা বাড়ি সে দেখিয়ে দিল। বাড়িটা বেশ বড়, অন্ধকার। বুঝলাম ভেতরে যারা আছে তারা সবাই ঘুমচ্ছে। আবার আমরা স্থানীয় থানার থেকে সেপাই নিয়ে এলাম। ঠিক করলাম, সরাসরি রেড করব। প্রথমেই আমরা বাড়িটা ঘিরে ফেললাম। তারপর অন্ধকারের মধ্যে পাঁচিল টপকে খুব সন্তর্পণে বাড়ির কাছে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। স্থানীয় একজন সেপাই এ বাড়ির কাজের লোককে চিনত। সে লোকটার নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর, আদিবাসী গোছের একটা লোক দরজা খুলল। আমরাও আড়াল থেকে বেরিয়ে, সেই লোকটা কিছু বোঝার আগেই দ্রুত বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলাম। এঘর-ওঘর খুঁজতে লাগলাম। একটা ঘরে একটি মেয়েকে পেলাম। সেই-ই মহাদেবের দিদি সঞ্জু। সঞ্জু তো মহাদেবকে দেখে যা তা গালাগালি দিতে লাগল। আমি সঞ্জুকে প্রশ্ন করলাম, "আর কে কোথায় আছে, তাড়াতাড়ি বল। কোন নেতার সাথে তুমি মিটিং করতে এসেছ? নাম কি সেই নেতার? কোথায় সে এখন?" সঞ্জু বলল, "আমি একা এসেছি, কোনও নেতার সাথে মিটিং করতে আসিনি। কে কোথায় আছে আমি কিচ্ছু জানি না।" ধমকে উঠলাম, "ফালতু কথা শোনার সময় আমাদের নেই।" ও ফের বলল, "সত্যিই আমি একা এসেছি।" জিজ্ঞেস করলাম, "কেন এসেছ? ভয়ে?" সঞ্জু নিরুত্তর। কি করি? আমরা সঞ্জুকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর ওকে একটা টিলার ওপর নিয়ে গিয়ে একেবারে ধারে দাঁড় করিয়ে দিলাম। পেছনে গভীর খাদ। একজনকে বললাম সঞ্জুর দিকে রিভলবার তাক করে রাখতে, যাতে ও ভয় পায়। "বল এবার, নয়ত।" রিভলবারের সামনে দাঁড়িয়েও সঞ্জু একই কথা বলতে লাগল। সে একা ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে, কে কোথায় আছে কিছুই জানে না। এদিকে রাত বাড়ছে। আমি সঞ্জুকে বললাম, "সত্যি কথা না বললে ওরা কিন্তু তোমায় গুলি করে পেছনের খাদে ফেলে চলে যাবে। কেউ টের পাবে না, তুমি মরে পড়ে থাকবে। এখনও সময় আছে।" সঞ্জু তবু নির্বাক। স্থানীয় এক সেপাই আমায় হিন্দিতে বলল, "কি করছেন স্যার। ওই খাদের ওপাশেই এস-ডি-পি ওর বাংলো, এখানে গুলি করবেন না।" সেপাইরা ভেবেছিল, সত্যিই বোধহয় আমরা সঞ্জুকে মেরে ফেলব। আসলে ওকে যে আমরা শুধুই ভয় দেখাতে এখানে নিয়ে এসেছি তা ওরা বুঝতে পারেনি। সঞ্জুই তো এখন আমাদের নতুন সোর্স, তাকে মেরে ফেলে কি নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারব? শেষ পর্যন্ত সঞ্জুকে টিলা থেকে নামিয়ে দেওঘর থানায় মেয়েদের লকআপে রেখে যশিডিতে ফিরে এলাম।

যশিডি ফিরে সবাই বিছানা নিলাম। কিন্তু ঘুম আর আমার আসছে না। ভাবছি, কাল কি কলকাতায় ফিরে যাব শুধু সঞ্জুকে নিয়ে? তাহলে বলতে হয়, আমাদের এই অভিযান

পুরোপুরি ব্যর্থ। তার আগে সঞ্জুকে আবার জেরা করে দেখতে হবে যদি কোন আলো পাওয়া যায়। মেয়েটা ঠিক বলছে তো, ভয়ে পালিয়ে এসেছে? নাকি কোন নেতার সঙ্গে সত্যিই মিটিং করতে এসেছিল? এখন পর্যন্ত যত নকশাল দেখলাম, কজনই বা আমাদের জেরার মুখে দাঁড়াতে পেরেছে? বেশিরভাগ ধমকধামকেই ভেঙে পড়েছে। কান্নাকাটি করতেও কতজনকে দেখলাম। অথচ বাজারে রটেছে, আমরা নাকি দারুণ দারুণ নির্যাতনের কৌশল বার করেছি। সেসব নকশালদের শরীরে প্রয়োগ করছি। এসব প্রবাদে আমাদের লাভই হয়েছিল অবশ্য। অল্প ধমকেই ভয় পেয়ে সব বলে দিত বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে। মারধর করতে নিজেদেরও তো পরিশ্রম করতে হয় !

তবে কি পুলিশকে আদৌ বলপ্রয়োগ করতে হয় না? নিশ্চয়ই হয়, মাঝে মধ্যে হয়। পৃথিবীর সব দেশের পুলিশকেই করতে হয়। এমন কি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও। শুনেছি স্তালিন সাহেবকেও প্রচুর বলপ্রয়োগ করতে হয়েছিল। যদি তিনি সেসময় শক্ত হাতে দেশদ্রোহীদের না দমন করতেন, তবে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়াল দিনগুলোতে হিটলারের বাহিনীকে স্তব্ধ করে শান্তির পৃথিবী ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত? কোন কোন সময় কি পরিস্থিতিতে পুলিশকে ওই পন্থা নিতে হয়? একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে। ধরুন, হেমন্ত বসুর মত এক বড় মাপের নেতা খুন হলেন। পুলিশ কোনও সূত্র পাচ্ছে না। খুনীদের ধরা যাচ্ছে না। সরকার থেকে পুলিশকে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে। জনসাধারণের দিক থেকেও আসছে চাপ। পত্রপত্রিকায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার বিস্ফোরক অভিযোগ। চারদিকে মিটিং মিছিল হচ্ছে খুনীদের ধরে শাস্তির দাবি জানিয়ে। যেন পুলিশ ইচ্ছে করেই খুনীদের ধরছে না। পুলিশের তখন কি অবস্থা? তারা তো প্রচণ্ড চেষ্টা করছে খুনীদের ধরবার। কিন্তু ধরতে পারছে না। অবশেষে হয়তো একজন খুনীকে ধরা হল। কিন্তু সে তো আর সাধু যুধিষ্ঠির নয়- -ধরা পড়েই গড়গড়িয়ে সব বলে দেবে। এদিকে পুরো দলটাকে ধরতে হবে। তখন কি করবে পুলিশ? গ্রেফতার হওয়া আসামীকে বাবা-বাছা বলে আদর করবে? এমন অবস্থায় পুলিশকে বাধ্য হয়েই বলপ্রয়োগের পন্থা নিতে হয়। তবে সাধারণত পুলিশ ততটুকুই শক্তি প্রয়োগ করে যতটুকু দরকার। কখনই হিন্দি সিনেমার মত সেটে সাজানো উদ্ভট কল্পিত অত্যাচার হয় না। পুলিশে চাকরি করতে যারা আসে তারাও সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ে। চাকরি করতে এসে কেউ খুনী হয়ে যেতে পারে? কে আর চায় “মানবাধিকার কমিশন” বা আদালতে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে? অথচ দেখুন, যারা পুলিশকে অত্যাচারীর অপবাদ দিয়ে “অপরাধী” বানায়, তারাই তুচ্ছ কারণে নিজেরা মারপিট করে। এমনকি ট্রামে-বাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিলেও রাগ সামলাতে পারে না। হাতাহাতি করে বসে। আর পুলিশ যদি একটা খুনী বা ডাকাত ধরতে প্রয়োজনে সামান্য চড়চাপড়ও দেয়, তক্ষুনি চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। অপরাধী হয়ে যায় নায়ক, আর যারা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত তারা হয়ে যায় খলনায়ক! আর এই খলনায়কের অভিশাপ কাঁধে নিয়েই পুলিশকে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। ভাগ্যের কি পরিহাস। ওই চাকরিতে সবসময় শাঁখের করাতের ওপর বসে থাকতে হয়। কাজ করলেও দোষ, না করলেও দোষ। ভিক্ষুকের পাশে দাঁড়ানোর লোক পাওয়া যাবে, কিন্তু তুমি পুলিশ, তোমার পাশে কেউ নেই। তোমার হয়ে কেউ সাফাই গাইবে না। না কোনও সরকার, না কোনও দল। দু-একটা পদকটদক হয়তো কপালে জুটবে। ব্যস, আর কিচ্ছু না। ওই মেডেল বুকে ঝুলিয়ে অবজ্ঞার, অবহেলার লাথি খেয়ে কাটিয়ে দাও বাকিটা জীবন।

আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে কেটে গেল বাকি রাতটুকু। সঞ্জুকে জেরা করে দেখতে হবে কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা। উঠে পড়লাম। আজ তেসরা নভেম্বর, সাল ১৯৭১। দেখলাম, শচীও জেগে গেছে। ওকে বললাম, “কাউকে জাগিয়ে লাভ নেই, চল বাইরে কোনও দোকান থেকে চা খেয়ে আসি।” লুঙ্গি পরা, জামার ওপর একটা আলোয়ান চাপিয়ে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে বুঝলাম হাওড়া থেকে ভোরের ট্রেনটা যশিড়িতে এসে পৌঁছেছে।

রিকশায় রিকশায় ট্রেনযাত্রীরা লোটাকম্বল নিয়ে যে যার জায়গায় যাচ্ছে। আমার লুঙ্গিটা দক্ষিণ ভারতীয়দের মত দুর্ভাজ করে কোমরে গোঁজা। হঠাৎ টের পেলাম, ঘুম থেকে উঠেই যে কাজটা প্রথমে সারি সেটা না সেরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তাই নর্দমার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শচীও "বাঙালির একতা একমাত্র এখানেই" বলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ রাস্তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়েছি, একটা রিক্সায় চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। শচীকে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "রিভলবার এনেছ?" শচী অবাক হল, "না স্যার, কেন?" ফিসফিসিয়ে বললাম, "ঘাড় ঘুরিও না।" শচী জানতে চাইল, "কিছু দেখেছেন?" বললাম, "রিক্সায় অসীম যাচ্ছে।" শচী আরও অবাক, "অসীম মানে অসীম চ্যাটার্জি?" বললাম, "হ্যাঁ। সাথে আর একটা ছেলেও আছে।" অসীমদের রিক্সা তখন আমাদের পার হয়ে চড়াই থেকে উৎরাইয়ে নেমে পাঁই পাঁই করে ছুটছে দেওঘরের দিকে।

আমরা নর্দমার ধার থেকে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওদের রিক্সা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। আমি আর শচী অসহায়ের মত দেখছি। ছুটে বা অন্য রিক্সা করে ওকে তাড়াও করতে পারছি না। কারণ আমাদের দুজনের কাছেই তখন কোন অস্ত্র নেই। আমাদের কাছে নিশ্চিত খবর ছিল অসীম সবসময় সঙ্গে রিভলবার বা পিস্তল রাখে। একবার যদি তাড়া করে ধরতে না পারি ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

শচীকে জিজ্ঞেস করলাম, "টাকা পয়সা সাথে কত আছে?" শচী জানাল, "দশ-পনের হবে।" আমি বললাম, "চল, ছাড়া যাবে না।" যশিডি থেকে দেওঘর যাওয়ার ট্রেন তখনই ছাড়ে। আমরা ছুটতে ছুটতে যশিডি স্টেশনে গিয়ে ওই ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেন ছাড়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। ছাড়ছে না। আমি আর শচী ড্রাইভারের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলাম। ড্রাইভার আমাদের বেশভূষা দেখে দুচারটে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিল। ইয়ার দোস্তদের সাথে ফের হাসিমস্করায় মেতে গেল। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। আমাদের হার্ট বিট দ্রুত হচ্ছে! ড্রাইভারের ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষে আমাদের নাছোড়বান্দা ভাব দেখে ড্রাইভারের মন গলল। ট্রেন ছাড়ল। ততক্ষণে কুড়ি পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেছে।

অসীম চ্যাটার্জি, নকশালদের "কাকা"কে আমি আগের থেকেই চিনতাম। সেই ১৯৬৭-৬৮ সালে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজকে ঘাঁটি করে নকশালরা কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল জুড়ে রোজই কিছু না কিছু ঝামেলা পাকাত, তখন থেকেই আমি অসীমকে চিনি। আমাকেই বেশির ভাগ সময় ওদের মোকাবিলা করতে যেতে হত। এমনও অনেকদিন হয়েছে, অসীম আর ওর চ্যালাচামুণ্ডারা যখন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের টেবিলে "বিপ্লবের ঝড়" তুলছে, আমি আর কলকাতা পুলিশের কয়েকজন অফিসার তখন পাশের টেবিলে বসে ব্ল্যাক কফি খাচ্ছি। আসলে আমরা ওদের আলোচনা শুনতাম। তখন অসীম প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এস. সি-র ছাত্র। ৬৯ সালে পড়া শেষ না করেই আত্মগোপন করে। তারপর থেকে ওকে আর দেখিনি। শুধু গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়েছিলাম রমা নামে এক বিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছে। আর আজ এই '৭১-এর শেষে এসে ওকে দেখলাম। নিজেকে আড়াল করতে চশমা পরেছে। কিন্তু ওকে যে একবার দেখবে, সে আর ভুলবে না। শচী ওকে চেনে না। শচী কেন, আমরা যারা এবার যশিডিতে এসেছি তার মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া ওকে আর কেউই চেনে না। শচীকে ওর চেহারার মোটামুটি বিবরণ দিলাম। স্টেশনে নেমেই ছুটলাম যেখান দিয়ে অসীমদের রিক্সা দেওঘরে ঢুকবে, সেই যশিডি-দেওঘর রাস্তার মোড়ের দিকে।

মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। এখান দিয়েই দেওঘরে ঢোকে যশিডি থেকে আসা রিক্সা। আমরা প্রায় পলক না ফেলে যশিডির রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি, অসীমদের রিক্সার অপেক্ষায়। না, এল না। তার মানে আমরা আসার আগেই ওরা দেওঘরে ঢুকে গেছে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকাটা বোকামি। আমি আর শচী অসীমদের খুঁজতে দেওঘরে ঢুকে পড়লাম। ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম চা খেতে। তখন চা আমার আর শচীর মাথায় উঠে গেছে। আমাদের সামনে একটাই চ্যালেঞ্জ। অসীমরা কোথায় আছে খুঁজে বার করতেই

হবে। তারপর সময়, সুযোগ বুঝে রেড করে ওদের গ্রেফতার করা। ওকে যদি ধরতে পারি তবে কলকাতায় বড়সাহেবদের কাছে এ যাত্রা আমাদের মুখ রক্ষা হবে।

শুরু করলাম সারা দেওঘর চষা। গরু খোঁজার মত খুঁজতে লাগলাম। কোথায় অসীম? শচী তো বিড়বিড় করে বৈদ্যনাথ বাবার নাম জপ করে যাচ্ছে। আমার চোখদুটো একবার বাঁ থেকে ডানে আবার ডান থেকে বাঁয়ে সিনেমার ক্যামেরা প্যান করার মত ঘুরছে। চোখ দুটো কটকট করছে। দুরাত্রি একটুও ঘুমইনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে জলও দিইনি। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, চক্কর মারছি। পকেটে পয়সাও নেই যে কিছু কিনে খাব। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয়ে গেল আমাদের দলের তিনজনের সঙ্গে, উমাশংকর লাহিড়ী, সুভাষ চ্যাটার্জি, সুকমল রক্ষিত। তারা আমাদের যশিড়িতে খুঁজে না পেয়ে দেওঘরে চলে এসেছে। আমি আর শচী কি পরিস্থিতিতে চলে এসেছি তা ওদের জানালাম। শুনে ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল। ওরাও আমাদের সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল। ওদের কাছে টাকাপয়সা ছিল, খুঁজে খুঁজে মহুয়ার দোকানে ঢুকতে লাগলাম। এরকম পাঁচটা মহুয়ার দোকানে ঢুকে পাঁচ বোতল মহুয়া কিনে রাস্তায় ফেলে দিলাম। সম্ভাব্য সব জায়গাতেই আমরা অসীমকে খুঁজতে লাগলাম উদভ্রান্তের মত। এমন সময় জেলেদের ঘুনি বা আটলের কথা মনে পড়ে গেল। বাঁশের সরু সরু বাখরি দিয়ে তৈরি হয়। মাছ ধরার জন্য বর্ষাকালে জলের স্রোতের বিপরীত দিকে নালা, নর্দমায়, মাঠেঘাটের আলের মাঝে ভাল করে খুঁটি দিয়ে বেঁধে বসিয়ে দেওয়া হয়। মাছ স্রোতের টানে ঘুনির মধ্যে ঢুকে যায়। ঘুনির দরজা এমন কায়দায় বানান হয় যে ঢোকা যায়, কিন্তু যতই চেষ্টা কর বেরনো যায় না। ঘুনির ছাদের ওপর একটা ফুটো থাকে। জেলেরা ঘুনি তুলে মাছ-টাছ যা ভেতরে ঢোকে তা ছাদের ফুটো দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে বের করে নেয়। আমার কেন যেন মনে হল অসীম এবার ঘুনির মধ্যে ঢুকে গেছে। শুধু দরজা আটকে দিলেই হল, আর পালাতে পারবে না। নিশ্চয়ই জানে না, আমরা এখানে এবং ওকে দেখে ফেলেছি। দেওঘরের দরজা হল যশিডি। ওখান দিয়েই বেরতে হবে। দেওঘর ছাড়তে হলে অসীম যশিডি আসবেই। আমাদের এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যশিডি স্টেশন ও তার আশপাশ ঘিরে ঘাঁটি গাড়তে হবে। এবার আমরা দেওঘর স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। যশিড়ি ফিরে যাব। স্টেশনের উল্টোদিকে এসে একটা পানের দোকান দেখলাম। সকাল থেকে এত পরিশ্রমে গা গোলাচ্ছে। শচীকে বললাম, "দেখ তো, ওই দোকানে বাংলা পান পাওয়া যায় কিনা, পেলে একটু সুপারি দিয়ে নিয়ে এস।" এবার বিদ্যুৎ চমক। পানের দোকানের লাগোয়া একটা পাইস হোটেল। ওখানে অসীম একটা টেবিলে বসে আছে। উল্টোদিকে দুজন, তাদের সঙ্গে কথা বলছে। বিকেল পাঁচটা। হোটেলের নামটা দেখে নিলাম, "ও কে হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট।" আমি সবাইকে ইশারায় ডাকলাম। ঠিক করলাম, এখানেই ওকে ধরব, যা হয় হবে। অসীম আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। দেখলেও বুঝতে পারবে না। আমাকে ছাড়া আমাদের দলের আর কারোকে ও চেনেই না। আমাদের শুধু একটাই অসুবিধে, আমাদের কারও কাছে কোন অস্ত্র নেই। দেখছি ওর সামনে একটা ফোলিও ব্যাগ টেবিলের ওপর রাখা আছে। নিশ্চয়ই তার ভেতর রিভলবার বা পিস্তল আছে। ও কিছু বোঝার আগেই ওকে ধরে ফেলতে হবে। ঠিক করলাম, আমরা প্রত্যেকে আলাদা ভাবে খদ্দের সেজে হোটেলে ঢুকব, যাতে অসীমদের কোনরকম সন্দেহ না হয়। আমি মাথা চুলকানর ভান করা মানেই চার্জ, আক্রমণের নির্দেশ। আলোয়ান দিয়ে মাথা ঢেকে দেহাতি ঢঙে হোটেলে ঢুকে পড়লাম। অন্যেরাও এক এক করে ঢুকে পড়েছে। অসীমের পাশে একটা চেয়ার খালি, আমি তাতে গিয়ে বসলাম। সেটা অসীমের ডান দিক, সে তার ফোলিও ব্যাগটা সরিয়ে বাঁ দিকে টেবিলের ওপর রাখল। ওর সঙ্গী দুজন খাবার খাবে বলে হাত ধুতে উঠে গেল বেসিনের কাছে। সুকমল আর সুভাষ ও হাত ধোওয়ার অছিলায় বেসিনের কাছে পৌঁছল। আমি মাথা চুলকানর ভান করে সঙ্কেত দিলাম। ঝট করে জাপটে ধরলাম অসীমকে, "অসীম তোমার খেলা শেষ।" ততক্ষণে সুকমল আর সুভাষ অসীমের সঙ্গী দুজনকে ধরে ফেলেছে। লাহিড়ী তুলে নিয়েছে অসীমের ফোলিও ব্যাগ। শচী এসে

দাঁড়িয়েছে অসীমের সামনে। এমনভাবে জামার ভেতর ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা রেখেছে যে মনে হচ্ছে রিভলবারের নল। যা ভেবেছিলাম, লাহিড়ী অসীমের ফোলিও খুলে পেল, গুলি ভর্তি রিভলবার। ওটাই এখন আমাদের একমাত্র অস্ত্র। অসীমকে ধরার সময় আমার মাথা থেকে আলোয়ানের ঘোমটা পড়ে গিয়েছিল। ও আমাকে চিনে ফেলল। নরম গলায় বলল, “প্লিজ রুণুদা, ছেড়ে দিন। সবে দুলাইনের লড়াইটা শুরু করেছি, ওটা শেষ করি, তারপর ধরবেন।” আমি ভাবলাম, বোকা ছেলে, তোমাদের দু লাইন, দশ লাইনের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? তখন নকশালদের ভেতর তত্ত্বগত একটা লড়াই চলছিল। একদিকে চারু মজুমদারের “খতমের” লাইন, অন্যদিকে “খতমের” লাইন ছেড়ে সংগঠন নির্ভর সংগ্রামের লাইন। এই দ্বিতীয় লাইনে ছিল অসীম। এতসব লাইনের ব্যাখ্যা শুনে আমাদের কি লাভ? আমরা পুলিশের চাকরি করি। সরকারের নির্দেশ আমাদের মানতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিহার সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার অসীমকে ধরার জন্য নগদ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে বহু খুন, জখম, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির মামলা বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন আদালতে ঝুলছিল। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে এমন কোন ধারা নেই যেখানে খুনের কোন অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে। খুন খুনই, ডাকাতি ডাকাতিই। তার কোন রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক চরিত্র নেই। আমরা খুন বা ডাকাতি কিংবা অন্য অপরাধের উদ্দেশ্য এবং চরিত্র দেখে নিজেরা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। ব্যক্তিস্বার্থ যেখানে জড়িত সেসব অপরাধকে আমরা অরাজনৈতিক অপরাধ বলি আর রাজনৈতিক উদ্দেশে যেসব অপরাধ, তাকে রাজনৈতিক অপরাধ বলি। কিন্তু সব অপরাধই আই.পি.সির চোখে এক। যেরকম জেল কোড অনুযায়ী রাজবন্দী আর সাধারণ বন্দীতে কোন ফারাক নেই। তবু রাজনৈতিক কারণে কারোকে গ্রেফতার করলে তাকে রাজবন্দী বলি এবং আলাদা সম্মানও দিয়ে থাকি।

আমি আইনের হাতে বন্দী আর তখন আমার হাতে বন্দি নকশাল নেতা অসীম চ্যাটার্জি ওরফে কাকা। ও ছটফট করে উঠল। বুঝল, উপায় নেই। মরীয়া হয়ে মুক্তি পাওয়ার শেষ চেষ্টা শুরু করল। আমি ওকে দুহাত দিয়ে জাপটে ধরে আছি আর ও বক্তৃতা দিচ্ছে গরম গরম হিন্দিতে গরিবদের জন্য লড়াই করছি আমরা, আমাদের লড়াই ধনীদের বিরুদ্ধে যারা গরিবদের শোষণ করছে। আমাদের দেখিয়ে বলল, “এরা ধনীদের পোষা গুণ্ডা। আমাদের মারধর করছে। যাতে গরিবদের হয়ে লড়াইটা বন্ধ করি।”

অসীমের বক্তৃতা শুনে হোটেল ঘিরে লোকজন জমে গেল। আমরা কি করব ভেবে পাচ্ছি না। আমাদের অসীম গুণ্ডা বলে দেখাচ্ছে। লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। একবার যদি অসীমের কথায় বিশ্বাস করে এখানকার সাধারণ লোক আমাদের মারপিট শুরু করে, তাহলে খুব বিপদ। এখানকার লোকজন তো আমাদের চেনে না। আমাদের সঙ্গে এ মুহূর্তে কোন পরিচয়পত্রও নেই। চারদিকে চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈ হল্লা শুরু হয়ে গেছে। আমি অসীমকে জাপটে ধরে আছি। সুকমল আর সুভাষ ও অসীমের সঙ্গী দুজনকে ধরে আছে। ওদিকে লাহিড়ী অসীমের রিভলবারটা তুলে চিৎকার করছে। ওটাই এখন আমাদের ভরসা। যাকে ধরেছি তার অস্ত্র দিয়েই তাকে কাবু করে এখান থেকে কোনমতে নিয়ে যেতে হবে। হল্লার মধ্যেই অসীমের বক্তৃতা চলছে। আমাদের লোকেরাও বারবার বলছে, “আমরা গুণ্ডা বদমাইশ নই, কলকাতা থেকে এসেছি, পুলিশ।” কে কার কথা শোনে।

এইরকম পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দূতের মত হাজির হল বিজিন্দ্রপ্রসাদ সিং। দেওঘর থানার সেই সেপাইটা, যে গতরাতে সঞ্জুকে টিলার ওপর ভয় দেখানর সময় আমায় এস-ডি পি-ওর বাংলো দেখিয়েছিল। সে হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে বগলে রুলটা চেপে খইনি টিপতে টিপতে দেওঘর থানার দিকে যাচ্ছিল। ভিড় দেখে, হৈ চৈ শুনে সে হোটেলে উঁকি মারল। বিজিন্দ্রপ্রসাদকে এখানকার প্রায় সব লোকই চেনে। সে ডাণ্ডা উঁচিয়ে ভিড় হটাতে লাগল। বলতে লাগল, ওই আদমি মিথ্যে কথা বলছে, এরা কেউ গুণ্ডা নয়, কলকাতার পুলিশ অফিসার, এদের ধরতে এখানে এসেছে। ও আমাদের চেনে, জানে। বিজিন্দ্রপ্রসাদের কথায় আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হতে লাগল। লোকজন চলে যেতে অসীম

হতাশ হয়ে একসময় বক্তৃতা বন্ধ করে দিল। আমরা অসীমদের তিনজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে সামনেই দেওঘর থানার হাজতে ঢুকিয়ে দিলাম।

থানায় চেয়ারে বসে প্রথমে এক গ্লাস জল খেলাম। মনে হল, কোন থ্রিলার ছবির একটা রিল যেন দেখে এলাম। কিছুক্ষণ পর হাজত থেকে একজন একজন করে ডেকে আনালাম। প্রথমেই ডাকলাম সেই ছেলেটাকে যাকে অসীমের সঙ্গে সকালবেলায় যশিডি থেকে রিক্সায় দেওঘর আসতে দেখেছি। জেরা করে জানলাম, তার নাম দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী। ভাল পরিবারের শিক্ষিত ছেলে, অসীমের অনেকদিনের বন্ধু, একসাথে নকশাল রাজনীতি করে। আর অন্যজন যাকে হোটেলেই প্রথম দেখি সেও বাঙালি, নাম শচীন্দ্রকুমার বাগচী, বিহার সরকারের কৃষি ও বিপণন মন্ত্রণালয়ের গেজেটেড অফিসার। দেওঘরে পোস্টিং। সক্রিয় না হলেও সে নকশালদের সমর্থক। এর সঙ্গে দেখা করতে অসীম ও দীপাঞ্জন দেওঘরে এসেছিল। অসীমের চশমাটা পরীক্ষা করে দেখলাম। পাওয়ার লেস আর রিভলবারটা পুলিশের থেকে ছিনতাই হওয়া পয়েন্ট .৩৮ রিভলবার। ওদের সবাইকে হাজতে ফেরত পাঠিয়ে ও.সি.র ঘর থেকে স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে লালবাজারের নাম্বার দিয়ে ট্রাঙ্ক কল বুক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত বাড়ছে। খিদেও প্রচণ্ড পেয়েছে। বাবা বৈদ্যনাথ, তুমি আমাদের এ যাত্রায় মুখ রক্ষা করেছ, এখন শুধু তাড়াতাড়ি লালবাজারের লাইনটা পাইয়ে দাও।

ভাবছি যশিডিতে আমাদের বাকি লোকজনকেও খবর দিতে হবে, কোথায় আমরা হারিয়ে গেছি! হয়তো ওরা এতক্ষণে যশিডি থানায় মিসিং ডায়েরি লিখিয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় খেলে গেল। রাত আর একটু বাড়ুক, তখন এমনভাবে খবর দেব প্রথমে যেন হকচকিয়ে যায়। টেলিফোনটা বেজে উঠল, আমিই ধরলাম। না, লালবাজার নয়, স্থানীয় কল। বিজিন্দ্রপ্রসাদকে ফোনটা দিয়ে দিলাম। বিজিন্দ্রপ্রসাদ আমাকে আর ছাড়ছে না, ছায়ার মত লেগে আছে। কে একজন চা আর সিঙাড়া নিয়ে এল। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। খালি পেটে এগুলো খেলে রাতে আর চোরা অম্বলের ঠেলায় কিছু খেতে হবে না। যা হয় হবে, মা কালীর নামে ওই সিঙাড়াই দুতিনটে চায়ের সাথে খেয়ে নিলাম। রাত নটা নাগাদ পেয়ে গেলাম লালবাজার। ধরলাম ডি.সি.ডি.ডি (ওয়ান) দেবী রায়কে। বললাম, "স্যার, আমি দেওঘর থানা থেকে বলছি।" আমি গলাটা নামিয়ে বললাম, "অসীমকে ধরেছি।" "তার মানে?" ওঁর গলায় অবিশ্বাস। বললাম, "হ্যাঁ, অসীম চ্যাটার্জি, কাকাকে ধরেছি স্যার।" "সত্যি?" উনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। "সত্যি স্যার, এখানকার লকআপে রেখেছি।" আমার উত্তর। "দারুণ কাজ করেছ, ওয়েল ডান, দেখ আবার পালিয়ে টালিয়ে না যায়। আমি কাল সকালেই ওখানে যাচ্ছি।" টেলিফোনে ওঁর গলা দারুণ খুশি খুশি শোনাচ্ছিল। আমি ওঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, "ঠিক আছে স্যার। আমরা আছি, পালানর কোন চান্স দেব না।" আমি ফোন নামাতেই বিজিন্দ্রপ্রসাদ ডায়াল করল। হিন্দিতে ওদের এস ডি পিও সাহেবের সঙ্গে কথা বলছে। বলছে এখানে আমরা তিনজন নকশাল ধরেছি। এতক্ষণ বিজিন্দ্রপ্রসাদের কাছে আমরা অসীমের নামটা গোপন রেখেছিলাম। বিজিন্দ্রপ্রসাদ ফোনে কথা বলতে বলতে আমার কাছে ওদের নাম জিজ্ঞেস করল। বোধহয়, সাহেব ওর কাছে ওদের নাম জানতে চাইলেন। আমি নামগুলো ওকে বললাম। বিজিন্দ্রপ্রসাদ নির্বিকার মুখে অসীমের নামটা বলার পরই দেখলাম পরিবর্তন। বিজিন্দ্রপ্রসাদ থরথর করে কেঁপে উঠল। মুখটা লাল হয়ে গেল। টেলিফোনের রিসিভার হাত থেকে ফেলতে ফেলতে সামলে নিয়ে শুধু, "সাব, সাব" বলতে লাগল। তারপর কোনমতে রিসিভারটা নামিয়ে থমথমে মুখে আমায় বলল, "আমাকে এতক্ষণ বলেননি ওই নকশালদের নাম। সাহেবকে আগেই খবর দিতে পারতাম।" আমি ওর শরীরের ভাষা পড়ে বুঝলাম সাহেব ওকে প্রচণ্ড গালাগালি দিয়েছেন। অপমানে লজ্জায় ওর এই অবস্থা। বিজিন্দ্রপ্রসাদ ধমক খেতেই পারে, কারণ অসীমের ফটো এখানকার বহু পত্রপত্রিকায় পুলিশের পক্ষ থেকে ছাপান হয়েছে, সব থানায় ওর ফটো দেওয়া আছে "হাইলি ওয়ান্টেড" বলে। সেখানে

বিজিন্দ্রপ্রসাদ এতক্ষণ অসীমকে দেখেও চিনতে পারেনি। এটা ওর নিশ্চিত গাফিলতি, অন্যায় ও বটে। আমি বললাম, "তুমি তো আমার কাছে ওদের নাম জিজ্ঞেস করনি। ভাবলাম তুমি বোধহয় জান, তাই বলিনি।" বিজিন্দ্রপ্রসাদ জানাল, সাহেব এক্ষুণি এখানে আসছেন।

রাত দশটা। ফোন বেজে উঠল, আমিই ধরলাম। ওদিক থেকে হিন্দিতে আমাদের খোঁজ করল, গলা শুনেই বুঝলাম যশিডি থেকে দেবনাথদা। চট করে দুষ্টুবুদ্ধিটা খেলে গেল, এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলাম যেন সারাদিন ধরে আমি আর শচী মদটদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে গিয়েছি। বললাম, "আমি রুণু বলছি।" দেবনাথদা জিজ্ঞেস করল, "কি করছ কি ওখানে?" আমি উত্তর দিলাম,, "ভেরেন্ডা ভাজছি।" "তা তো বুঝতেই পারছি। আমি যে তোমার দেবনাথদা কথা বলছি তাও তুমি বুঝতে পারছ না। সারাদিন তুমি আর শচী বোধহয় আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরেছ।" আমি জবাব দিলাম, "শুধু ঘুরিনি, খুব ছুটেওছি।" দেবনাথদা বলল, "লাহিড়ীদের পাঠালাম তোমাদের খুঁজতে, তাদেরও পাত্তা নেই। ঠিক আছে তোমরা ওখানে থাক, আমি একটা গাড়ি নিয়ে তোমাদের আনতে যাচ্ছি, বুঝতেই পারছি তোমরা এমনি আসতে পারবে না।" আমি বললাম, কোন দরকার নেই, আমি আর শচী হাঁটতে হাঁটতেই যশিডি পৌঁছে যাব।" দেবনাথদা আঁতকে উঠল, ভাবল দুই মাতাল গলা জড়াজড়ি করে দেওঘর থেকে যশিডি সারারাত রাস্তায় মাতলামি করতে করতে আসবে। কি দৃশ্য! তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, আমি আসছি।" এবার আমারও হাসি পেয়ে গেল। গলা স্বাভাবিক করে বললাম, "তোমরা সবাই এস।" দেবনাথদা তখনও ভাবছে আমি ঘোরেই কথা বলছি। বলল, "সবাই এসে কি হবে? আমি আসছি।" আমি বললাম, "দরকার আছে, আজ আমাদের সকলকে আসামী পাহারা দিতে হবে।" দেবনাথদা বলল, "কি যা তা বকছ।" আমি বললাম, "ঠিকই বলছি, আজ আমাদের সবাইকে দেওঘর থানায় থাকতে হবে। আসামী পাহারা দিতে হবে।" দেবনাথদার প্রশ্ন, "কোন আসামীকে?" আমি বললাম, "অসীমকে।" দেবনাথদার গলায় সন্দেহ, "কোন অসীমকে?" বললাম, "অসীম, মানে অসীম চ্যাটার্জি, কাকাকে, আজ বিকেলে আমরা ধরেছি, লাহিড়ীরা আমাদের সাথেই আছে।" দেবনাথদা জানাল এক্ষুণি চলে আসছে।

ফোন নামিয়ে রাখতেই শুনলাম বাইরে জিপের আওয়াজ। এস ডি পি সাহেব এলেন। আমাদের খুব অভিনন্দন জানালেন। তারপর হাজতে গিয়ে অসীমদের দেখে এলেন। আমরা রাতটা এখানেই থাকব শুনে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে সকালে আবার আসব বলে চলে গেলেন। আগেই দেখে নিয়েছিলাম, লক আপ থেকে টয়লেট অনেকটা দূর। দেখেই আমি রাতে থানায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। অসীমদের তো টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হবেই। তখন শুধু এই থানার রাতের পাহারাদাররা থাকবে। ওদের ওপর এই সাঙ্ঘাতিক আসামীকে ছেড়ে যাওয়াটা আমি ভরসা করতে পারিনি।

সময় কাটাতে নিজেরা গল্পগুজব শুরু করলাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। শচীকে দেখে নিজের অবস্থাটা বুঝলাম। দুদিনের খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ি। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, উদভ্রান্তের মত এলোমেলো চুল। লুঙ্গি পরা, গায়ে জামার ওপর একটা আলোয়ান। থানায় কেউ এলে আমাকে আর শচীকে দেখে ভাববে আসামী, চুরিটুরির কেসে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছে। ও. সির ঘরে একটা বহু পুরনো, অর্ধেক পারা ওঠা আয়না দেখেছিলাম। ভাবলাম, দেখব নাকি একবার নিজের চেহারাটা!

খাবার এসে গেছে। তরকা রুটি। গরম থাকতেই খেতে হবে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ওই রুটি কি আর ছেঁড়া যাবে? খেয়েদেয়ে হাজতের দিকে এগিয়ে গেলাম। বসে পড়লাম সামনে। সেপাইদের থেকে খইনি নিয়ে টিপতে শুরু করব নাকি? তাহলেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণ হয়। দেবনাথদাও বাকি সবাইকে নিয়ে হাজির হয়ে গেল। দেওঘর থানা এখন লালবাজারের অফিসারদের দখলে। আমরা অসীমদের পাহারা দিচ্ছি আর আমাদের জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে মশারা। মাঝে মাঝে থানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। রাতজাগা পাখির দল

ডেকে উঠছে। পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসছে শীত। কুয়াশা পড়ছে। আলো ফুটছে অল্প অল্প। বুঝলাম, ভোর এগিয়ে আসছে। জানি, দেবীবাবুরাও গাড়ি নিয়ে দেওঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন দ্রুত।

হঠাৎ ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। এমন ভোরে মা পরীক্ষার আগে জাগিয়ে দিতেন। মা জানেন না, তাঁর খোকাকে এখন আর জাগিয়ে দিতে হয় না। চাকরির খাতিরে প্রায়ই রাতভর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কোন না কোন দূরের থানায় !

চা এল, খেলাম। সকাল হয়ে গেছে। এক এক করে বড় বড় অফিসাররা সব আসতে শুরু করলেন। কলকাতা থেকে এসে গেলেন দেবীবাবু ও অরুণ মুখার্জি, সঙ্গে প্রায় কুড়িজনের দল। জামশেদপুর থেকে এলেন বিহার পুলিশের আই.জি. সাহেব, এস.পি এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা। দেওঘর থানায় এর আগে একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের এত উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের সমাবেশ কখনও হয়নি। তাই সবাই তটস্থ। আপ্যায়নে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। আমরা অভিনন্দনের জোয়ারে আপ্লুত। একটু পরেই অবশ্য বড়সাহেবদের জিম্মায় সব কিছু চলে গেলে আমরা ফের 'খড়কুটো' হয়ে দেখতে লাগলাম।

আজ অসীমদের দেওঘর সাব-ডিভিশনাল কোর্টে হাজির করাতে হবে। নিয়ম হচ্ছে, যে কোনও আসামীকেই গ্রেফতারের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে হাজির করাতে হয়। আমরা চাইছি, কোর্টের সম্মতি নিয়ে অসীমদের কলকাতায় নিয়ে যেতে। আর বিহার পুলিশ চাইছে, কলকাতায় পাঠানর আগে তাদের প্রদেশের মামলাগুলোতে অসীমকে হাজির করাতে। ওদের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু অসীম দেওঘরে তাদের এলাকায় ধরা পড়েছে এবং নগদ পুরস্কার বিহার সরকার আমাদের সরকারের থেকে বেশি ঘোষণা করেছেন, সুতরাং প্রথম অধিকার তাদেরই। আর আমাদের যুক্তি হল, হোক না বিহার, কিন্তু ধরেছি তো আমরা, তাই আমাদেরই প্রথম অধিকার। অনেক টানাপোড়েনের পর ঠিক হল, বিহার পুলিশ সাতদিন পর অসীমকে আমাদের হাতে তুলে দেবে। কি আর করব, আমরা সঞ্জু, দীপাঞ্জন আর শচীন্দ্রকুমার বাগচীকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম।

বিহার পুলিশ সাতদিন নয়, প্রায় তিনমাস হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে অসীমকে রেখেছিল। তারপর আমাদের হাতে পৌঁছে দিল।

নকশাল নেতাদের বিচারের জন্য যে পঞ্চম ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল, অসীমকেও সেই মামলায় যুক্ত করা হল। এর আগের চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে বিচার চলছিল অনন্তবাবু ও তাঁর দলের। স্বাধীনতার পর প্রথম ও দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল আদালত গঠন করা হয়েছিল পান্নালাল দাশগুপ্তদের বিচারের জন্য, দমদম-বসিরহাট মামলায়। আর তৃতীয় ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়েছিল সোনারপুরের কংসারী হালদারদের। সাধারণত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে আনা হয় তাদের বিচারের জন্য রাজ্যপালের আদেশ অনুযায়ী এইসব ট্রাইব্যুনাল আদালত গঠন করা হয়। সুবিধে হল, একই ছাদের তলায় একই আদালতে বিভিন্ন আদালতের মামলাগুলো একসঙ্গে চালান যায়।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয়। তখন অসীমের বিরুদ্ধেও পশ্চিমবঙ্গে যত মামলা ছিল তা তুলে নেওয়া হল। কিন্তু বিহার সরকার কিছুতেই তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করেনি। ফলে তখন অসীম জেল থেকে মুক্তি পেল না। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে সব মামলা প্রত্যাহার করল বিহার। অসীম ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায়।

মহাদেবকে আমরা কিন্তু আর কোনদিনই ধরিনি। সে তারপর এক মন্দিরের পাণ্ডা হয়ে যায়। সেই চোর এখন মন্দিরের সাধু। একমুখ দাড়ি, গেরুয়া বসনধারী। জানি না, সেও একদিন বাল্মীকির মত কোন রামায়ণ লিখবে কিনা! মহাদেব রামায়ণ লিখুক বা না লিখুক, তার দিদি সঞ্জু কিন্তু আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মত বিয়ে থা করে ঘরসংসার করছে। আমার শুভেচ্ছা রইল, সে যেন আগামীদিনেও সুখে শান্তিতে থাকে !

আমরা শান্তির কথা বললেও, নকশালরা কারোকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। ব্যক্তিহত্যাই তখন ওদের একমাত্র রাজনৈতিক কর্ম হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিহত্যা করেই সব সমস্যার সমাধান হবে, ভেবেছিল ওরা। অনেকে বলেন, নকশালও তো অনেক মারা গেছে। হ্যাঁ গেছে। আপনি যদি কারোকে খুন করতে যান সেখানে আপনারও মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ওরা যখন "শ্রেণীশত্রু" খুন করবে, তখন ওদের "শ্রেণীশত্রুরা" কি মুখে আঙুল দিয়ে বসে থাকবে? তারাও বাঁচার অধিকার নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছে। আক্রান্ত হলে প্রতি আক্রমণ করার অধিকার কি আপনার নেই? আপনাকে যদি কেউ ছুরি-বোমা নিয়ে আক্রমণ করে আপনি কি বাঁচার চেষ্টায় হাতের সামনে যা পাবেন তাই দিয়ে আপনার খুনীকে প্রতি আক্রমণ করে নিজের মৃত্যুকে ঠেকাতে চেষ্টা করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। পিঁপড়েকে মারতে গেলে পিঁপড়েও তার ক্ষমতা অনুযায়ী কামড় দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে কেউ মরলে সে দোষ কি আগুনের না কি যে ঝাঁপ দেয় তার? একটা ঘটনার কথা এখানে বলি। আশুতোষ চ্যাটার্জি নামে এক নকশাল ছিল, যার অন্য দুটো নাম ছিল জন আর ক্যাপ্টেন। খুন করার পর নিহত ব্যক্তির মাথা নিয়ে ফুটবল খেলা ছিল তার নেশা। চারুবাবুর শিষ্য সেই বিপ্লবীকে আমরা সাঁকরাইলে গ্রেফতার করতে গেলাম। গভীর রাত, যে বাড়িতে সে ছিল আমরা সেটা ঘিরে ফেললাম। একটা ঘরে সে ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ জেগে দেখে পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। বালিশের তলা থেকে একটা রিভলবার বার করে জন আমাদের গুলি করতে গেল। আমাদের পাল্টা গুলিতে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল সে। তার রিভলবারটা লক হয়ে গিয়েছিল, তাই তার কোনও গুলি আমাদের দিকে আসতে পারেনি। সে যদি আমাদের দিকে রিভলবার নিয়ে আক্রমণ না করত, আমরাও তাকে প্রতি আক্রমণ করতাম না। সে বেঁচে যেত। খুনের রাজনীতির এই তো পরিণতি! আসলে ওরা হিংসা আর মৃত্যুর খেলায় এত মেতে উঠেছিল যে নিজেরাই জানত না কি করছে।

আর আমাদের এই নিয়েই সারাটা দিন, মাস, বছর লালবাজারে কাটাতে হত। এখানে খুন ছোটো, ওখানে 'সংঘর্ষ ছোটো, সেখানে রাহাজানি কিংবা ডাকাতি, ছোটো ছোটো। তদন্ত কর, খুনী ধর, সাক্ষী যোগাড় কর, আদালতে পাঠাও। জনসাধারণের নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার, আইন শৃঙ্খলার রক্ষী তুমি, বসে থাকলে চলবে কেন? সরকারে কে এল, কে গেল, তোমার দেখার প্রয়োজন নেই। তুমি কাজ করে যাও। যতদিন কাজ করছ ততদিন কোনও দিকে তাকাবার অবসর নেই।

সারা একাত্তর সাল জুড়ে নকশালরা আমাদের দম ফেলতে দেয়নি। একদিকে সরকারের চাপ, অন্যদিকে খুনের পর খুনের কিনারা করতে না পারার আগেই আবার খুন, নির্বিচারে খুন। তখন নাগরিকদের কোনও স্তরই খুনের আশঙ্কা ছাড়া দিন রাত পার করতে পারেননি। যদিও একাত্তরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে অধিকাংশ পুরনো নকশাল যুবকযুবতীকে আমরা গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওদের লুম্পেনদের " দেশপ্রেমিক" বানাবার প্রচেষ্টার ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে সমাজবিরোধীরা ওদের দলে ঢুকে গিয়েছিল। লুম্পেনদের হাতে চলে গিয়েছিল ওদের পার্টির নেতৃত্ব। তারা কিছু একটা "কাজ" করে নিজেদের জাহির করার লোভে খেয়ালখুশি মত কাজগুলো করত। আর আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখতাম, চারুবাবুর লেখার মধ্যে সেইসব কাজের ভূয়সী প্রশংসা। অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চারুবাবু নিজেই বলতেন উনি নাকি মাও সে-তুঙের থেকেও অনেক দূরের ভবিষ্যৎ দেখতে পান। কারণ হিসাবে উনি বলেছিলেন, "বাবা যেমন ছোট ছেলেকে কাঁধে চাপিয়ে রাস্তায় হাঁটলে বাবার থেকে ছেলে বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পায়, তেমনি তিনিও মাও সে-তুঙের কাঁধে চড়ে চলেছেন বলে তাঁর থেকে বেশি দেখতে পান।" অথচ ওঁকে কি কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, ছোট ছেলে বেশি দূর দেখতে পায় ঠিকই, কিন্তু কিছু চিনতে পারে কি? ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করে, এটা কি, ওটা কি? বাবা তখন অবোধ

ছেলেকে চিনিয়ে দেয় পৃথিবীর এটা আর ওটা, ভাল আর মন্দ।

শুনেছি এক বড়নকশাল নেতা যখন চীনে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, চৌ এন-লাই সেই নেতাকে মোটামুটি ধমকই দিয়েছিলেন। চারুবাবুর মস্তিষ্কপ্রসূত "চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান" স্লোগানের জন্য। তিনি সেই নকশাল নেতাকে নাকি বলেছিলেন, "আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান আপনাদের পার্টির চেয়ারম্যান কবে থেকে হল? আমাদের পার্টি আলাদা, আপনাদের পার্টি আলাদা। আপনাদের পার্টির ভাল কি মন্দ কোনরকম কাজের দায়িত্বই আমাদের পার্টির চেয়ারম্যানের ওপর বর্তায় না, বর্তাবেও না কোনদিন। সুতরাং ওই রকম কথাবার্তা আর স্লোগান দেওয়া আপনারা বন্ধ করুন।"

মনে হয়, বাড়ির ছাদের ওপর টবের গাছ যদি মহীরুহ হওয়ার চেষ্টা করে তার পরিণতি যা হয়, এখানেও তাই হয়েছিল। একদিকে ব্যক্তিগত দম্ভ, অন্যদিকে হতাশা, দুইয়ে মিলে সন্ত্রাসবাদকে চালিয়ে যাওয়ার রসদ যুগিয়েছিল। চারুবাবুর রাজনীতির লাইসেন্স পেয়ে তাই লুম্পেনরা একদিকে দাদাগিরি, অন্যদিকে সস্তার বিপ্লবী সাজার স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল। আর রাজনীতি বলতে তো শুধু চারুবাবুর নাম জপ করা। যে যত চারুবাবুর নাম ভজনা করতে পারবে সে তত বড় নেতা! এই জপ করাটাই ওদের রাজনীতির প্রথম ও শেষ কথা। আর এর সঙ্গে যদি দু চারটে খুনের স্কোয়াডে থাকা যায় তাহলে তো সে অতি বড় বিপ্লবী। আর খুনেরও তো কোন বাছবিচার নেই। যে কোন লোককে ইচ্ছেমত "শ্রেণীশত্রু" বানিয়ে খুন করে দিলেই হল। তাতেই কেল্লা ফতে! দেশসেবার কি জ্বলন্ত নিদর্শন ! এমনকি দরকার হলে নিজেদের লোককেই নিজেরা খুন করত। যেমন বাহাত্তরের এপ্রিলে ওদের পার্টির দক্ষিণ কলকাতা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমল সান্যাল ও তার সঙ্গীকে কসবার বোসপুকুর মাঠে গভীর রাতে নিয়ে গিয়ে পুলিশের গুপ্তচর নাম দিয়ে খুন করে দিল। যাকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকেই ওরা পুলিশের চর বলে খুন করে বড় বিপ্লবী বনে গেল।

নভেম্বরে দেওঘর থেকে অসীম চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করার সময় ওদের অনেকেই চারুবাবুর রাজনীতির অসারতা ও দেউলিয়াপনা বুঝে গিয়েছিল। দু'চারটে পুলিশ, হোমগার্ড কিংবা নিরীহ মানুষ মেরে যে দেশের কোন উপকার হয় না তা তারা বুঝেছিল। কিন্তু অনেক দেরিতে, ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। অসংখ্য তরুণ তরুণী মারা গেছে, নিরীহ সাধারণ মানুষ খুন হয়েছে, অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে মানুষজন পালিয়ে গেছে, জেলে জেলে কয়েক হাজার তরতাজা যুবক অযথা দিন গুজরান করছে। চরম ক্ষতি হবার যা, তা হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য যতই মহৎ থাক, সঠিক পথ না জানা থাকলে, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ গাইড সাথে না থাকলে কেউ কি হিমালয়ের শীর্ষে উঠতে পারে? পারে না। উল্টে বরফের অতল গহ্বরে অকালে হারিয়ে যায়। এখানে নকশালরা তো নিজেরা ঝরে গেলই, বাঙালির এতদিনের তিলে তিলে গড়া মনোবল ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ভবিষ্যৎকে অন্ধকার পাতালে ফেলে দিল। পশ্চিমবাংলার মানুষ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেল আর সেই পটভূমিতে বাহাত্তর সালে পশ্চিমবাংলার মানুষ একটা অদ্ভুত নির্বাচন দেখলেন। ওই রকম নির্বাচন তারা আগে কখনও দেখেননি, ভবিষ্যতেও কখনও দেখবেন কিনা জানি না। আর সেই ভোটের ফলে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এল। অবশ্য রাষ্ট্রপতির শাসনের বকলমে ওরা মাঝেমধ্যেই শাসন চালিয়েছিল এবং নির্বাচনের সময়ও পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

ততদিনে নকশালরা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত দিশাহীন ছোট ছোট ভ্রাম্যমাণ মাস্তান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের তাড়া ও ধরপাকড়ের জেরে ওদের নিজেদের মধ্যেই কোন যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল না। ফলে হতাশায় যেখানে সেখানে যা ইচ্ছে তাই করতে লাগল তারা। আবার চারুবাবুর শিক্ষা মেনে পুরনো নকশালদের কোনও কথাই নতুনরা শুনত না। চারুবাবু ওদের শিখিয়েছিলেন, "নতুন পুরনো বিরোধে নতুনকে সমর্থন কর।" শুনতে হয়ত কথাটা ভাল লাগে, চমক লাগে। কিন্তু সেটা মানলে তো অভিজ্ঞতার কোন দামই দেওয়া হয়

না। কোচিংয়ের কোন মূল্যই দেওয়া হয় না। চারুবাবুর বুলি আওড়ান সেইসব নতুন নতুন নকশালরা যারা অধিকাংশই লুম্পেন, তারা পুরনোদের হটিয়ে “ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠী” নিয়ে এলাকায় এলাকায় দাপট দেখাতে লাগল। আর এদের কীর্তিকলাপে যেটুকু জনসমর্থন অবশিষ্ট ছিল, তাও হারাল নকশালরা। এমনও হয়েছে যেখানে ওরা রাতে আত্মগোপন করেছে, সেখানকার লোকেরাই লুকিয়ে এসে আমাদের খবর দিয়ে গেছে। আমরা গিয়ে ওদের ধরে নিয়ে এসেছি। আমরা অনেক এলাকায় নকশালদের ধরতে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে দারুণ অভ্যর্থনাও পেয়েছি। সহযোগিতা তো বটেই, অনেকে বাড়িতে ডেকে মিষ্টি খেতে দিয়েছে, বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষ করে সি.পি.আই (এম) পার্টির নেতা ও কর্মীদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য, খবর পেতাম। সেইসব সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে হয়ত আরও বহু অপকর্ম আমাদের দেখতে হত।

অন্যদিকে এও জানি, বহু সাধারণ মানুষ অযথা হয়রানির শিকার হয়েছেন আমাদের অভিযানে। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে আমাদের উপায় ছিল না। হয়ত খবর পেলাম, অমুক জায়গায় নকশালরা গোপনে মিটিং করছে, কিংবা অমুক এলাকায় ওদের জমায়েত হয়েছে, আমাদের তখন কি করণীয় থাকত?

একদিকে ওদের অধিকাংশ কর্মীরই কোনও ফটো আমাদের কাছে ছিল না। চিনতামই না, শুধু ওদের সংগঠনের ভেতরে আমাদের যেসব সোর্স ছিল তাদের দেওয়া বিবরণ তো যথেষ্ট নয়। তাছাড়া ওরা সবসময়ই সশস্ত্র থাকত। আমাদেরও তাই নিরাপত্তার প্রশ্নে বিভিন্ন পন্থা নিতে হয়েছিল। আর্মি ও সি.আর. পি.র সাহায্য নিতে হয়েছিল। ভাবুন, কোন পর্যায়ে গেলে আর্মির সাহায্য নিতে হয় আমাদের। আর্মি ও সি.আর.পি. দিয়ে এলাকার পর এলাকা ঘিরে, বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাতে হয়েছিল। জানি, সেই সময় অনেক নিরাপরাধ সাধারণ লোককে অশেষ অশান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অনেক সাধারণ মানুষকে সন্দেহের বশে, চেহারার মিল বা নামের মিলের জন্য গ্রেফতারও করা হয়েছিল। এগুলো সবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কিন্তু দয়া করে একে পুলিশি জুলুম আখ্যা দেবেন না। কই এখন কি আর পুলিশ এলাকা ঘিরে খানাতল্লাশি করছে? এখন এই নব্বইয়ের দশকে পঞ্জাবে আর কাশ্মীরে, আসামের কিছু কিছু এলাকায় কর্ডনিং করে চিরুনি তল্লাশি করতে হচ্ছে উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য। যা আমাদের তখন করতে হয়েছিল, আমরা বাধ্য হয়েই আপনাদের নিরাপত্তার জন্যই তা করেছিলাম। আর আপনারা সেই কাজটা সহ্য করেছেন বলেই যেখানে একাত্তর সালে শুধুমাত্র কলকাতাতে একশ আঠের জনকে হত্যা করেছিল ওরা, সেটাই বাহাত্তর সালে নেমে এসে দাঁড়াল মাত্র আট জনে। এই আট জনের মধ্যে পুলিশ তিনজন, কংগ্রেস কর্মী একজন, সি.পি.আই (এম)-এর একজন ও সাধারণ মানুষ দুজন। ইতিমধ্যে আমরা অনেক নকশাল নেতাকে ধরলেও চারুবাবুকে গ্রেফতার করতে পারিনি। চারুবাবুকে ধরতে না পারলে নকশাল আন্দোলন পুরোপুরি দমন করা যাচ্ছে না। সেটা বাহাত্তরের এপ্রিল মাস। একদিন খবর পেলাম ইছাপুরে গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির পাশে আনন্দমঠ বলে একটা জায়গায় অস্ত্র পাচার হয়। গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির থেকে ময়লার গাড়ির ভেতর রাইফেলের সব পার্টস বেরিয়ে এসে ওই এলাকায় কয়েকটা বাড়িতে জমা হয়, তারপর সেগুলো জোড়া লাগিয়ে রাইফেল বানিয়ে নকশালরা বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্মি দিয়ে ঘিরে ওই এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালালাম। বেশ কয়েকটা বাড়ি থেকে পেলাম আটত্রিশটা নতুন জোড়া লাগান রাইফেল, তাছাড়া প্রচুর সরঞ্জাম, পার্টস। আমরা আনন্দমঠ থেকে গ্রেফতার করে আনলাম আঠাশ জনকে। তার মধ্যে এমন একজন ছিল যাকে আমরা বহুদিন ধরে খুঁজছি। সে চারু মজুমদারের চিঠির ক্যুরিয়ার ছিল। এইসব ক্যুরিয়াররা এক জায়গা থেকে জিনিসপত্র, চিঠি নিয়ে অন্য জায়গায় দিত এবং অন্য জায়গা থেকে খবরাখবর নিয়ে আসত। নেতাদের নির্দেশ এদের মাধ্যমেই বিভিন্ন জায়গায় যেত। তাকে জেরা করে জ্ঞানতে পারলাম সে মাত্র একবারই চারুবাবুর চিঠি নিয়ে উত্তরবাংলায়

শিলিগুড়িতে গিয়েছে। এখন যায় না, তবে এখন যে যায় তাকে সে চেনে। সে মাসের দুটো বৃহস্পতিবার দার্জিলিং মেলে করে শিলিগুড়ি যায়।

পরদিনই ছিল বৃহস্পতিবার। আমরা শিয়ালদহ স্টেশনে সেই ছেলেটিকে নিয়ে গেলাম। দার্জিলিং মেল যে প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে সেখানে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। না, যার অপেক্ষায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি সে এল না, আমাদের সামনে দিয়ে দার্জিলিং মেল হুস হুস করে চলে গেল। আমরা লালবাজারে ফিরে এলাম। এইভাবে চলে গেল কয়েকটা বৃহস্পতিবার। আমরা দার্জিলিং মেল দেখতে আসি, সে আমাদের কিছু না দিয়ে টা টা করে চলে যায়। মে মাস থেকে জুন। জুন থেকে জুলাই মাস এসে গেল, তাকে পাচ্ছি না। অবশেষে পনেরই জুলাই, বৃহস্পতিবার, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙে যাচ্ছে প্রায়, আমরা পেয়ে গেলাম এতদিনের প্রতীক্ষার ফসল। সেই ছেলেটি দার্জিলিং মেল ধরতে এল, শিলিগুড়ি যাবে। আমরা তাকে ধরলাম, লালবাজারে নিয়ে এলাম। তার কাছ থেকে পেলাম একগাদা চিঠি, তার মধ্যে ছিল চারুবাবুর স্ত্রীকে লেখা একখানা চিঠি। এই সব চিঠি শিলিগুড়ির একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানে দিয়ে আসার কথা ছিল। চারুবাবু তাঁর স্ত্রীকে কি লিখেছিলেন? এখানে তা হুবহু তুলে দিলাম।

লীলা,

১৪.৭.৭২

তোমাদের খবর পাই না অনেকদিন। এখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হয়েছে। তুমি চিঠি লিখলে সেটা আমি পেতে পারি একমাসের মধ্যেই। কাজেই চিঠি দিও। অনীতা বোধহয় কলেজে চলে এসেছে। মিতু, অভী কেমন আছে জানিও। ওদেরও বোল আমাকে চিঠি দিতে। এখানে আমাদের অবস্থা ভাল। ভিয়েতনাম ডে তে একটা মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মিছিলটা হবে শ্রমিক কমরেডদের নিয়ে, ২০শে জুলাই। কাগজে নিশ্চয়ই বেরোবে। আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম বড় কম হচ্ছে। তার কারণ খতমের উপর বড় বেশী জোর পরে গিয়েছে। এটা বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি আমরা কাটিয়ে উঠছি। পার্টির মধ্যে সমালোচনা বেড়েছে, কাজেই সংশোধিত হবে। আমাদের পার্টি অল্প দিনের, অভিজ্ঞতাও কম, ফলে বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। কমরেডদের নজরে পড়েছে বিচ্যুতি, এটাই শুভ লক্ষণ, যাইহোক, তোমাদের খবর দিও। আমি একরকম আছি। ভালবাসা নিও। যদি সম্ভব হয় তাহলে কলকাতায় এসো। —- চারু মজুমদার।

এই চিঠিটাই চারুবাবুকে গ্রেফতার করার মূল সূত্র হয়ে দাঁড়াল। আমরা বুঝলাম চারুবাবু কলকাতা বা তার আশেপাশেই আত্মগোপন করে আছেন। এই চিঠিটা হাতে পাওয়ার আগে আমাদের কাছে খবর ছিল তিনি জামশেদপুর অঞ্চলে আছেন। চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর বুঝলাম, আমাদের কাছে যে খবরটা ছিল তা সম্পূর্ণ ভুল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, যা আমার দীর্ঘ পুলিশ জীবনের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমি দেখেছি, যে সব গুপ্তচর বহুদিন আমাদের হয়ে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছে কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ায় আর আগের মত চটপট কাজ করতে পারছে না, তারা আমাদের পরোক্ষভাবে শোষণ করতে শুরু করে। ভিত্তিহীন খবর পাঠায়, আমাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। চারুবাবুর জামশেদপুর অঞ্চলে থাকার খবরটা এইরকম এক বহু পুরনো বয়স্ক গুপ্তচরের পাঠান ভিত্তিহীন খবর ছিল। সেই গুপ্তচরটি আমাদের এক উঁচুস্তরের অফিসারের বহুদিনের নিজস্ব সোর্স ছিল। আমরা যখন চারুবাবুর চিঠিটা হাতে পেয়ে মোটামুটি নিশ্চিত যে চারুবাবু কলকাতা কিংবা তার আশেপাশেই আছেন, ওই অফিসার প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি। কিন্তু আমি গোঁ ধরাতে তিনি আমাকে নিজের মত করে কাজ করতে দিলেন।

আমরা আমাদের কাজ শুরু করলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করতে হবে, কারণ ওদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ক্যুরিয়ার আমাদের হাতে বন্দী, এই খবরটা ওদের কাছে পৌঁছনর আগেই আমাদের যা কিছু করতে হবে। একবার যদি ওদের কাছে এই ক্যুরিয়ার

গ্রেফতারের খবর পৌঁছে যায়, তবে চারুবাবু সমেত ওই ক্যুরিয়ারের জানা সবাই এমন জায়গায় চলে যাবে যাতে সে কোন খবরই না জানাতে পারে। এই ছেলেটার কাছ থেকে জানলাম, ওকে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নকশাল এইসব চিঠি দিয়েছে আগের দিন সন্ধেবেলায়, বজবজ অঞ্চলের এক বাড়িতে। সে তারপর চলে আসে কলকাতায়, পরের দিন দার্জিলিং মেল ধরে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য।

সেদিন ছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা। আমাদের ওপরের সব অফিসারেরা খেলা দেখতে মাঠে গেছেন। ওদের একটা খবর পাঠিয়ে আমরা একটা অন্য খেলা খেলতে ওই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বিশ-বাইশ জনের দল কয়েকটা গাড়িতে বজবজের দিকে রওনা দিলাম। বজবজে পৌঁছে ছেলেটি দেখিয়ে দিল কোন বাড়িতে ওই শীর্ষস্থানীয় নকশাল নেতারা ছিল। আমরা ওই বাড়িতে হানা দিলাম, কাউকে পেলাম না। তারা সকালেই সবাই চলে গেছে। এরপর আমরা বজবজের আরও চারটে বাড়িতে তল্লাশি চালালাম, কিন্তু সেখানেও কারোকে পেলাম না। সেই সূত্র ধরে আমরা বাটা আর বেহালার কয়েকটা বাড়িতে অনুসন্ধান চালালাম। কিন্তু কোথাও কাউকে গ্রেফতার করতে পারলাম না। আমাদের এত ছোটাছুটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। রাত দশটা নাগাদ লালবাজারে ফিরে এলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

ব্যর্থ হলেই লোকে আঙুল তুলে বলবে যে ব্যর্থ অমুক, ব্যর্থ তমুক, আর আমাদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ পুলিশ অফিসার। তুমি যতই তোমার প্রচেষ্টার কথা বল লোকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেবে। তাই আমাদের একবার ব্যর্থ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সুতরাং "একবার না পারিলে দেখ শতবারের" নির্দেশ মাথায় রেখে আবার ওই ছেলেটাকে নিয়ে পড়লাম। নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা। পেতে আমাদের হবেই। ততক্ষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, চারুবাবু কলকাতাতেই আছেন, তাঁর চিঠিতে সেই আভাসই পেয়েছি, নয়ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখতেন না, পারলে যেন একবার কলকাতাতে আসেন। রাত এগারটা নাগাদ সেই ছেলেটি জানাল, বহুদিন আগে এন্টালি এলাকার একটা বাড়ি থেকেও তাকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আবার নেচে উঠলাম। ততক্ষণে আমাদের বিশ বাইশ জনের দল ছোট হয়ে নয়জনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সূত্র যখন একটা পেয়েছি তাকে তো না দেখে ফেলে রাখা যাবে না। তদন্তের নিয়মই হচ্ছে, যে কোন সূত্র বা তথ্য পেলে তা অনুসন্ধান করে শেষ করা এবং একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়া। তাই আমরা দেরি না করে ছেলেটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছাড়া অন্যরা হচ্ছে শচী মজুমদার, উমাশংকর লাহিড়ী, সমীর গাঙ্গুলি, দেবনাথদা আর ডি. ডি. সেকশনের তিনজন কনস্টেবল ও ছয়জন আর্মড সিপাই। আমরা মৌলালির মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। সেই ছেলেটিকে নিয়ে একটা গাড়িতে তার নির্দেশে চললাম। ছেলেটি দেব লেনে এসে দূর থেকে একটা টিনের বাড়ি দেখিয়ে দিল। আমি সেই ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এলাম। রাত তখন বারোটা বাজে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সবার। সারাদিনের ছোটাতে কারও পেটে চা ছাড়া আর কিছু পড়েনি। বেলেঘাটার এক বন্ধু রামগোপাল দাসের বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন ছিল। তাঁর ছেলের বৌভাত। সেই সময়কার বেলেঘাটা মানে একটা বিভীষিকাময় অঞ্চল। বেলেঘাটার বহু অঞ্চল থেকে বহু সাধারণ মানুষ নকশালদের অত্যাচারে বাড়িঘরদোর ফেলে কিছুটা নিরাপদ জায়গায় চলে গেছে। যা হয় হবে, ঠিক করলাম, বেলেঘাটায় গিয়ে নেমন্তন্ন খাব, তারপর দেব লেনের ওই নয় নম্বর বাড়িতে হানা দেব। আমরা সবাই মিলে বেলেঘাটার দিকে রওনা দিলাম। নেমন্তন্ন আমার একার, যাচ্ছি এত জন। যেতে গিয়ে লজ্জাও হচ্ছিল কারণ পুত্রবধূর জন্য কোন উপহারও কিনিনি, কেনার সময়ও পায়নি। তবে ভরসা হচ্ছে, বন্ধুটি আমাকে "ব্যক্তি হিসাবে" খুব ভালভাবে চেনে। আমি যে কাজপাগল লোক সে তা খুব ভালই জানে। আর এই বছর তিনেক তো নকশালদের সন্ত্রাসের ঠেলায় দম ফেলার সময়ও পাচ্ছি না। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, "অনুষ্ঠানের কথাও মনে রাখতে পারছি না। তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম রাজাগোপালের বাড়ি।

বন্ধু দেখেই বলল, “এই সময় হল আসার? আমি তো ভেবেই নিয়েছিলাম, তুমি আসছ না। হয়ত কোন বিশেষ কাজে ফেঁসে গিয়েছ।” আমি বললাম, “তা গিয়েছি, সে পরে শুনবে, এখন বল, খাবার-দাবার আছে? আমরা ন-দশজন আছি।” বন্ধু বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবাইকে নিয়ে এসো।” আমরা সবাই মিলে পাত পেড়ে বসলাম এবং এত উদ্বেগের মধ্যেও আয়েস করে পেট ভরে খেলাম। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা দেব লেনে পৌঁছে গেলাম।

একে নকশাল আমল তায় বর্ষাকালের গভীর রাত। পথঘাট জনমানবশূন্য। মাঝে মাঝে রাস্তার কুকুরদের ডাক ছাড়া সব নিশ্চুপ। আমরা কিছু দূরে গাড়ি রেখে ন নম্বর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলাম। টিনের বাড়ি, বাড়ির সামনে বিরাট টিনের গেট। অন্ধকার, ভেতর থেকে গেটটা বন্ধ। পাশের পাঁচিলে উঠে গেল আমাদের অফিসার সমীর গাঙ্গুলি। দেখল, গেটের ওপাশে একটা ছেলে গেটের পাশে বসে ঘুমচ্ছে। সমীর নেমে গেটটা খুলতে গিয়ে অন্ধকারে ছেলেটার গায়ে পা লাগিয়ে ফেলেছে। ছেলেটা জেগে জিজ্ঞাসা করল, “কে?” সমীরের চটপট উত্তর, “কমরেড।” গেটটা খুলে ফেলল সমীর। আমরা দ্রুত ঢুকে পড়লাম। প্রথমেই ওই ছেলেটাকে বেঁধে ফেললাম, যাতে সে চিৎকার না করতে পারে।

তখনও জানি না, ভেতরে কাকে পাব, কি পাব, কারণ আমরা শুধুমাত্র চান্সের ওপর এসেছি। চান্সটা হচ্ছে প্রায় আট-নয় মাস আগে এই বাড়ি থেকে একবার সেই ক্যুরিয়ার ছেলেটিকে শীর্ষস্থানীয় নেতারা চিঠি দিয়েছিল শিলিগুড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সুতরাং বাড়ির ভেতরে কাকে পাব জানি না, আমাদের মত সঙ্গের সেই ছেলেটিও জানে না। তাছাড়া, নকশাল নেতারা একটা বাড়ি কিংবা শেলটার একবার ব্যবহার করার পর অন্তত পাঁচ-ছ মাস পরে নিরাপদ থাকলে আবার ব্যবহার করত। সুতরাং আট-ন মাস আগে ওরা এই বাড়িটা ব্যবহার করে গেছে আর আমরা আজ এসেছি হাতড়াতে, ব্যাপারটাকে চান্স বলা ছাড়া আর কিভাবেই বা ব্যাখ্যা করা যায়? গেটের ভেতর ওদের যখন পাহারাদার আছে তখন বুঝলাম, কপাল মন্দ নয়, একদম খালি হাতে ফিরতে হবে না, সোনা না হয় তামা, রুপো কিছু না কিছু পাবই। ভেতরে দুটো ঘর, দরজা খোলা, কয়েকজন ঘুমচ্ছে। আসলে সারাদিন খাটাখাটনির পর দীর্ঘক্ষণ মিটিং করে ওরা অঘোরে ঘুমচ্ছিল। আমরা ওদের ঘুমের মধ্যেই টেনে টেনে তুলে ঝপাঝপ বেঁধে ফেললাম। ওরা কোন বাধাই দিতে পারল না। তখনও আমরা জানি না কাকে কাকে আমরা গ্রেফতার করছি। ওদেরকে কিছু বুঝতে না দিয়েই সোজা গাড়িতে এনে বসিয়ে লালবাজারের দিকে ছুটলাম। মোট ন-জনকে পেলাম। ওদের কাছে যা জিনিসপত্র ছিল তা দুজন কনস্টেবলের হেফাজতে রেখে এলাম সব গুছিয়ে লালবাজারে নিয়ে আসার জন্য। ওদেরকে প্রায় কিডন্যাপের কায়দায় লালবাজারে তুলে আনলাম। আশেপাশের বাড়ির লোকজন কেউ কিছু বুঝলই না, এত বড় একটা অপারেশন ওদের এলাকায় করে এলাম।

লালবাজারে এনে ন-জনকে আলাদা আলাদা করে দিলাম। তারপর লালবাজারে ওদের ভেতরকার যে সোর্স আটক ছিল, তাকে এনে দূর থেকে চিহ্নিত করালাম কাকে কাকে আমরা ধরে এনেছি। সেই সোর্সও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমরা ধরে এনেছি সি.পি.আই(এম.এল) পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রত্যেকটি সদস্যকে। রাজ্য কমিটির সম্পাদক দীপক বিশ্বাস, দিলীপ ব্যানার্জি সমেত পুরো কমিটিই আমাদের কব্জায়। এ যে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি, সোনা নয় একেবারে মণি মুক্তা পেয়ে গেছি। আর তাও কিনা বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে, একটা গুলিগোলা না খরচ করে।

কিন্তু তখন আমাদের আনন্দ করার সময় নয়। আমাদের চারুবাবুর আস্তানা খুঁজে বার করতে হবে। আমি বুঝলাম, এরা যখন রাজ্য কমিটির সদস্য, এদের সঙ্গে চারুবাবুর সক্রিয় যোগাযোগ থাকবেই থাকবে। কারণ চারুবাবুর সমস্ত নির্দেশ এদের কাছেই আগে আসে। এরাও চারুবাবুকে প্রতিদিনকার খবরাখবর পাঠায়। সুতরাং এদের কাছ থেকেই বার করতে হবে চারুবাবুর গোপন আস্তানা। আর সেটা করতে হবে আজ রাতের মধ্যেই, কারণ ওদের

ক্যুরিয়ার আর পুরো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির সব সদস্য উধাও হয়ে যাওয়ার খবর যদি একবার ওঁর কাছে পৌঁছে যায়, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না ফুলবেলপাতা নিয়ে। আমরা যাব আর উনি ফুল ছিটিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে বলবেন, "এসো, এই যে আমি, চারু মজুমদার। কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার, ওড়িশা, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে মৃত অথবা জীবিত ধরবার জন্য, আমি এখানে বসে আছি, তোমরা আসবে বলে। ভীম নাগের সন্দেশও আনিয়ে রেখেছি, ওইগুলো খাও, তারপর আমায় লালবাজারে নিয়ে যাও।"

সুতরাং যা করতে হবে ভোর হওয়ার আগেই। রাত তখন দেড়টা বাজে। আমি একটা ঘরে বসে আছি। আমাদের ন-জন ওদের ন-জনকে আলাদা আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু করেছে, যাতে কে কি বলছে অন্যেরা না জানতে পারে। প্রত্যেকের বক্তব্যের সিনথেসিস করেই সিদ্ধান্তে 'আসতে হবে।

কিছুক্ষণ পর আমি ওই ঘর থেকেই শুনতে পেলাম আমাদের অফিসার ও কনস্টেবলরা ওদের দিল্লি-আগ্রা- মথুরা-বৃন্দাবন সব দেখিয়ে দিচ্ছে। ওরা কি আর সহজে বলবে ওদের "ভগবান" এখন কোন্ মন্দিরের থানে বসে আছে?

রাত বাড়ছে, আমাদের লোকেরা ট্যুর প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওদের দেশ বিদেশ দেখাচ্ছে। এইভাবে অনেক ঘোরাঘুরি করার পর আমি বুঝলাম, ওই ন-জনের মধ্যে সবাই জানে না কোথায় সেই মুহূর্তে চারুবাবুর আস্তানা। এক এক করে বাদ দিয়ে অবশেষে একজনে এসে ঠেকলাম। সে আমাদের প্রচণ্ড চাপের মুখে রাত তিনটে নাগাদ বলতে বাধ্য হল যে, সে জানে কোথায় আছেন চারুবাবু। তাঁর নামটা এই এত বছর পরেও গোপন রাখছি, যদিও ছাড়া পাওয়ার পর নকশালরা তাঁকে খুন করেছে, তবুও তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের নিরাপত্তার কথাটা মাথায় রেখেই গোপন রাখছি কে সেই নকশাল নেতাটি। কারণ বলা তো যায় না, কার মাথায় কখন ভূত চাপে, আর সেই ভূতের ঠেলায় আক্রোশে অন্ধ হয়ে "বিশ্বাসঘাতকের পরিবার" বলে সেই নকশাল নেতার পরিবারের ওপর আক্রমণ করে ফেলে এবং অযথা কোন জীবন হানি করে দেয়। আসলে আমার পুলিশি জীবনে এইসব তথাকথিত বীর পুরুষদের অনেক দেখেছি। দেখেছি, সেই সব বীরপুরুষদের যারা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য গোপনে গোপনে কতই না কাকুতি-মিনতি করেছে। কতজনকে দেখেছি, ছাড়া পেয়ে যে সব দলকে দিনে কমপক্ষে পাঁচশ বার গালাগালি দিত, গালাগালি না দিলে ভাত হজম হত না, তাদেরই ছত্রছায়ায় যাওয়ার জন্য কত রকমই না হ্যাংলাপনা। কেউ কেউ সেই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে নিজের কেরিয়ার বানানোর জন্য লাইন দিল। একসময় সে সব দেশের নাম শুনলেও তাদের মুখ ঘৃণায় একেবারে বেঁকে যেত। দেখেছি, সেইসব আগুনখেকো বিপ্লবীদেরই বেশি বেশি করে ভোল পাল্টে আখের গোছানর রাস্তায় নেমে পড়তে। বরং অন্যদিকে দেখেছি, যারা কিছুটা লো-প্রোফাইল নকশাল ছিল অর্থাৎ আগুন বোধহয় কিছুটা " কম খেয়েছিল, তারা এখনও অনেক সতেজ আছে, এখনও তাদের দেখি না টাকার জন্য কাঙালপনা। হয়তো তারা অনেকে আর সক্রিয় রাজনীতি করে না, বসে গেছে, কোন দলেই আর যোগ দেয়নি, নকশালদের বর্তমান হাজারও গ্রুপের মধ্যেও আর নেই, পুরনো নাম ভাঙিয়ে রাজনীতির ময়দানে ব্যবসাও করে না, অতি সাধারণ জীবন যাপন করছে। এদের সততার জন্য এখনও আমরা শ্রদ্ধা করি।

আসলে পুলিশে চাকরি করে, লালবাজারে থেকে, বহু বিচিত্র চরিত্রকে অতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, যা অন্য কোন পেশায় মানুষ পায় না। তাই অনেক সময় চমকে উঠেছি, অবাক হয়েছি যখন একজন মানুষের মুখোশ খসে আসল রূপটা বেরিয়ে পড়েছে। যেমন বহু খুনী, ডাকাত, গুণ্ডা, মাস্তান, চোর, চিটিংবাজ, ঠকবাজদের দেখেছি, তেমনি নকশাল ছাড়াও অন্য সমস্ত পার্টির নেতা ও কর্মীদেরও বহুবার কাছ থেকে দেখেছি। আমাদের কাছে এসে যখন আসল রূপটা বেরিয়ে পড়েছে, তখন অবাক হয়ে ভেবেছি, এরা সাধারণ মানুষকে কত ঠকায় এবং আরও কত ঠকাবে। কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা, আমরা

পুলিশে চাকরি করে অনেক তথ্যই পাই এবং পেয়েছি যা জনসমক্ষে আনা যায় না বা সেইসব তথ্যকে গোপন রাখতে বাধ্য হই। যদি আমরা সব তথ্য বলতে পারতাম, তবে আজকের বহু নেতাকেই আপনারা আর সেই সম্মান দিতেন না বা নেতার আসনেও বসিয়ে রাখতে পারতেন না। মন্ত্রীদের মন্ত্রগুপ্তির শপথের মত আমাদেরও কিছু অলিখিত লক্ষণরেখা আছে, যা আমরা ভাঙতে পারি না। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও সেই অলিখিত নিয়মটা মেনে চলা আমাদের ভদ্রতা ও নিষ্ঠার মধ্যে পড়ে। আর আমরা আইনের পরিকাঠামোর মধ্যে কাজ করেছি। তাই আমরা জানি, আইন ছাড়া কাউকে আর এমনি এমনি বাঁধা যায় না। আমাদের কাজ তো আর কুৎসা প্রচার করা নয়। যতক্ষণ না একজন আইনের চোখে অপরাধ করছে, ততক্ষণ আমরা কিছুই করতে পারি না আর সবচেয়ে বড় জিনিস হল সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করা। সেটাও খুব কঠিন কাজ।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি, সেই নকশাল নেতাকে নিয়ে তাঁর কথা মত চললাম মৌলালির মোড়ের দিকে। মৌলালির মোড়ে আমরা আমাদের গাড়িগুলি দাঁড় করালাম। ঠিক করলাম, ওই নেতাকে নিয়ে গোপনে আগে বাড়িটা দেখে এসে তারপর হানা দেব। কিন্তু গাড়ি নিয়ে যাব না। ছদ্মবেশে যাব, যেন কাকপক্ষীও টের না পায় আমরা কে এবং কি উদ্দেশে আমাদের আসা। দেখলাম মৌলালির মোড়ে একটা টানা রিকশা। চালক তাঁর রিকশার মধ্যে গুটিসুটি মেরে ঘুমচ্ছে। তাকে গিয়ে আমি তুললাম। কিছু বোঝার আগেই গ্রেফতারের কায়দায় নিয়ে গিয়ে বসালাম আমাদের একটা গাড়িতে, যাতে আমাদের আগে সে কোনদিকে যেতে না পারে। তারপর তার রিকশাটা নিলাম। সিটের তলায় ওর একটা লুঙ্গি ছিল। আমি প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে সেটা পরে নিলাম। কাঁধে ফেলে দিলাম তার প্রচণ্ড ময়লা গামছাটা। তারপর সেই নকশাল নেতাকে রিকশায় বোরখা পরিয়ে বসালাম, আমাদের একজন ওকে ধরে বসে রইল। লালবাজারে সেই নেতা খুব কেঁদেছিল, তখন কান্না থামিয়ে দিয়েছে। কান্না থামিয়ে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে কোনদিক দিয়ে যেতে হবে।

আমি রিকশা টানছি। রাত তিনটে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। রিকশা টানার অভিজ্ঞতা তো নেই, মন দ্রুত চললেও, রিকশাকে অত দ্রুত টানতে পারছি না। সেইভাবেই চলতে চলতে নকশাল নেতাটি আমাকে মিডল রোডের একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে এসে একটা তিনতলা বাড়ি দেখিয়ে দিল, কোনদিকের কোন ফ্ল্যাটটায় তাদের বিখ্যাত নেতা চারুবাবু আত্মগোপন করে আছেন তা জানিয়ে দিল। আমি আবার রিকশা ঘুরিয়ে মৌলালির মোড়ে এসে পৌঁছলাম। মৌলালিতে পৌঁছে রিকশা চালককে তার গাড়ি, লুঙ্গি, গামছা দিয়ে দিলাম। নকশাল নেতাকে একটা গাড়িতে আমাদের ড্রাইভার ও একজন আর্মড সেপাই-এর জিম্মায় দিয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম মিডল রোডের দিকে। রওনা হওয়ার আগে আমি প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিলাম বাড়িটা কোথায়। মিডল রোডের কাছাকাছি এসে আমরা গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলাম সেই বাড়িটার কাছে। ১৭০এ, মিডল রোড, তিনতলা বাড়ির একতলায় পেছনের দিকের ফ্ল্যাটে চারুবাবু আছেন। বাড়ির পেছনের দিকের প্রাচীর ঘেঁষে চলে গিয়েছে শিয়ালদহ-বালিগঞ্জ ট্রেন লাইন। আমরা অফিসার আর আর্মড সিপাই মিলে মোট চোদ্দ জন। প্রথমেই বাড়িটা ঘিরে ফেললাম। এমনভাবে ঘিরলাম, যে কোন দিক দিয়ে দেখলেই মনে হবে যেন সেখানেই আমরা প্রচুর শক্তি নিয়ে উপস্থিত। ঠিক করলাম, আমি একাই বাড়ির ভেতর ঢুকব। শচী এমনভাবে পাঁচিলের ওপর দাঁড়াল, যাতে আমি ঢুকলে সে দেখতে পায় ভেতরে কি করছি।

আমি সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। রাত তখন তিনটে তিরিশ। ক্যালেন্ডারের ডেট অনেকক্ষণ হয় পাল্টে গেছে, অভিযান শুরু করেছিলাম পনেরই জুলাই, আর আজ ষোলই জুলাই। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর একজন বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়সের লোক এসে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, “কাকে চাই?” আমি তাঁর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়েই তাঁকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে সোজা সেই ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলাম, সেই নকশাল নেতার বিবরণ অনুযায়ী যেখানে চারুবাবুর থাকবার কথা। যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে আমার পেছন

পেছন আসছে আর আমায় জিজ্ঞাসা করেই চলেছে, "আপনি কে? কাকে চাইছেন?"

ততক্ষণে দেখে নিয়েছি যে ঘরটা আমার লক্ষ্যস্থল, সেই ঘরটার দরজা খোলা, একজন বৃদ্ধ দরজার উলটোদিকে মুখ করে দেওয়ালের দিক করে শুয়ে আছেন। আমি সেই লোকটির প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি কে?" লোকটি আমায় বলল, "আমার দাদু।" আমি সরাসরি ওই ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপর সেই জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, "দাদু, দাদু।" দাদু প্রায় সাথে সাথেই উঠে বসলেন। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়- এই কথাটা কবি কেন বলেছিলেন?" দাদু কোন কথাই বললেন না।,

আমি নীরবতা ভেঙে একটা চুরুট এগিয়ে দিয়ে বললাম, "এটা ধরান, টানুন।" উনি এবার বললেন, "টানব?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" দেশলাই দিয়ে ওঁকে চুরুটটা ধরাতে সাহায্য করলাম। চুরুট ধরাবার সাথে সাথেই আমি বাইরে শচীকে ইশারা করলাম ভেতরে আসার জন্য। আমাদের চারজন ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে পড়ল। ফ্ল্যাটের অন্য আর একটা ঘর থেকে পাওয়া গেল একটি আঠাশ-তিরিশ বছর বয়সের ভদ্রমহিলাকে এবং অন্য একজন প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে। আমি দ্রুত শচীদের জিম্মায় "দাদু" এবং অন্য তিনজনকে রেখে বাড়ির বাইরে এসে টেলিফোনের খোঁজ করলাম। কারণ তখন আমার অনেকগুলো ফোন করা জরুরী প্রয়োজন। খোঁজ করতে গিয়েই জানতে পারলাম, ওই বাড়ির মালিকের কাছেই ফোন আছে। তিনতলা বাড়ির ওপর উঠে কলিং বেল বাজালাম। দরজা খুললেন মালিক নিজেই। আমি তাকে আমার পরিচয় দিয়ে প্রয়োজন জানাতেই তিনি ফোনের কাছে নিয়ে গেলেন।

প্রথমেই লালবাজারের হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করে ফোর্স পাঠাতে বললাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তারপর আমাদের ডি.সি.ডি.ডি. দেবী রায়কে ফোন। উনি ফোন ধরতেই আমি বললাম, "গুড মরনিং স্যার, আমি রুণু বলছি, একটা গুড খবর আছে।" উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি গুড খবর?" বললাম, "চারু মজুমদারকে ধরেছি।" উনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না প্রথমে। আমি বললাম, "হ্যাঁ স্যার, আমি ওঁকে দেখেই চিনেছি, যদিও ওঁর যা ফটো আগে দেখেছি তা সব দাড়ি গোঁফসমেত ছিল, এখন তা পরিষ্কার, তবু চিনতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। আমি ওঁকে চুরুট দিয়েছি, উনি সেটা ধরিয়েছেন। আমি জানতাম, চারুবাবু চুরুট টানতে খুব ভালবাসেন।" দেবীবাবু ততক্ষণে ফোন নামিয়ে আমার অবস্থান জেনে নিয়ে এখানে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, নিচের ওরা কবে এসেছেন? খোদ চারুবাবু যে তাঁর বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন সেটা শুনে তিনিও তাজ্জব বনে গেলেন। যাই হোক, উনি জানালেন, প্রবাল রায় নামে এক ভদ্রলোক জুন মাসে তাঁর থেকে ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে। আরও বললেন, আগের দিন তাঁর ভাইয়ের বিয়েতে ওদের সবাইকে ওরা নেমন্তন্ন করেছিল, কিন্তু দাদুর শরীর খারাপ এই অজুহাতে কেউ 'সেখানে যোগ দেয়নি। আমি নিচে নেমে এলাম।

দাদুকে এসে বললাম, "চারুবাবু, আমার নাম রুণু গুহ নিয়োগী। আপনাকে আমরা গ্রেফতার করতে এসেছি।" উনি ততক্ষণে বুঝে গেছেন যে তাঁর খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার দিকে একবার তাকালেন। তখন নকশালদের মধ্যে আমার নামটা খুব পরিচিত ছিল, সেটা চারুবাবুরও জানা ছিল। তাই উনি একদম ভেঙে পড়ে পাশে দাঁড়ান সেই ছেলেটিকে, যে আমায় দরজা খুলে দিয়েছিল, তাকে বললেন, "আমায় ইনজেকশান দাও।" দেখলাম পেথিড্রিন ইনজেকশান সমেত প্রচুর ওষুধ চারুবাবুর খাটের পাশেই রয়েছে। আমি সেই ছেলেটিকে বাধা দিয়ে বললাম, "না, কোন ইনজেকশান এখন দেওয়া চলবে না। যা কিছু ইনজেকশান বা ওষুধ দেওয়ার দরকার সব আমাদের ডাক্তাররা দেবে।" ততক্ষণে তল্লাশিও চালাতে শুরু করেছি, চারুবাবুর বালিশের তলা থেকে পাওয়া গেল চোদ্দ হাজার ছ'শ টাকা ও অনেক চিঠিপত্র, তার মধ্যে বিদেশ থেকে আসা চিঠিও অনেক ছিল। আমরা ওই ফ্ল্যাটটা

থেকে যা যা পেলাম তার একটা সিজার লিস্ট বানিয়ে ফেললাম। জেরা করে জানতে পারলাম, মেয়েটির নাম নীলিমা ব্যানার্জি, সে নকশালদের ত্রিপুরার রিজিওনাল কমিটির সম্পাদিকা। তার সাথে একই ঘর থেকে যে ভদ্রলোককে পাওয়া গিয়েছে, তাঁর নাম প্রবাল রায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেজেটেড অফিসার, উনিই ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন। আর যে আমাকে প্রথম সদর দরজা খুলে দিয়েছে, তার নাম অনিল রায় ওরফে অনল রায়, উনি শিলিগুড়ির সেটেলমেন্ট অফিসে চাকরি করতেন, এখন চারুবাবুর সেবা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত। উনিই চারুবাবুকে ওষুধপত্র দেন, প্রয়োজনে ইনজেকশান উনিই প্রয়োগ করেন। চারুবাবু ক্রনিক হাঁপানি রোগী ছিলেন, তাছাড়া পেথিড্রিন ইনজেকশান নিয়ে নিয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আমাদের হেড কোয়ার্টার্স থেকে প্রচুর ফোর্স চলে এসেছে।

তারা এসে বাড়িটা ঘিরে রেখেছে। আশেপাশের লোকজনও উঠে পড়েছে, তারাও জেনে গেছে, চারুবাবু বহুদিন ওই বাড়িটায় তাদের পাড়াতেই ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী, দেবী রায় সমেত আরও অনেক বড় বড় অফিসাররা। ওঁরা আসতেই আমরা ওদের বার করে আমাদের গাড়িতে তুললাম। ভ্যানে তুলে দিলাম চারুবাবু বাদে অন্য তিনজনকে। চারুবাবুকে একটা প্রাইভেট গাড়িতে তুলে আমি অন্য একটা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, দেবীবাবু কিছুতেই আমায় অন্য গাড়িতে উঠতে দিলেন না। চারুবাবুর গার্ড হিসাবে চারুবাবুকে যে গাড়িতে তুলেছি তাতেই যেতে বললেন। আমি বললাম, "উনি ভাল করে হাঁটতেই পারেন না, পালাবেন কোথায়।" তবু দেবীবাবু আমাকে প্রায় জোর করে চারুবাবুর পাশে বসিয়ে দিলেন। আমরা লালবাজারের দিকে রওনা দিলাম। এলাকার মানুষ আশ্চর্য হয়ে দেখছিল, এই বৃদ্ধ লোকটাই এতদিন তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল?

আমরা চারুবাবুদের লালবাজারে এনে চা-টা খাইয়ে, বিশ্রাম করতে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। যদিও আমাকে ও আমাদের সেই অভিযানের বাহিনীর সব সদস্যকে নিয়ে অন্য অফিসাররা দারুণ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু আমরা তখন এত ক্লান্ত ছিলাম যে তাদের অভিনন্দনও ভালভাবে গ্রহণ করতে পারছিলাম না। তবে বাড়ি যাওয়ার আগে দেব লেন থেকে গ্রেফতার করা ওদের নজন রাজ্য কমিটির সদস্যকে লালবাজারের অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে চারুবাবু জানতে না পারেন তাঁর সাধের রাজ্য কমিটির সব সদস্যই আমাদের মুঠোয় আর সেখান থেকেই সূত্র পেয়ে তাঁকে আমরা ধরেছি। এটা জানতে পারলে রাজ্য কমিটির সদস্যদের জীবন সংশয়ও হতে পারে। সত্যি বলতে কি, আমরা কলকাতার পুলিশ কখনও চাইনি অযথা কোন জীবন অকালে ঝরে যাক। তার জন্য প্রয়োজন মাফিক অনেক সতর্কতা নিয়েছি। কিন্তু তবুও বহু যুবক অকালে প্রাণ হারিয়েছে শুধুমাত্র তাদের হঠকারিতার জন্যই, অথবা যেখানে আমরা ক্ষণিকের জন্য অসতর্ক হয়েছি, সেইসব ক্ষেত্রে।

চারুবাবুর রাজ্য কমিটির এই সব সদস্যদের দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ যারা ভারতবর্ষে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, আর বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিমবঙ্গের মত একটা প্রদেশের বিপ্লবের দায়িত্বে ছিল তাদের পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কেই কোনরকম ধ্যানধারণা ছিল না, ভারতবর্ষ তো দূর অস্ত ! কি করে, কি ভিত্তিতে যে চারুবাবু এদের ওপর এত বড় দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা তিনি নিজেই বলতে পারতেন। অবশ্য কি আর করার ছিল, উনি নিজেই তো ছেলেমানুষী "বিপ্লব বিপ্লব খেলায়" মেতেছিলেন। আর বিপ্লব করতে গিয়ে "শ্রেণীশত্রু খতমের" রাজনীতি আমদানি করেছিলেন। আর তাঁর পাশে তাঁর পুরনো কোন সঙ্গীসাথী ছিলেন না। কেউ মারা গেছেন, কেউ গ্রেফতার হয়ে জেলে আছেন, কেউ সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিরোধিতা করে তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়েছেন। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁর কিছু স্তাবকদের উনি এইসব অকল্পনীয় দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যেন ছোট ছোট মেয়েদের পুতুল খেলা। যাকে ইচ্ছা যখন খুশী রাজা করব, রাণী করব। কিন্তু তাঁর পুতুল খেলার সঙ্গীসাথী তো আর কোন সুস্থ চিন্তাশীল মানুষ হতে পারে না। কেউ তো আর শিশু নয় যে "ভারতবর্ষের বিপ্লব" নিয়ে ছেলেমানুষী খেলা খেলতে গিয়ে খুনোখুনিতে মেতে উঠবে কিছু

না বুঝেই। গ্রেফতার হওয়ার আগে মনে হয় তিনি কিছুটা ভুল বুঝেছিলেন। স্ত্রীকে লেখা চিঠিটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, "খতমের উপর বড় বেশী জোর পরে গিয়েছে, এটা বিচ্যুতি।" খতম অর্থাৎ ব্যক্তিহত্যার মাধ্যমে যে একটা দেশের বিপ্লব সমাধা হয় না সেই সত্যটা তিনি ধরতে পেরেছিলেন। যদিও তাঁরই দেওয়া "বিপ্লবী কৌশলকে" শুধুমাত্র "বিচ্যুতি" বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। আরও লিখেছিলেন, "এই বিচ্যুতি আমরা কাটিয়ে উঠছি, পার্টির মধ্যে সমালোচনা বেড়েছে, কাজেই সংশোধিত হবে। আমাদের পার্টি অল্পদিনের, অভিজ্ঞতাও কম, ফলে বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক।" যে বিচ্যুতির কথা তিনি বলতে চেয়েছেন, সেই "খতমের লাইন" তিনি ও তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক সরোজ দত্ত প্রায় জোর করে নকশাল পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সুতরাং সেটা কাটিয়ে ওঠার প্রশ্নে তাঁকেই সর্বপ্রথম পার্টির নীতি নির্ধারক পদ থেকে বহিষ্কারের কথা। যা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। তাছাড়া কোন্ পার্টিতে সমালোচনা বেড়েছে? যে পার্টির অস্তিত্ব তখন প্রায় বিলুপ্তির মুখে? সুতরাং সংশোধিত হয়ে আবার এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। আর অল্পদিনের পার্টি বলেই কি সবসময় "বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক" এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় কি? দীর্ঘদিনের পার্টিগুলোর বুঝি বিচ্যুতি হয় না? আসলে শর্ট-কাট মেথডে দেশের কোন উপকার করা যায় না, এটা তিনি ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলটা ধরতে এত দেরি করেছিলেন যে, সর্বনাশ যা হওয়ার তা ততদিনে হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ একটা প্রজন্ম। অর্থনৈতিক অগ্রগতি পিছিয়ে গেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। চূড়ান্ত ধ্বংস হওয়ার পর আমরা ওঁকে গ্রেফতার করতে পারলাম। চারুবাবুকে গ্রেফতার করার পর আমাদের থেকে আমাদের ডাক্তারদের কাজ অনেক বেড়ে গেল। এমনিতেই তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন। তার ওপর নিজে ধরা পড়ে ও তাঁর সব শক্তিশালী সদস্যরা আমাদের কব্জায় জেনে তিনি মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। তার ওপর পেথিড্রিন ইনজেকশান আমাদের ডাক্তাররা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে জেরার চাপ তো একটা ছিলই। তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

চারুবাবুকে গ্রেফতারের সময় তাঁর বালিশের তলা থেকে টাকা ছাড়া যে সব চিঠিপত্র আমরা পেয়েছিলাম, তার মধ্যে চীন, ভিয়েতনাম, কানাডা, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা কয়েকটা চিঠি ছাড়াও আমাদের দেশের কিছু ব্যক্তির লেখা চিঠিও ছিল। সেইসব চিঠি পরীক্ষার জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা আমাদের থেকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। ওই চিঠির গুচ্ছের মধ্যে একটা চিঠি ছিল কোনও এক নবীনচন্দ্র সেনের। তিনি চারুবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের বাংলা-বিহার-নেপাল আঞ্চলিক কমিটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য কলকাতা থেকে কোনও এক দায়িত্বশীল নেতাকে তাঁর কাছে পাঠাতে। আরও জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে নেপাল সীমান্তের নকশালদের সেখানে ডেকে এনে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন।

চারুবাবুকে গ্রেফতার করে আমাদের দলটা সারা দিন আর রাতের দাপাদাপি ও উত্তেজনার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি, শচী, সমীর ও সেপাইরা সবাই বিশ্রামের জন্য যে যার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। বিকেল চারটে নাগাদ কোয়ার্টার থেকে আমাকে ডেকে পাঠালেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী। আমি তাঁর সাথে দেখা করতেই তিনি আমাকে বললেন, "তোমাকে আগামীকালই উত্তরবঙ্গে যেতে হবে।" শরীর জুড়ে অবসাদ, তবু উত্তরবঙ্গ শুনে মনটা আমার নেচে উঠল, কারণ আমি উত্তরবঙ্গের ছেলে, উত্তরবঙ্গ মানেই ঘরের টান। তাই শরীরের অবসাদ ভুলে গেলাম। তার ওপর সাহেবের নির্দেশ। বললাম, "ঠিক আছে।" আমার উত্তর শুনে টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে আমাকে বললেন, "এই চিঠিটা পড়, তাহলেই এবারের মিশনটা বুঝবে।" আমি চিঠিটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাতেই দেখলাম, চারুবাবুকে লেখা নবীনচন্দ্র সেনের সেই চিঠিটা। উনি তারপর আমাকে বললেন, "তোমার সাথে এস.বি. আর আই.বি. থেকে চারজন করে অফিসার যাবে,

তুমি আমাদের ডি.ডি. থেকে যাকে যাকে নেওয়ার নিয়ে নেবে।"

পরদিন আমি আমাদের গোয়েন্দা দফতর থেকে কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেল ধরে নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। আমাদের সাথে চলেছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের চারজন ও রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের চারজন অফিসার।

রওনা হওয়ার আগে আমাদের হেফাজতে থাকা ওদের রাজ্য কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে জেনে নিলাম নবীনচন্দ্র সেনের সম্পর্কে। এটা তার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। সে চারু মজুমদার ও আরেক নেতা খোকন মজুমদারের মাঝখানে যোগাযোগের দায়িত্বে আছে। তাছাড়া তার মাধ্যমেই চারুবাবু উত্তরবঙ্গে তাঁর ক্যাডারদের নির্দেশ পাঠাতেন। সে নকশালবাড়ির সেটেলমেন্ট অফিসের কর্মচারী।

দার্জিলিং মেল ছেড়ে দিল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমরা ছাড়া বাইরের কোনও লোক ছিল না। তাই আমাদের নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। আমি খুব গম্ভীরভাবে সবাইকে বললাম, "আমরা একটা ঐতিহাসিক কাজ করতে যাচ্ছি, সবাই মনে রাখবেন, সুতরাং যে কোনরকম হালকা চালচলন পরিত্যাগ করে চলবেন।" আমার গম্ভীর মুখ দেখে সবাই একে অপরের দিকে দেখতে থাকল। ঠাট্টা-ইয়ার্কি ছেড়ে সবাই নিষ্ঠাবান অফিসার হয়ে গেল। কেউ গম্ভীরমুখে সিগারেট টানছে, কেউ ম্যাগাজিন নিয়ে মনযোগ সহকারে পড়ছে, কেউ জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। যেন সব ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র, পরীক্ষা দিতে চলেছে। মিনিট দশেক এইভাবে চলার পর আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। আমাকে ওইভাবে হাসতে দেখে সবাই অবাক। "আরে আমরা কি ঐতিহাসিক কাজ করতে যাচ্ছি না? বিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তো ধরতে যাচ্ছি, সেটা কি কম গুরুত্বপূর্ণ?" এবার সবাই আমার কথা বুঝে হাসিতে যোগ দিল। নবীনচন্দ্র সেনের আসল নাম কমলেশ রায়।

আমরা নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে নামলাম। আমরা স্টেশনের বিশ্রামাগারের দুটো ঘর নিলাম। আমরা মোট এগার জন, আর দুটো ঘরে শোওয়ার জন্য মাত্র চারজনের ব্যবস্থা আছে। তাই হোক, আমরা তো এখানে ঘুমতে আসিনি। কাজের তাগিদে এসেছি। বিশ্রাম তো বহুদিন আগে থেকেই শিকেয় উঠেছে।

সকালে আমি সবাইকে বিশ্রামাগারেই অপেক্ষা করতে বলে অরুণকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। উত্তরবঙ্গের বহু চা বাগানের মালিক আমার পরিচিত, অনেকেই আমার বন্ধু। আমি যখন ফুটবল খেলে বেড়াতাম তখন থেকেই তাঁদের সাথে আমার যোগাযোগ, পরিচয় ও বন্ধুত্ব। আমরা দুজন সেইরকম এক চা বাগানের মালিকের বাড়ি গেলাম। সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাকে বললাম দিন কয়েকের জন্য তার গাড়িটা আমাকে দিতে, ড্রাইভার লাগবে না। বন্ধু আমাকে ড্রাইভার ছাড়াই গাড়িটা দিল। আমরা চাই না এখানকার কোনও নিরীহ ড্রাইভার আমাদের সাথে থেকে কোনওরকম বিপদে পড়ুক, আমরা চলে আসার পর নকশালদের প্রতিহিংসার শিকার হোক। অরুণ অসম্ভব ভাল গাড়ি চালাতে পারত, তাই উত্তরবঙ্গের অসমান উঁচু নীচু রাস্তায় গাড়ি চালানর দায়িত্বটা তার হাতে সঁপে দিলাম।

গাড়ি নিয়ে ফিরে এসে আমরা সবাই আলোচনায় বসলাম। ছক করতে লাগলাম কিভাবে সেটেলমেন্ট অফিস থেকে কমলেশ রায়কে গ্রেফতার করা যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি বেরিয়ে গিয়ে এক বন্ধুর সাহায্যে একটা নেপালী যুবক ঠিক করলাম, যাতে নকশালদের বাংলা-বিহার-নেপাল সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির নেপাল সীমান্তের নেপালী ক্যাডার সাজতে পারে। যুবকটিকে ভাল করে তার কাজ বুঝিয়ে দিলাম। কমলেশ রায়ের চিঠিতে একটা জিনিস পরিষ্কার ছিল, কলকাতা ও নেপাল সীমান্ত থেকে যাদের সে ডেকেছে সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য, তাদের কাউকে সে চিনত না। এটাই আমাদের কাজের সুবিধা করে দিল।

ছক কষে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। লক্ষ্য নকশালবাড়ির সেটেলমেন্ট অফিস। যেতে যেতে বেলা গড়িয়ে যেতে লাগল। অবশেষে পৌঁছলাম সেটেলমেন্ট অফিসের কাছে। আমরা পরিকল্পনা মাফিক ওই অফিস থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা নির্জন মত জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালাম। তারপর নেপালী যুবক ও আই.বি-র একজন অফিসার কলকাতার নকশাল নেতা সেজে সেটেলমেন্ট অফিসে ঢুকে গেল। আমরা দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ওরা অফিসে গিয়ে নবীনচন্দ্র সেন মানে কমলেশ রায় কোন ব্যক্তিটি তা অন্য একজন কর্মচারীর কাছ থেকে জেনে নিল। কমলেশ অফিসের মধ্যেই এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। আই.বি-র অফিসার তাঁর কাছে গিয়ে নিচু স্বরে বললেন, "কমরেড, শ্রদ্ধেয় নেতাকে যে ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন, সে জন্য কলকাতা থেকে আমরা এসেছি, কিন্তু তিনি নিজেই এর মধ্যে গ্রেফতার হয়ে গেলেন।" কমলেশও খাটো পর্দায় প্রশ্ন করল, "খবরটা সঠিক তো? তিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন?" আসলে চারুবাবু গ্রেফতার হলেও অনেক নকশাল প্রথম দিকে বিশ্বাসই করেনি যে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। কারণ তাদের অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে তাদের "ভগবানকে" কোনও পুলিশ ধরতেই পারবে না। তাই কমলেশের ওই প্রশ্ন। কমলেশের প্রশ্নের উত্তরে আই.বি. অফিসার ফিসফিস করে বললেন, "হ্যাঁ, খবরটা সত্যি, কিন্তু ধরা পড়ার তিনদিন আগে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এখানে এসে আপনার সাথে দেখা করে আপনাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে, তা এখানে তো—।" কমলেশ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না, এখানে কোন কথা নয়, চলুন তাহলে বাইরে যাই, আপনার কাছ থেকে কিছুটা শুনে নিই।" তারা তিনজন অফিস থেকে বেরিয়ে এল, আলোচনা করতে করতে আমাদের গাড়ির কাছে চলে এল। অফিসার কমলেশকে বললেন, "গাড়িতে উঠুন, কোথাও গিয়ে বসা যাক।" তখন গাড়িতে আমাদের মাত্র দুজন ছিল, অন্যেরা একটু দূরে আড়ালে লুকিয়ে আছে। অফিসার কমলেশকে গাড়িতে উঠতে বললে কমলেশ একটু আশ্চর্য হয়ে অফিসারের মুখের দিকে তাকাল। অফিসার হেসে বললেন, "আপনার জন্যই এনেছি।" কমলেশ গাড়িতে উঠল গাড়ি কিছু দূরে যেতেই যারা আড়ালে ছিল তারা বেরিয়ে এল। আমরা গাড়ি নিয়ে সোজা পৌঁছে গেলাম শিলিগুড়ি থানায়।

থানায় এসে আমাদের পরিচয় দিলাম। কমলেশকে যে গ্রেফতার করে এনেছি তাও জানালাম। তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। শিলিগুড়ি থানার দারোগাবাবু কমলেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য একটা আলাদা ঘর দিলেন। কমলেশকে মধ্যবয়স্ক, বুদ্ধিমান, সুতরাং চট করে যে তার কাছ থেকে কোনও খবর আদায় করা যাবে না, তা আমরা জানি। কিন্তু তার সাথে যখন চারুবাবুর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল, তখন নিশ্চয়ই সে অনেক খবর রাখে। সে নিশ্চয়ই খবর রাখে, তখন পর্যন্ত গ্রেফতার এড়িয়ে থাকা নকশাল নেতা খোকন মজুমদারের গতিবিধি ও আস্তানার। কমলেশের কাছ থেকে প্রথমে এই খবরটাই বার করতে হবে বলে ঠিক করলাম। রাত বাড়ছে, আমাদের অফিসাররা দু-তিনজন পালা করে তাকে জেরা করে যাচ্ছে। বাকিরা খাওয়াদাওয়া সেরে নিচ্ছে। কিন্তু আসল কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, আমরাও নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞাসাবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছে একের পর এক। অবশেষে ভোর পাঁচটার সময় সে জানাল, কোথায় আছে খোকন মজুমদার। শিলিগুড়িরই এক বাড়ির ঠিকানা সে আমাদের বলল। আমি ঠিক করলাম, তখনই হানা দিই সেই বাড়িতে। কিন্তু আই.বি. অফিসাররা ও অন্য দুজন বললেন, "না, এখন নয় কারণ ওই বাড়িতে পৌঁছতেই আমাদের ভোর ছ-টা বেজে যাবে, হয়ত ততক্ষণে খোকন ঘুম থেকে উঠে চলে যাবে। অথচ আমরা যে গেছি সেটা সে পথে জেনে যাবে, তখন আর ওই বাড়িতে ফিরে আসবে না।" তাঁরা আমাকে আরও বললেন, "খোকন মজুমদার তো আর জানে না যে আমরা কমলেশকে গ্রেফতার করেছি, সুতরাং সে তার আস্তানা পাল্টাবে না।" আমি ওদের যুক্তি মেনে তখন আর খোকন মজুমদারকে গ্রেফতারের জন্য ওই বাড়িতে হানা দিলাম না। আমরা কমলেশকে শিলিগুড়ি থানার হেফাজতে রেখে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের

বিশ্রামাগারে চলে এলাম। সেখানেই আমরা স্নান-টান সেরে স্টেশনের উল্টো দিকের একটা হোটেলে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা ঠিক করলাম বিশ্রামাগারে স্নানটান করব, কিন্তু রাত কাটাব না। সেইমত আমি তখনকার শিলিগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট শ্যামল দত্তের সাথে দেখা করে আমাদের সমস্যার কথা বললাম। তিনি তখন আমাদের নিউ জলপাইগুড়ির রেলওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অর্থাৎ রাতে ওখানেই সেপাইদের খাটিয়াতে শুতে হবে। হোক, তবু রাতে আমরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় বিনা পাহারায় থাকব না, কারণ কমলেশকে ধরে একটা ঘাই তো মেরেছি!

সেদিন রাতে আমরা কমলেশের দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী খোকন মজুমদারকে গ্রেফতারের উদ্দেশে সেই বাড়িতে হানা দিলাম। কিন্তু না, পেলাম না, খোকন সে রাতে ওই বাড়িতে আসেনি। বাড়িতে বাসুদেব নামে অন্য একটা নকশাল ছেলেকে পেলাম, তাকে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে এলাম। জেরার মুখে সে জানাল, গতকাল বিকালেই কমলেশের অফিসে খোকনের যাওয়ার কথা ছিল, কমলেশের সাথে আলোচনার জন্য, কিন্তু খোকন সেখানে গিয়েছিল কিনা সেটা বাসুদেব জানে না। আর কমলেশ যে ধরা পড়ে গেছে সেটা বাসুদেবও জানত না। বুঝলাম, খোকন কমলেশের অফিসে গিয়েছিল এবং সেখানে গিয়ে সে শুনেছে যে কমলেশ দুজন লোকের সাথে অফিস থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। তবে বাসুদেবের কাছ থেকে জানা গেল আগের রাতে খোকন ওই আস্তানাতেই ছিল। সেই কথাটা জানার পর আমার আফশোস হল, ভাবলাম, “ইস, যদি আমি আমার সহকর্মীদের পরামর্শ না শুনে ওই ভোরেই সেই বাড়িতে হানা দিতাম তবে খোকনকে পেয়ে যেতাম।” বাসুদেবের কথার ভিত্তিতে বোঝা গেল, কমলেশ খোকনকে বাঁচাতেই সেদিন যে খোকনের তার সাথে অফিসে দেখা করতে আসার কথা, সেটা আমাদের কাছে গোপন করে গেছে। যাতে খোকন সময় পায়, বোঝে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে এবং যথাসময়ে পালিয়ে যায়। কমলেশ যখন এই চালাকিটা করেছে তখন বুঝতে অসুবিধা হল না, কমলেশকে যত ছোট নেতা ভাবছি, আসলে তা নয়। সে আরও খবর জানে এবং খোকন মজুমদার কোথায় কোথায় যেতে পারে, সেই খবরটাও সে দিতে পারে। আমরা তারপর আলাদা আলাদা ভাবে তাদের দুজনকে জেরা করতে লাগলাম। দুজনের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে শিকারপুর এলাকায় রায়গঞ্জ গ্রামে নকশালদের একটা ঘাঁটি আছে।

আমরা শিকারপুর যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু সেখানে যেতে হলে স্থানীয় পুলিশের সাহায্যের দরকার। সেইমত আবার অতিরিক্ত এস.পি. দত্ত সাহেবকে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যটা বলতে, তিনি বললেন তিনিও আমাদের সাথে যাবেন। সন্ধেবেলা আমরা শিকারপুরের রায়গঞ্জ গ্রামের উদ্দেশে বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। ওই গ্রামে যেতে গেলে গাড়ির রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রায় পনের কিলোমিটার হেঁটে যেতে হবে। দত্ত সাহেব বিরাট ফোর্স সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাথে রওনা দিলেন। আমরা রাত দশটা নাগাদ গাড়ি ছেড়ে হাঁটতে শুরু করলান। প্রায় অর্ধেক রাস্তা হাঁটাব পর দত্ত সাহেব বললেন, “আমি আর হাঁটতে পারছি না, আপনারা এগিয়ে যান, আমি আস্তে আস্তে এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি।” আমরা আর কি করি, তাঁকে ছেড়ে দিয়েই অন্ধকারের ভেতর বর্ষার জলীয় হিমেল বাতাস সরিয়ে কাঁচা মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। উল্টো দিকে দত্ত সাহেব হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

রাত তখন প্রায় তিনটে, বাসুদেবের নির্দেশে আমরা রায়গঞ্জ গ্রামের সেই বাড়িটার কাছে পৌঁছলাম, যেখানে নকশালরা মাঝেমধ্যেই ঘাঁটি গাড়ে। বাড়িটা একদম বাংলাদেশ সীমান্তের লাগোয়া। বাড়ির উঠোনের প্রান্তেই বাংলাদেশ শুরু, তাই যে কোনও সময় বাংলাদেশে অনায়াসেই ঢুকে পড়া যায়। পালিয়ে যাওয়ার আদর্শ স্থান। আমরা নিঃশব্দে প্রথমে অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটা ঘিরে ফেললাম। তারপর বাড়ির সদর দরজায় ঘা দিয়ে বলতে থাকলাম, “দরজা খোল, দরজা খোল।” আচমকা বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে ছিটকে

ছিটকে বেরিয়ে এল দশ পনেরটা বল্লম। আমরা এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। তবে নকশালরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে ভেবে আমরা প্রত্যেকেই আড়াল নিয়েছিলাম, তাই বল্লম কারও গায়ে লাগল না। এরপর আমরা টর্চের আলো ফেলে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। ওদিক থেকে বল্লম ছোঁড়ার পর আর কোন সাড়াশব্দ নেই। একটু পরে বাড়ির ভেতর থেকে একটা মেয়েলি কান্নার আওয়াজ পেতে বুঝলাম, ভেতরে মহিলা আছে, এবং সে সম্ভবত নকশাল নয়, নকশাল হলে ওইভাবে কেঁদে উঠত না। আমি এবার চিৎকার করে বলতে লাগলাম, "যারা যারা বাড়িতে আছ, বেরিয়ে এস, কোন ভয় নেই।" কিন্তু তাতেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আর অপেক্ষা করা যায় না ভেবে আমরা অসম্ভব দ্রুতগতিতে সদর দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। না, কোনও নকশাল পেলাম না। বাড়ির বাসিন্দা ছাড়া আর কেউ নেই। গৃহকর্তার কাছে জানলাম, তারা আমাদের ডাকাত ভেবে বল্লম ছুঁড়ে মেরে ছিল। ওখানে প্রচণ্ড ডাকাতের উৎপাত, ডাকাতি করে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। উনি আরও জানালেন, নকশালরা বেশ কিছুদিন হল আর ওদিকে আসছে না। খোকন মজুমদারের খবরও তিনি দিতে পারলেন না। বুঝলাম, খোকন বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে। আসলে খোকন ছিল মুসলিম, হিন্দু নামটা তার ছদ্মনাম। আর এই নামে নিজেকে আড়াল করতে তার সুবিধা হয়েছিল। বাংলাদেশের সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, যখন তখন বাংলাদেশে পালিয়ে যেত। ব্যর্থ হয়ে আমরা রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে হাঁটতে শুরু করলাম।

সীমান্ত অঞ্চলের একটার পর একটা গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি। জীবনযাত্রা ওখানে প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য। একটা গ্রামে এসে শুনলাম, আগের দিন রাতে একটা লোককে চুরির দায়ে ধরে তাকে সাথে সাথে গ্রামের লোকেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। যুক্তি হল, সেখান থেকে পনের কুড়ি কিলোমিটার হেঁটে থানায় খবর দেওয়া বিরাট পরিশ্রমের, তাছাড়া থানায় খবর দিলে থানা থেকে তদন্ত করতে আসবে খুব তাড়াতাড়ি হলে পনেরো-কুড়ি দিন পর অথবা কোনদিন নাও আসতে পারে। তাই তাদের কাছে মেরে ফেলাই শ্রেষ্ঠ উপায়, কোন আর ঝুট ঝামেলা রইল না। ওদের যুক্তি শুনে আমরা তো তাজ্জব, আরে এ তো খুন, খুনের দায়ে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন জেল খাটতে হতে পারে, ফাঁসি হতে পারে। ওরা নির্বিকার, কারণ ওরা জানে যেমন চুরির খবরও কেউ থানায় দিতে যায় না, খুনের খবরও কেউ থানায় দিতে যাবে না। সুতরাং কিসের মামলা, কিসের সাজা? এত কঠিন, নিষ্ঠুর ওখানকার জীবনযাত্রা !

আমরা ফিরে এলাম নিউ জলপাইগুড়ির রেলওয়ে স্টেশনে। স্টেশনে বাসুদেবকে নিয়ে বসে আছি। আগের দিনই আমরা বিশ্রামাগারের ঘর দুটো ছেড়ে দিয়েছি। শিলিগুড়ি থানার ভেতর সরকারী ভবনে চলে গেছি। কারণ আমরা যে কলকাতা থেকে এখানে এসে কমলেশ, বাসুদেব ও চারুবাবুর "পোস্ট অফিস" সেই দোকানদারকে গ্রেফতার করেছি তা নকশালদের জানা হয়ে গেছে। চারুবাবুর ক্যুরিয়ার যে দোকানদারকে চারুবাবুর চিঠি পৌঁছে দিত, তার থেকে আমরা বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি।

বাসুদেবকে নিয়ে স্টেশনের ভেতর একটা বেঞ্চে বসে আছি, হঠাৎ সারা স্টেশন জুড়ে হৈ চৈ। লোকেরা চারদিকে ছুটে পালাচ্ছে। একজনকে ধরে জানতে চাইলাম, ব্যাপার কি? কি হয়েছে? তার কাছ থেকে শুনলাম, নকশালরা বিশ্রামাগার আক্রমণ করে ছিল, দুটো ঘর বোমা মেরে তছনছ করে দিয়েছে। বুঝলাম, আমরা যে ঘর দুটোতে ছিলাম সেখানেই ওরা আক্রমণ করে চলে গেছে অর্থাৎ আমরা যদি ওখানে থাকতাম তাহলে এতক্ষণে বোমার আঘাতে উত্তরবঙ্গ থেকে সোজা চলে যেতাম দক্ষিণ দুয়ারের রঙ্গভূমিতে। এরপর স্টেশনে আর অপেক্ষা না করে সোজা বাসুদেবকে নিয়ে চলে এলাম শিলিগুড়ি থানায়।

পরদিন আমরা উত্তরবঙ্গ সফর গুটিয়ে কমলেশ, বাসুদেব আর দোকানদারকে নিয়ে কলকাতার দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে দেখলাম, চারুবাবু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর সাথে দেখা করে গেছেন তৎকালীন পুলিশমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি। দেখা করেছেন তাঁর স্ত্রী, একমাত্র ছেলে অভিজিৎ, ছোট মেয়ে মধুমিতা ও বড়মেয়ে মেডিকেলের ছাত্রী অনীতা।

কিন্তু জীর্ণশীর্ণ চরম অসুস্থ, চূড়ান্তভাবে মানসিক বিপর্যস্ত, হতাশায় নিমগ্ন একটা দুর্বল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সত্যিই কঠিন। বাধ্য হয়েই লালবাজারের ডাক্তাররা ওঁকে সাতাশে জুলাই বিকেলে শেঠ সুকলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতালের কারডিওলজি বিভাগে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আঠাশে জুলাই ভোর চারটে পঞ্চান্ন মিনিটে তিনি মারা গেলেন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের একটা খণ্ডিত অধ্যায় শেষ হল।

শুধু সেদিন যখন রাত দশটা নাগাদ তাঁর ছেলে মুখাগ্নি করার পর তাঁর দেহ কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লিতে তুলে দেওয়া হল, তখন আমি ভাবলাম, তিনি সত্যিই আমাদের শিক্ষক ছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তা নেগেটিভ অর্থে। তিনি আমাদের শিখিয়ে গেলেন কোন কিছু না বুঝে ছেলেমানুষী খেলায় কিংবা ভুলপথে চালিত হলে পরিণতি কি হয়। এরপর আর কেউ না ভেবে তাঁর খেলায় মাতবে না। এই আশা নিয়ে কেওড়াতলা থেকে লালবাজারে ফিরে এলাম !

নকশাল আন্দোলন এরপর আস্তে আস্তে প্রায় থেমে গেল। আমাদের ছোটাছুটি অনেক কমে গেল। তারপর থেকে লালবাজারে বা রাস্তাঘাটে যখনই পরিচিত পুরনো নকশাল নেতা বা কর্মীদের সাথে দেখা হয়েছে তখনই তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি, "কি কারণে তারা ব্যর্থ হল?" কিন্তু যুক্তিপূর্ণ কোন সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কারও কাছে পাইনি। আমাদেরও প্রয়োজনে মার্কসবাদ কিছু পড়াশুনা করতে হয়েছে। জানতে হয়েছে। সে অনুযায়ী বিখ্যাত এক তরুণ নকশাল নেতার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছিলাম, তাঁর বোধহয় মার্কসবাদের গোড়ার কথা "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ" সম্পর্কেই কোনও ধ্যান ধারণা নেই, অথচ তিনি কাগজপত্রে বিরাট মার্কসবাদী নকশাল নেতা! নকশালদের অনেক নেতা ও কর্মী পরবর্তীকালে আমাদের কাছে এসেছে বিভিন্ন প্রয়োজনে। তাদের অনেককে আমি প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছি, চাকরি বাকরি করে দিয়েছি। প্রয়োজনমত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি। একবার এক তুখোড় নকশাল নেতা ও পরবর্তীকালের সাহিত্যিক, আমার কাছে এসে বললেন, "আমার মেয়েটা এক বখাটে মাড়োয়ারি ছেলের সাথে প্রেম করে, তাকেই বিয়ে করে চলে যেতে চায়, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন যাতে বিয়েটা বন্ধ করা যায়।" আমি সেই উচ্চবিত্ত পরিবারের নকশাল নেতাকে বললাম, "ঠিক আছে, আমি মাড়োয়ারি ছেলেটাকে ভাগিয়ে দেব, যাতে সে আপনার মেয়ের পেছনে আর না লাগে। কিন্তু আপনার মেয়ের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে, যাতে তারপরে আর সে ছেলেটার কাছে না যায়।" সেই প্রাক্তন নেতা বললেন, "আপনি আর কি করবেন, আমার মেয়ের দায়িত্ব আমিই নেব।" তারপর সেই নেতা মাড়োয়ারি ছেলেটার নাম-ঠিকানা আমার কাছে দিয়ে চলে গেলেন। আমি পরদিনই ছেলেটাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এমন ধমক দিলাম যে সে কান্নাকাটি করে বলে গেল, জীবনে আর ওই মেয়ের মুখ দেখবে না। তারপর মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়।

হাজারও ছোট ছোট দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে নকশাল আন্দোলন অনেকদিন হল শেষ হয়ে গেছে। সাতাত্তর সালে প্রথম বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে তাঁদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে। আমরা তখন রাজনৈতিক আন্দোলন মোকাবিলা করার থেকে অন্য কাজে ব্যস্ত। সে সময় আশির দশকের মাঝামাঝি একদিন বিকেলে লালবাজারে বসে আছি আমরা অনেকে। দেখলাম, অনন্তবাবুর দলের রাজারাম চৌধুরী এসেছে আমাদের দফতরে। তার পাড়ার একটা অল্পবয়সী মেয়ে দুদিন ধরে নিখোঁজ, সেই খবরটা আমাদের মিসিং স্কোয়াডে লেখাতে এসেছে। আমি তাকে ডাকলাম আমাদের কাছে, এমনিতে আমরা প্রত্যেকে ওদের ভীষণ ভালবাসতাম। তাকে চা খেতে দিলাম, চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কি করছে। রাজারাম জানাল। তারপর তাকে সেই প্রশ্নটা করলাম, "কি কারণে নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে?"

সে আমার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি মানি না, যেমন ধরুন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহসটা নকশাল আন্দোলনের ফলেই সামনে এসেছে, এবং দুর্নীতিকে শেষ করতে গেলে যে ডাণ্ডাটাই একমাত্র কার্যকরী সেটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সেইসময় কি আপনারা দেখেন নি সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষেরা লুকিয়ে পড়েছিল? এমন কি পাড়ায় পাড়ায় ছোট খাট মাস্তানরা পর্যন্ত ভয়ে মেয়েদের টিটকারি দিত না। তাছাড়া ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা যে বদমাইস এবং ভণ্ড সেইটা কিন্তু নকশাল আন্দোলনের ফলেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তাঁদের মুখোশ খুলে গিয়েছে। আর আমাদেরও জানা হয়ে গিয়েছে যে ভারতবর্ষে কোন কমিউনিস্ট পার্টি নেই, কোনও কালে সাইনবোর্ড সর্বস্ব ছাড়া কিছুই ছিল না। এগুলো সবই নকশাল আন্দোলনের ফল। আর ব্যর্থতারও কিছু কারণ আছে। মাও সে-তুং বলেছিলেন, নীতি যদি সঠিক থাকে তবে কিছু না থাকলেও সবকিছু পাওয়া যায়, জয় হয়। আর নীতি যদি বেঠিক থাকে তবে সব কিছু থাকলেও শেষে সব কিছু হারিয়ে ফল হয় শূন্য।

তার মানে আমাদের নীতি সঠিক ছিল না, এটাই ব্যর্থতার মূল কারণ। আর লেনিন রুশ বিপ্লবের পর বলেছিলেন, রাশিয়াতে যেভাবে বিপ্লব সংগঠিত হল, তা পৃথিবীতে একবারই হল, এরকম আর হবে না, অন্য কোনও দেশের কমিউনিস্টরা যেন রুশ বিপ্লবের অনুকরণ না করেন। লেনিনের এই শিক্ষাটা আমরা ভারতীয়রা কখনও শুনিনি, সবসময় আমরা অন্যান্য দেশের অনুসরণ করে গেছি, বুঝে অথবা না বুঝে, কখনও রাশিয়া কখনও বা চীন ও ভিয়েতনামের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে। অথচ ভারতবর্ষের পরিস্থিতির কোন বিশ্লেষণই আমরা করিনি, যা করা হয়েছে সবই অপক্ক, ভাসা-ভাসা। তাই আমরা এই দেশে কি ভাবে বিপ্লব করব, যে দেশটাকে চিনিই না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তা এই যে এত বিশ্লেষণ, লেখালেখি, এগুলো তবে কি?" রাজারাম নির্দ্বিধায় বলল, "সব টুকলিফাইয়িং, নিজেদের বিশ্লেষণ একটাও নয়, দেশের অবস্থান বুঝতে যে ব্যাপক অনুসন্ধান দরকার তা কোনদিনও হয়নি। অন্য দেশের নেতারা যা বলে দিয়েছেন, তা না বুঝেই আওড়ে গেছি।" প্রশ্ন করলাম, "এসব কি নেতারা জানত না?" সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালভাবেই জানে, আমার চেয়ে কি আর তারা কম মার্কসবাদ পড়েছে? তা না, আসলে এখানেই তো বিশ্বাসঘাতকতা, দালালী। আর তাছাড়া ভারতবর্ষের বিপ্লবী প্রয়াসে সবসময়ই নেতৃত্ব দিয়েছে মধ্যবিত্তরা, যে মধ্যবিত্তদের জন্ম দিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে। তাই সেই ব্রিটিশের ঔরসজাত মধ্যবিত্তরা একটা দূর পর্যন্ত যেতে পারে, তারপরই তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, আত্মসমর্পণ করে বসে। এমন কি এই মধ্যবিত্তরা ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যেও নিজেদের সমস্ত সুবিধাবাদী মানসিকতা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই শ্রমিকরা এখন অর্থনৈতিক আন্দোলন ছাড়া অন্য আন্দোলনে কোনও উৎসাহই পায় না। আর আমরা, নকশালরা তো প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের সংগঠিতই করতে পারিনি। বাকি প্রায় সব শ্রমিক নেতা মাসে একবার ইউনিয়নে যায়, মাসকাবারী মাইনে নেওয়ার জন্য নেতারা তো পরস্পরের পিঠ চুলকে আরামেই আছে।"

রাজারাম একটানা বলে চুপ করে গেল। আমরাও চুপ করে আছি। হঠাৎ সে বলে উঠল, "অবশ্য এসব আপনাদের বলে কোনও লাভ নেই, তবু প্রশ্ন শুনলেই বুকের জ্বালাটা বেরিয়ে আসে।" রাজকুমার ও আমার সহকর্মী তখন রাজারামকে প্রশ্ন করল, "তুই যদি সবই বুঝিস, তবে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে বসে গেলি কেন?" রাজারাম এবার হেসে উত্তর দিল, "দূর, আমি লেনিনও নই মাও সে-তুংও নই যে এতবড় দেশের বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারব। এখন ওদের মত কাউকে চাই একদম প্রথম থেকে শুরু করার জন্য। আমি জানি পারব না, তাই চুপ করে গেছি। সাধারণ জীবন যাপন করছি! সেটাও খুব কঠিন, রাজনীতির ব্যবসার চেয়ে কঠিন তো বটেই, তবে, না-থাক—।" এই পর্যন্ত বলে সে চুপ করে গিয়ে বলল, "আজ আমি যাই", রাজারাম উঠে পড়ল। চলে গেল। আমরা সবাই চুপ করে বসে রইলাম। এরপর আর কোনদিন কোনও নকশাল কর্মী বা নেতাকে তাদের আন্দোলন কি জন্য ব্যর্থ হয়েছে সে প্রশ্ন করিনি,

তারপর থেকে ওই প্রশ্ন কলকাতা পুলিশের কোনও অফিসারকে কি করতে হয়েছে? মনে হয়, হয় নি। কারণ 'বিপ্লবী আন্দোলনের' কোনও রকম ঝড় ঝাপটার মোকাবিলা তাঁদের করতে হয়নি। গলিতে গলিতে আরবান গেরিলাদের সাথে লড়তে হয়নি। যারা তেমন কর্মকাণ্ড করবে বলে ঘোষণা করেছিল, তারা তো নন্দন, চ্যাপলিন আর রূপায়ণ নিয়ে ব্যস্ত। জমির দালালী আর দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতেই বেশি সময় ব্যয় করে, সুতরাং কি আর বিশেষ এখন কাজ আছে কলকাতা পুলিশের? তাতেই নাকানিচোবানি। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যই প্রাক্তনদের কুৎসা গেয়ে বেড়ানটাই তাদের কর্মের শীর্ষস্থানে রয়েছে।

মধ্যবিত্তের চরিত্রের একটা অদ্ভুত রূপ, ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে কর্মবীর হিসাবে প্রচার করে দায়মুক্ত থাকার অপচেষ্টা। পুলিশে চাকরি করতে এসে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, তাকে এড়িয়ে অন্য কাজে নিজেকে মগ্ন রাখলে তার আর

পুলিশে চাকরি করতে আসা উচিত নয়।

বর্তমানে দেখি, পুলিশের নিচুতলার কিছু কর্মীকে বিভিন্ন সমাজবিরোধী দুষ্কর্মে অংশ নিতে। তার দায় যাদের তাঁরা কি সেটা বন্ধ করার কোনও সক্রিয় চেষ্টা করছেন? তাঁরা কি কখনও ভেবে দেখেছেন কি কারণে বাহিনীর লোকেরা জড়িয়ে পড়ছে? বাহাত্তর সাল থেকে যে মূল্যবোধহীন সামাজিক অবক্ষয় পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছে, তার থেকে উঠে আসা যে সব লোকেরা পুলিশে যোগ দিচ্ছে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন না করেই তারা বাহিনীতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনিংয়ের সময় চরিত্র গঠনের জন্য যে ঝাড়াই-পোছাই দরকার তার দিকে যাঁদের নজর দেওয়া উচিত তাঁরা সেই কাজটা ঠিকমত করছেন কি? করছেন না বলেই এত বদনাম। আর সেই বদনামের দায় কিন্তু তাঁরই যিনি যখন থাকেন গৃহকর্তার দায়িত্বে। খরগোশের মত গর্তে মুখ লুকিয়ে কেউ যদি ভাবে তার কর্ম অন্যেরা দেখল না, তবে তার মত মূর্খ কজন হয়? হয় না। সেই সব খরগোশদের আর যাই করা উচিত পুলিশে চাকরি করা উচিত নয়, কারণ পুলিশে চাকরি করতে হলে ন্যায়ের পক্ষে প্রিয়--অপ্রিয় সবরকম কাজ করতে হবে। পুলিশের চাকরি তো মুখস্ত করা বই নয়, যে পরীক্ষায় মুখস্ত করা পড়া ছাড়া অন্য কিছু লিখব না। এটা বড় বাস্তববাদী, র‍্যাশনাল, সামাজিক কাজ। এখানে মুখস্ত বিদ্যার কোনও স্থান নেই। স্থান আছে বোধের। যে বোধের মর্যাদা দিতে পুলিশকেও অনেকসময় করতে হয় অদ্ভুত কাজ। যা হয়ত কারও চোখে কালো আর কারও চোখে সাদা।

একদিন আমার পূর্বপরিচিত এক ব্যক্তি, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আলিপুর শাখার ম্যানেজার মিঃ চঞ্চল বিশ্বাস লালবাজারে আমার কাছে এসে বললেন, "ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি, আপনি যদি একটু দয়া করেন তবে হয়ত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি।" আমি বললাম, "কি বিপদ সেটা আগে খুলে তো বলুন, আপনার কি ধরনের সাহায্য দরকার সেটা আগে বুঝতে দিন।"

মিঃ বিশ্বাস বললেন, "আলিপুরের আদালতে একটা মামলা চলছে। সেই মামলায় লালগোলার মহারাজের মুকুট জড়িত আছে। কিন্তু কোর্টে এমন কোনও সুরক্ষিত জায়গা নেই যে সেটা রাখা যায়। তাই যতদিন না সেই মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে আমরা যেন আমাদের ব্যাঙ্কের লকারে সেটা রাখার ব্যবস্থা করি, আদালত আমাদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন।"

আমি বললাম, "এ আর কি সমস্যা! আদালতের যখন নির্দেশ তখন আপনাদের লকারে ওই মুকুটটা রাখার ব্যবস্থা করলেই তো হয়ে যায়।" মিঃ বিশ্বাস বললেন, "সমস্যাটা সেটা নয়। ওই মুকুট রাখতে গেলে যে মাপের লকার দরকার, আমাদের ব্যাঙ্কে তা আছে মাত্র দুটো, আর সেই দুটোই আমাদের দুই গ্রাহককে দেওয়া আছে, একটাও খালি নেই।" বললাম, "তা কোন এক গ্রাহককে অনুরোধ করে একটা লকার খালি করিয়ে নিন না। তাহলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।" মিঃ বিশ্বাস বললেন, "সেখানেই তো সমস্যা, আর তার জন্যই আপনাকে বিরক্ত করতে আসা।"

আমি জানতে চাইলাম, "বলুন, কি সমস্যা?" মিঃ বিশ্বাস বললেন, "ওই দুটো লকারের মধ্যে একটা দেওয়া আছে এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীকে। তিনি আমাদের ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বড় গ্রাহক। আমরা তাকে বিরক্ত করতে চাই না, আমরা তাকে হারাতেও চাই না। আর বাকি যে লকারটা আছে সেটা এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার। তাঁর ওপর আমাদের ব্যাঙ্কের কোন কর্মচারীই সন্তুষ্ট নয়। প্রত্যেকেরই তাঁর ওপর ভীষণ রাগ।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" মিঃ বিশ্বাস বললেন, "হবে না কেন? ব্যাঙ্ক বন্ধ হয় বিকেল পাঁচটায়, লকার বন্ধ হয় বিকেল চারটেয়। ওই ভদ্রমহিলা ব্যাঙ্কে আসেন তাঁর কতগুলো নাতিপুতি নিয়ে বিকেল তিনটে সাড়ে তিনটের সময়। তারপর তিনি চারটে বাজতে মিনিট দশেক বাকি থাকতে তাঁর লকার খুলতে যান। আমার কাছে রাখা একটা চাবি দিয়ে লকার খুলে দিয়ে আসি। তারপর উনি ঘণ্টাখানেক ওইখানে থাকেন, কি যে করেন জানি না। এদিকে বিরক্ত হয়ে সব কর্মচারী চলে যায়। আমি লকার বন্ধ না করে ব্যাঙ্ক ছেড়ে যেতেও পারি না। ভীষণ অস্বস্তিকর। এদিকে তিনি লকারও ছাড়বেন না। কি যে করি? তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি যদি কিছু একটা ব্যবস্থা করেন তাহলে ভীষণ উপকৃত হব।" আমি বললাম, "আমি কি করব?" মিঃ বিশ্বাস বললেন, "আপনি যদি দয়া করে ওই ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে বা অন্য উপায়ে তাঁর লকারটা খালি করাতে পারেন, তা হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।" আমি বললাম, "দেখুন তিনি আপনাদের গ্রাহক, আপনারা তাঁকে অনুরোধ করে পারছেন না, সেখানে আমি কি করতে পারি? কেউ যদি অনুরোধ না রাখে, এখানে বলার কি আছে?" মিঃ বিশ্বাস তবু নাছোড়, আমাকে বারবার অনুরোধ করে যেতে লাগলেন। আমাকে বললেন, "আপনাকে সবাই ভীষণ ভয় পায়, আপনি যদি ভদ্রমহিলাকে একটু ভয় দেখান, তবে দেখবেন সুড়সুড় করে লকারটা ছেড়ে দেবেন। আপনি আমার চেনা লোক, এই উপকারটা আমার করুন।" কি আর করি, ঢেঁকি গেলার মত করে বললাম, "ঠিক আছে একবার নয় যাব, আপনার মুখের কথায় তো আর যাওয়া যাবে না, আপনি একটা দরখাস্ত দিয়ে যান।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, "আগামীকালই দিয়ে যাব।" কিন্তু পরদিন তিনি দরখাস্ত দিয়ে অনুরোধ করলেন, যেন তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করি। আমি প্রশ্ন করলাম, "ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কোন কোন দিন আসেন?" মিঃ বিশ্বাস জানালেন, "এমনিতে কোনও ঠিক নেই। তবে সপ্তাহে তিনি চারদিন আসেন।" জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে যে কোনও দিনই চান্স নেওয়া যেতে পারে?"

মিঃ বিশ্বাস বললেন, “হ্যাঁ, যে কোন দিনই আসতে পারেন।”

দরখাস্ত দেওয়ার পরদিন আমি বিকেল তিনটের সময় ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির। দেখা করলাম ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, “এসেছেন? আমাদের বাঁচান।” জানতে চাইলাম, “তিনি কখন আসবেন?” তিনি জানালেন, “আসার সময় তো হয়ে গিয়েছে, আপনি আমাদের কাস্টমারদের এনক্লোজারে গিয়ে বসুন, তিনি এলে ওখানেই তাঁর নাতিপুতি নিয়ে সময় কাটান। তারপর লকার বন্ধ হওয়ার মিনিট দশেক আগে খুলতে যান।”

আমি মিঃ বিশ্বাসের নির্দেশ মত কাস্টমার এনক্লোজারে গিয়ে বসলাম। আমার সৌভাগ্য, তিনি সেদিন একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে চড়ে এলেন। ম্যানেজার সাহেব যেমন বিবরণ দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী তাঁকে দেখেই আমার চিনতে একটুও অসুবিধে হল না। দেখলাম, তিনি আমার মায়ের বয়সী, বর্ধিষ্ণু পরিবারের মহিলা। এককালে যে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তা দেখেই বোঝা যায়। গায়ের রঙ পাকা হলুদ, ঠিক দুর্গা প্রতিমার মত মুখ, দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছে করে। সাদা ধবধবে পাটভাঙা শাড়ি পরা, তিনি চার পাঁচটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে ঢুকলেন, এবং আমার কাছেই বসলেন। তারপর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বাচ্চাগুলোকে লজেন্স, বিস্কুট দিতে লাগলেন। বাচ্চারা দেখলাম, তাঁর কথা খুব মানে। যাকে যেটা নিতে বললেন, সেইমত নিজেরা ভাগ করে নিল। চারটে বাজতে মিনিট দশেক আগে তিনি উঠে ম্যানেজারকে নিয়ে লকার খুলতে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ম্যানেজার লকার খুলে তাঁর চেম্বারে চলে গেলেন। আমি তখন বাচ্চাগুলোর সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলাম। প্রত্যেকেই দেখলাম ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে “দিদা” বলে সম্বোধন করছে। আমি তাদের নাম জিজ্ঞেস করে দেখলাম, ওদের কারও পদবির সাথে ওই ভদ্রমহিলার পদবির কোনও মিল নেই। জানলাম ভদ্রমহিলার বাড়ির আশেপাশেই সবাই থাকে। তার মানে, বাচ্চাগুলো তাঁর পরিবারের কেউ নয়। আমার সাথে কথা বলতে বলতে বাচ্চাগুলো মনের আনন্দে চকলেট, লজেন্স, বিস্কুট খাচ্ছে।

এইভাবে কেটে গেল অনেকটা সময়। ভদ্রমহিলা মিনিট পঁয়তাল্লিশ হল লকারে ঢুকেছেন। আমি মিঃ বিশ্বাসের চেম্বারে সাড়ে চারটে নাগাদ ঢুকলাম।

তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, লকার কোনদিকে? তিনি জানালেন, চেম্বার থেকে বেরিয়ে লকার এরিয়ার প্রবেশ পথ ধরে সোজা গিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যাবে একটা মানুষ সমান আয়না। আর ওই আয়নার ঠিক ডানদিকেই ভদ্রমহিলার লকার।

আমি ম্যানেজার সাহেবের নির্দেশ মত লকার এরিয়ায় গিয়ে বেড়ালের মত নিঃশব্দে সোজা চলতে লাগলাম। তারপর যেখান থেকে তিনি ডানদিকে ঘুরতে বলেছিলেন, সেখানেই ঘুরলাম, আয়না। কিন্তু নেই, ভদ্রমহিলা নেই, কোথায় তিনি?

মিনিট দশেক পর লকার এরিয়া থেকে ফিরে ম্যানেজারকে বললাম, “আমি চলি।” মিঃ বিশ্বাস আঁৎকে উঠে বললেন, “আপনি চলে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের কি ব্যবস্থা হবে?” আমি তাঁকে বললাম, “আগামীকাল আপনার ওই যে মাড়োয়ারি গ্রাহক আছেন, তাঁর নাম-ঠিকানা নিয়ে আমার সাথে দেখা করবেন, দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি।” মিঃ বিশ্বাসকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সোজা লালবাজারে ফিরে এলাম।

পরদিন তিনি মাড়োয়ারি গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর নিয়ে আমার কাছে এলেন। সেগুলো আমায় দিয়ে জানতে চাইলেন, “কি ব্যাপার বলুন তো, আপনি ওই ভদ্রমহিলার লকারটা না নিয়ে এঁর।”, আমি মিঃ বিশ্বাসকে থামিয়ে বললাম, “আপনি আর একবার কষ্ট করে আগামীকাল সন্ধেবেলায় আমার সঙ্গে দেখা করুন, এখন কোনও কথা নয়।” তিনি আমার কথা শুনে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতে আমি তাঁর দেওয়া ঠিকানাটা দেখছি আর ভাবছি কি করা যায়। ভাবতে ভাবতে হাসি পেল, ঠিক করলাম, কি আর করব, বাজারে আমার নামে চলতি যে দুর্নামটা আছে তাই ব্যবহার করে একটা লকার খালি করাব। অন্য

কোন উপায় তো নেই। দেরি না করে আমি পরদিনই সকালে সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে ডেকে এনে সোজাসুজি বললাম, “আলিপুর পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে যে লকারটা আপনার আছে সেটা ছেড়ে দিতে হবে।” তিনি বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, “কিন্তু আমার কি কসুর?” গম্ভীরভাবে বললাম, “কোন কসুর উসুর নয়, এটা আমার অনুরোধ, দরকার হলে ওই ব্যাঙ্ক থেকে আপনাকে ছোট ছোট দুটো লকার দেওয়া হবে। আর একটা কথা বলছি আপনার ওই ব্যাঙ্কের সাথে যেমন লেনদেন চলছে সেটাও বন্ধ করবেন না।” আমার কথা শুনে ভদ্রলোক কি বুঝলেন জানি না, মনে মনে নিশ্চয়ই আমার বাপান্ত করলেন। তবে মুখে বললেন, “ঠিক আছে সাব, আপনি যখন বলছেন তখন আমি ছেড়ে দেব, আজই ছেড়ে দেব।” আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে তিনি চলে গেলেন।

সেদিনই সন্ধেবেলা মিঃ বিশ্বাস মুখে একগাল হাসি ঝুলিয়ে আমার কাছে এলেন। বললেন, “সমস্যা মিটে গেছে, আপনি এমন ধমকেছেন সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে যে তিনি লকার ছেড়ে দিয়েছেন।” বললাম, “ধমকেছি? কই না তো।” মিঃ বিশ্বাস বললেন, “কেন তিনি তো কাঁপতে কাঁপতে আমাকে গিয়ে আপনার নাম করে বললেন, ওনাকে কেন বলতে গেলেন, আমাকে বললেই তো আমি লকার ছেড়ে দিতাম। তাই ভাবলাম, আপনি বোধহয় ওকে ধমকেছেন।” আমি চুপ করে শুনে বললাম, “আপনার কাজ হয়ে গেছে তো? ওসব ছেড়ে দিন। আর একটা কথা, ওই ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করবেন না।” মিঃ বিশ্বাস বললেন, “ব্যাপারটা কিছু বুঝলাম না, ভদ্রমহিলার লকারটা নিলেই ভাল হত, আমাদের ফালতু একটা কাজের চাপ কমত। তার ওপর আবার বলছেন তাঁকে যেন বিরক্ত না করি। কিন্তু কেন তা একটু বলবেন?” মিঃ বিশ্বাসের প্রশ্নে একটু রাগ হল, সেই সুরেই বললাম, “হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি, বিরক্ত করবেন না।”

মিঃ বিশ্বাস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, আমি বলতে শুরু করলাম, 'শুনুন, সেদিন যখন আপনাদের লকার এরিয়ায় সোজা গিয়ে ডান দিকে ঘুরে আয়নার দিকে তাকাই, দেখি ওই বিধবা ভদ্রমহিলা নেই।” মিঃ বিশ্বাস বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করলেন, “নেই?” আমি বললাম, “না, নেই। উধাও।” মিঃ বিশ্বাস বলে উঠলেন, “তার মানে?” বললাম, “তার বদলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রচণ্ড দামী লাল টুকটুকে বেনারসী শাড়ি পরা, সর্বাঙ্গে গয়না মোড়া এক মহিলা।” মিঃ বিশ্বাস প্রায় চিৎকার করে বললেন, “মহিলা?” বললাম, “হ্যাঁ, মহিলা। তিনি আয়নায় নিজেকে দেখছিলেন। আমার প্রতিবিম্ব আয়নায় পড়তেই তিনি ঘুরে তাকালেন। আমাকে দেখতে পেয়েই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দেখছি, ভাবছি, আমি ঠিক দেখছি তো? ইনি কি সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা? বেনারসী শাড়ি জড়িয়ে সারা গায়ে প্রচুর ভারি ভারি সোনার গয়না পরে, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ এঁকে ঠিক নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।” মিঃ বিশ্বাস ধৈর্যচ্যুত হয়ে প্রশ্ন করলেন, “তারপর?”

আমি বললাম, “আপনি আমায় বলেছিলেন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা হাতে একটা ছোট রূপোর কৌটো নিয়ে আসেন। দেখলাম সেটা হাতে ধরা। আমি আস্তে সেই কৌটোটা নিয়ে খুলে দেখলাম তাতে রয়েছে সিঁদুর। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার ওই সাজ দেখে আমি নিজেই হতভম্ব, কৌটোটা ফেরত দিতে তিনি খুব নিচু স্বরে আমায় বললেন, তোমার ব্যাঙ্কের কাউকে আমার এই লজ্জার কথা বোল না, বাবা। আমিও গলা নামিয়ে জানতে চাইলাম, কিন্তু কেন? তিনি কাঁদতে কাঁদতে ধীরে ধীরে বললেন, আমার বাবা আমাকে চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, আর বিয়ের রাতেই আমার স্বামী মারা যান। তারপর থেকে আমি এখানে। আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, আপনি আসবেন, ব্যাঙ্কের কেউ কোনদিন আপনাকে বিরক্ত করবে না। আর সেখানে না দাঁড়িয়ে আমি সোজা চলে এসেছিলাম আপনার কাছে। তাই আমার অনুরোধ তাঁকে আপনারা বিরক্ত করবেন না। তাঁর নিঃস্ব জীবনে মাঝেমধ্যে বিয়ের রাতের সাজে নিজেকে দেখে যদি একটু সান্ত্বনা পান, ক্ষতি কি? সেটা যদি আপনারা ছিনিয়ে নেন, তা কি খুব ভাল হবে?” মিঃ বিশ্বাস এতক্ষণ আমার কথা

শুনছিলেন, প্রশ্ন শুনে বলে উঠলেন, “না-না।” আমি বললাম, “দেখুন, বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধা আছে, আর তাছাড়া, যত গয়না দেখলাম সেগুলো বাড়িতে রাখাটা নিরাপদও নয়। তাই তিনি আপনাদের ব্যাঙ্কটা বেছে নিয়েছেন।” মিঃ বিশ্বাস আমার হাত ধরে বললেন, “আমি কথা দিচ্ছি, আমাদের ব্যাঙ্কের কোনদিনও আর তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না।” বললাম, “আর একটা অনুরোধ আপনাকে করছি, এই ঘটনার কথা কিন্তু আপনি কাউকে বলবেন না, পাঁচকান হক সেটা আমি চাই না। ওই ভদ্রমহিলার সম্মান রক্ষা করাটা এখন আপনার হাতে।” মিঃ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার দ্বারা তেমন কোন কিছুই হবে না।” মিঃ বিশ্বাস চলে গেলেন, কিন্তু আমার স্মৃতির গুহা থেকে ওই মাতৃপ্রতিম দুর্গাপ্রতিমা কোন দিনও যান নি !

দেবীবাবু গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ভুষি কেলেঙ্কারি মামলার তদন্তের ভার নিয়ে রাজ্য পুলিশে চলে যেতে লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হয়ে এলেন উত্তর কলকাতার ভারপ্রাপ্ত ডি.সি.। তিনি এসে প্রথমেই শুরু করলেন, “দেবী রায় পরিষ্কারকরণ প্রক্রিয়া।” তিনি দেবীবাবুর তৈরি করা গোয়েন্দা বিভাগকে ভাঙতে শুরু করলেন। বদলি করতে লাগলেন দক্ষ অফিসার ও বহুদিন গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করা অভিজ্ঞ কর্মচারীদের। ফলে সুবিন্যস্ত বিভাগটা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তবে সমস্ত পুরনো ও সুদক্ষ অফিসারকে বদলি করার তিনি দুঃসাহস দেখালেন না, তাই কোনক্রমে বিভাগটা বেঁচে গেল। সেইসব বদলি হওয়া অফিসার ও কর্মচারীদের বদলে তিনি ওই সব পদে নিয়ে এলেন তাঁর প্রিয় ও পূর্বপরিচিত উত্তর কলকাতা বিভাগের অফিসার ও কর্মীদের। যাদের কারও গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে প্রথম দিকে গোয়েন্দা বিভাগে এদের থাকা বা না থাকাটা প্রায় সমান হয়ে গিয়েছিল। যেমন তিনি নিয়ে এলেন ঠাকুর নামে এক সার্জেন্টকে। সার্জেন্টরা মূলত ট্রাফিক ও গণজমায়েত সামলানর কাজ করে থাকেন। এবং তাঁদের ট্রেনিংও দেওয়া হয় সেইভাবে। তাঁদের ইনভেসটিগেটিং ক্ষমতাটা আইনগতভাবে নেই। তিনি তাঁকে নিয়ে এলেন গোয়েন্দা দফতরে। ঠাকুরবাবুর একটাই গুণ, তিনি সেই ডি.সি. সাহেবের খুবই অনুগত ও বাধ্য। একবার এক জুনিয়ার অফিসারের সঙ্গে চুরির তদন্তে গিয়ে ঠাকুর নিজেই তদন্তের সিজার লিস্ট তৈরি করেছিলেন। আদালতে হাকিম সাহেব ঠাকুরের কাছে জানতে চান, কেন তিনি ওই সিজার লিস্ট তৈরি করেছেন, আইনে যখন সার্জেন্টদের তদন্ত করার অধিকার দেওয়া নেই। ঠাকুর আদালতের প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় বললেন, “কেন, ডি.সি. বলেছিলেন স্যার।” ভাবটা এমন যেন আইনের চেয়ে ডি.সি. ঊর্ধ্বে।

সেই ঠাকুরের মাথায় জন্মের থেকেই চুল ছিল না। দুচারটে চুল এদিক ওদিক মাথার পাশে উড়ে বেড়াত। তাই তিনি সবসময় টুপি পরে থাকতেন। ডি.সি. সাহেব একদিন ঠাকুরকে বললেন, “আমি কবিরাজি ওষুধের পরীক্ষা করছি, তুমি দুচারদিন পর আমার সাথে দেখা কর, ওষুধ লাগিয়ে তোমার মাথায় আমি চুল গজিয়ে দেব।” ঠাকুর বললেন, “ঠিক আছে স্যার।' সেই কথা মত দু চারদিন পর ডি.সি. সাহেব লালবাজারে তাঁর কোয়ার্টারে ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন কি সব গাছগাছালির পাতার শুকনো গুঁড়ো ও অন্যান্য জিনিসের গুঁড়ো দিয়ে তাতে জল মিশিয়ে একটা কাদার তাল বানালেন। তারপর সেটা ঠাকুরকে দিয়ে বললেন, “ঠাকুর এটা তোমার পুরো মাথায় লাগিয়ে টাকটা ঢেকে নাও।” ঠাকুর তাড়াতাড়ি টুপি খুলে ওই কাদার তালটা পুরো মাথায় লাগিয়ে নিলেন। তখন ডি.সি. সাহেব ঠাকুরকে বললেন, “যাও বারান্দায় রোদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।” ঠাকুর সাথে সাথে বারান্দায় গিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে রইলেন। নট নড়নচড়ণ। এবং ঘণ্টা দুয়েক পর ডি.সি. অফিসে এসে ঠাকুরকে খবর পাঠালেন, আজ - আর দাঁড়াতে হবে না। ঠাকুর ডি.সি. সাহেবের সাথে দেখা করলেন, ডি.সি. সাহেব ঠাকুরকে বললেন, “আগামীকাল থেকে প্রতিদিন আমার কোয়ার্টারে এসে সকাল দশটা থেকে মাথায় ওষুধ লাগিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি দেখব।” এইভাবে দিন পনের চলল। ঠাকুর প্রতিদিন সকাল দশটার মধ্যে লালবাজারে ডি.সি. " সাহেবের কোয়ার্টারে এসেই গুঁড়োর কাদাবানিয়ে, মাথায় ভাল করে লাগিয়ে রোদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ডি.সি. সাহেব' দেখতেন ঠাকুর তাঁর দেওয়া ওষুধ লাগিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে আছে। ডি. সি. ওই দৃশ্য দেখে খুব খুশি হতেন। সাতদিনের মাথায় ঠাকুরের মাথা থেকে ওষুধটা একটু সরিয়ে দেখে বললেন, “বাঃ, ওই তো চুল উঠছে।” উত্তরে ঠাকুর বললেন, “হ্যাঁ স্যার। আমিও হাতে ফিল করছি।” ডি.সি. সাহেব মহানন্দে হাসতে হাসতে তাঁর চেম্বারে গিয়ে সবাইকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, “জানো , ঠাকুরের চুল উঠছে।” তারপর ডি.সি. সাহেব কদিন' খুব প্রসন্ন রইলেন। তারও দিন তিনেক পর আমি আমার অফিসে ঠাকুরের টুপি সরিয়ে দেখলাম সত্যিই চুল উঠছে কি না। কিন্তু কোথায় চুল? কিছু নেই।

আমি ঠাকুরকে বললাম, "ঠাকুর, কই চুল? চুল তো ওঠেইনি।" আমার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বললেন, "না স্যার, ডি.সি. বলেছেন, স্যার, আপনি ভাল করে দেখুন স্যার।" অর্থাৎ ডি.সি. যখন বলেছেন, তার ব্যতিক্রম হয় না; চুল নিশ্চয়ই উঠছে। সেই ঠাকুর অনেক রোদে পুড়েও সারা জীবন চুল ছাড়াই কাটিয়ে দিলেন। ... .. সেই ডি.সি... সাহেব এমনিতে সজ্জন ছিলেন। নিজের মধ্যে নিজের মত করে থাকতে ভালবাসতেন। কোনও কোনও ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন; আবার কিছুটা রোমান্টিক। নিজেই থমসন মেসিনগান নিয়ে অনেকটা ফিদেল কাস্ত্রোর ঢঙে চলাফেরা করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু এত ভুলো মনের ছিলেন যে, গাড়িতেই হয়ত সেটা ফেলে কোন দোকানে বা বাজারে চলে যেতেন। আর সে সময় উপস্থিত সঙ্গীকে সেটা পাহারা দিতে হত।

সেই ডি.সি. সাহেবের আমলে চুয়াত্তর সালের আগস্ট মাসে আমি একদিন সোর্সের মাধ্যমে একটা বিরাট বড় খবর পেলাম। বিশাল পরিমাণের' ইউরেমিয়াম বিদেশে পাচার করার জন্য পাচারকারীরা কলকাতার এসেছে। যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম শুনলাম; তার দাম এক কোটি টাকার ওপর তো হবেই। সোর্সের মাধ্যমেই আরও খবর পেলাম, পাচারকারীরা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের একটা "সুইট" "বুক করে তাতে উঠেছে। তবে সেখানে দলের পাণ্ডাটি নেই, অন্য দুজন আছে। সোর্স ওদের পূর্বপরিচিত ছিল, তাই বললাম, ওদের খাইয়ে-পরিয়ে আরও আস্থাভাজন হতে। কারণ - তারা যে ইউরেনিয়াম বিক্রি করতে কলকাতায় এসেছে সে ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে জানতে হবে এবং তারপর ইউরেনিয়ামের হদিসটা পেতে হারে। আমার পরামর্শ অনুযায়ী সোর্স কাজে নেমে পড়ল এবং ঘনিষ্ঠ হতে বেশি সময় নিল না। সে জানাল, ইউরেনিয়ামের কোনও খদ্দের তখনও ওরা ঠিক করেনি। এতে আমার সুবিধাই হল। আমার কথামত সোর্স তাদের বলল, "তার কাছে জবরদস্ত পার্টি আছে, যদি তারা বলে তবে সেই পার্টিকে তাদের কাছে নিয়ে আসতে পারে।" পাচারকারীদের কাছে তখন অন্য পার্টি ছিল না। আমার সোর্সের কথায় রাজি হয়ে তারা সোর্সের পার্টিকে আলোচনার জন্য নিয়ে আসতে বলল।

এরপর আমি আমার দুই বিশ্বাসভাজন ব্যবসায়ী, একজন মাড়োয়ারি ও অন্যজন গুজরাটি, মিঃ বি. আগরওয়ালা ও মিঃ দোশীকে ভাল করে তাদের কাজ বুঝিয়ে খদ্দের সাজিয়ে আমার সোর্সের সাথে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পাঠালাম। তারা গিয়ে পাচারকারীদের সাথে পরিচয় করল। আমার লোকেরা তাদের বলল, তারা সেই ইউরেনিয়াম বাংলাদেশের মাধ্যমে ইউরোপের বাজারে পাঠিয়ে দেবে। সে সব দায়িত্ব তাদের। তারপর তারা দরদপ্তর সব ঠিক করে ইউরেনিয়ামের কিছুটা নমুনা নিয়ে চলে এল। আমি সেই নমুনা আমাদের অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগে পাঠিয়ে দিলাম। সেটা সত্যিকারের ইউরেনিয়াম কি না তা পরীক্ষার জন্য পরদিনই বিশ্লেষণের রিপোর্ট পেলাম, হ্যাঁ, ইউরেনিয়ামই। ব্যস, আমরা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে গিয়ে সেই দুই পাচারকারীকে ইউরেনিয়াম সমেত গ্রেফতার করলাম। কিন্তু দলের মূল পাণ্ডাকে আমাদের চাই। লালবাজারে আমাদের পদ্ধতি অনুযায়ী ধৃত দুই পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। জিজ্ঞাসার উত্তরে জানতে পারলাম, দলের পান্ডা পরের দিনই অর্থাৎ আঠাশে আগস্ট বড়বাজার এলাকায় মহাত্মা গান্ধী রোডের একটা ছোট হোটেলে আসার কথা। আমরা ঠিক সময়ে সেখানে গিয়ে চারদিক ঘিরে রাখলাম। পাচারকারীদের একজনকে নিয়ে একটা গাড়িতে বসিয়ে একটু দূরে রেখে দিলাম। পাণ্ডা এল, সঙ্গের পাচারকারী আমাদের চিনিয়ে দিতে তাকে গ্রেফতার করে লালবাজারে এনে তুললাম।

পরদিন সব পত্রপত্রিকায় ইউরেনিয়াম উদ্ধার ও পাচারকারীদের গ্রেফতারের খবর ফলাও করে ছাপা হল। তাতে আমাদের সেই ডি.সি. সাহেব খুব খুশি হলেন। এতবড় একটা কাজে তাঁর নাম হল, তাতে তো খুশি হবেনই। এরপর আমরা এই ইউরেনিয়াম পাচারের উৎসটা বন্ধ করার পরিকল্পনা করলাম। গ্রেফতার হওয়া পাচারকারীদের কাছ থেকে তখন জেনে নিয়েছি, জামশেদপুরের কাছে যদুগোড়ায় যে ইউরেনিয়ামের খনি আছে, সেখান

থেকে এইসব ইউরেনিয়াম অন্ধকার পথে বেরিয়ে আসে। এখনই যদি উৎসটা বন্ধ না করা যায়, তবে আরও বেশী পাচার হবে এবং তাতে দেশের ক্ষতি হবে প্রচুর।

জামশেদপুরে তাদের দলের লোকজনের ঠিকানা জেনে ফেলেছি। তৎকালীন কমিশনার সুনীল চৌধুরীর নির্দেশ মত ঠিক হল, আমরা কয়েকজন অফিসার গাড়ি নিয়ে জামশেদপুর রওনা হব। সেই অনুযায়ী আমরা ডি.সি. সাহেবের কাছে প্রস্তাব দিলাম। তিনি জানালেন, আমাদের সাথে তিনিও যাবেন। আমরা তো আর ডি.সি. সাহেবকে না করতে পারি না। তাই-ই ঠিক হল।

পরের দিন দুটো অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে আমরা রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত। একটা ডি.সি. সাহেবের, অন্যটা আমাদের বিভাগীয়। আমাদের কোনও অফিসারই ডি.সি. সাহেবের সাথে তাঁর গাড়িতে সঙ্গী হতে চাইছেন না। বাধ্য হয়ে আমিই তাঁর সঙ্গী হলাম। অন্য গাড়িতে শচী, লাহিড়ী, রাজকুমার, প্রদীপ, অমিত ও টুটুল। ডি.সি. সাহেবের ড্রাইভারটা আবার কানে শোনে না। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, “স্যার, আপনার ড্রাইভার কানে শোনে না, এতে আপনার অসুবিধা হয় না?” আমার প্রশ্ন শুনে তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, “বহু খুঁজে তবে ওকে আমি পেয়েছি। গাড়ির মধ্যে আমাদের কি কথা হয় অন্য কেউ শুনুক তা আমি চাই না। সেজন্য আমি ওকে খুঁজে বার করেছি।” আমি আর কথা না বাড়িয়ে চেপে গিয়েছিলাম।

আমাদের দুটো গাড়ি ছুটল জামশেদপুরের দিকে। ডি.সি. সাহেবের একটা মারাত্মক গুণ ছিল। তিনি যে কোনও বিষয়ের ওপর অনবরত কথা বলে যেতে পারতেন। শ্রোতা শুনছে কি না শুনছে সেদিকে তাঁর কোনও খেয়াল থাকত না। শ্রোতাকে শুধু মাঝেমধ্যে “হুঁ, হ্যাঁ” করে যেতে হত। তিনি তাঁর ধ্যানধারণা আর কথাকে সর্বশেষ বলে মনে করতেন। যদি কেউ তাঁর মতামতের প্রতিবাদ করতেন তবে তিনি তাঁর ওপর ভীষণ রেগে যেতেন এবং তাঁকে অপদার্থ বলে মনে করতেন।

তিনি যখন উত্তর কলকাতার ডি.সি. ছিলেন, তখন বটতলা থানায় এক জুনিয়ার অফিসারকে প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন। ডি.সি. সাহেব প্রতিদিনই রাতে ওই অফিসারের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার সামনের মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলতেন আর হেরে যেতেন। হেরে গিয়ে তিনি সেই অফিসারের সার্ভিস বুকে অহেতুক সাজা লিখে দিতেন। অফিসারের কেস ডায়েরি থেকে খুঁজে খুঁজে তুচ্ছ ভুল ধরে তিনি সাজা দিতেন। সেই জুনিয়ার অফিসার একদিন আমায় বলল, “ডি.সি. সাহেব রোজ আমায় ডেকে ব্যাডমিন্টন খেলেন, অথচ আমার কেস ডায়েরি খুঁজে কিছু না কিছু ভুল ধরে সাজা দেন, কি যে করি!” আমি প্রশ্ন করলাম, “তুমি ডি.সি. সাহেবের সঙ্গে খেলায় হার না জেত?” অফিসার জানাল, প্রতিদিনই সে জেতে। আমি সেটা শুনে বললাম, “এবার থেকে তুমি হারবে, তবে সাবধান, যেন বুঝতে না পারে তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে হেরে যাচ্ছ। তাই মাঝেমাঝে দুএকটা গেম জিতবে। কিছুদিন পর তুমি তোমার সার্ভিস বুক নিয়ে যাবে সাহেবের কাছে, ক্ষমা চাইবে। দেখবে হাতেনাতে ফল পেয়েছ।” অফিসার আমার 'পরামর্শ মত খেলতে লাগল, এবং যথারীতি হারতে লাগল। তার দিন দশেক পর অফিসার তার সার্ভিস বুক নিয়ে গিয়ে সাহেবের কাছে হাজির। সাহেব প্রশ্ন করলেন, “কি ব্যাপার?” অফিসার বলল, "স্যার ' আমায় ক্ষমা করে দিন, 'সাজাগুলো মকুব করে দিন।” সাহেব হেসে বললেন, “বস, বস, আমার সাথে চালাকি! কদিন শরীরটা ঠিক ছিল না, তাই হারিয়েছ, তারপর দেখলে তো,” তোমায় কর্কের সাথে রোজ উড়িয়ে দিচ্ছি।” অফিসার বিগলিত হয়ে মাথা নিচু করে শুনলেন। সাহেব অফিসারের সার্ভিস বুক নিয়ে সব সাজা মুকুব করে দিলেন। পরদিন সেই অফিসার আমাকে এসে বলল, “স্যার, আপনার কথা মত সব কাজ হয়েছে। তিনি সাজা তুলে নিয়েছেন।”

গাড়ি ছাড়ার পর ডি.সি. সাহেব খোশমেজাজে গল্প শুরু করলেন। আমি আর কি করি, নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা পালন করতে লাগলাম। তাঁর কথার মাঝে একবার শুধু “রামায়ণ” ধরিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি তারপর “রামায়ণের” বিভিন্ন চরিত্র ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। '

আমি 'মাঝেমধ্যে হুঁ, হ্যাঁ করে যেতে লাগলাম। ´ বম্বে রোড ধরে গাড়ি ছুটছে, - অন্য গাড়িটা আমাদের গাড়ির পেছন পেছন আসছে। ওই গাড়িতে আমাদের অন্য অফিসাররা হাসিঠাট্টা করতে করতে আসছে। তাদের দেখে আমার হিংসা হচ্ছে, আমার খালি মনে হচ্ছে, আমি যেন জেলখানায় বন্দী।

ডি.সি. সাহেবের "রামায়ণ" শেষ হলে, আমি তাঁকে "বেদ" ধরিয়ে দিলাম। তিনি এবার "বেদ" নিয়ে বলতে শুরু করলেন। আমিও মাঝেমধ্যে হুঁ, হ্যাঁ করতে লাগলাম। ডি.সি. সাহেবকে দু-একবার বললাম ' গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা-টা খেয়ে নিতে। তিনি বললেন, "কাজের সময় কাজ; কোনও খাওয়া দাওয়া ঠিক নয়, তাতে কাজের একাগ্রতা কমে যায়।" আমি চুপ করে গেলাম, তিনি আবার বেদে ঢুকে পড়লেন। আমার ইচ্ছা ছিল, একবার যদি গাড়ি থামাতে পারি, তবে আমি দ্বিতীয় 'গাড়িতে উঠে সেই গাড়ি থেকে অন্য অফিসারকে ডি.সি. সাহেবের গাড়িতে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। আমাদের গাড়ি কোলাঘাট পেরিয়ে মেদিনীপুর জেলায় ঢুকে পড়ল।

ডি.সি. সাহেব 'কি জানি কি দেখে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা রুনুবাবু, আপনি কত উঁচু উই টিপি দেখেছেন?" আমি তাঁর প্রশ্ন শুনে একটু থমকে গেলাম। আমি কোচবিহারের ছেলে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির গ্রামে গ্রামে ঘুরে বড় হয়েছি। সেখানে বহু উই ডিপি দেখেছি বৈকি। তা সেগুলো. আর কতটা উঁচু হবে? বড় জোর এক হাত দু হাত। কিন্তু আমি আমার কল্পনাশক্তিকে যতদূর পারি বাড়িয়ে দিলাম। কারণ 'আমি জানি যতই উঁচু বলি না কেন, তিনি ঠিক তার উত্তরে বলবেন, "মাত্র, এইটুকু!" আমি যাতে না হারি, তাই গল্পের গরুকে গাছে উঠিয়ে একটা ডাহা মিথ্যা বললাম, "তা ধরুন দেখেছি, এই দোতলা বাড়ির সমান উঁচু।" তিনি যথারীতি হেসে বললেন, "দূর, এইটুকু!" আমার তখন নিজেরই নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে, ভাবলাম কেন আরও বাড়িয়ে বললাম না। তিনি একটু থেমে বললেন, "আমি যখন ত্রিপুরায় ডি.এস.পি ছিলাম, তখন ওখানে আমি চারতলা সমান উঁচু উই টিপি দেখেছি।" সেটা শুনে আমার তখন 'গুরু" বলে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কোনমতে সামলে আমি গাড়ির জানালা দিয়ে গ্রামবাংলা দেখতে লাগলাম।

ভাদ্র মাস, আকাশে শরতের মেঘের খেলা। ভরা ধানের ক্ষেত, আলের চারপাশে ধবধবে কাশ ফুলের দোলা। পুজো পুজো ভাব। সন্ধের মুখে গ্রামের লোকেরা "জীবনের লেনদেন" শেষ করে অলস পায়ে ঘরে ফেরার দিকে। আমি সে দিকে মন দেব কি? ত্রিপুরার চারতলা সমান উঁচু উই টিপির বিশ্লেষণ শুনতে শুনতে হুঁ, হ্যাঁ করে যেতেই হচ্ছে।

খড়্গপুরের কাছে চলে আসতেই আমার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। আমি সেই অনুযায়ী ডি.সি. সাহেবকে বললাম, "স্যার গাড়ি একবার দাঁড় করাতেই হবে। নয়ত আমার তলপেট ফেটে যাবে।" তিনি সাথে সাথে বললেন, "তবে তো থামাতে হবেই।" আমি একটা ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করালাম। পেছনের গাড়িও দাঁড়িয়ে গেল। ধাবাটা ছিল রাস্তার থেকে নিচে এবং বেশ খানিকটা দূরে। গাড়ি থামার সাথে সাথে আমি নেমে দ্বিতীয় গাড়ির কাছে গিয়ে শচীকে বললাম, "শচী, সাহেবের কাছে যাও, সঙ্গ দাও, এতক্ষণ আমি তো হুঁ হ্যাঁ" করে গেছি।" শচীরা আমার অবস্থাটা বুঝেছে। তাই আমাকে একটু নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দিতে সে ডি.সি. সাহেবের কাছে গেল। আমি, রাস্তার ধারে তলপেটের ওজন কমিয়ে অবার গিয়ে চায়ের অর্ডার দিলাম। দূর থেকে দেখছি, ডি.সি. সাহেব শচীকে নিয়ে রাস্তার ওপর একবার একশ গজ মত পশ্চিম দিকে যাচ্ছেন আবার একটু পর পুব দিকে গাড়ির কাছে ফিরে আসছেন। আর মাঝে মাঝে হাত দিয়ে কিছু না কিছু শচীকে দেখাচ্ছেন। সন্ধে নেমে গেছে। আমরা সবাই চা ও খাবার খাচ্ছি। হঠাৎ শচী ছুটতে ছুটতে রাস্তা থেকে নেমে আমার কাছে এসে বলল, "স্যার বাঁচান, সর্বনাশ হয়ে গেছে, জোতদারের বাড়ি এগচ্ছে, আপনি যান। পেছন ফিরলেই বিপদে পড়ব।" শচীর কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাই প্রশ্ন করলাম, "কি এগচ্ছে?" শচী বলল, "জোতদারের বাড়ি।" বললাম, "তার মানে?" শচী

করুণ মুখে বলল, “তা আর কি বলছি, আমি যেতেই তিনি একটার পর একটা গাছ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, বলুন তো এটা কি গাছ, আমি যাই উত্তর দিই না কেন, তিনি তখনই বলেন, দূর, এই গাছটা চেনেন না, এটা হল অমুক গাছ। আমি চুপ করে শোনার পরই বলেন, এতদিন কিছুই শেখেন নি, সাধারণ গাছগাছড়াও চেনেন না?” শচীকে বললাম, “তা অসুবিধা কোথায়? শুনে গেলেই হয়।” শচী আমায় বলল, “তাইতো শুনছিলাম, কিন্তু এবার যে বিপদে পড়ে গেছি।” জানতে চাইলাম, “কিসের বিপদ?” শচী জানাল, “তিনি দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা জায়গায় অনেকগুলো লাইট দেখিয়ে আমায় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ওই লাইটগুলো কোথায় জ্বলছে বলুন তো?” আমিও অনেকক্ষণ ওই লাইট গুলো লক্ষ্য করছিলাম। তাঁর প্রশ্ন শুনে ভাবলাম, এখানে আর কোথায় এত লাইট জ্বলবে, নিশ্চয়ই কোন জোতদারের দোতলা বাড়িটাড়িতে। তাই তাঁর প্রশ্নের জবাবে বললাম, কোথায় আর স্যার, জোতদারের বাড়িতে। তিনি আমার উত্তর শুনে বললেন, কারেক্ট। এতক্ষণে একটা ঠিক উত্তর দিয়েছেন, ওটা জোতদারেরই বাড়ি।” শচী এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে একটু থামলে বললাম, “ ভালই তো, একটা প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পেরেছ।” শচী আমার কথা শুনে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, “না স্যার, ওই জোতদারের বাড়িই যে এগিয়ে আসছে, তাই দেখেই আমি আপনার কাছে ছুটে চলে এলাম। তিনি কারেক্ট বলার সাথে সাথেই পেছন ফিরে দেখি কি জোতদারের বাড়ি এগিয়ে আসছে, আসলে সেটা একটা লরি। অনেকগুলো লাইট জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।”

এরপর শচী ভয়ে রাস্তার দিকে ফিরে আমাদের একটা লরি দেখিয়ে বলল, “ওই যে স্যার জোতদারের বাড়ি।” আমরা দেখলাম একটা লরি সামনের দিকে ছোট বড় হরেকরকম লাইট জ্বালিয়ে দ্রুত বেগে রাস্তা দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। “জোতদারের বাড়িটা” চলে যেতে আমি শচীকে বললাম, “তাহলে তুমি কি আর সাহেবের গাড়িতে যাবে না? তুমি কারেক্ট বলেছ, দেখবে তোমায় আর কিছু বলবে না। তবু শচী মাথা নেড়ে বলল, “আমাকে ছেড়ে দিন স্যার।” কি আর করি, আমিই আবার সাহেবকে গিয়ে বললাম, “চলুন স্যার।” তিনি জোতদারের বাড়ির প্রসঙ্গ আর তুললেন না।

গাড়ি আবার ছুটতে শুরু করল। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। ডি.সি. সাহেব বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করে আমাকে বুঝিয়েই চলেছেন, আমি উত্তরে “হুঁ, হ্যাঁ” করে চলেছি। খড়্গপুর পেরিয়ে নিমপুরা, কলাইকুণ্ডা, লোধাশুলি ছাড়িয়ে ঝাড়গ্রামকে ডান দিকে রেখে এগিয়ে চলেছি। ঝাড়গ্রাম ছাড়তেই তিনি বললেন, “আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বিহারে প্রবেশ করব।” আমি শুনলাম। এইভাবে চলতে চলতে আমরা ঘাটশিলায় পৌঁছলাম, সেখানে বম্বে রোডের ওপরে একটা বাড়ি দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, “এই বাড়িটা কার বলুন তো?” আমি এক ঝলক দেখে বললাম, “জানি না।' তিনি তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, “কিছুই জানেন না দেখছি, এটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। দেবীবাবুর আমলে দেখছি কিছুই শেখেন নি।” আমার পেটের ভিতর তখন হাসি মেঘের মত গুরগুর করছে, কারণ আমি জানি, বিভূতিভূষণের বাড়ি ঘাটশিলার অনেকটা ভেতরে, বম্বে রোড থেকে তা দেখাই যায় না। তবু সাহেবের মুখের উপর কোন কথা না বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে চুপ করে রইলাম। আর ভাবতে লাগলাম কতক্ষণে জামশেদপুর পৌঁছব।

অবশেষে জামশেদপুর পৌঁছলাম। রাত তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

সাকচি বাজারের ওপর একটা হোটেল ঠিক করলাম। সাহেবের জন্য আলাদা একটা ঘর দিয়ে আমরা অন্য কটা ঘরে জিনিসপত্র রাখলাম। আমি শচীকে নিয়ে ছুটলাম স্থানীয় থানায়, সেখানে নিজেদের পরিচয় দিয়ে, জামশেদপুরের এস.পি. সাহেবের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে বললাম। তাঁরা টেলিফোনে এস.পি. সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলে আমি ফোনে তাঁকে বললাম, “একটা বিশেষ কারণে আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, আপনার সাথে সরাসরি দেখা করতে চাই।” তিনি আমাকে ওই থানাতেই থাকতে বললেন। মিনিট কুড়ি পর এস.পি. সাহেব জিপে চড়ে এলেন। আমাদের সাথে পরিচয় পর্ব শেষ হলে তিনি

একটা আলাদা ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন কি জন্য আমরা এসেছি। তাঁকে আমরা কারণ জানাতেই তিনি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে নির্দেশ দিলেন আমাদের যেন সবরকম সাহায্য করা হয়। রাত একটায় আমরা আসব বলে থানা থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলে ফিরে স্নান খাওয়াদাওয়া সেরে আসামী ধরবার অভিযানে বার হওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। সবাই তৈরি হলে আমি ডি.সি. সাহেবের ঘরে গিয়ে তাঁকে ডাকলাম। তিনি দরজা খুলে, আমাকে বললেন, 'আমার কি যাওয়ার প্রয়োজন আছে?” উত্তরে বললাম, “সে আপনার ইচ্ছে।” তিনি বললেন, 'আমি ভীষণ ক্লান্ত, আপনারাই যান, আমাকে ছাড়া পারবেন তো সব কিছু ঠিকঠাক করতে?” উত্তরে বললাম, “কোনও অসুবিধা নেই, আপনি বিশ্রাম করুন স্যার, আমরাই যাচ্ছি।" তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ..

রাত একটায় আমরা থানায় পৌঁছলাম।, থানা থেকে একজন অফিসাব ও ফোর্স নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠে আমাদের সঙ্গে আনা ঠিকানার খোঁজে চললাম। সেই অফিসারই রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা পরপর দুটো বাড়িতে হানা দিয়ে তিনজন আসামীকে গ্রেফতার করলাম। কোনও বকম হাঙ্গামাই হল না। আসামীদের থানার হাজতে রেখে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন, আমরা যদুগোড়ায় ইউরেনিয়াম কারখানা দেখতে গেলাম। দূরে রুয়ামের পাহাড়-জঙ্গল, যেখান থেকে ধরা পড়েছিল অনন্তবাবুর দলের ছেলে-মেয়েরা। কারখানার এলাকাটা সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত। বাইরের কোনও লোককেই ঢুকতে দেওয়া হয় না। তবু সেখান থেকেই পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের অমূল্য সম্পদ। আমরা চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সেখানকার রক্ষীবাহিনীর কর্তার সাথে কথাবার্তা বলে জামশেদপুরের হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে থানায় গেলাম। আসামীদের হাজত থেকে বার করে কলকাতার রাস্তা ধরলাম।

দেবীবাবু ও মনাদার মত গোয়েন্দা দফতরের বিরাট 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও সোর্সের জাল বিছনো দায়িত্বশীল অফিসাররা আমাদের দফতর থেকে চলে যেতে আমাদের বিভাগ একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল বৈকি; কারণ তাঁদের বদলে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের গোয়েন্দা কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না।' আর 'তাঁদের সোর্সের কোনও মাধ্যম তো থাকার প্রশ্নই নেই। সোর্স হচ্ছে পুলিশের উপগ্রহ, চোখ। সেই চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়ার অর্থ নিজেদের দেখার ক্ষমতা কমিয়ে ফেলা। সোর্সের কার্যকরী ভূমিকার জন্যই আমরা শুধু কলকাতা পুলিশ এলাকায় সংঘটিত অপরাধ ছাড়াও রাজ্য পুলিশের এলাকার বহু অপরাধেরও নিষ্পত্তি করতে পেরেছি।

একদিন ভোরবেলায় লালবাজারে আমার কোয়ার্টারে এসে হাজির নিমাতা বেলঘরিয়া অঞ্চলের নারায়ণ সরকার, হাতে একটা চটের থলি, কালো ভুষোর মত তার গায়ের রঙ, দোহারা চেহারা, নিমতা আলিপুর অঞ্চলের মাস্তান। সব সময় পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলে। আমার বিশ্বস্ত সোর্স। তাকে ওই ভোরবেলায় দেখে বিরক্ত লাগল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, “কি ব্যাপার, এত ভোরে?” নারায়ণ বলল, “একটা ভুল কইরা ফালাইছি।” জিজ্ঞেস করলাম, “কি ভুল?” সে বলল, “একটা খুন কইরা ফালাইছি।” তার কথা শুনে আঁৎকে উঠে বললাম, “খুন করেছিস? কোথায়?” নারায়ণ বলল, “আমাগো ওইখানে। পোলাটা আমার বোইনের পিছনে লাগতো, মাথাটা ঠিক রাখতে পারি নাই, কোপ দিয়া ধড় নামাইয়া দিছি। এই দ্যাখেন।” নারায়ণ হাতের থলিটার মুখ খুলে দেখাল। দেখি একটা কাটা মাথা। প্রথমে ভাবছিলাম নারায়ণ বোধহয় থলিতে করে আমার জন্য লাউ টাউ নিয়ে এসেছে। থলির ভেতর আমি মুখ বাড়িয়ে চমকে উঠি! নারায়ণ নির্বিকার চিত্তে বলে, “এই পোলাটা। আপনে হয়ত মুখের কথায় বিশ্বাস করতেন না, তাই মাথাটা কাইটা লইয়া আইছি।” আমার ভেতরে তখন অসম্ভব রাগ হচ্ছে, ভাবছি লোকটি কি উম্মাদ? আমি তবু দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর বাকি দেহটা?' সে বলল, “সেটা আমি একটা হাই-ড্রেনের মইধ্যে ফালাইয়া দিছি।” বললাম, “সেখানেই এই মাথাটা নিয়ে রাখ। তারপর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ কর।” নারায়ণ বলল, “ওই থানায় আমি যামু না। আপনি একটা ব্যবস্থা কইরা দেন।” রাগ না দেখিয়ে বললাম, “যা বলছি তাই কর।” সে জানাল, “থানার ওরা বিশ্বাস কইরব না।” তাড়াতাড়ি তাকে আমার সামনে থেকে বিদায়ের জন্য বললাম, “তুই যা, আমি থানায় ফোন করে দেব।” আমার আদেশ তার পছন্দ হল না, সে তাই বলল, “আপনে যখন কইতাছেন, তখন যাইতাছি।” নারায়ণ ধীর পায়ে লালবাজার থেকে বেরিয়ে গেল।

নারায়ণ' চলে যেতে ভাবলাম, একটা অত্যন্ত অনুগত সোর্স আমি হারালাম। ডানলপ মোড় থেকে রানাঘাট পর্যন্ত ছিল নারায়ণের বিস্তীর্ণ পরিধি, বহু খবর সে আমায় দিয়েছে। সেই সূত্র ধরে আমি ধরেছি অনেক ডাকাত। এমনও হয়েছে, ডাকাতি বা অন্য কোন অপরাধ থেকে লুণ্ঠিত টাকার সে ভাগ নিয়েছে; আবার সেই খবরটা আমাকে দিয়ে গেছে।

নারায়ণ চলে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পর আমি থানায় ফোন করে জানালাম, কোথায় আছে লাশ এবং নারায়ণকে যেন গ্রেফতার করে রাখে খুনের অপরাধে। নারায়ণ আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাটা মাথাটা বাকি দেহটার কাছে ফেলে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। থানার লোকেরা নারায়ণের কথা বিশ্বাসই করেননি। আমি ফোন করাতে লাশ উদ্ধার করে নারায়ণকে গ্রেফতার করে রাখে।

অল্প কয়েকদিন পর নারায়ণ আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পায়। মামলা চলাকালীনই বিরুদ্ধ দলের হাতে নারায়ণ খুন হয়ে যায়। অন্ধকার জগতের নিয়ম অনুযায়ীই নারায়ণের পরিণতি!

পরিণতি যাই হোক আমাদের সবরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করে অপরাধী ধরবার জন্য তদন্তের স্বার্থে এগিয়ে যেতেই হবে। সেদিন ছিল রবিবার, তাড়া নেই। সকালে কোয়ার্টারে বসে জড়তা কাটাচ্ছি। এগারটা নাগাদ ফোন বেজে উঠল। অলস হাতে তুলে কানে রাখতেই ওপার থেকে তৎকালীন ডি.সি. হেড কোয়ার্টার কমলকুমার মজুমদারের গলা পেলাম। সাথে সাথেই বুঝলাম ছুটির হাওয়া আর খাওয়া যাবে না। বললাম, “বলুন স্যার।” তিনি বললেন, “কন্ট্রোল রুমে একটা ছেলে এসে, সেখান থেকেই ফোনে আমায় বলল, তার কাছে ইন্টারন্যাশানালি ওয়ান্টেড একটা লোকের খোঁজ আছে, সেই লোকটা নাকি আজ কলকাতায় থাকবে। আপনি গিয়ে ব্যাপারটা দেখুন তো।” আমি জানতে চাইলাম, “লোকটার নাম, ঠিকানাটা ছেলেটা বলেনি?” তিনি জানালেন, “না, ছেলেটা বলছে, সে কথা বলবে শুধু কোন উঁচুস্তরের অফিসারেরই সঙ্গেই। কন্ট্রোল রুমের কোনও অফিসারকেও কিছু বলেনি, তারা তখন ফোনে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে।” বললাম, “ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।” ফোন নামিয়ে রেখে ভাবলাম, সকালবেলাতেই আবার কোন আন্তর্জাতিক অপরাধীর খবর এল রে বাবা, রোববারটাই মাটি করবে না কি?

কন্ট্রোল রুম বিল্ডিংয়ের ওপরেই চারতলায় আমার কোয়ার্টার। রেসিডেনসিয়াল অফিসার হিসাবে ওখানে থাকি। মজুমদার সাহেবের নির্দেশ পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে পায়ে পায়ে নেমে এলাম দোতলায় কন্ট্রোল রুমে। কন্ট্রোল রুমের গোল টেবিলের গোটা পঞ্চাশেক ফোনের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে একটা অচেনা আঠাশ-তিরিশ বছরের যুবক। গায়ের রঙ মাজা, চোখ মুখ বেশ ধারাল। সাদা ফুলহাতা জামার সাথে গাঢ় নীল রঙের জিনসের প্যান্ট। এক ঝলকেই বোঝা যায় বেশ স্মার্ট।

ডিউটি অফিসারের কাছে জানতে চাইলাম, কে এসেছেন বিশেষ খবর নিয়ে? তিনি আমায় সেই যুবককে দেখিয়ে দিলেন। আমি সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “বলুন কি খবর এনেছেন?” সে আমার দিকে তাকিয়ে চোস্ত ইংরেজতে বলল, “কিন্তু আপনি কে? কি নাম আপনার? পরিচয়ে খুশি হলে তবে কথা বলব।”

এতদিন পুলিশে চাকরি করছি, প্রশ্নের জবাবে কেউ ওই ভাবে উত্তর এড়িয়ে নাম জিজ্ঞেস করেনি। ছেলেটার উদ্ধত ভাব আর ঝরঝরে ইংরেজি আমাকে ভেতরে ভেতরে নাড়া দিলেও সেটা লুকিয়ে আমি তাঁর বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য বললাম, “আপনি আমাকে আপনার কথা বলতে পারেন, আমার নাম রুণু গুহ নিয়োগী।” আমার নাম শুনে সে একটু চিন্তা করেই বলল, “হ্যাঁ, আপনার নাম শুনেছি, আপনাকে বলা যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমি কোনও কথাই বলব না, আলাদা ঘরে চলুন যেখান থেকে কোনও কথা বাইরে আসবে না।” আমি পাশের কাঁচে ঘেরা ওয়্যারলেস রুমটার দিকে তাকাতে সে বলল, “না ওখানেও হবে না, অন্য লোক আছে।”

আমি অগত্যা কন্ট্রোল রুমের পাশে উঁচুপদের অফিসারের যে বড় চেম্বারটা আছে সেখানে নিয়ে গেলাম তাঁকে। ছেলেটা ঘন ঘন একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে। তাঁকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “বলুন কি বিশেষ খবর?” ছেলেটা বলল, “ইন্টারন্যাশানালি হটলি ওয়ান্টেড একজন আজ রাতে কলকাতায় থাকবে, কোথায় থাকবে আমি জানি, তাকে চিনিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার শর্ত অনুযায়ী চললে, তবেই।” প্রশ্ন করলাম, “কি শর্ত?” সে বলল, “সে ঠিক আজ রাত বারোটায় একটা বাড়িতে থাকবে, আপনারা সেই বাড়ি ঘিরে ফেলবেন, আমি তার সাথে দু-চার মিনিট কথা বলব, তারপর আপনারা আপনাদের কাজ করবেন।” জানতে চাইলাম, “কি নাম তার?" ছেলেটা বলল, “তা আমি এখন জানাব না, জায়গায় গিয়ে জানাব।”

আমার প্রশ্ন, “লোকটা স্মাগলার না খুনী, কি?” ছেলেটা বলল, “সে আপনি যা ইচ্ছা ভাবতে পারেন, বলেছি তো সে ইন্টারন্যাশানালি হটলি ওয়ান্টেড।” বললাম, “তার মানে

ইন্টারপোলও তাকে খুঁজছে?" সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইন্টারপোল, সি-আই-এ, কে-জি-বি সবার কাছেই সে হাইলি ওয়ান্টেড।" জানতে চাইলাম, "তা আপনি তাঁকে কি ভাবে চেনেন? কি করে জানলেন সে আজ রাতে কলকাতায় থাকবে?" সে দৃঢ় স্বরে বলল, "এসব কোন কথাই আমি এখন বলব না। ভুল বলে থাকলে আমাকে আপনি গ্রেফতার করবেন, আমি তো আপনাদের হেফাজতেই থাকছি, আর তো কোথাও যাচ্ছি না।" জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার নামটা কি, কোথায় থাকেন?" ছেলেটা এবারও বলল, "সেটাও এখন আমি জানাব না, কাজ হয়ে গেলে সবই জানতে পারবেন। আমি তো পালাচ্ছি না।"

মনে মনে ভাবলাম, কি ফ্যাসাদেই না পড়েছি, নিজের নাম, "অপরাধীর নাম কোনও পরিচয়ই বলছে না, কিন্তু কিছু না জেনে এগিয়ে যাই কি করে? রোববারটাই মনে হচ্ছে মাটি করে দেবে। বড়সাহেবরা তো দিব্যি দায়িত্ব দিয়ে ছুটি উপভোগ করছেন। এদিকে ছেলেটার ঝকঝকে ইংরেজি ও বাংলা, কথাবার্তায় আমি বেশ ইমপ্রেসড। এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আমাকে নীরব থাকতে দেখে ছেলেটা বলে উঠল; "দেখুন, আপনারা তাকে হাতে পেয়েও যদি কিছু না করেন তো আমার কিছু বলার নেই। আমার কথায় বিশ্বাস না করলে কলকাতা পুলিশ একটা বিরাট গৌরবের থেকে বঞ্চিত হবে, আমার আর কি?" বললাম, "ঠিক আছে, আপনি শুধু তার নাম, কি ধবনের অপরাধী সে, রাতে কোথায় আসবে তা বলুন না, দেখবেন আমরা তাকে গ্রেফতার করি কি না করি।" ছেলেটা বলল, "আমি তো বলেইছি এখন আমি কিছু জানাব না, কারণ যার কথা আমি বলছি, সে অসম্ভব বুদ্ধিমান, উচ্চশিক্ষিত, তুখোড়, তাঁর বিস্তার সর্বত্র।" প্রশ্ন করলাম, "তার মানে আপনি কি ভয় পাচ্ছেন আমাকে জানালে, সেই খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছে যেতে পারে?" ছেলেটা বলল, "হ্যাঁ, তাই আমি কিছুতেই বলব না।" বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তেমন কোন সম্ভাবনা নেই।" সে সাথে সাথে উত্তর দিল, "হয়ত আপনার কাছে নেই, কিন্তু আমার কাছে আছে, আমি সেই সম্ভাবনাটা রাখব কেন?"

কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার আমায় এসে বললেন, আমার ফোন এসেছে। আমি কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ফোন ধরতেই, ওপার থেকে মজুমদার সাহেব প্রশ্ন করলেন, "কি হল রুণুবাবু, কিছু জানতে পারলেন?" বললাম, "না স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না।" তারপর ছেলেটার সমস্ত বক্তব্য তাঁকে জানালে তিনি বললেন, "দেখুন, কতটা জানতে পারেন, কিছু জানলে আমাকে জানাবেন। আমি চিন্তায় থাকব।" বললাম, "ঠিক আছে, নিশ্চয়ই জানাব।"

কন্ট্রোল রুমে সেদিন ডিউটি অফিসার যে ছিল সে বহু বাংলা ছবিতে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার হিসাবে অভিনয় করেছে। তাকে বললাম, "যাও না, ছেলেটাকে গিয়ে জেরা করে বার কর রহস্যটা কি। সিনেমা 'তো আবছার করছ।" সে হেসে বলল, "দূর, ওগুলো সিনেমাতেই হয়, ওসব সংলাপ আর দৃশ্য চিত্রনাট্যকাররা লিখে দেন, আর পরিচালকরা আমাদের দিয়ে সেগুলো করিয়ে নেন। এখানে আর ছবির সংলাপ বললে চলবে না, এটা যে একেবারে বাস্তব। এখানে অভিনেতার বদলে তোমরা।" ওর কথা শেষ হতে না হতে ফোন, ফোন তুলেই অফিসার আমার হাতে দিয়ে বলল, "ডি.সি. ডি.ডি.।" আমি ফোন ধরে বললাম, "স্যার।" তিনিও জানতে চাইলেন ওই ছেলেটার খবর। আমি যা যা ঘটেছে সব কথা তাঁকে বলতে তিনি বললেন, "আমি বাড়ি থেকে একটু বেরচ্ছি, তুমি সব চিন্তা করে সাবধানে এগোবে।"

ফোন রেখে আমি বিভিন্ন দিক ভাবছি। একবার মনে হচ্ছে ছেলেটার কথামত যাই-ই না, দেখি কাকে পাওয়া যায়। আবার ভাবছি, "দূর, না জেনে না বুঝে একটা অচেনা, অজানা ছেলের কথা বিশ্বাস করে কাকে গ্রেফতার করে কি বিপদে জড়িয়ে পড়ব, ওই রকম ছেলেমানুষী কি আর আমাদের সাজে? তবে কোনখানে একটা রহস্য আছে, সেই রহস্যটাই ভেদ করতে হবে। কিন্তু ছেলেটা যেমন একগুঁয়ে, তাকে ভাঙাটা অত সহজ হবে না। ওর কথাবার্তায় ব্যাপারটা ফালতু বলে উড়িয়েও দিতে পারছি না। তবে ছেলেটা যে লালবাজার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় সেটা বুঝে গেছি, কারণ সে জানলে অপরাধীর খবর দিতে

কন্ট্রোল রুমে না এসে গোয়েন্দা বিভাগে যেত। তার মানে ছেলেটা অপরাধ জগতের লোক নয়, কারণ অপরাধ জগতের লোকেরা এগুলো ভালই জানে। অথচ অপরাধ জগতের লোক না হয়ে সে কি করে আন্তর্জাতিক অপরাধীর খোঁজ নিয়ে এল? কি সেই রহস্য?

ছেলেটাকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি যেখানে আমাদের নিয়ে যেতে চাইছেন তা কি কলকাতার উত্তরে না দক্ষিণে বা অন্য কোন দিকে?" ছেলেটা আমার প্রশ্ন শুনে একটু চুপ করে থেকে কিছু একটা ভেবে নিয়ে বলল, "দক্ষিণে।" জানতে চাইলাম, " এখান থেকে কতদূর?" সে বলল, "তা এখন বলব না, আপনারা গেলেই তা জানতে পারবেন, আমি তো আপনাদের সঙ্গেই যাব।" বললাম "কতক্ষণ লাগবে যেতে?" সে বলল, "বললাম তো এখন কিছু জানাব না, কতক্ষণ লাগবে জার্নালেই তো আপনারা বুঝতে পারবেন দূরত্বটা কতখানি।"

ভাবলাম, কি টেটিয়া রে বাবা! কিছুতেই ভাঙছে না। আমি ভাল করে ওর শরীরের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছি। চেন-স্মোকার। মাঝেমাঝে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে। গরমকাল, ঘাম হতেই পারে। আমি উঠে চেম্বারের এয়ারকন্ডিশন - মেশিনটা চালিয়ে দিলাম। ততক্ষণে বৈশাখের দুপুর-বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা প্রায় ছুঁয়েছে। আবার ফোন। কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ধরলাম, মজুমদার সাহেব জানতে চাইলেন কতদূর এগিয়েছে। বললাম, "একটুও না।" তিনি বললেন, "আমি কিছুক্ষণ কোয়ার্টারে থাকব না, আপনি ফোর্স লাগলে নিয়ে যাবেন, কি হল না হল জানাবেন। চিন্তায় থাকব।"

ফোন রেখে একা একা দাঁড়িয়ে ভাবছি, কি করা যায়? ছেলেটার কথায় একটা ঝুঁকি নেব কি? পেলেও তো পেতে পারি কোনও "অমূল্যরতন।" একটা দিন আমার নষ্ট করল অথচ কোনও কথাই তার থেকে আমি বার করতে পারিনি। বিরক্ত লাগছে, এইভাবে প্রায় উড়ো খবরের ভিত্তিতে ফোর্স নিয়ে কোথায় গিয়ে পড়ব, কে জানে? আবার ছেলেটার দৃঢ়তা দেখেও তাচ্ছিল্য করা যাচ্ছে না। যদি বিশেষ অপরাধীর খবর পেয়েও ধরতে না পারি তবে আমাদের বড় বড় সাহেবরা জানতে পারলে সম্পূর্ণ দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। আর তার চেয়ে বড় হল, তখন নিজেকেই নিজে দোষী মনে করব। এইরকম দোটানা মন নিয়ে ছেলেটার সামনে এসে বসলাম।

বললাম, "আপনি তো ভাই কোন কথাই বলছেন না, অথচ আমাদের সমস্যাটাও বুঝতে পারছেন না।" ছেলেটা বলল, "দেখুন, আপনি ফোর্স রেডি করুন, সে কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে থাকবে না, ওখান থেকে চলে গেলে আপনারাই পস্তাবেন ; তখন কিন্তু আমাকে কিছু বলতে পারবেন না।" দুজনের মধ্যে পরস্পরের কথা এড়িয়ে গিয়ে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ার যেন আড়াআড়ি যুদ্ধ চলছে। বললাম, "আপনি তো তার আস্তানাটা বলছেন না, আচ্ছা আপনি কোথায় থাকেন, মানে কলকাতার কোন্ দিকে?" সে একটু ভেবে বলল, "উত্তরে।"

যেন শুনিনি এমন ভাব করে অন্য কথা পাড়লাম, ওর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ইচ্ছে করেই সময় কাটাচ্ছি যাতে তার উত্তেজনা বাড়ে। আমরা জানি যতবড় চতুরই হোক না কেন, অনবরত কথা বলার মাঝে দু একটা বেফাঁস কথা লোকে বলে ফেলে, যা আমাদের কাজে লেগে যায়। আর সেই ফাঁক দিয়েই আমরা তীর ছুঁড়ে করি লক্ষ্যভেদ। কথার মাঝে চট করে জিজ্ঞেস করলাম, "কতক্ষণ লাগবে সেখানে যেতে?" সে এবার বলে ফেলল, "দশ-পনের মিনিট।" বুঝলাম তার ভেতর ভেতর উত্তেজনা বাড়ছে। এতক্ষণ দূরত্বটাও বলছিল না। বললাম, "ও, তাহলে তো বেশি দূর নয়। এখনও তো অনেক দেরি আছে। ইতিমধ্যে আপনি আপনার বাড়ি ঘুরে আসতে পারবেন।" সে বলল, "না, আমি আর কোথাও যাব না, একবারে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরব।" আমার প্রচেষ্টা ছিল তাকে যদি বের করতে পারি, তবে সে কোথায় কোথায় যায়, কার সাথে কথা বলে, বাড়িটাই বা কোথায় তা এক নজরদার ওর পেছনে লাগিয়ে জেনে নেব। তার জন্য একটা নজরদারও ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু সে যেতে অস্বীকার করাতে, আমার পরিকল্পনাকে গুটিয়ে

ফেলতে বাধ্য হলাম।

রাত বাড়ছে। সে বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে আর আমাকে বলছে, “আপনি কিন্তু ফোর্স রেডি করছেন না।” আমি ওর কথার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, “আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?” সে জানাল। আমি ঝট করে উঠে কন্ট্রোল রুমের দিকে চলতে শুরু করলাম, যাতে তার উত্তেজনা আরও বাড়ে। উত্তেজনা বাড়ার লক্ষণ তো দেখছিই। ঘরে এয়ার-কন্ডিশন চলছে, তবু তার কপালে ঘাম হচ্ছে, আর সে রুমাল দিয়ে মাঝেমধ্যে মুছছে।

কন্ট্রোল রুমে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কেন সে আমাদের আগে অপরাধীর সাথে দেখা করাতে চায়? কি কারণে? সেটা কি তার ব্যক্তিগত কোনও প্রতিশোধস্পৃহার জ্বালায়? কি হতে পারে তার সেই জ্বালার কারণ?

চা আনলাম। চা নিয়ে গেলাম ছেলেটার কাছে। কাপটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, “এই যে আপনি আমাদের আগে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, তখন যদি সে আপনাকে আঘাত করে বা খুন করে তার দায় কে নেবে?” সে বলল, “না-না, তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই, সম্ভাবনা থাকলে তো আমি বলতামই, তিনি হাইলি হাইলি ইন্টেলেকচুয়াল লোক। এত বুদ্ধি যে আপনারা ভাবতেই পারবেন না। তাছাড়া একটা বিখ্যাত ব্যক্তির বাড়িতে এসে থাকবে। আমি তাকে চিনিয়ে দেব, আমি তো আছিই আপনাদের সঙ্গে।”

আমি ওর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছি। চা শেষ করে আবার আমি ফিরে এলাম কন্ট্রোল রুমে। রাত তখন প্রায় পৌনে এগারটা। কন্ট্রোল রুম, ওয়্যারলেস রুমের ডিউটি অফিসার ও কর্মীরা পাল্টে গেছেন। মাথার মধ্যে চিন্তার কাটাকুটি খেলতে খেলতে কন্ট্রোল রুমের টেবিলে এক পাশে পড়ে থাকা সেদিনের বাংলা পত্রিকাটা চোখের সামনে মেলে ধরে এলোমেলো ভাবে পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা ছোট খবরের ওপর চোখ আটকে গেল। আমি সেই খবরের চারদিকটা দাগ দিয়ে দিলাম।

কন্ট্রোল রুম থেকে ছেলেটার কাছে গিয়ে প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করলাম, “আপনার গান-বাজনা, সাহিত্য কেমন লাগে?” আমার হঠাৎ প্রসঙ্গহীন প্রশ্নে সে একটু চমকে উঠে বলল, “ভাল লাগে। কিন্তু দেরি হচ্ছে, এখনও প্রস্তুত হচ্ছেন না?” তার কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, “চলুন আপনার বাড়িটা দেখে আসি।” সে বলল, “সে কি? আমার রাড়ি গিয়ে ফিরে এসে সেখানে যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, দেখছেন, না, এখনই এগারটা বাজে।” গম্ভীর ভাবে বললাম, “সে চিন্তা আমার, এখান থেকে তো মাত্র দশ মিনিট সময় লাগবে, আমি সব রেডি রাখছি, আপনার বাড়ি থেকে ফিরে এসেও অনেক সময় থাকবে। আমি আপনার বাড়ি না চিনে, অপরাধী ধরতে যাব না, আপনি যদি পালিয়ে যান; তখন কি করব?” ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে বলল, “না না, আমি পালাব না; আর পালাব কি করে, আপনারা তো বাড়িটা ঘিরে রাখবেন। তবু যদি কোন ভুল করি তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ি থেকে বাবা-মাকে ও নয় গ্রেফতার করে নিয়ে আসবেন, কিন্তু এখন আপনারা রেডি হন।”

বললাম, “না, আপনার বাড়ি না দেখে আমি কোথাও যাব না। কারণ, তাকে গ্রেফতারের পর জেরা করে জানতে এবং সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য আপনাকে আমাদের দরকার হবে; তখন আপনাকে আমরা কোথায় পাব? তাছাড়া আপনি যে সত্যিই এখানকার লোক তা জানব কি করে? অন্যখান থেকে এসেও আমাদের ফ্যাসাদে ফেলতে পারেন।” ছেলেটা আমার কথায় একটু ভেঙে পড়ে বলল, “ঠিক আছে চলুন, কিন্তু গাড়িতে আপনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না; আমি গাড়ি থেকেই আপনাকে বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে সোজা চলে আসব, যাতে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারি।” বললাম, “তাই-ই হবে। কিন্তু সেই বাড়িটা যে আপনার তা বুঝব কি করে? আপনি তো অন্য কোন বাড়িও দেখিয়ে দিতে পারেন।” সে বলল, “আমার বাড়ির সামনে আমার বাবার নামে একটা নেমপ্লেট লাগান আছে।” তারপর সে তাঁর বাবার

নামটা বলল। এই প্রথম সে কোনও নাম বলল। "

দ্রুত কন্ট্রোল রুমে এসে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগে ফোন করলাম। ধরলাম শচীকে। ওকে বললাম, "এক্ষুণি আমাদের একটা বুদ্ধিমান কনস্টেবল নিয়ে কন্ট্রোল রুমে আমার কাছে এস।" লালবাজারের পশ্চিম দিকের গোয়েন্দা দফতরের বিল্ডিং থেকে কন্ট্রোল রুমের উত্তর দিকের বাড়িতে শচী ও কনস্টেবল অসিত যেন উড়ে আমার সামনে এসে হাজির। আমি ওদের কাজ বুঝিয়ে দিতে অসিত নেমে চলে গেল। আমি শচীকে নিয়ে ছেলেটার কাছে এসে বললাম, "আমাদের অফিসার আপনার সঙ্গে যাবেন, একেই আপনি বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে সোজা আসামীর জায়গায় চলে যাবেন।" তারপর শচীর দিকে ফিরে ওকে একটা পোর্টেবল ওয়্যারলেস দিয়ে বললাম, "তুমি বাড়ি থেকে ফেরার পথে আমায় ওয়্যারলেসে জানিয়ে দেবে, আমি এখান থেকে ফোর্স নিয়ে সেই জায়গায় পৌঁছে যাব।" ছেলেটাকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে, তাড়া দিলাম তাড়াতাড়ি যেতে। শচী আর ছেলেটা কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে নিচে অপেক্ষমান আমাদের এক প্রাইভেট গাড়িতে গিয়ে পেছনের সিটে বসল। ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটে অন্য কয়েকজন কনস্টেবল বসেছে। আর বাঁদিকে দরজার দিকে অসিত। অসিতও ড্রাইভারকে ততক্ষণে আমার নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছে।

তাদের গাড়ি বেরিয়ে যেতে আমি নেমে এসে আমাদের একটা ট্যাক্সিতে উঠে ওদের পেছন পেছন ছুটলাম। তখন আমরা গোয়েন্দাগিরির কাজে ট্যাক্সি ব্যবহার করতাম। তাতে নজরদারী করার সুবিধা পাওয়া যেত, যার ওপর নজর রাখা হচ্ছে সে বুঝতে না পারে হাজারও ট্যাক্সির ভিড়ে কোনও এক ট্যাক্সির আরোহীর শাণিত দৃষ্টি রয়েছে তার ওপর।

আমার ট্যাক্সির নম্বরটা দেওয়া আছে অসিতকে। সঙ্গে রেখেছি একটা পোর্টেবল ওয়্যারলেস সেট, শচীর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য। ট্যাক্সির ড্রাইভার দারুণ দক্ষ। অন্য গাড়ির থেকে কতটা দূরত্ব রেখে নজর রাখতে রাখতে যেতে হবে তার কুশলী হাত যেন সেই জন্যই তৈরি। ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে রাত বারোটার দিকে, সাথে হৃদযন্ত্রের ধকধক শব্দও বোধহয় শোনা যাবে। আসামী ধরতে যাব কলকাতার দক্ষিণ দিকে, অথচ যাচ্ছি উত্তরের দিকে।

বের হওয়ার আগে আরও দুতিনবার মজুমদার সাহেব কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন আমার অগ্রগতির ফল, কিন্তু একটুও এগোয়নি ছাড়া কোন উত্তরই তাঁকে দিতে পারিনি। আমি যে কোথায় চলেছি তাও জানেন না। কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার রাস্তা চিরে চিরে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে দুটো গাড়ি দ্রুত ছুটছে কলকাতার উত্তর দিক পার হয়ে, এখন বরানগরে। বরানগরের এদিক ওদিক ঘুরে একটা অন্ধকার রাস্তায়, দূর থেকে দেখলাম আমাদের প্রাইভেট গাড়ি একটু আস্তে হয়েই আবার জোরে ছুটতে শুরু করল। আমিও ট্যাক্সিটা ওইখানে রাখতে বললাম। আমার নির্দেশ মত অসিতও গাড়ি থেকে স্লিপ করে নেমে গেছে।

শচীরা এগিয়ে যাচ্ছে। অসিত আমার কাছে এসে জানাল কোন বাড়িটা ছেলেটা দেখিয়েছে।

আমি আর অসিত সেই একতলা বাড়িটার সামনে এসে প্রথমে নেমপ্লেটের নামটা মিলিয়ে দেখে সদর দরজার কড়া নাড়লাম। দরজা খুললেন একজন মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা। তিনি আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললাম, "ভয় নেই মাসীমা, আমরা লালবাজার থেকে এসেছি, আপনার ছেলের নামটা কি?" তিনি লালবাজার শুনে কোনমতে ছেলের নাম বলেই কেঁদে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন কি হয়েছে ওর?" বললাম, "কিছু হয়নি, আমরা একটু ওর ঘরটা দেখব।" তিনি আমাদের ছেলেটার ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। দরজাটা ভেজানো ছিল, ধাক্কা দিয়ে খুলে লাইটের সুইচটা টিপে দিতেই আমি চমকে উঠে ঘরের চারদিক দেখতে লাগলাম।

সারা ঘরের দেওয়াল জুড়ে শুধু একজনেরই ছবি। শুধু দেওয়ালে নয়, টেবিলে, খাটে,

চেয়ারের সর্বত্র শুধু তাঁর বিভিন্ন রকমের ছবি। টেবিলের ওপর দেখলাম পড়ে আছে সেদিনের পত্রিকাটা। সেটা খুলে দেখলাম, আমি যে খবরটার ওপর লালবাজারে দাগ দিয়ে এসেছি, এখানেও ঠিক সেই খবরের ওপর ছেলেটা লালকালি দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছে। তার পাশে অনেক হিজিবিজি লেখা।

আমার সাথে সাথে ভদ্রমহিলাও ঘরে ঘুরছেন। ছবিগুলো দেখিয়ে বললেন, "সারাদিন খালি ওঁরই ধ্যান, জ্ঞান, ওঁরই ফটো আগলে নিয়ে বসে থাকে। আজ সকাল থেকে দেখলাম ওর মনটা কেমন যেন অস্থির, কোন কথারই ঠিক মত উত্তর দিল না। সকালে প্রায় কিছু না খেয়েই বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলল, ফিরতে রাত হবে।" আমি তাঁর কথা শুনতে শুনতে শচীকে ওয়্যারলেসে নির্দেশ দিয়ে দিলাম, "দাঁড়াও, আর এগবে না।"

শচী অবশ্য আমার কথামত খারাপ হয়ে যাওয়ার বাহানায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। ড্রাইভার গাড়ির বনেট খুলে সারানর অভিনয় করে যাচ্ছে। ছেলেটা অস্থির, ড্রাইভারকে বারবার বলছে, "কি হল? ঠিক হয়েছে?" ড্রাইভার বলছে, 'তেল আসছে না ঠিকমত, আমি দেখছি, ঠিক হয়ে যাবে।" ছেলেটা উত্তেজনার চরমে পৌঁছে গেছে, শচীকে বলছে, "কি হবে?" শচী বলছে, "হবে, হবে, ঠিক হবে।"

আমরা ছেলেটার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। ট্যাক্সি দাঁড় করালাম শচীদের গাড়ির সামনে। ট্যাক্সি থেকে আমাকে নামতে দেখে ছেলেটা যেন ভূত দেখল, বলে উঠল, "আপনি?" তার কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, "আপনি গাড়ি থেকে নেমে আসুন।" ছেলেটা বলল, "কেন, যাবেন না?" বললাম, "যাব, তবে আপনাকে নিয়ে নয়। আপনি নামুন।" আমার গলার স্বরে এমন ঝাঁঝ ছিল যে ছেলেটা আর দ্বিরুক্তি না করে গাড়ি থেকে নেমে এল। বললাম, "আপনি আমাদের যেখানে নিয়ে যেতেন তার ঠিকানা আমি পেয়ে গেছি; ওখানে আমরাই যাব, আপনার প্রয়োজন নেই।" আমার কথা শুনে সে ঝট করে আমার হাতটা ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলল, আমার সব স্বপ্ন আপনি ভেঙে দিলেন? একটাই স্বপ্ন ছিল, তা আর পূর্ণ হবে না? কি নিয়ে বাঁচবো ?"

আমি 'গাড়িতে শচীর পাশে বসতে বসতে বললাম, "ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি, যান।" আমাদের ট্যাক্সিচালককে সেই নির্দেশ দিয়ে দিলাম। আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ি বেশ কিছুটা চলার পর শচী আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার বলুন তো, ছেলেটা আসতে আসতে বলল, ইন্টারন্যাশানালি হটলি ওয়ান্টেড একটা লোকের খবর আছে ওর কাছে, আর তারপর দেখলাম সোর্সই আপনার হাত ধরে কাঁদছে।"

শচীর কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। গাড়ি ছুটছে কলকাতার দিকে। হঠাৎ একটা চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে শচীকে বললাম, "কি শুনতে চাইছ?" শচী বলল, "ব্যাপারটা আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না, তাই জানতে চাইছি, কে ছেলেটা?" সবাই আমার দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি তাদের সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব বললাম। শচী বলল, "তারপর?" বললাম, "ছেলেটার মতিগতি কোন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম, ব্যর্থ প্রেমিক-টেমিক নাকি, ব্যর্থতার জ্বালায় কাউকে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, কারণ সে শর্ত রেখেছিল, আমাদের দিয়ে বাড়ির দরজা খোলানোর পর সে প্রথমে অপরাধীর সাথে কথা বলতে চায়। তারপর পত্রিকার খবরটা দাগ দিয়ে আমি ঠিক করি তার বাড়ি আমি আগে যাবই যাব। তখন ওকে রাজি করিয়ে ফোন করি তোমায়। এরপর তো তোমরা সবই জান।" শচীর প্রশ্ন, "তারপর?" বললাম, "ওর বাড়িতে বাবার নেমপ্লেটটা মিলিয়ে দেখে ভাবলাম, সে তাহলে মিথ্যা বলেনি। তারপর ওর ঘরে গিয়ে সারা ঘরময় একজনের ফটো দেখলাম আর পত্রিকায় আমি যেভাবে দাগ দিয়ে এসেছি লালবাজারে ঠিক তেমনভাবেই ওর টেবিলে দেখলাম রয়েছে খবরটার ওপর দাগ। তখন আমি বুঝে গেলাম আমার ধারণাই সত্যি, কোথায় সে আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিল।"

শচী উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল, "কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল?" বললাম, "বিশপ লেফ্রয় রোডের একটা বাড়িতে।"

শচী জিজ্ঞেস করল, "সেখানে কার বাড়িতে?" আমি কিছু বলার আগেই অসিত বলল, "সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে। ওর সারা ঘরে শুধু সত্যজিৎ রায়ের ফটো।"

শচী জানতে চাইল, "সেখানে কেন?" বললাম, "পত্রিকায় ছোট্ট খবরটা ছিল আগামীকাল সোমবার, ১৮ই বৈশাখ সত্যজিৎবাবুর জন্মদিন, তিনি বাড়িতে সারাদিন 'অনাড়ম্বরভাবে কাটিয়ে দেবেন।"

"এই খবরের সঙ্গে স্মাগলারের কি সম্পর্ক?" বললাম, "খবরটা পড়েই আমার মনে হয় রাত বারোটার সঙ্গে খবরটার একটা সম্পর্ক আছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর ঘরটা দেখব বলে ঠিক করে নিই।"

শচী জানতে চাইল, "কিন্তু কি উদ্দেশ্য ছিল ছেলেটার?" বললাম, "উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দিয়ে তাঁর বাড়িটা ঘিরিয়ে ফেলবে, আমাদের দিয়ে সদর দরজা খোলাবে, কারণ এমনিতে তো অত রাতে অজানা লোকের জন্য ওই বাড়ির দরজা কেউ খুলবে না। তারপর পুলিশ তল্লাশিতে এসেছে শুনলে সত্যজিৎবাবু নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে আসতেন। আর তখন রাত বারোটা বেজে যেত, তারিখ পাল্টে যেত, সত্যজিৎবাবুর জন্মদিন এসে যেত। তখন সেই সুযোগে ছেলেটা সত্যজিৎবাবুকে তাঁর জন্মদিনের প্রথম অভিনন্দন জানাত। এটাই ছিল ওর বিরাট আনন্দ, এতে সে নিজেও খ্যাত হতে চেয়েছিল।"

শচী বলল, "আমাদের গাড্ডায় ফেলে সে এতবড় একটা পরিকল্পনা করেছিল?"

বললাম, "পাগল ফ্যানের পাগলামি আর কি! হাইলি ওয়ান্টেড-ফোয়ান্টেড গল্প ফেঁদে আজ আমার চাকরিটা খেয়েছিল আর কি।"

রাত বারোটা বেজে গেছে। লালবাজারে পৌঁছে মজুমদার সাহেবকে ফোন করে সব জানালে তিনি বললেন, "দারুণ সামলেছেন তো ব্যাপারটা, একটা বিরাট বদনামের হাত থেকে আমরা বেঁচে গেলাম !"

সেই ছেলেটা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। সুপ্রতিষ্ঠিত বামপন্থী সাহিত্যিক। প্রায় প্রতিদিনই নন্দন-রবীন্দ্রসদন-শিশির মঞ্চ এলাকায় তাঁকে দেখা যায় !

দেখার চোখ থাকলে সবই দেখা যায়। তবে সেই দেখাটা দেখতে হয় হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। গোয়েন্দা দফতরের কাজে এই দেখাটাই আসল। আমি যখন গোয়েন্দা দফতরের ডাকাতি দমন শাখার অন্যতম প্রধান হিসাবে ছিলাম, তখন আমরা একটা সুবিন্যস্ত টিম হিসাবে তৈরি হয়েছিলাম, সেই হিসাবেই আমরা কাজ করতাম।

আমাদের সময় চল্লিশটা ডাকাতি হয়েছিল কলকাতা ও তার আশেপাশে। আমরা তার মধ্যে উনচল্লিশটার মীমাংসা করতে পেরেছিলাম, একটা পারিনি। অর্থাৎ সাড়ে সাতানব্বই শতাংশ। কেন আমরা ওই একটা ডাকাতির কিনারা করে একশভাগ সফল হলাম না তা নিয়ে এখনও আমরা সব সহকর্মীরা হা-হুতাশ করি, নিজেদের ব্যর্থ মনে করি !

রাজ্য পুলিশের সি.আই.ডি. দফতরের সাথে আমাদের দারুণ সুসম্পর্ক ছিল, খবরের আদানপ্রদানের জন্য আমরা যেমন তাঁদের ভবানী ভবনের কেন্দ্রীয় দফতরে যোগাযোগ করতাম, তাঁরাও ঠিক তেমনি লালবাজারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতেন। একদিকে যেমন তাঁদের সঙ্গে ছিল সহযোগিতার সম্পর্ক, অন্যদিকে ছিল প্রতিযোগিতার, কারা আগে ধরতে পারে আসামীদের।

আমাদের টিমটা ডাকাতি ধরার ক্ষেত্রে এমন পারদর্শী হয়ে উঠেছিল যে, সারা পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের মধ্যে আমাদের সুনাম তো হয়েছিলই, এমন কি মুখ্য তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের প্রতি তাঁর আস্থার কথা বিধানসভায় পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন।

একদিন বর্ধমান শহরে একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। সাধারণভাবে শান্ত শহর বর্ধমান। ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে সবাই চমকে উঠলেন। খবর শুনে এস.পি. সমেত সমস্ত অফিসাররা ব্যাঙ্কে গিয়ে পৌঁছলেন। বর্ধমানের তৎকালীন এস.পি. ছিলেন এস.আই.এস. আহমেদ। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে তাঁর মনে হল, ডাকাতরা সব কলকাতা শহরের। কারণ কলকাতা শহরে যে কায়দায় ডাকাতি হয়, এই ডাকাতিটা অনেকটা সেই কায়দায় করা হয়েছে। তিনি তখন সেখানে প্রাথমিক তদন্ত সেরে, অন্য তদন্ত শুরু করার আগে সময় নষ্ট না করে ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারীকে প্রাইভেট গাড়িতে তুলে সোজা কলকাতায় আমাদের লালবাজারের ডাকাতি দমন শাখায় নিয়ে এলেন। কারণ তাঁরাই ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁদের দেওয়া বিবরণটা আমাদের কাজে লাগবে ভেবেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন।

এস.পি. সাহেব বর্ধমানের ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের যখন আমাদের দফতরে নিয়ে এসেছিলেন, তখন আমি দফতরের বাইরে অন্য কাজে গিয়েছিলাম। তিনি সন্ধের সময় এসেছিলেন, দফতরে অনেক কর্মচারীই তখন এদিক ওদিক ছিলেন। তবে যাঁরা তখন দফতরে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই খুব দক্ষ। তিনি তাঁর আসার উদ্দেশ্য তাঁদের কাছে সবিস্তারে বললেন। তাঁরা এস.পি. সাহেবের কথা মন দিয়ে শুনে নিজেদের মধ্যে যখন আলোচনায় ব্যস্ত, তখন আমি দফতরে ফিরে আসি। দফতরে এসে বর্ধমানের এস.পি. সাহেবকে দেখি, উনিও আমাকে তাঁর আসার উদ্দেশ্য বললেন।

আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডাকাতির কথা ও ডাকাতদের চেহারার বর্ণনা শুনব। এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর সবাই যেখানে বসে আছেন সেখানে না গিয়ে অন্যত্র গিয়ে অপেক্ষা করবেন। আমরা এস.পি. সাহেবকে আমাদের প্রস্তাব দিতে উনি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। কথা মত আমাদের অফিসাররা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন একজন একজন করে।

প্রথমেই ডাকা হল ওই ব্যাঙ্কের এক মহিলা কর্মচারীকে। আমরা ছজন অফিসার ছিলাম। তাঁর চোখে মুখে তখনও আতঙ্কের ছাপ। বর্ধমান থেকে লালবাজারে আসার ধকল স্পষ্ট। রাজকুমার তাঁকে অভয় দিয়ে প্রশ্ন, করল, "আচ্ছা দিদিমণি, আপনি এর আগে কখনও কি ডাকাতি দেখেছেন?"

ভদ্রমহিলা আঁৎকে উঠে বললেন, "না——না।" এমনভাবে তিনি বললেন যেন মনে হল

ডাকাতরা এখনও ব্যাঙ্কেই রয়েছে।

রাজকুমারই জানতে চাইল, "এই ডাকাতির কথা কি আপনি জীবনেও ভুলতে পারবেন?" তিনি সাথে সাথে বললেন, "এ কি ভোলার জিনিস? কখনও ভুলব না।"

বললাম, "তাহলে চোখ বুজে একবার দেখে নিন তো ডাকাতির সেই দৃশ্যগুলো, তারপর বলুন কি কি হয়েছিল।"

ভদ্রমহিলা সত্যিই চোখ বুজে ভাবতে থাকলেন। আমরা সবাই বসে আছি। আসলে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ নেওয়ার এটা একটা কৌশল। ঘটনা যখন দ্রুত ঘটে যায় তখন তারা আতঙ্কিত চোখে দেখে, মস্তিষ্ক ঠিক মত কাজ করে খুব কম লোকেরই। তাই ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আতঙ্কিত চোখে দেখা আতঙ্কিত মনের বিবরণ হয়ে যায়। সে সময় তাকে শান্ত হওয়ার জন্য সময় দিয়ে চোখ বুঁজে ফ্ল্যাশ ব্যাক দেখতে দিতে হয়, যাতে পূর্বাপর দৃশ্যগুলো তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। এবং সেই অনুযায়ী বিবরণ দিতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাও আমাদের কাজে এসে যায়। বিবরণের সত্যমিথ্যার পার্থক্য বোঝা যায়।

অনেক সময় মিথ্যা ঘটনার কথা বলে, মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে আমাদেরও কেউ কেউ ফাঁদে ফেলে নিজের কুকর্মকে আড়াল করে বাঁচতে চায়।

একদিন সন্ধেবেলা লালবাজারে এসে দেখি আমার চেম্বারের সামনে একজন বেশ স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়স্ক লোক বসে আছে। চুলগুলো উসকো খুসকো, চোখ উদভ্রান্ত। কাছেই ছিল রাজকুমার। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “কে ইনি, কি কারণে বসে আছেন?”

রাজকুমার বলল, “লোকটা ডায়মন্ড হারবারের কাছে থাকে। আজ সকালে ওর দাদা ওকে আশি হাজার টাকা দিয়েছিল, নিউ আলিপুরের একটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে। সে টাকাটা একটা থলিতে করে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝেরহাট ব্রিজের ওপর বাস থেকে নেমেছিল। তারপর ব্রিজ থেকে নেমে নিউ আলিপুরের দিকে যখন যাবে, সে সময় ব্রিজের নিচে চার পাঁচজন ছেলে ওকে মেরে থলি নিয়ে চম্পট দেয়। এখন আপনার কাছে এসেছে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে।”

লোকটার কাছে জানতে চাইলাম, “কটার সময়?” লোকটা বলল, “বারোটা-সাড়ে বারোটা হবে।”

আমি তার উত্তর শুনে রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে বললাম, “ওর থেকে আর কি কি জেনেছিস?”

আমার ইশারা বুঝে রাজকুমার তাকে প্রশ্ন করল, “আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?"

সে জানাল।

রাজকুমারের প্রশ্ন, “আপনি কি প্রায়ই কলকাতায় আসেন?”

সে বলল, “প্রয়োজন পড়লেই আসি।”

রাজকুমার বলল, “যেমন আজ এসেছেন।”

সে বলল, “হ্যাঁ।”

“বাসে আসতে কত সময় লাগে?” রাজকুমারের প্রশ্ন।

সে বলল, “ঘণ্টা দুয়েক।”

রাজকুমার এবার জানতে চাইল, “আজ কখন বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন?” সে জানাল, “আটটা নাগাদ।”

আমি তখন রাজকুমারকে বললাম, “রাজু একটু পর একে আমার ঘরে নিয়ে আয়, তুই একটা ডাণ্ডা নিয়ে আসিস।” আমি চেম্বারে ঢুকে গেলাম। রাজকুমার মিনিট পাঁচেক পর হাতে একটা “রুল” নিয়ে লোকটাকে নিয়ে আমার সামনে হাজির।

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল, “আমায় বাঁচান রুণুবাবু, আমায় বাঁচান।”

আমি পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, “উঠে বস, ভেবেছিলি, আমাদের মিথ্যা ঘটনার কথা বলে, দাদার টাকাটা মেরে দিবি? আমরাও তোর কথায় ধিতাং ধিতাং নেচে এদিক ওদিক ছুটে দেখাব, সত্যিই টাকাটা চোট।”

লোকটা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, “সত্যি আমি মারিনি।” জানতে চাইলাম, “তবে কে মেরেছে?” সে বলল, “মহিলাটা, ওই মহিলাটা, ওর ভীষণ লোভ।”

প্রশ্ন করলাম, “কোন মহিলাটা? কোথায় থাকে?” সে তখন কান্না থামিয়ে বলল, “থাকে ঠাকুরপুকুরে, ওকে আমি রেখেছি।” রাজকুমার সে কথা শুনে লোকটাকে কিছু গালাগালি দিয়ে দিল। আমি থামিয়ে দিলাম। গালাগালি খেয়ে লোকটার বোধহয় একটু লজ্জা হয়েছে, সে বলল, "আজ সকালে ওর কাছে যাব প্রথমে ভাবিইনি। বাসে করে আসছিলাম, জোকা পেরিয়ে ঠাকুরপুকুর আসতেই হঠাৎ মাথায় কি ক্যাঁড়া ঢুকল, বাস থেকে নেমে ওর বাড়ি গেলাম। বাড়িতে ও একাই থাকে। বাড়িটাও আমি বানিয়ে দিয়েছি। সেখানে গিয়ে ওর সাথে খাওয়াদাওয়া করার পর আমি বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখি টাকার থলিটা ঘরে নেই।

থলিটা কোথায় জানতে চাইলে সে বলল, থলিটা সে আর ফেরত দেবে না। তারপর আমাকে জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। ”

রাজকুমার বলল, “তারপর এখানে আমাদের বুদ্ধ বানাতে এসেছিস? তুই কি ভেবেছিস, সময়ের অসঙ্গতি স্যার ধরতে পারবে না?”

লোকটা আমায় বলল, “না স্যার, আমি কোন উপায় না দেখে ভবানীপুরে আমার এক বন্ধুর কাছে যাই, সে তখন ওই মাঝেরহাটের গল্পটা বানিয়ে আপনার কাছে এসে বলতে বলল।”

বললাম, “তবে এখন বাড়ি যা।” সে আবার কেঁদে উঠে বলল, “বাড়ি যাব কি করে? দাদা আমায় আস্ত খেয়ে নেবে।”

ওই নোংরা চরিত্রের লোকটার আমাদের বোকা বানাতে আসার সাহস দেখে এমনিতেই ওর ওপর প্রচণ্ড রাগ ধরছে, সেই রাগের স্বরেই বললাম, “তা আমরা কি করব?”

বেহায়া লোকটা বলল, “ওর কাছ থেকে যদি উদ্ধার করে দেন।” বললাম, “কে কোথায় যাবে, আর টাকা দিয়ে আসবে, সেটা গিয়ে আমরা উদ্ধার করে আসব, এ জন্য কি এখানে বসে আছি? অন্য কোন কাজ নেই?”

লোকটা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, “কিন্তু টাকাটা না পেলে আমি আর বাঁচব না স্যার, এমনিতে অনেক জমি জায়গা বিক্রি করে ওকে দিয়েছি। এবার কি করব জানি না।”

কি আর করি? রাজকুমারকে বললাম, “দুজন কনস্টেবল নিয়ে দেখ, উদ্ধার করতে পারিস কিনা।” রাজকুমার আমার নির্দেশ শুনে লোকটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাজকুমাররা যখন ঠাকুরপুকুরে সেই বাড়ির কাছে পৌঁছল তখন রাত দশটা বাজে প্রায়। নির্জন, গ্রাম্য মত পরিবেশ। গিয়ে দেখল, বাড়ির সামনে তালা ঝুলছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাজকুমার যখন ভাবছে ফিরে আসবে, সে সময় একটা ট্যাক্সিতে অন্য একটা লোকের সঙ্গে টাল খেতে খেতে মহিলা নামল।

মহিলা রাজকুমারদের সাথে লোকটাকে দেখেই গালাগালি করতে লাগল। সঙ্গের পুরুষটা রাজকুমারদের ভেবেছে মাস্তান, সে বীরত্ব দেখাতে চেষ্টা করল। মাতলামি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন রাজকুমার তার কলারটা চেপে ধরে বলল, “আমরা লালবাজার থেকে এসেছি, একটাও কথা বলবি না। তাহলে তুলে নিয়ে যাব।”

রাজকুমারের কঠিন, রক্ত হিম করা গলা শুনে মাতালের নেশা মাথা থেকে নেমে পায়ে গিয়ে পৌঁছল।

মহিলা ততক্ষণে অশ্রাব্য ভাষায় লোকটার সাথে ঝগড়া করতে করতে দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকল।

রাজকুমাররা টাকার থলিটা উদ্ধার করল। কিন্তু তাতে দেখা গেল কুড়ি হাজার টাকা কম। লোকটা মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, “কেন কুড়ি হাজার টাকা কম?” মহিলা বলল, “আমার ব্যবসার টাকা থেকে ভাইকে দিয়েছি ব্যবসা করতে।”

রাজকুমার বের হয়ে এল। লোকটা থলি নিয়ে চলে গেল।

তাই ঘটনার বিবরণ নেওয়ার সময় মাথা খুব ঠাণ্ডা রেখে প্রত্যক্ষদর্শীকে বলতে দিতে হয়। প্রশ্নের পর প্রশ্নের জালে জড়িয়ে ঘাবড়ে দিতে নেই। করার মত প্রশ্ন থাকলে তবেই প্রশ্ন করতে হয়।

বর্ধমান ব্যাঙ্কের ভদ্রমহিলা চোখ বুজে ফ্ল্যাশ ব্যাক দেখে নিয়ে ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেলেন। কখন ডাকাতিটা হল, কিভাবে ডাকাতরা এসে সবাইকে হুমকি দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেল। তিনি জানালেন, ডাকাতরা সংখ্যায় ছ-সাতজন ছিল, বয়স সব তিরিশের আশেপাশে।

তাঁর কথা শেষ হলে প্রশ্ন করলাম, "তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কাউকে মনে হয়েছে সেই-ই লিডার, অর্থাৎ ডাকাতিটার নেতৃত্ব সে দিচ্ছে?" তিনি সাথে সাথে বললেন, "হ্যাঁ, তা মনে হয়েছে।" জানতে চাইলাম, "তার চেহারাটা কেমন?" এবার তিনি বললেন, "বেঁটে, কালো, মাঝারি ধরনের স্বাস্থ্য।" আবার আমাদের প্রশ্ন, "তার মুখটা নিশ্চয়ই মনে আছে, আচ্ছা তার মুখের আদলটা কেমন ছিল বলতে পারেন, তা কি গোলাকার না চৌকো, না কি অন্যরকম, ধরুন লম্বা বা কি ধরনের?" ভদ্রমহিলা ভাবতে লাগলেন, আমি বললাম, "দাঁড়ান, আমি আসছি।" তারপর আমার কাছে রাখা বিভিন্ন রকম মুখের ফটো এনে টেবিলের ওপর রেখে বললাম, "এবার বলুন, কোন রকম।" তিনি দেখালেন। বললাম, "ঠিক আছে আপনি যান।" মহিলা চলে গেলেন অন্য ঘরে।,

এবার অন্য এক ভদ্রলোককে ডাকা হল, তাকেও ওই একই প্রশ্ন করা হল। তিনি উত্তর দিলেন, "ছেলেটার মুখ একটা অদ্ভুত ধরনের, সচরাচর দেখা যায় না। ত্রিকোণ টাইপের।" তাঁকেও ফটোগুলো দেখালাম। তিনিও ভদ্রমহিলা যে ফটোটা চিহ্নিত করেছেন, সেটাই দেখালেন। মুখটা অনেকটা ইংরেজি "ভি" অক্ষরের মত। আমরা প্রশ্ন করলাম, "ঠিক বলছেন তো?" তিনি দ্রুত বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

ভদ্রলোককে ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেরা কিছুক্ষণ আলোচনা করে নিলাম।

তারপর একে একে চারজন ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে ডেকে সেই ফটোগুলো দেখিয়ে প্রশ্ন করা হল, ডাকাত সর্দারের মুখের আদলটা কেমন। তারাও সবাই "ভি" আদলের ফটোর মুখটা দেখিয়ে দিল।

তখনও আটজনকে আমাদের প্রশ্ন করা বাকি ছিল। কিন্তু আমরা ঠিক করলাম আর কাউকে প্রশ্ন করব না। সেই অনুযায়ী আমি এস.পি. সাহেবকে গিয়ে বললাম, "স্যার, আপনি ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের বর্ধমানে ফিরে যেতে বলতে পারেন, আমাদের যা জানার জেনে নিয়েছি। আপনাকে আমরা দুচার দিনের মধ্যেই খবর দিচ্ছি কতদূর কি করতে পারলাম, আর প্রয়োজন হলে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেব।" এস.পি. আহমেদ সাহেব ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের নিয়ে লালবাজার থেকে চলে গেলেন।

আমাদের জানা এক "ভি" আদল মুখের ডাকাত ছিল। তাকে অনেক আগেই দুটো ডাকাতির মামলায় ধরেছিলাম। সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তার গড়িয়ার বাড়িতে বাস করত। "ভি" আদলের আর কোনও ডাকাতকে আমরা জানতাম না। আমাদের কাছে রাখা, সেই ডাকাতের জবানবন্দি নিয়ে আসলাম, সেটা পড়ে আমরা আলোচনা করে ওর গতিবিধি ও মোডাস অপারেন্ডি খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। দিন কয়েক আগে আমরা এক সোর্সের কাছে খবর পেয়েছিলাম, সে গোসাবায় এক গরুর মেলায় চরকির জুয়া চালাচ্ছে। তবুও আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম তাকেই আগে গ্রেফতার করা হবে। তখন যদি দেখা যায় সে ওই ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত নয়, তারপর নতুন করে সিদ্ধান্ত নিয়ে তদন্তে এগিয়ে যেতে হবে। এস.পি. সাহেব বর্ধমান থেকে এসে যখন আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন, তখন তাঁর সম্মানটা তো আমাদের রাখতেই হবে।

সেদিন রাতেই আমাদের অফিসাররা সেই "ভি" মুখের ডাকাতের গড়িয়ার বাড়িতে হানা

দিল। বাড়ি ঘিরে ফেলতে, ডাকাতের বৌদি আর স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, যাকে আমরা খুঁজছি সে বেশ কিছুদিন হল বাড়িতে নেই। সে তার দাদার শালীকে নিয়ে কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না।

তার একটা বিশেষ কৌশল ছিল, ডাকাতি করার কদিন আগে সে নিজের বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত, কোথায় যেত কাউকে বলত না। এমন কি বাড়ির লোকজনকেও জানাত না। এবারও গিয়ে যখন পাওয়া গেল না, তখন ধারণা হল, সে এবারও একই কৌশল নিয়ে আগের থেকেই আস্তানা পাল্টেছে। ওই বাড়িতে দক্ষিণ ভারতীয় এক ভদ্রলোক পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকতেন। আমাদের অফিসারেরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লালবাজারে নিয়ে এলেন।

তাঁরা তাকে এই বিশ্বাসে আনলেন যে, যেহেতু সে দক্ষিণ ভারতীয়, তাই ভয়ে আমাদের কাছে অন্তত মিথ্যা বলবে না। সেই ভদ্রলোককে প্রশ্ন করাতে তিনিও বললেন, যাকে খুঁজছি, সে এখন নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দাদার শালীকে নিয়ে থাকে। কোথায় এখন আছে, তিনি সঠিক বলতে পারবেন না। তবে সে মাঝে মধ্যে কোন্নগর যেত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে, কেন যেত তা তিনি জানেন না। কোন্নগরের ঠিকানাটা তার পুরনো বিবৃতি থেকে আমরা সেটা পেয়ে গেলাম।

আমাদের অফিসাররা পরদিন বিকেলেই কোন্নগর গিয়ে পৌঁছল। কোন্নগরে সেই বাড়িতে সে একটা মেয়ের কাছে যেত। তাকে না পেয়ে তার ভাইকে লোকটার গতিবিধি সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে সে বলল, "তাদের বাড়িতে সে ইদানীং কমই আসত, কিন্তু ওই পাড়ার প্রদীপ নামে এক চাল বিক্রেতার কাছে সে আসত, সেই প্রদীপ হয়ত কিছু জানলেও জানতে পারে।"

সেদিন ছিল কালীপুজোর রাত। রাত তখন প্রায় নটা বাজে। ছেলেটা প্রদীপের বাড়ি দেখিয়ে দিলে, অফিসাররা প্রদীপের বাড়িতে গিয়ে জানতে পারল, প্রদীপ নেই। কোথায় আছে কেউ বলতে পারবে না।

কালীপুজোর রাত, চারিদিকে বাজি পুড়ছে, ফাটছে, বাচ্চারা হৈ চৈ করে আনন্দে মত্ত। অফিসাররা ফিরে না এসে প্রদীপের পাড়ার কালীপুজোর প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সেই ছেলেটা, কারণ প্রদীপকে তো আমাদের কেউ চেনে না। তাই ছেলেটার সাহায্যের দরকার। আমাদের লোকেরা চুপিসাড়ে কায়দা করে প্যান্ডেলটা মোটামুটি ঘিরে ফেলল, যাতে প্রদীপ থাকলে পালিয়ে না যেতে পারে। প্যান্ডেলে গিয়ে প্রদীপের খোঁজ করতে প্যান্ডেলে বসে থাকা ছেলেগুলো জানাল, প্রদীপ সেখানে আসেইনি। এমন সময় রাজকুমার লক্ষ্য করল, একটা ছেলে প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে প্যান্ডেল থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। রাজকুমার আস্তে আস্তে প্যান্ডেলের পেছন দিক দিয়ে গিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটা প্যান্ডেলের কাপড় তুলে যেই বের হল, রাজকুমার খপ করে ওকে ধরে ফেলে বলল, "কি রে প্রদীপ পালাচ্ছিস যে খুব, ভেবেছিস আমরা তোকে চিনি না, এখন চল, আমাদের সাথে লালবাজার। "

রাজকুমার প্রদীপকে সত্যিই চিনত না, কিন্তু ওর হামাগুড়ি দিয়ে পালানোর চেষ্টা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, আর তখনই ওকে ঝপ করে ধরে আন্দাজে ঢিল মারল। আর তাতেই প্রদীপ কাৎ। সে কোনমতে বলল, "আমি কিছু জানি না, আমায় কেন ধরছেন আপনারা?" রাজকুমার জানতে চাইল, "তুই কিছু যদি না জানিস, তবে পালানোর চেষ্টা করছিলি কেন? ঠিক আছে কি জানিস না জানিস পরে বোঝা যাবে। প্যান্ডেল থেকে চল, তোকে আমাদের দরকার।"

রাজকুমার ও অন্য অফিসাররা প্রদীপকে প্যান্ডেলের বাইরে নিয়ে এসে জানতে চাইল, যার সন্ধানে ওখানে তারা গিয়েছে সে এখন কোথায়? প্রদীপ বলল, "জানি না। সে

অনেকদিন হল আমার কাছে আসেনি।” রাজকুমার বলল, “ঠিক আছে, তবে চল, আমাদের সাথে। সেখানে গিয়ে বলবি, কি জানিস না জানিস।” প্রদীপকে নিয়ে এসে তারা লালবাজার লকআপে ঢুকিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল।

পরদিন সকালবেলা, প্রদীপকে লকআপ থেকে নিয়ে আসা হল। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, “প্রদীপ, সে কোথায় আছে বল, নয়ত, তার বদলে তোকেই ডাকাতির কেসে চালান করে দেব।” শেষের কথাটা ওকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য বললাম। কাজ হল, প্রদীপ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে বলল, “আমি ডাকাতির কিছু জানি না, সে খুব সম্ভবত ব্যান্ডেলে আছে।” প্রশ্ন করলাম, “ব্যান্ডেলে কোথায় আছে বল?” প্রদীপ বলল, “ব্যান্ডেল স্টেশনের রেল কোয়ার্টারের পাশে একটা ঘরে।” বললাম, "ঠিক আছে, তুই আমাদের সাথে যাবি, দূর থেকে দেখিয়ে দিবি, সে বুঝতেই পারবে না যে তুই ওর বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছিস। সুতরাং তোর কোনও ভয় নেই।”

সেই অনুযায়ী আমাদের লোকেরা দুটো গাড়ি নিয়ে প্রদীপকে সাথে তুলে ব্যান্ডেলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। ব্যান্ডেলে পৌঁছে স্টেশনের পাশে রেলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টারের পাশে একটা দরমার বাড়ি দেখিয়ে প্রদীপ বলল, “ওই বাড়িতে সে দিন পনেরো হল দাদার শালীর সাথে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।”

প্রদীপকে গাড়িতে বসিয়ে আমাদের বাহিনী ওই দরমার বাড়িতে হানা দিল, এবং তাকে পেয়ে গেল। পুলিশ দেখে সে তো ভূত দেখার মত চমকে তাকিয়েই অভিনয় শুরু করল। প্রথমেই সে প্রশ্ন করল, “আপনারা?” রাজকুমার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, “সুভাষ মজুমদার, তুই নিজেকে খুব চালাক মনে করিস, না? প্রতিবার ডাকাতির আগে ঠেক পাল্টে ভাবিস তোকে আমরা খুঁজে পাব না, এবারও ভেবেছিস বর্ধমানে ডাকাতি করে এখানে এসে পার পেয়ে যাবি, না?” সে বলল, “আমি কিছুই জানি না স্যার, আমি কোনও ডাকাতিই করিনি।” ততক্ষণে ওর নতুন সংসারে আমাদের লোকেরা তল্লাশি শুরু করেছে, জিনিসপত্র সব নতুন, কিন্তু ডাকাতির কোনও কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

অফিসাররা ধন্দে পড়ে গেল, সত্যিই কি সুভাষ বর্ধমানে ডাকাতি করেনি, আমরাই কি ভুল করলাম? কিন্তু এতসব নতুন বিছানাপত্র, থালাবাসন আর অন্যান্য জিনিস ঘরে সাজান, তা কেনার এত টাকা একসঙ্গে পেলই বা সে কি করে? কেনই বা সে ব্যান্ডেলে এসে থাকতে শুরু করেছে? কেনই বা তার বাড়ির লোককে না বলে সে আত্মগোপন করে আছে ব্যান্ডেলে? দাদার শালীকে নিয়ে যে থাকে, তা তো তার বাড়ির লোকজন সবই জানে। সেই মহিলাও আছে, তার শরীর দেখে সবাই বুঝল মহিলা সন্তানসম্ভবা এবং খুব সম্ভবত মাসখানেকের মধ্যেই মা হতে চলেছে।

অত সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে তারা সুভাষকে লালবাজারে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করাই শ্রেয় মনে করে বলল, "ঠিক আছে, চল, তুই যদি ডাকাতি নাই করে থাকিস, তবে ওখান থেকে তোকে ছেড়ে দেব, এখন আমাদের সাথে তোকে যেতে হবে।” সুভাষ আমাদের জানে। ফালতু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিনয়ের সাথে বলল, “চলুন, যেতে যখন হবে।” সুভাষকে ঘর থেকে নিয়ে আসার সময় সুভাষের দ্বিতীয় স্ত্রী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। রাজকুমার ভাবল, এই মহিলাকে এই অবস্থায় একা এখানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। একেও কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত। সে মহিলাকে বলল, “আপনিও চলুন আমাদের সাথে।” মহিলা ভ্যাবাচাকা খেয়ে প্রশ্ন করল, “আমি, আমি যাব?” রাজকুমার বলল, “হ্যাঁ।”

রাজকুমারের ছ'ফুটের ওপর বলিষ্ঠ চেহারার সামনে সেই মহিলা আর কি উত্তর দেবে, তাড়াতাড়ি বেরনর জন্য তৈরি হয়ে নিল, তারপর মাটির বারান্দায় রাখা একটা ঘুঁটের বস্তা ঘরে টেনে নিয়ে গেল। তা দেখে, রাজকুমারের সন্দেহ হল, সে ঘুঁটের বস্তাটা এক টানে উপুড় করে দিল। ঝপঝপ করে ঘুঁটে পড়তে পড়তে হঠাৎ টাকার বান্ডিল পড়তে লাগল। সে

একটা বান্ডিল তুলে দেখল তখনও বর্ধমানের ব্যাঙ্কের স্লিপ তাতে লাগান।

রাজকুমার একটু হেসে সুভাষকে জিজ্ঞেস করল, “কিরে সুভাষ তুই নাকি বর্ধমানে ডাকাতি করিস নি? লালবাজারে গিয়ে তো রুণুবাবুর কাছে সবই বলে দিতিস ফটফট করে, তখন আমাদের আবার ঝামেলা হত, তোকে নিয়ে আবার ব্যান্ডেলে আসতে হত এই টাকাগুলো নিতে। আমাদের তো চিনিস। ঠিক আছে, চল।” “ভি” আদলের মুখের মালিক সুভাষ মজুমদার তখন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর তারা সুভাষের বাড়িতে পাওয়া টাকা ও অন্যান্য জিনিসের সিজার লিস্ট বানিয়ে সুভাষ ও সেই মহিলাকে নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা দিল। লালবাজারে পৌঁছে তাকে আমার কাছে নিয়ে এল।

আমি বর্ধমানের এস.পি. আহমেদ সাহেবকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে বললাম, “স্যার, আপনার মূল আসামীকে ডাকাতির টাকা সমেত আজ আমাদের অফিসাররা গ্রেফতার করে এনেছে, আপনি এসে নিয়ে যান।” পরদিন বর্ধমান থেকে এস.পি. সাহেব সঙ্গে অন্যান্য, অফিসার ও সিপাই নিয়ে এসে হাজির। আমরা তাদের হাতে সুভাষ মজুমদারকে ও ব্যাঙ্কের ডাকাতির টাকা তুলে দিলাম। ডাকাতির ধরন দেখে তাঁর সন্দেহটা সঠিক হয়েছিল বলেই খুব তাড়াতাড়ি টাকা সমেত ডাকাত ধরা পড়ল।

আমরা সুভাষের দ্বিতীয় স্ত্রীকে ছেড়ে দিলাম, কারণ তখন সে মা হতে চলেছে। যদিও আইনের চোখে সেও অপরাধী, কারণ ডাকাতির টাকা লুকিয়ে রাখার অপরাধ সে তখন করে বসেছে, তার বিরুদ্ধেও সাজাযোগ্য মামলা হতেই পারে। কিন্তু মানবিক কারণটাকেই আমরা প্রাধান্য দিলাম।

রাজ্য পুলিশ এলাকায় শুধুমাত্র বর্ধমানের ব্যাঙ্কের ডাকাতই আমরা ধরিনি। আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে ঘটে যাওয়া বহু ডাকাতির কিনারা আমরা করেছি। ডাকাত ধরাটাকে আমাদের পেশার সাথে মিশিয়ে নেশায় পরিণত করেছিলাম। তাই পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে আমরা দায়িত্ব নিজেরাই কাঁধে তুলে নিতাম। ছোটখাট ডাকাতির থেকে ব্যাঙ্ক ডাকাত ধরতেই বেশি সময় ব্যয় করতাম।

বিরাশি সাল থেকে চুরাশি সালের মাঝামাঝি অবধি রাজ্য পুলিশের এলাকায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ডাকাতির খবর আমরা পেতে থাকলাম। আর সেইসব ডাকাতির কায়দাও প্রায় এক। এবং শুনতে পেলাম, ব্যাঙ্কে গিয়ে ডাকাতরা আবার লম্বা চওড়া বক্তৃতাও দিচ্ছে। তারা ব্যাঙ্কে ঢুকেই ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রথমে ভয় দেখিয়ে তারপর বলছে, “আমরা সব বেকার শিক্ষিত যুবক, কাজ পাইনি, তাই বাধ্য হয়ে এ কাজে নেমেছি। টাকা নিয়ে আমরা ভাল ভাল কাজই করব। ফূর্তি করে উড়িয়ে দেব না। সবার যাতে কল্যাণ হয় তেমন কাজই করব।” এই ডাকাতরা ব্যাঙ্কে আসত সবাই টুপি পরে। দক্ষিণেশ্বরে একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি করার পর একটা দেশি টুপিও পাওয়া গেল।

রাজ্য পুলিশ এলাকায় ডাকাতি বা ওই ধরনের বড় কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে আমাদের ওপর তার তদন্তের দায়িত্ব না থাকলেও আমরা তার খোঁজ রাখতাম ঠিকই। কিন্তু ওই ডাকাতিগুলোকে প্রথমদিকে আমরা তেমন গুরুত্ব দিইনি। রাজ্য পুলিশ এলাকাতে সংঘটিত হয়েছে বলেই নয়, আমাদের মধ্যে তখন একটা উন্নাসিক ভাবও এসে গিয়েছিল, যেন ডাকাত ধরাটা আমাদের কাছে কিছু না। ভাবখানা এমন যখন আমাদের কলকাতা পুলিশের এলাকায় হবে তখন দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে হাওড়ার ডোমজুড় এলাকায় একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হল। ডাকাতরা এক লক্ষ ছ' হাজার টাকা নিয়ে পালাল। ডাকাতি যেদিন হয়, সেদিন হাওড়ার তখনকার এস.পি. সুলতান সিং রাত এগারটা নাগাদ লালবাজারে এলেন, তখন বিভাগে আছি আমি আর রাজকুমার। তিনি আমাদের জানালেন, ডাকাতরা সবাই ডাকাতি করার সময় দেশি টুপি পরে ছিল। তিনি এসেছিলেন, সেই ডাকাতির সময় যে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা ব্যবহৃত হয়েছিল সেই গাড়িটার নম্বর নিয়ে, সেই গাড়ির আসল মালিক কে তা জানার জন্য। গাড়িটার নম্বর উনি পেয়েছেন, ওই ব্যাঙ্কের উল্টোদিকে যে স্কুল আছে তার ছাত্রদের কাছ থেকে। ডাকাতির সময় সেই স্কুলের ছাত্ররা দেখতে পেয়ে গাড়িটার নম্বর বুদ্ধি করে লিখে রেখেছিল।

গাড়িটার নম্বর বেলতলার মোটর ভিহিকেলসের, সেখান থেকে পাওয়া যাবে না মালিকের নাম, কারণ পাঁচটার মধ্যেই মোটর ভিহিকলস বন্ধ হয়ে গেছে। উপায় আমাদের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট, সেখানেও সন্ধের পর গাড়ির নম্বর বিভাগের সবার ছুটি হয়ে যায়। তবু ওই বিভাগে গিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা নিয়ে এলাম। গাড়ির মালিকের ঠিকানা দমদম ক্যান্টনমেন্টের।

ঠিকানা পেতেই সিং সাহেব মালিকের খোঁজ করতে উদ্যোগী হলেন। আমি তাঁকে বললাম, “আমাদের ডাকাত ধরায় অভিজ্ঞ কজন অফিসারকে কি আপনার সাথে দেব?” উনি বললেন, “না, না, তার দরকার হবে না।” উনি চলে গেলেন।

তিনি চলে যেতে আমরা বসলাম ডাকাতিটার ঘটনা ব্যাখ্যা করতে। প্রথমেই ভাবলাম, আচ্ছা, ওই ডাকাতগুলো টুপি পরে ডাকাতিগুলো করছে কেন? তার মানে, ডাকাতদের কারও মাথায় কিছু আছে, সেটা ঢাকতেই ওরা টুপি পরছে, যাতে চট করে কেউ চিনতে না পারে, এবং ডাকাতরা পরিচিত না হয়ে যায়। এ নিয়ে আমরা আগেও চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু বেশি দূর যাইনি। যেহেতু তেমন কোন ঘটনার বিবরণ সরাসরি হাতে পাইনি। এবার আমরা ঠিক করলাম, মাথায় বিশেষ কিছু চিহ্ন আছে তেমন পরিচিত ডাকাত কে কে আছে, তার একটা তালিকা তৈরি করা যাক।

তালিকা তৈরি করতে প্রথমেই এমন একটা নাম তালিকায় লেখা হল, তার মাথায় একটা বিশাল টাক, সে সবসময় টাক ঢাকবার জন্য টুপি পরে থাকত। তাই তার কিশোরী নামের সাথে বিশেষণ যোগ হয়ে সে কিশোরী নামেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। সেই ডাকাতকে আমরা প্রথমে চিনি সত্তরের দশকে কতগুলো সোনার দোকান ও অন্যান্য দোকানে ডাকাতির ঘটনায়। তখন সেই ডাকাতিগুলোর জন্য তাকে আমরা ধরি, এবং জেলে পাঠাই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তখনও সে দমদম সেন্ট্রাল জেলে আছে। এবং সে না কি বদ্ধ উন্মাদ সেজে আছে। সে যখন জেলে আছে, সে নিশ্চয়ই হবে না ওই ডাকাতির পাণ্ডা।

এবার দ্বিতীয় যার নাম আমাদের তালিকায় এল, তার মাথাতেও টাক এবং তাকেও টুপি কিশোরীর সাথে ধরা হয়েছিল। সে সাজা খেটে জেল থেকে বেরিয়ে গেছে। সে ছিল অমিতাভ বসু বা ছোট্টুর দলে। এই ছোট্টু উনসত্তর-সত্তর সালে একটা ডাকাতির দল গড়ে। দলে ছিল আট-দশ জন অল্পবয়সী বখে যাওয়া ছেলে। ছোট্টু প্রথমেই একটা গাড়ি যোগাড় করে। ছোট্টুর ডান হাত ছিল ফরডাইজ লেনের হাতকাটা রাধাকৃষাণ। এদের আগের থেকে কোনও ছক কষা থাকত না। সন্ধেবেলায় এরা গাড়িতে চড়ে সবাই বেরিয়ে পড়ত। তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঠিক রাত আটটা থেকে সওয়া আটটার সময়, যখন দোকান বন্ধ করে দোকানদাররা টাকা পয়সা গুছিয়ে বের হতে যাবে, এরা সেই সব দোকানে ঢুকে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যেত।

এই ছোট্টুর দল সারা কলকাতা জুড়ে এমন মোট ছত্রিশটা দোকানে ডাকাতি করেছিল। তারমধ্যে লিন্ডসে স্ট্রিটের একটা ওয়াইন শপ, কলেজ স্ট্রিটের হরলালকার দোকান ইত্যাদি ছিল।

একদিন খবর পাওয়া গেল ছোট্টু তার পুরো দল নিয়ে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে ইন্ডিয়া হোটেলে আছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের বাহিনী হোটেলে ঘিরে ফেলল। ছোট্টু সর্দারজীর ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদের লোকেদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কেউ তাকে চিনতে পারল না। সে ও তার দলের অন্য একজন ছাড়া হোটেলে সবাই ধরা পড়ল। গাড়িটাও পাওয়া গেল।

ছোট্টু হোটেল থেকে পালিয়েই দিন পনেরোর মধ্যে নতুন একটা দল তৈরি করল। আবার একটা গাড়ি যোগাড় করে নতুন করে দোকানে দোকানে ঠিক একই কায়দায় শুরু করল ডাকাতি। এবার আমরা তাদের ধরলাম। এই দলেই ছিল সেই টাক মাথার ছেলেটা, যার নাম আমাদের তালিকায় দ্বিতীয় হয়ে এল।

ছোট্টুর দলের বিরুদ্ধে আমরা "গ্যাং কেস" করলাম। তারা সবাই আদালতে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিতে, আদালত তাদের অল্প সাজা দিলেন। তারা সেই সাজা খেটে বেরিয়ে গেল।

সেই টাক মাথার ছেলেটা জেল থেকে বের হয়ে নিজে একটা ছোট দল করে দক্ষিণ কলকাতায় একটা সোনার দোকানে ডাকাতি করল এবং আমাদের হাতে ধরা পড়ল। জামিনে ছাড়া পেতে সে আর আদালতে হাজির হল না। কিছুদিন পর সে আমাদেরই এক অফিসারের সোর্স হয়ে যায়। তাই তার নাম তালিকায় আসতে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। প্রথমে ভাবা হল, না এটা বোধহয় ঠিক নয়। ওই গাড়ির মালিকের মত এই ডাকাত বন গয়্যা সোর্সের বাড়িও দমদম ক্যান্টনমেন্টেই। ভাবলাম, এটা কি কাকতালীয় না সত্যিকারের কোন মিল আছে? আমরা চুপ করে রইলাম, রাজ্য পুলিশের তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর দিলাম।

অন্যদিকে হাওড়ার এস.পি. সাহেব দমদম ক্যান্টনমেন্টের ওই গাড়ির মালিকের বাড়ি গেলেন। মালিক ভদ্রলোক রাতে আর কোথায় যাবেন, বাড়িতেই ছিলেন। এস.পি. সাহেব তাঁর গাড়ির খোঁজ করতে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাড়ির নম্বর আর রঙ যা বলছেন, তা তো আমারই গাড়ি। গ্যারেজেই আছে, কিন্তু গাড়িটা তো আমি চালাই না, চালায় আমার ড্রাইভার স্বপন ঘোষ।"

এস.পি. সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, “গাড়িটা আজ সকালে কোথায় গিয়েছিল, তা কি আপনি জানেন?” গাড়ির মালিক ভদ্রলোক বললেন, “তা তো জানি না, ড্রাইভার স্বপন দুদিন আগেই আমায় বলেছিল, আজ ও সকালে বেড়াতে যাবে। গাড়িটা যদি ওকে দিই তবে সেটা নিয়েই যাবে। আমি দেখলাম, রোজই ও আমার গাড়ি চালায়, একদিন যদি চায়, কি আর ক্ষতি? আমি ওকে আজ গাড়িটা দিয়েছিলাম, সে সকালেই নিয়ে গিয়েছিল, সন্ধের সময় দিয়ে গেছে, কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, তা তো আমি জানি না।”

এস.পি. সাহেব ওই ভদ্রলোকের থেকেই ড্রাইভারের ঠিকানা নিয়ে তার বাড়ি গেলেন। তার বাড়িও ক্যান্টনমেন্টেই। কিন্তু জানতে পারলেন, সেই যে সকালে বেরিয়েছে, তারপর থেকে আর ফিরে আসেনি। সেখান থেকেই খবর পাওয়া গেল মিতা বৈদ্য নামে একটা মেয়ের সাথে স্বপনের খুব ঘনিষ্ঠতা আছে, স্বপন ওই মেয়েটার বাড়ি প্রায় প্রতিদিনই যায়। মিতার বাড়িতে এস.পি. সাহেবের নেতৃত্বে হানা দেওয়া হল। মিতা বাড়িতে ছিল, কিন্তু স্বপন ওখানে নেই।

মিতার ঘরে ছিল দুটো স্টিলের আলমারি। মিতার কাছে একটা আলমারির চাবি ছিল, সেটা খুলে দেখা হল, কিন্তু ডাকাতি সংক্রান্ত কোনও কিছুই পাওয়া গেল না। এস.পি. সুলতান সিংয়ের নির্দেশে অন্য আলমারিটা ভাঙা হতে সেই আলমারিতে পাওয়া গেল বেশ কয়েক বোতল স্কচ হুইস্কি, পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আর বেআইনী বেশ কিছু অশ্লীল পত্রপত্রিকা। মিতা আলমারি ভাঙার আগেই জানিয়েছিল, ওই আলমারিটা তার নয়, তার পিসিমার, সে মুম্বাই থাকে এবং সেখানে সে হোটেলে নাচে। সেই পিসিমা কলকাতায় এলে এখানে থাকে, ওই আলমারিতে জিনিসপত্র রাখে। যাই হোক, সিংসাহেব ওই সব জিনিসগুলোর সিজার লিস্ট বানিয়ে বাজেয়াপ্ত করে মিতাকেও গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন।

মিতাকে নিয়ে গিয়ে ওরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, আমরা জানতে পারলাম না। মিতা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ল, তাকে হাসপাতাল ভর্তি করাতে হল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তা নিয়ে পত্রপত্রিকায় তোলপাড় শুরু হল।

আমরা কিন্তু মিতার পিসিমার আলমারি থেকে পাওয়া জিনিসগুলো বা মিতাকে নিয়ে মাথাই ঘামালাম না। আমরা দমদম অঞ্চলে আমাদের রাডারগুলোকে সজাগ করে দিয়েছি মাত্র।

রাডারগুলোকে সজাগ করে দিতে আমাদের কেউ বলেনি। এমন কি এস.পি. সাহেবও আমাদের বলেননি, এই ব্যাপারে কোনরকম খোঁজ খবর করতে। কিন্তু খবর যখন পেয়েছি, বর্ণনা যখন শুনেছি, নিজেরা নিজেদের দায়িত্বে এগিয়ে গেলাম। সরকারের প্রতি, সমাজের প্রতি, নাগরিকদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জন্যই এই উদ্যোগ। আমাদের মানসিকতা ছিল এরকম, ডাকাতরা নির্বিঘ্নে ঘুরবে, আর আমরা এলাকার দোহাই পেড়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাব তা হয় না। সেই রাডারের মাধ্যমে খবর পেলাম, যেদিন ডাকাতি হয়েছে তার পরদিন আমাদের এক অফিসারের ডাকাত- সোর্স আর স্বপন একটা রিকশা করে বেলঘরিয়ার দিকে চলে গেছে, তারা আর দমদম ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসেনি।

আমরা তদন্ত শুরু করলাম এইখান থেকে। সেই সোর্সের নাম ছিল চন্দন চৌধুরী। তার আর স্বপন ড্রাইভারের যোগাযোগের অর্থ ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তাছাড়া তার টুপি পড়ে ডাকাতি করার সম্ভাবনা আছে। আমাদের বানান তালিকায় তার নাম টুপি কিশোরীর পরেই রেখেছি। সে দমদম ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দা এবং স্বপনের সাথে একসঙ্গে রিকশায় বেলঘরিয়ার দিকে যেতে দেখা গেছে, তার মানে কি দুয়ে দুয়ে চার হল? মনে তো হয় দুয়ে দুয়ে চারই। তাহলে খোঁজ কর চন্দনের।

চন্দনের সব পুরনো আস্তানায় নিঃশব্দে আমরা ওই সোর্সের মাধ্যমে খবর নিতে

লাগলাম। চন্দন নেই। কোথায় গেল, কেন তার হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা? তার একটাই অর্থ, সে বুঝতে পেরেছে তাকে খোঁজা হবে। আমরা অবশ্য তার সন্দেহের তালিকায় ছিলাম না, এস.পি. সাহেব এবং রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দফতর সি.আই.ডি. খুঁজবে, সে জানত। কিন্তু আমরাও যে তার খোঁজে নেমে পড়েছি তা সে জানে না, সে আমাদের দফতরের এক অফিসারের সোর্স হওয়াতে তার বিশ্বাস ছিল যে আমরা তাকে ধরব না। সে আবার আমাদের গ্রেফতার এড়াতেই কলকাতা পুলিসের এলাকার বাইরে ডাকাতিগুলো করত। কিন্তু আমরা যে তার খোঁজে নেমেছি তা তার অজানাই রইল।

আমরা চন্দনের পুরনো দলের লোকজনকে খুঁজতে শুরু করলাম, যাঁরা চন্দনের খোঁজ দিতে পারে, এবং গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষ কে কে চন্দনের ঘনিষ্ঠ ছিল? প্রথমে এক এক করে বাছাই করতে করতে আমরা খড়দহ থানা অঞ্চলের সোদপুরের নিউ কলোনির একটা ছেলেকে ঠিক করলাম, যাকে ধরলে হয়ত চন্দনের খবর আমরা পেতে পারি। ছেলেটার নাম গোপাল। সে, চন্দন, শিউপ্রসাদ, রূপলাল, তারক, টিটাগড়ের জগা, বেলঘরিয়ার নারু মিলে টালিগঞ্জের ও মধ্য কলকাতার সোনার দোকানে ডাকাতি করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরাও পড়েছিল। তখন থেকে গোপালকে আমরা চিনি।

তাছাড়া গোপাল, চন্দনরা রানাঘাট ও আমডাঙ্গায় ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছিল। এগুলো সবই আমরা পরে জেনেছি।

ডোমজুড়ে ডাকাতি হওয়ার পর ইতিমধ্যে তিন চার দিন পার হয়ে গেছে। এরপর আমরা প্রথমেই গোপালকে ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই অনুযায়ী আমাদের অফিসাররা সোদপুরের নিউ কলোনিতে তার বাড়িতে রাত্রিবেলা হানা দিলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন সি.আই.ডি. অফিসারদের। তাকে পাওয়া গেল। তল্লাশি করে ডাকাতির কোনও কিছু পাওয়া না গেলেও, আমাদের অফিসারেরা পেল, চন্দনকে লেখা আমাদের দফতরের সেই অফিসারের একটা চিঠি যার সোর্স ছিল চন্দন। চিঠিটা সেই ছেলেটার কাছে পাওয়া যেতে সি.আই.ডি. অফিসারদের সামনে তারা যথেষ্ট বিব্রত বোধ করল, কারণ চন্দন যে আমাদের সেই অফিসারের সোর্স ছিল তা তো আর সি.আই.ডি. অফিসাররা জানেন না। তাঁরা হয়ত ভেবে বসতে পারেন চন্দনের সাথে আমাদের সেই অফিসারের গোপন কোনও যোগ আছে। তারা সি.আই.ডি. অফিসারদের হাতে ওইসব চিঠিগুলো না দিয়ে নিজেরাই নিয়ে চলে গেল, সাথে গোপালকেও।

যে অফিসার চিঠিটা পেয়েছিল সে লালবাজারে এসে আমাকে সেটা দিয়ে বলল, “স্যার, দেখুন।”

আমি চিঠিটা নিয়ে পড়ে সেটা পকেটে রেখে দিলাম। যে অফিসারের সোর্স ছিল চন্দন তাঁকে আমি কিছুই বললাম না, কারণ তাঁর পেশাদারী আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত।

চন্দন খুবই ধূর্ত ছিল। তাই সে জেল থেকে বের হয়ে নিজেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য ডাকাতি দমন শাখারই অফিসারের সোর্স হয়ে গেল। আমাদের সেই অফিসারকে সে বোকা বানিয়ে কলকাতা পুলিশের এলাকার বাইরে একটার পর একটা ডাকাতি করে চলল।

সেই অফিসার আমারই অধীনে ছিল। তার যদি কোনও দোষ থেকে থাকে তবে তার দায় তো আমার ওপরও বর্তায়।

আর চিঠিটার মধ্যে এমন কিছু লেখাও ছিল না, শুধু চন্দনকে সে দেখা করতে বলেছিল। সেই অফিসারের চাকরি জীবনের আনুগত্যকে মুহূর্তে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার সুযোগ আমার হাতে এসেছিল, কিন্তু তা করলে তার এতদিনের দক্ষতাকে অস্বীকার করা হত।

এমন ভাবেই আমাদের ডাকাতি দমন শাখার আর একজন অন্যতম প্রধান অফিসার আশিসদাকে অন্যায়ভাবে অপদস্থ করা হয়েছিল। সে ডাকাতদের ভেতরে সোর্সের সাথে

যোগাযোগ রাখতে গিয়ে পেশাদারী হিংসার বলি হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছিল তার নাকি ডাকাতদের সাথে ঘনিষ্ঠতা প্রবল। এমনভাবে পত্রপত্রিকায় মুখরোচক গল্প ফেঁদে প্রচার হল, মনে হবে সে যেন ডাকাতদের থেকে ডাকাতির টাকার বখরা নেয়।

সবচেয়ে যা ক্ষতি হয়, কিছু সন্দেহবাতিক ঊর্ধ্বতন অফিসার এই সব প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এমন কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়, যার ফলে চরম ক্ষতি হয় দফতরের। তখন সাহস করে অফিসাররা আর বিশেষ ঝুঁকি না নিয়ে কোনমতে শুধুমাত্র "চাকরি বজায়" রাখার কাজটুকু করেই বাড়ির ছেলে বাড়ি চলে যায়।

একবার এক অফিসার পেশাদারী হিংসায় বশবর্তী হয়ে, এক ডাকাতকে ভয় দেখিয়ে এক লরি লুটের গল্প বানিয়ে ডাকাতের মুখ দিয়ে সেই গল্পকে স্বীকারোক্তি হিসাবে বলাল এবং তা বড় একটা টেপ রেকর্ডারে টেপ করে নিল। সেই গল্পে সে অন্য এক অফিসারকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসাবে দেখাল, এবং ডাকাতের মুখ দিয়ে জানাল সেই লরি লুটের টাকা অফিসারটি নিয়েছে। আসলে তেমন কোন লরিই লুট হয়নি। টাকা নেওয়া তো দূরের কথা। এই মিথ্যা অনেক কষ্টে ধামাচাপা দেওয়া গেছে।

আসলে আশিসদা চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের কিছু ডাকাতকে সোর্স হিসাবে ব্যবহার করতেন, সেটাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করার হাতিয়ার হিসাবে কেউ কেউ ব্যবহার করেছিল। এই রকম সোর্স সবাইকেই রাখতে হয়, নয়ত কাজ কঠিন হয়ে পড়ে।

ডাকাতদের তো আর বিশেষ গণ্ডি নেই, এখানে ডাকাতি করব না, ওইখানে করব। তারা যেখানে সুযোগ পাবে সেখানেই ডাকাতি করবে। তাছাড়া আমরা দেখেছি, কলকাতা অঞ্চলের ডাকাতরা ডাকাতি করে হয়ত পালিয়ে যেত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে, আবার ওই সব অঞ্চলের ডাকাতরা তাদের এলাকায় ডাকাতি করে আস্তানা নিত কলকাতায়। সুতরাং আমাদের সব জায়গাতে সোর্স রাখতে হত।

তেমন একটা ঘটনা চন্দনকে লেখা আমাদের সেই অফিসারের চিঠিটা। তবু আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেদিন রাতেই গোপালকে জিজ্ঞেস করলাম, "চিঠিটা তুই কিভাবে পেয়েছিস?"

সে বলল, "একদিন ওই অফিসার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন চিঠিটা তিনি দেন চন্দনকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু চন্দনকে তা দেওয়া হয়নি।" ওর কথা শুনে আমি ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করে চুপ করে গেলাম।

কিন্তু চিঠিটা ওই ছেলেটির কাছে পেতে একটা জিনিস হাতেনাতে প্রমাণ হল, চন্দনের সাথে ওই ছেলেটার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। নয়ত চন্দনের চিঠি সে তার হেফাজতে রাখত না।

পরদিন সকালে গোপাল আমাদের কাছে বলল, চন্দনের এই সব টুপি পরা ডাকাতির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। ডোমজুড়ে যে ডাকাতি হয়েছে তা সে শুনেছে, তা চন্দনের নেতৃত্বেই হয়েছে। আরও জানাল, চন্দন খুব সম্ভবত দুর্গাপুরে আছে এবং দুর্গাপুরের সেই বাড়িটা সে চেনে। ঠিক করলাম, দুর্গাপুরে যাব। আমরা গোপালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুর্গাপুরের উদ্দেশে।

শীতকাল, কুয়াশায় পথঘাট প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। জি. টি. রোড ধরে গাড়ি দ্রুত এগতে পারছে না। উল্টোদিক থেকে হুস হুস করে প্রচণ্ড গতিতে লরির ঝাঁক হেডলাইট ও স্পট লাইট জ্বালিয়ে আমাদের গাড়ির ঘাড়ে এসে পড়ছে যেন হঠাৎ হঠাৎ। পানাগড় ছাড়িয়ে দুর্গাপুরের মুচিপাড়ার মোড় যখন এল, তখন রাত সাড়ে বারোটা পার হয়ে গেছে।

এবার কোন দিকে ভাই? মুশকিল হল, সোদপুরের ছেলেটা দুর্গাপুরে যখন এসেছে তখন ট্রেনে করে এসেছে এবং স্টেশন থেকে রিকশা করে গিয়েছে তাদের আস্তানায়, ওইভাবেই সে চেনে। জি. টি. রোড থেকে কোন দিকে কিভাবে যাবে সে অত রাতে আন্দাজ করতে পারছে না। উত্তর দক্ষিণ সব গুলিয়ে ফেলছে। কি আর উপায়, গাড়ি মুচিপাড়া থেকে ঘুরল

দুর্গাপুর স্টেশনের দিকে, তারপর রেললাইন পার হয়ে স্টেশনের চত্বরে গিয়ে ঢুকল। গাড়ি দাঁড়াল, এবার ছেলেটা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে দিকটা ঠিক করে নিয়ে বলল, "এবার মনে হয় চিনেছি, চলুন।"

ঘুম নেই, কারও চোখে ঘুম নেই। কিন্তু ক্লান্তিও নেই। আমাদের এমনই হত। শরীর না চাইলেও মনের জোরে এগিয়ে যেতাম, যতক্ষণ না ধরতে পারছি আসামীকে। এবার গোপালের নির্দেশমত গাড়ি দুটো চলল। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে দুর্গাপুরের একটা কলোনির মধ্যে সে আমাদের নিয়ে এল। চারদিকে নিঝুম, শীতের রাত, দুর্গাপুরের প্রচণ্ড শীতে সবাই ঠকঠক করে কাঁপছে, রাস্তার আলো দূর থেকে কুয়াশা ভেদ করে যতটুকু আসছে তা দিয়েই যা কিছু দেখার তা দেখতে হচ্ছে। মাঝেমধ্যে রাস্তার কুকুরের ডাক ছাড়া আর কোন প্রাণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে এবার হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। কারণ তাকে আগেই বলা হয়েছিল, বাড়ির থেকে একটু দূরে যেন গাড়ি দাঁড় করায়।

রাতে বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ালে অপরাধীরা সজাগ হয়ে যায়, সজাগ হলেই আস্তানা থেকে বেরিয়ে পালায়। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গাড়ি দূরে দাঁড় করাতে বলা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী আমাদের গাড়ি দুটো কিছুটা দূরেই দাঁড় করিয়েছিল। ঠাণ্ডার মধ্যে আমরা তার পিছু পিছু এগিয়ে যেতে লাগলাম। একটু পরে একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল সে। আমরা বাড়িটা নজর করে দেখে নিয়ে ঘিরে ফেললাম। বাড়ির সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল দুজন। তারা চন্দনকে চেনে, অবশ্য চন্দনও তাদের চেনে। বাড়িটার চারদিক চারফুট মত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে লোহার গেট, তালা মারা। রাত তখন আড়াইটা, আমাদের দুজন অফিসার পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর সদর দরজায় গিয়ে কলিং বেল খুঁজে টিপে দিল, কোনও সাড়া নেই। আবার টিপল, ভেতর থেকে পুরুষকণ্ঠে প্রশ্ন এল, "কে?"

একজন অফিসার বলল, "আমি, কলকাতা থেকে এসেছি, একটা বিশেষ জরুরী খবর দিতে।" দুর্গাপুরের সব বাঙালিরই কলকাতায় আত্মীয়স্বজন আছেন। সুতরাং কার কি হল, কিসের খবর এল ইত্যাদি ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে এক ভদ্রলোক এসে দরজা খুলতেই তারা পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলল, "এক আসামীর খোঁজে আমরা এসেছি, শুনেছি সে আপনার বাড়িতে আছে, আমরা আপনার বাড়িটা দেখব।" ভদ্রলোক বললেন, "কোনও আসামী আমার বাড়িতে নেই, 'আপনারা দেখুন।" সবাই একথা বলে, বিশ্বাস করা যায় না, তাই তাঁরা বাড়ির ভেতর ঢুকে সব ঘর দেখল। কিন্তু কাউকে না পেয়ে ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে এল।

তারপর বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে থাকা সবাই একসঙ্গে জড়ো হয়ে যখন আলোচনা করছি, তখন গোপাল বলল, "এই বাড়িটাই হবে, কিন্তু কিরকম যেন গুলিয়ে ফেলছি। সবই একইরকম দেখতে, কোয়ার্টার তো।" তখন আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করলাম, এতদূর এসে বিফল হওয়ার মানে হয় না, অন্তত যে বাড়িটায় চন্দন এসে থাকে সে বাড়িটা তো খুঁজে দেখা যাক। সত্যিই সে এখানে এসেছে না কি অন্যখানে? আর তার ঘনিষ্ঠজন যখন বলছে সে দুর্গাপুরে এসেছে, তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু সত্যাসত্য আছে, নয়ত আমাদের বিপাকে ফেলে, চন্দনকে আরও পালানোর সময় দিয়ে সে নিজের বিপদ ডেকে আনবে না। বিশেষ করে যেখানে সে নিজে এইসব ডাকাতিগুলোর একটাতেও অংশগ্রহণ করেনি।

তার কথা অনুযায়ী ডোমজুড়ের ডাকাতিতে অংশ নিয়েছে নবদ্বীপের অসিত, টালার মনা, দমদম ক্যান্টনমেন্টের সমর ও আরও কয়েকটা ছেলে যাদের নাম ওর জানা নেই। সুতরাং একেবারে মিথ্যা কথা বলে সে আমাদের নিযে আসেনি। একই রকম বাড়ি দেখে সঠিক বাড়িটা আন্দাজ করতে পারেনি, তার ওপর বাড়ির নম্বরটা এবং মালিকের নামও মনে নেই।

ঠিক ওই সময় অন্ধকারে পাশের বাড়ি থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে রাস্তার ধারে প্রাকৃতিক কর্ম শুরু করেছে। আমাদের দুজন সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসার উদ্দেশে এগিয়ে গেল। লোকটির প্রাকৃতিক কর্ম শেষ হওয়ার পর তারা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল, আরে কাকে জিজ্ঞাসা করছি, এই তো চন্দন !

একটু নাটক করেই অফিসার বললেন, "আরে চন্দন, তুই যে দুর্গাপুরে চলে এসেছিস তা আমাদের জানিয়ে আসবি তো, ওদিকে তোকে ভীষণ দরকার, কত ঝামেলা করে যে আমাদের আসতে হল তা আর বলে লাভ নেই, এখন চল। আর আমরা জানি, তুই একা আসিসনি, যাদের সঙ্গে এনেছিস তাদেরও ডাক, এখানে তাদের ফেলে রেখে কি করবি? আমাদের সাথে কলকাতা চলুক।"

চন্দন ঝানু ওস্তাদ, সে আমাদের প্রায় সব অফিসারকেই চেনে। সে পাকা খেলোয়াড়ের মত আমাদের যে অফিসারের সে সোর্স তাঁর নাম করে বলল, "কেন আমি তো "দাদা"কে বলে এসেছি। উনি কি বলেন নি? তা কি এমন দরকার পড়ল যে, আমার খোঁজে এতদূর আসতে হল? ঠিক আছে, আমি তো শুনলাম, কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশুদিনই কলকাতায় গিয়ে দেখা করছি।"

অফিসার বললেন, "সে কি রে চন্দন, এমাজেন্সি আছে বলেই তো 'আমরা ছুটতে ছুটতে এই ঠাণ্ডার মধ্যে তোর কাছে এলাম, চল, আগে তোর ঘরে চল।" তাঁরা চন্দনকে নিয়ে সেই বাড়িতে ওর ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা ছেলেকে পেলেন, সে তখন অঘোরে ঘুমচ্ছে। একজন অফিসার তার গায়ের থেকে লেপটা সরিয়ে দিতেই ঠাণ্ডা লাগতে সে জেগে গেল। অফিসার বললেন, "চল, কলকাতায় যেতে হবে।" ধড়মড়িয়ে উঠে সে প্রশ্ন করল, "কেন?" অফিসার বলল, "ডাক এসেছে ভাই, ডাক এলে সবাইকেই যেতে হয়।"

অন্যদিকে দুটো গাড়ি ভাগ করে ফেলা হয়েছে। গোপাল যে চন্দনের আস্তানা চিনিয়ে দিয়েছে তা চন্দনকে জানান হবে না। তাকে একটা গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সেই গাড়িটা অন্য গাড়ির থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

চন্দন আর নতুন ছেলেটাকে নিয়ে আমাদের অফিসাররা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। চন্দন সেই বাড়ির লোকজনকে অফিসারদের সামনেই বলল, "আমার অফিসের বিশেষ জরুরি কাজ পড়ে গেছে, তাই ওরা আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। ঠাণ্ডাটা একটু কমুক, তারপর আবার আসা যাবে।" চন্দন আর নতুন ছেলেটাকে নিয়ে আমাদের অফিসাররা দ্বিতীয় গাড়িতে বসলেন। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে দুটো গাড়ি ছুটল দুর্গাপুর স্টেশনের দিকে। শীতের জন্য দুটো গাড়ির কাঁচের জানালা বন্ধ। ভোর হয়ে আসছে, প্রায় চারটে বাজে, প্রথম গাড়িটা দুর্গাপুর স্টেশনে এসে থামল। দ্বিতীয় গাড়িটা স্টেশনের চত্বরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, চন্দনকে নিয়ে ।

প্রথম গাড়ির থেকে গোপালকে নামিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে বলা হল, প্রথম ট্রেনেই বাড়ি চলে যেতে। গোপাল বুঝে গিয়েছে, সে যে চন্দনের আস্তানা চিনিয়ে দিয়েছে তা যেন চন্দন বুঝতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা। অবশ্য চন্দনের সঙ্গীর নামটা সে আমাদের ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। চন্দন যখন তাকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল, তখন তাকে দেখেছে গোপাল। চন্দনের সঙ্গিটা হচ্ছে নবদ্বীপের অসিত।

গাড়ি এবার ছুটল কলকাতার দিকে। আবার মুচিপাড়ার মোড়। তারপর জি. টি. রোড, দুধারের বড় বড় গাছ থেকে পাখিরা ভোরের আলোর সাথে ঘুম থেকে জেগে ওঠার ডাক দিচ্ছে চারপাশের গ্রামের লোকজনকে, মাঠে মাঠে ভর্তি কুয়াশা, ফসলের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমাদের রাত তো জাগাই। ধরে নিয়ে আসছি এক সহকর্মীর সোর্সকে, ডাকাত হিসাবে। চন্দন অনেক আগেই বুঝে গেছে, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু সে চালাক ছেলে, এমনভাবে কথাবার্তা বলছে যেন ভুল করে তাকে ধরা হয়েছে, সে কোনও অপরাধই করেনি।

আমাদের গাড়ি দুটো সকাল দশটার মধ্যেই লালবাজারে পৌঁছে গেল। চন্দন আর অসিতকে লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে পাঠিয়ে দিয়ে সবাই বাড়ি চলে গেলেন। বারোটা নাগাদ চন্দন আর অসিতকে নিয়ে আসা হল আমাদের বিভাগে। শুরু হল জেরা।

ডোমজুড়ের ডাকাতির কথা, অন্য টুপি পরে যেসব ডাকাতিগুলো করেছে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন। কিন্তু না চন্দন, না অসিত, কেউ কোনও কিছুই স্বীকার করল না। চন্দনের বয়স তখন কত, খুব জোর সাতাশ-আঠাশ, ফর্সা গায়ের রং, বলিষ্ঠ চেহারার মাঝারি উচ্চতার ছেলে। কিন্তু তখনই ক্ষুরধার বুদ্ধি ধরে। অসিতও কোনও কথাই স্বীকার করল না। ওদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা চলল প্রায় বার তের দিন। কিন্তু সব কথাই ওরা অস্বীকার করতে লাগল। অথচ আমাদের কাছে পাকা খবর ওরা সব কিছু জানে। তাই ওদের আমরা তো আর ছেড়ে দিতে পারি না।

ইতিমধ্যে আমাদের একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওদের দুজনকে একই লকআপে রাখতাম। জিজ্ঞাসাবাদ আলাদাভাবে করলেও একই লকআপে থাকার ফলে ওরা রাতে একই সঙ্গে থাকত। তাই কি কি প্রশ্ন ওদের করছি তা নিজেরা আলোচনা করার সুযোগ ওরা প্রতিদিন পেত এবং কে কি উত্তর দিচ্ছে তাও নিজেরা আলোচনা করত। ফলে আমাদের জেরার উত্তরে ওরা "না" ছাড়া অন্য কোনও উত্তর দিত না। এবার আমরা আমাদের ভুলটা সংশোধন করে নিলাম, দুজনকে আলাদা আলাদা লক আপে রাখার ব্যবস্থা করলাম, যাতে ওরা পরস্পর পরস্পরের সাথে দেখা না করতে পারে, আলোচনা না করতে পারে।

ওদের আলাদা করার পর প্রথমেই আমরা লক আপ থেকে নিয়ে এলাম অসিতকে। একটা মোটা টাইপ করা কাগজের বান্ডিল দেখিয়ে ওকে বলা হল, "কিরে অসিত, তুই না বললেও দেখ চন্দন সব কিছু স্বীকার করে নিয়েছে, সব বলেছে, তুই যদি না বলিস, তুই বিপদে পড়বি। আমাদের কি, চন্দন তোদের ফাঁসিয়ে নিজে বেঁচে চলে যাবে। মাঝখান থেকে তুই মরবি।" অসিত একবার আমার হাতের কাগজের বান্ডিলটার দিকে দেখল, কাগজগুলো ইংরেজি টাইপে লেখা। জানি অসিত ইংরেজি জানে না। আমি ওকে বললাম, "পড়, পড়ে দেখ না, কি কি বলেছে চন্দন।" অসিতের মুখ সাদা হতে থাকল, বুঝলাম, আমাদের ওষুধে কাজ হয়েছে। সে বলল, "দাঁড়ান একটু ভেবে নিই।"

ব্যস, একবার ভেবে নিই মানে, পালাবার আর পথ নেই। তুমি নিশ্চয়ই জান, নয়ত কি আর ভাবার আছে! এবার শুরু কর, একবার চালু করলে যতক্ষণ না শেষ করবে ততক্ষণ ক্যাসেট চালিয়েই যেতে হবে।

অসিতকে চা জলখাবার এনে দেওয়া হল, যাতে সে ভাবার রসদ পায়। চা শেষ করে সে বলল, ডোমজুড়ের ডাকাতি ও অন্য কয়েকটা ডাকাতিতে সে চন্দনের সবচেয়ে বড় সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে। ডোমজুড়ের ডাকাতিটা সেদিন করতে সে চন্দনকে বারণ করেছিল, কিন্তু চন্দন তার কথাও শোনেনি, অন্যদেরও না।

অসিতরা বারণ করেছিল একটা কারণে। আগে ঠিক ছিল স্বপন মালিকের গাড়িটা নিয়ে বালিতে অপেক্ষা করবে, তারা অন্য একটা ছিনতাই করা গাড়ি নিয়ে ডোমজুড়ের ব্যাঙ্কে গিয়ে ডাকাতি করে, সেই গাড়িতে বালি পর্যন্ত এসে, ছিনতাই করা গাড়িটা ফেলে দিয়ে স্বপনের গাড়ি করে চলে যাবে। সেই অনুযায়ী তারা রাস্তাতে একটা গাড়ি ধরে, সেই গাড়ির ড্রাইভারকে মারধর করে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে ডোমজুড়ের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝপথে ওই ছিনতাই করা গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল, কিছুতেই আর ঠিক করা গেল না। তখন অসিতরা চন্দনকে বলেছিল, আজ যখন একবার বাধা পড়েছে তখন ডোমজুড়ে গিয়ে লাভ নেই, ফিরে যাই, অন্যদিন আসা যাবে। কিন্তু চন্দন কারও কথা শুনল না, সে স্বপনের গাড়িটা নিয়েই চলল। বলল, "ও কিছু হবে না। বেরিয়েছি যখন, তখন কাজটা করেই ফিরব। একটার পর একটা ডাকাতি করে চন্দন এত বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল যে এইসব তুচ্ছ কারণগুলোকে আমলই দিত না। ডোমজুড়ে গিয়ে ব্যাঙ্ক লুঠ করে পালাতে অবশ্য তাদের

কোনও অসুবিধা হয়নি। ডাকাতি করে ওরা এদিক ওদিক ঘুরে দমদম ক্যান্টনমেন্টেই ফিরে এসেছিল।

একে একে জায়গা মত মনা, সমর, চন্দন সবাই নেমে যেতে স্বপন তার মালিকের গাড়ি মালিকের বাড়িতে দিয়ে এসেছে। মালিকের বাড়ির লোক কেউ টেরই পায়নি যে ওদের গাড়ি নিয়ে স্বপন ডাকাতি করে এসেছে। স্বপনও চায়নি তার গাড়িটা সরাসরি ব্যাঙ্কের সামনে ডাকাতির জায়গায় নিয়ে হাজির করান হোক। কিন্তু চন্দনের হুমকির সামনে সে অসহায় বোধ করে এবং চন্দনের নির্দেশ মত সে বাধ্য হয় গাড়িটা নিয়ে যেতে। তারপর তারা গাড়ির নম্বর না পাল্টেই ব্যাঙ্কে ডাকাতিটা করে। ব্যাঙ্ক থেকে বের হয়ে সোজা গাড়িতে চড়ে পালায়। ডাকাতির টাকাটা সবাইকে অল্প কিছু কিছু দিয়ে চন্দন আর অসিতই বেশির ভাগটা নিয়ে চলে গিয়েছিল।

এইভাবে চন্দনের পরিকল্পনা মাফিক সব ঠিকই ছিল, কিন্তু বাদ সাধল ওই স্বপনের গাড়ি। ডাকাতির দিনই রাতে গাড়ির মালিকের বাড়ি পুলিশের হানা, তারপর স্বপনের বাড়ি। শেষমেষ মিতা বৈদ্যকে গ্রেফতার করে সুলতান সিং সাহেব নিয়ে যেতেই চন্দনরা সাবধান হয়ে যায়।

ওরা বোঝে স্বপনের খোঁজ পেয়ে গেছে হাওড়ার এস.পি. সাহেব অর্থাৎ রাজ্য পুলিশ। সুতরাং নিজেদের জন্য ওরা দমদম ক্যান্টনমেন্টকেই আর নিরাপদ মনে করতে পারল না। চন্দন মনে করল, স্বপন একটু দুর্বল চিত্তের, একবার ধরা পড়লেই সব গড়গড়িয়ে বলে দেবে, তাই একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। চন্দনের দৃঢ় ধারণা ছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনীর কেউ ওর পেছনে লাগবে না, সুতরাং কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলেই সময়ের ব্যবধানে রাজ্য পুলিশের দৌড়দৌড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। আর রাজ্য পুলিশের লোকজন ওকে বিশেষ চেনে না। সেজন্য ওরা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালাল দুর্গাপুর। চন্দনই প্রথম স্বপনকে নিয়ে রিকশা করে বেলঘরিয়া যায়, সেখান থেকে অসিত, সমর, মনাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে আসে, সেখান থেকে বাসে করে বালিতে এসে নামে, তারপর বালি স্টেশন থেকে কর্ড লাইনের ট্রেন ধরে বর্ধমানে এসে পৌঁছয়। বর্ধমানে নেমে ওরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া স্টেশনের বাইরের একটা ছোট পাইস হোটেলে সারে, তারপর আবার ট্রেন ধরে দুর্গাপুর স্টেশনে এসে নামে।

“কিন্তু মনা আর সমর কোথায় গেল?” অসিতের কাছে আমরা জানতে চাইলাম। অসিত জানাল, সমর আর মনা দুর্গাপুর থেকে চলে গেছে আসানসোল। ওখানে মনার মামা থাকে, সেখানে বেড়াতে গেছে। কোথায় এখন আছে, তা সে বলতে পারবে না। “আর স্বপন? সেও কি কোথাও বেড়াতে গেছে? না ফিরে এসেছে? তাড়াতাড়ি বল।” আমাদের প্রশ্নের মুখে অসিত চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যা বলল তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

অসিত আমাদের দিকে মুখ করে গলার স্বর নিচু করে বলল, “স্বপন নেই।” “তার মানে?” আমাদের প্রশ্ন। অসিত বলল, “হ্যাঁ, স্বপন মারা গেছে।”

আমরা চমকে উঠলাম, কিন্তু সময় অপচয় না করে আমি বললাম, “তোরাই তবে মেরেছিস স্বপনকে?” অসিত যেন অন্য কোনও গল্প না ফেঁদে বসে, তাই ঝট করে ওকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়ে ওর দিকে আমরা তাকিয়ে বসে রইলাম। ওর চোখমুখের ভাষার কোনরকম পরিবর্তন হলে আমরা যেন বুঝতে পারি।

অসিত খুব নিচু স্বরেই বলল, “হ্যাঁ, আমরাই ওকে মেরে ফেলেছি। আসলে ওকে যখন হাওড়ার পুলিশ খুঁজতে শুরু করেছে, তখন চন্দন আমাদের বলল, দেখ স্বপনকে পুলিশ খুঁজছে, ওকে যদি পুলিশ ধরতে পারে তাহলে স্বপন আমাদের কথা বলে দিলে আমাদের বিপদ হয়ে যাবে, কিন্তু ওকে যদি ধরতে না পারে তবে পুলিশ আর আমাদের হদিসও পাবে না। তাই ওকে যাতে ধরতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।”

অসিত তারপর বলল, “আমি তখন বললাম, তাহলে ওকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিলে

হয়, কিন্তু চন্দন তখন বলল, হ্যাঁ বাইরেই পাঠাতে হবে, একেবারে পৃথিবীর বাইরেই পাঠিয়ে দিতে হবে, ওকে আমাদের পেছনে লেজ হিসাবে বাঁচিয়ে রেখে অশান্তিতে দিন কাটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই ওকে একেবারে সরিয়ে দেওয়াই ভাল। তারপর চন্দন আমাদের বলল, আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে, বারোটা নাগাদ আমার ক্লাবের সামনে তোরা চলে আসিস, তখন বলব। এরপর চন্দন আমাদের ওখানে রেখে কোথায় চলে গেল। আমি, মনা ভাল খাওয়া দাওয়া করতে শ্যামবাজারে চলে গেলাম। মনা আবার পকেটে পয়সা থাকলেই নোংরা জায়গায় যাওয়ার জন্য ছটফট করত। সেদিনও যেতে চেয়েছিল। আমি যেতে দিইনি। শুধু ওখানে আমরা হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে ঠিক রাত বারোটায় চন্দনের জন্য কাঁঠালতলার ওর ক্লাব ঘরের সামনে এসে হাজির হলাম। একটু পরেই চন্দন এল, দেখলাম, ওর কাছে একটা চটের থলি। সেটা আমার হাতে দিলে আমি দেখি তাতে একটা কোদাল আর শাবল আছে। ক্লাবঘরের চাবিও সে রেখে দিয়েছিল। ক্লাবঘরটা দরমার, নিচে মাটি। দরজা খুলে চন্দন বলল, এখানে একটা গর্ত কর, স্বপনকে মেরে এখানেই ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যাব, মাটি চাপা দেওয়ার পর ভাল করে বস্তা আর মাদুর দিয়ে ওপরটায় বিছিয়ে দেব, কেউ টের পাবে না। নিচে স্বপন শুয়ে থাকবে, আমরা ওপরে বসে তাস খেলব।

চন্দন মিটিমিটি হাসতে থাকল। চন্দনের কথায় অল্প মোমবাতির আলোয় চন্দনের দেওয়া মাপ অনুযায়ী আমরা গর্ত করতে শুরু করলাম, চওড়ায় ফুট তিনেক হবে, লম্বায় প্রায় পাঁচফুট। গর্ত খুঁড়েই চলেছি। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে গর্ত খুঁড়ে সাত ফুট মত গভীর হল। গর্ত হওয়ার পর আমি চন্দনকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এখন স্বপনকে কোথায় পাবি? চন্দন আমায় বলল, তা নিয়ে তোদের চিন্তার কিছু নেই, আমি এক জায়গায় ওকে রেখে এসেছি, ডাক দিলেই আমার সাথে চলে আসবে। কিন্তু এখন একটা কথা ভাবছি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কি? সে বলল, কিছুদিনের মধ্যেই ক্লাবঘরটা পাকা করার কথা আছে, তখন যদি ওর লাশটা বেরিয়ে পড়ে, একটা ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে হবে। তোরা বরং গর্তটা বুজিয়ে দে, আমি অন্য ব্যবস্থা করছি। আমরা তখন আবার গর্তটা বুজিয়ে দিলাম।

রাত দুটো বেজে গেছে। আমরা আর কোথায় যাই। ওখানেই শুয়ে রইলাম। চন্দন কিন্তু কোদাল আর শাবলটা নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, আমি ভোরের দিকে আসব, তোরা এখানেই থাকবি। অন্ধকারের মধ্যে চন্দন বেরিয়ে গেল। একদম কাকভোরে চন্দন চাদর মুড়ি দিয়ে ক্লাব ঘরে এল, আমাদের ডেকে তুলে বলল, তোরা এখন বেরিয়ে পড়। বেলঘরিয়ার স্টেশনের কাছে থাকবি, আমি দশটার সময় যাব। আমরা ক্লাবঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। চন্দন ক্লাবঘরের মাটিতে কতগুলো চট আর মাদুর বিছিয়ে রাখল। যাতে ওখানে মাটি যে খোঁড়া হয়েছে, তা চট করে কেউ না বুঝতে পারে। তারপর ক্লাবঘরে তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে চলে গেল।

আমরা তিনজন হাঁটতে শুরু করলাম। কারণ তখনও ভোরের বাস চলা শুরু হয়নি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে বেলঘরিয়া পৌঁছে গেলাম। তখন সকাল সবে ছটা-সাড়ে ছটা বাজে। বেলঘরিয়ার একটা চায়ের দোকানে বসে আমরা চা বিস্কুট খেলাম, চন্দনের মাথায় কি আছে তখনও আমরা জানি না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেও তার ঠিকানা পাচ্ছি না। কি করব ভাবছি, কারণ দশটা বাজতে তখনও অনেক বাকি। সমরের এক বন্ধু থাকে বেলঘরিয়ায়, আমাদের নিয়ে সমর ওর বন্ধুর বাড়ি গেল। সেখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর সাড়ে নটা নাগাদ আমরা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে এলাম বেলঘরিয়া স্টেশনে।

সেখানে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম চন্দনের জন্য, সেই আমাদের নেতা, তার নির্দেশমত আমাদের চলতে হবে। দশটা বেজে অল্প কিছুক্ষণ পার হয়েছে, চন্দন বেশ সেজেগুজে স্বপনকে নিয়ে রিকশায় করে এসে আমাদের কাছে নামল। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমাদের হাসতে হাসতে বলল, চল দক্ষিণেশ্বরে, মায়ের পুজোটা অনেকদিন

দেওয়া হয়নি, পুজোটা দিয়ে আসি। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরে দক্ষিণেশ্বরে এসে নামলাম, ট্যাক্সির মধ্যে চন্দনকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল, স্বপন কিন্তু মুখ গোমড়া করে বসে ছিল, কারণ মিতাকে পুলিশ ওর জন্যই ধরে নিয়ে গেছে, মিতা তো আর কিছু করেনি, মিতার কাছে ওর পরিচয়টা খারাপ হয়ে গেল, তাই সে চুপচাপই ছিল।

দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে আমরা পুজো দিলাম, চন্দন সবার কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিল, লক্ষ্য করলাম, স্বপনের টিপটা বেশ বড় করে পরাল। আমরা মন্দির চত্বর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। চন্দন একটা বাসে উঠতে বলল, আমরা পাঁচজন তাড়াতাড়ি সেই বাসে উঠে বসলাম।

নামলাম বালি, ওখান থেকে বর্ধমান তারপর বিকেলে দুর্গাপুর। দুর্গাপুর স্টেশনের বাইরে এসে একটা দোকানের বেঞ্চে বসে আমরা চা আর কেক খেলাম। চন্দন স্বপনকে টাকা দিয়ে কিছু জিনিস কিনতে দিল। দুই কাছি নারকেল দড়ি, দুটো গামছা, দুটো ব্লেড, ছ ইঞ্চি চওড়া একটা লিউকোপ্লাস্টের প্যাকেট, দু বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড, একটা চটের থলি।

স্বপন টাকা নিয়ে চলে যেতে চন্দন তার পরিকল্পনাটা বলল। আমরা মনোযোগ দিয়ে তার সব নির্দেশ শুনে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন স্বপন সব জিনিসগুলি কিনে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে আরও দুবার আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর স্বপন সিগারেট টানতে টানতে চটের থলিতে ওই সব জিনিস নিয়ে হেলতে দুলতে এসে পৌঁছল। স্বপন চটের থলিটা চন্দনকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এসব দিয়ে কি হবে গুরু? এখানে কি কোনও অপারেশন করবে? চন্দন হেসে বলল, অপারেশন না করলে কি আর এগুলো কিনেছি? চন্দন চটের থলির মুখ খুলে দেখে নিল সব জিনিস ঠিকঠিক এনেছে কিনা।

স্বপন সবই নির্দেশমত এনেছে দেখে চন্দন ওকে বলল, সবই ঠিক এনেছিস দেখছি, এবার চল, সন্ধে হয়ে এসেছে, আর দেরি করা যাবে না। আমরা চন্দনের কথামত একটা অটো রিকশায় উঠলাম। চন্দন স্বপনের হাতে চটের থলিটা ধরিয়ে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে চলল, এ.ভি.ভি. মোড়ের কাছে আসতে চন্দন অটো রিকশা ছেড়ে দিল।

এ.ভি.ভি. মোড়ের এদিকটা নির্জন, চারদিকে জঙ্গল, ছোট বড় মাঝারি শাল আর কাঁটাগাছে ভর্তি, পাশ দিয়েই চলে গেছে জি. টি. রোড, মোড়ের উল্টো দিকেই বিশাল জঙ্গল, ঝোপঝাড়ে ভর্তি জায়গা, ভবানী পাঠকের জঙ্গল বলে তা পরিচিত।

চন্দন স্বপনের কাছ থেকে ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে নিল। স্বপনকে বলল, শোন স্বপন, তোকে পুলিশ খুঁজছে, তুই ধরা পড়লে আমরাও ধরা পড়ে যাব। তাই আমাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, তাতে তোরও কিছু হবে না, আমাদেরও কিছু হবে না।

স্বপন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চন্দনের কথা মন দিয়ে শুনছে। চন্দন বলল, আমরা এখানে তোকে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে চলে যাব, এখান দিয়ে অনেক গাড়ি যায়। তুই চিৎকার করে একটা না একটা গাড়ি থামাবি। তখন গাড়ির লোকজনকে বলবি দড়ি খুলে দিতে, আর যখন জিজ্ঞেস করবে কে তোকে ফেলে রেখে দিয়েছে, তুই তাদের বলবি— চিনিস না, বলবি, তোকে বেঁহুশ করে একটা প্রাইভেট গাড়িতে তুলে পকেটের সব টাকাপয়সা, ঘড়ি নিয়ে এখানে ফেলে রেখে চলে গেছে। তারাই তোর একটা ব্যবস্থা করবে, খুব ভয় পেয়েছিস এমন ভাব দেখাবি, যাতে তুই দুর্গাপুরেই থাকতে পারিস। তুই যদি ধরা পড়ে যাস, তখন আমাদের দলটাই ভেঙে যাবে। চট করে তুই মিতার সঙ্গেও দেখা করবি না, মিতাকে ওরা ছেড়ে দেবে ঠিকই। কাগজে পত্রে যা লেখালেখি হচ্ছে তাতে ওকে আটকাতে পারবে না। স্বপন মাথা নাড়ল, জানাল যে সে বুঝেছে।

চন্দন বলল, তার আগে চল, জঙ্গলের একটু ভেতরে গিয়ে একটু মস্তি করি। তোর সঙ্গে তো অনেকদিন দেখা হবে না।

আমরা সবাই আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লাম। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। জঙ্গলের ওপর চাপ চাপ কুয়াশা। শীত করছে।

চন্দন হুইস্কির বোতলটা বের করে স্বপনকে দিয়ে বলল, খোল। স্বপন বোতলটা খুলে চন্দনকে দিল। চন্দন বোতলটা ধরে গলায় একটু ঢালল। "র" হুইস্কি খেয়ে মুখটা একটু বিকৃত করে স্বপনকে এগিয়ে দিল। স্বপনও খেল। তারপর আমরাও একটু একটু করে খেলাম। বারবার স্বপনকে দিতে থাকলাম হুইস্কি। খেতে খেতে অন্ধকার হয়ে গেল।

পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বোতল ফাঁকা। স্বপনের পা টলছে, কথা জড়িয়ে গেছে। চন্দন তাকে বসতে বললে সে বসে পড়ল। চন্দন প্রথমেই লিউকোপ্লাস্ট প্যাকেট থেকে বের করে স্বপনের মুখ আটকে দিল যাতে স্বপন আর চিৎকার করতে না পারে। এরপর আমরা নারকেল দড়ি দিয়ে দ্রুত ওর হাত পা বেঁধে ফেললাম। তারপর টানতে টানতে জঙ্গলের আরও ভেতরে নিয়ে গেলাম। কেউ কোথাও নেই। একটা ঝোঁপের আড়ালে স্বপনকে নিয়ে গিয়ে বসান হল।

চন্দন ব্যাগ থেকে নতুন গামছা বার করে স্বপনের গলায় ফাঁস করে লাগিয়ে দিল। আমরা দুজন দুজন করে সেই গামছা দুদিক থেকে টানতে থাকলাম।

স্বপনের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল, মুখে লিউকোপ্লাস্ট, কোনও আওয়াজ বেরচ্ছে না। গামছা ধরেই হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ওকে জঙ্গলের আরও ভিতরে নিয়ে গেলাম।

ওখানে চন্দন নতুন ব্লেড বের করে স্বপনের কণ্ঠনালী কেটে দিল। গামছার ফাঁসে মরেছে না মরেনি, কোনরকম দ্বিধায় সে থাকতে চায় না। তাই ব্লেড দিয়ে গলায় পোঁচ দিয়ে দিয়ে কণ্ঠনালীটা কেটে দিল। রক্তে ভাসতে থাকল স্বপনের মুখ। তারপর অ্যাসিডের বোতল দুটো ব্যাগ থেকে বার করে স্বপনের মুখের ওপর ঢালতে লাগল। স্বপনের মুখ বিকৃত হয়ে গেল, কেউ আর স্বপনকে চিনতে পারবে না।

তারপর ব্যাগের মধ্যে জিনিসগুলো ভর্তি করে জঙ্গলের অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আমরা একে একে অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাদের এই অপারেশন কেউ দেখল না। চন্দন তারপর সেই বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল, যেখান থেকে আমরা গ্রেফতার হলাম।

পরদিন মনা আর সমর আসানসোল চলে গেল। আমরাও আর দু চারদিন পর দুর্গাপুর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতাম, ওখানে আর ভাল লাগছিল না।"

অসিতকে লক আগে পাঠিয়ে দিয়ে এবার চন্দনকে নিয়ে এলাম। চন্দনকে অসিতের স্বীকারোক্তির কথা বলতেই চন্দন চমকে উঠল। চুপ করে অসিতের সব কথা শুনে বলল, "সবই যখন জানেন, আমি আর নতুন কি বলব।"

আমরা বললাম, "বলবি, তোদের কাছে যে রিভলবার, পিস্তলগুলো আছে, কোনখানে রেখেছিস তা বলবি।" চন্দন আমাদের দমদম ক্যান্টনমেন্টের একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা পুকুরের ধারে নিয়ে গেল। পুকুর পাড়ে একটা গাছ দেখিয়ে বলল, "ওই গাছের শিকড়ে একটা দড়ি আছে দেখবেন, সেটা আস্তে আস্তে টান দিলেই একটা পলিথিনের ব্যাগ উঠে আসবে। যা কিছু আছে, ওটার মধ্যেই আছে।"

চন্দনের কথা মত আমাদের একজন সিপাই গাছের কাছে গিয়ে দেখল, সত্যিই একটা দড়ি শিকড়ে বাঁধা আছে। সে তখন দড়ি ধরে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। আমরা তাকিয়ে আছি, হ্যাঁ, একটা মোটা পলিথিনের ব্যাগ উঠে এল। সিপাই ব্যাগটা আমাদের কাছে নিয়ে এল, দেখলাম, ব্যাগের ভেতর পলিথিন সিট দিয়ে মোড়া রয়েছে রিভলবার ও পিস্তল। ওইগুলো নিয়ে আমরা ফিরে এলাম লালবাজার।

এবার আমরা দুর্গাপুর যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করলাম। স্বপনকে যেখানে চন্দনরা খুন করেছে, সেই জায়গাটা সরেজমিনে তদন্ত করতে যেতে হবে, আমরা রাজ্য পুলিশের সি.আই.ডি.কে খবর দিলাম। তারপর সি.আই.ডি. ও আমরা যৌথভাবে চন্দন আর অসিতকে নিয়ে রওনা দিলাম পরদিনই ভোরবেলায়।

স্বপনকে যেদিন খুন করা হয়েছিল, তারপর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। দুপুরবেলা

চন্দন আর অসিত সি.আই.ডি. ও আমাদের অফিসারদের নিয়ে গেল খুনের জায়গায়। সেখানে তখন পড়ে ছিল ছোটবড় মিলিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশটা হাড়ের টুকরো, অর্থাৎ রাতে জঙ্গলের কোন কোন প্রাণী আর দিনে শকুনে মিলে স্বপনের মাংস মনের সুখে খেয়ে অল্প কিছু হাড় ফেলে রেখে গেছে।

এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড চন্দনরা খুবই নিপুণভাবে করেছিল। জন্তু জানোয়ারের পেটে লোপাটও হয়ে গিয়েছিল স্বপনের দেহ। সারাজীবন ধরে মিতা হয়ত ভেবেই যেত স্বপন কোন না কোনদিন ঠিক তার কাছে ফিরে এসে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে।

না, কয়েকটা হাড়ের অংশবিশেষ ছাড়া তার দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই এই পৃথিবীর বুকে।

হাড়ের টুকরোগুলো সি.আই.ডি. অফিসাররা যত্ন করে তুলে নিল ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে পাঠানর জন্য। আমরাও চন্দন ও অসিতকে তাঁদের হাতে তুলে দিলাম খুন ও ডাকাতির আসামী হিসাবে।

ডোমজুড় ডাকাতির মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন দুলাল সোম। মামলা ভালই করেছিলেন। চন্দনদের সাজাও হয়েছিল। কিন্তু আদালতের সাজাতেই কি আর স্বপন ফিরে আসবে? ফেরে না, ফিরবেও না।

মানুষের লোভ, নিজের সুখের জন্য যে কোন নিকৃষ্টতম কাজ করার প্রবৃত্তি যতক্ষণ না মুছে যাবে, এইসব অপরাধীরা যতদিন সমাজের বুকে থাকবে, সমাজকে দূষিত করবে। ধরা পড়ে গেলে, অল্প সাজা খেটে বেরিয়ে এসে আবার তারা এই সমাজকে দূষিত করার প্রক্রিয়া চালু করবে।

আর বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অপরাধী হয়ে ওঠে, অপরাধ করে। আসলে কেউ অপরাধী হয়ে জন্মায় না। কিন্তু সমাজের অপরাধ জগতে থাকতে থাকতে, মিশতে মিশতে এবং সেই পরিবেশে বড় হতে হতে এক একজন তৈরি হয়ে যায় পেশাদার অপরাধী। এদের পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ এদের মানসিক গড়নই এমন হয়ে যায় যে তারা অন্ধকার দিকটা ছাড়া জগতের অন্য দিকটা দেখতে পায় না। তাছাড়া অল্প পরিশ্রমে, অল্প আয়াসে টাকা রোজগারের এরা পথ পেয়ে যায়, তখন বেশি পরিশ্রম করে সাধারণ মানুষের মত জীবনধারণ করাটা এরা চিন্তার বাইরেই রেখে দেয়।

আবার কেউ হঠাৎ আবেগতাড়িত হয়ে একটা অপরাধ করে বসে। তাৎক্ষণিক বুদ্ধিভ্রংশে হয়ে যায় খুন, জখম বা অন্য কোনও অপরাধ। এইসব অপরাধী কিন্তু অপরাধ করার পরেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের ভুল বুঝতে পারে। তখন নিজেরাই নিজেদের পরিবর্তন করে নেয়।

এছাড়া রাজনৈতিক আবেগের জন্যও বহু অপরাধ অহরহ ঘটছে, যা রাজনৈতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একটা বিশ্বাসের তাড়নায় কোন সিদ্ধান্তে এসে এই সব অপরাধগুলো সংঘটিত হয়।

অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক অপরাধ তো প্রচুর হয়। কখনও তা ফসল নিয়ে ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে, কখনও বা শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্বের জন্য।

আর ভদ্রবেশী অর্থনৈতিক অপরাধ এখন আমাদের দেশে জল হয়ে গেছে। তা কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি ব্যক্তিকে করছে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে, ব্যাঙ্ককে প্রতারণার মাধ্যমে করছে, কিংবা চিট ফান্ড জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হচ্ছে।

তাছাড়া মানসিক বিকারগ্রস্ত ও নেশাগ্রস্ত মানুষেরাও অসুস্থ অবস্থায় বা নেশার তাড়নায় অপরাধ করে বসে। এইসব অপরাধীকে সময়মত পদক্ষেপ নিয়ে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কোনও কঠিন কাজ নয়।

আবার আমাদের ভুলের জন্যও অনেক "হঠাৎ করে বসা কোনও অপরাধের আসামীকে" পেশাদার অপরাধী বানিয়ে ফেলি।

পুলিশের কাছে অপরাধীর তালিকা সম্বলিত জাবদা খাতা আছে। তাতে সব রকম অপরাধীর নাম-ঠিকানা লেখা আছে।

যখন কোনও বিশেষ অভিযান, যেমন পুজোর আগে বা বাংলা বন্ধ কিংবা ওই জাতীয় প্রয়োজনে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অপরাধী ধরার অভিযান শুরু করা হয়, তখন পুলিশ ওই জাবদা খাতাটা ব্যবহার করে লাইন দিয়ে আসামী ধরে নিয়ে আসে।

অপরাধীদের গ্রুপ বা কোনরকম বিভাগ না করেই পাইকারি ধরা হয়। সেই অভিযানের জালে যেমন পেশাদার অপরাধীরা ধরা পড়ে, তেমনই ধরা পড়ে হঠাৎ কোনও অন্যায় করে ফেলা বা আবেগতাড়িত হয়ে অপরাধ সংঘটিত করা কোনও পুরনো আসামী, যে কিনা স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে।

বারবার তারা পুলিশের অন্ধ অভিযানের জালে ধরা পড়ে এবং জেলে গিয়ে পেশাদারদের সঙ্গে মিশে, একসময় তারাও পেশাদার হয়ে যায়।

কারণ বারবার অকারণে ধরা পড়ার জন্য তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ধরেই নেয় যে, পুলিশ তাকে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দেবে না। আর ফিরতে যদি নাই দিতে চায়, তবে আর অযথা চেষ্টা করে লাভ কি? তার চেয়ে শুরু করা যাক পেশাদারদের জীবন। আর জেলে বারবার যাওয়ার ফলে পেশাদার অপরাধীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় ভালই হয়ে যায়। সুতরাং সে পথে যেতে তখন তাদের কোন অসুবিধাই হয় না।

এই অন্ধের মত অপরাধীদের চরিত্র বিশ্লেষণ ছাড়াই বারবার একটা সাজান মামলায় যা মামলা সম্পর্কিত অর্থাৎ কেস কানেকশানের নামে পেশাদারি অপরাধী ছাড়া অন্য অপরাধী ধরে এনে তাকে জেলে পাঠিয়ে পুরোপুরি সমাজবিরোধী বানিয়ে ফেলার ভুল পদ্ধতির জন্য অনেককে আমরা অন্ধকার জগতে ঠেলে দিয়েছি বা এখনও দিচ্ছি।

আমাদের এই অন্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে অজান্তে হাকিম সাহেবদেরও মদত থাকে। কারণ হাকিম সাহেবরা এইসব কেস কানেকশানের অপরাধীদের যখন পুলিশের হেফাজতে বা জেলের ভেতর পাঠানর নির্দেশ দেন, তখন কোনরকম বিচার বিশ্লেষণই করেন না। তিনি একটাই লাইন লিখে দেন, তা হল, "সন্দেহ হচ্ছে এই অপরাধের সাথে সে জড়িত।" সুতরাং যাও পুলিশ হাজতে বা জেলের অন্দরমহলে।

এইসব কার্যকলাপে অপরাধী বাড়ে, কমে না। আসলে পুলিশ বাহিনী নিজে যদি নিজের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয় এবং অপরাধী ধরবার সমস্ত জাল যদি তার করায়ত্ব থাকে তখন তারা এই চোখ কান বোঁজা কর্মগুলো করে না, যখন তারা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে তখনই এই ভুলভ্রান্তিগুলো করে বসে। একটা ফুটবল দল যখন খেলায় বিরোধী পক্ষকে হারাতে না পেরে মারপিট করে খেলায় জিততে চায়, এটাও ঠিক তেমনি। দুর্বল মানসিকতাই দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে অন্যকে আঘাত করার প্ররোচনা দেয়।

আগে কলকাতা পুলিশের একটা ঐতিহ্য ছিল যে অপরাধীদের নতুন করে সামাজিক জীবন শুরু করার সুযোগ দেওয়া, তাকে সাহায্য করা যাতে সে আর অপরাধ না করে।

আমরা এমন বহু হঠাৎ অপরাধ করে ফেলা বা জেলফেরত আসামীকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছি। একবার তো আমি এক ডাকাতকে ভারতবর্ষের এক নামকরা শিল্পপতির বাড়িতে দারোয়ানের কাজ দিয়েছি, সে সেখানে দারুণভাবে সফল, এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে সুস্থ জীবনে ফিরে এসেছে সে।

আসলে বক্তৃতা দিয়ে নয়, প্রকৃতপক্ষে দরদ দিয়ে সমস্যা বুঝতে হবে, তার সমাধান করতে হবে। প্রতিনিয়ত সেইসব "মূলস্রোতে ফিরতে চাওয়া" প্রাক্তন আসামীদের খোঁজখবর রাখতে হবে। তার জন্য সময় দিতে হবে। নিজের বদনামের ভয়ে পিছিয়ে না গিয়ে, আবার যাতে না সে অপরাধী হয়ে যায় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কলকাতা পুলিশের আগের এই ঐতিহ্য ক্রমশ বিলুপ্তির পথে, তার জন্য অনেক কিছুকেই দায়ী করা যায়। কিন্তু সেই সব দোষের হিসাব-নিকাশ না করে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে, নেতৃত্বে যাঁরা থাকেন তাঁরা যদি সচেতন পদক্ষেপ ঠিক সময়ে নিতে পারেন, পত্রপত্রিকার বিবৃতিতে মনোযোগ না দিয়ে গঠনমূলক কাজে তৎপর হন, তবে আবার কলকাতা পুলিশ তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে।

গোষ্ঠ পালেরা খালি পারে যা ফুটবল খেলতেন তা কি আজকের আধুনিক সরঞ্জাম সজ্জিত ও ট্রেনিং পাওয়া খেলোয়াড়রা পারছেন? কিংবা সত্যজিৎ রায় যেমন ইউরোপের বাতিল করা ক্যামেরা দিয়ে ছবি করে আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে এসেছেন, তেমন কি এখন আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে অন্যেরা পারছেন? না, পারছেন না।

সব কিছুর পেছনেই চাই মানসিকতা। নিজের কাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা। চটজলদি নামের পেছনে ছুটে স্পনসরশিপের দৌলতে হয়ত ক্ষণস্থায়ী অর্থ ও নাম করা যায়, কিন্তু আখেরে তা সমাজের কোনও উপকারেই লাগে না।

কলকাতা পুলিশের এই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা কারও একার দ্বারা সম্ভব নয়। সামগ্রিক চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়েই তা আনতে হবে। সমাজে লোভ বাড়ছে, লোভী বাড়ছে, তার সাথে সাথে অপরাধও বাড়ছে, অপরাধী বাড়ছে।

আশির দশকের প্রথম দিকে একদিন সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ খবর এল, একটু আগেই ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের চৌরঙ্গি শাখায় ডাকাতি হয়ে গেছে।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড ও জওহরলাল নেহরু রোডের সংযোগস্থলের কাছেই

ব্যাঙ্কের শাখাটা।

অফিসের সময়, প্রচণ্ড ব্যস্ত রাস্তার ওপর ব্যাঙ্ক। দুর্ধর্ষ ডাকাতির খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা ছুটলাম। ব্যাঙ্কের লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম, মাত্র চারজন যুবক, বছর তিরিশের আশেপাশে তাদের বয়স, ডাকাতি করেছে। ডাকাতরা লাখ পাঁচেক টাকা নিয়ে চলে গেছে।

ডাকাতদের হাতে রিভলবার, পিস্তল ছিল। ব্যাঙ্কের বাইরে গাড়ি ছিল, সেই গাড়িতেই ডাকাতরা পালিয়েছে। কেউ সেই গাড়ির নম্বর বলতে পারল না।

বললেও কিছু হত কি না জানি না। কারণ ডাকাতরা সঠিক নম্বর লাগিয়ে তো আর সাধারণভাবে ডাকাতি করতে আসে না। এই ব্যাপারে অনন্ত সিংহের দলের লোকেরা দারুণ পারদর্শী ছিল। যদিও ডোমজুড়ের ব্যাঙ্কে ডাকাতরা গাড়ির সঠিক নম্বর না পাল্টেই ডাকাতি করেছিল এবং সেই সূত্র ধরেই তারা ধরা পড়েছিল।

কিন্তু সেটা একেবারে একটা ব্যতিক্রম। নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়, তাই গাড়ির নম্বর নেওয়াটা ও সেটা মিলিয়ে দেখাটা আমাদের একটা রুটিন কাজের মধ্যে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীকে জেরা করা, ডাকাতি করে কোনদিকে পালিয়েছে বা গাড়ির রঙ কি ছিল জানা, সবই রুটিন কাজের মধ্যে পড়ে, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এক হয় না। একেক জন একেক রকম বলে। তবু একটা সিদ্ধান্তে আসতে এইসব বিবরণ সাহায্য করে বৈকি।

ডাকাতিটার ধরন দেখে আমাদের চেনা পুরনো কোনও ডাকাতির মত মনে হল না। সাধারণভাবে ডাকাতরা সেইসব ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার জন্য বাছে যা একটু নির্জন জায়গায় অবস্থিত এবং যেখানে যানবাহনের জটিলতা কম। কারণ ডাকাতি করে পালানর পথটা যাতে মসৃণ হয়, সেদিকে তারা খেয়াল রাখে।

একবার ট্রাফিক জ্যামে আটকে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারে, সেজন্যই তারা একটু নিরাপদ রাস্তা খোঁজে। তার ওপর ডাকাতরা সংখ্যায় ছিল মাত্র চারজন। সুতরাং তারা যে অপরিকল্পিত ঝুঁকি নিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। তাছাড়া ব্যাঙ্কটা নির্জন জায়গায় নয় এবং রাস্তাও ফাঁকা নয়, তবু ডাকাতরা এই ব্যাঙ্কটা কি করে ডাকাতির জন্য পছন্দ করে নিল সেটাও আশ্চর্যের বিষয়। তাতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, ডাকাতরা ওই দুটো ব্যাপার মাথায় রাখেনি। অর্থাৎ ডাকাতরা খুব পোক্ত দল নয়, এটা হাতে খড়ি।

তবে এরকমই যে হবে তেমন কোনও কথা নয়। এটা স্রেফ অনুমান। কিংবা ডাকাতরা এই ব্যাঙ্কে খুব যাতায়াত করত, খুব চেনা, তাই এই ব্যাঙ্কটা ডাকাতির পক্ষে তাদের উপযুক্ত জায়গা ভেবেছে, এমনও হতে পারে। ডাকাতরা ভল্টের দিকে যায়নি, শুধুমাত্র ক্যাশ কাউন্টারগুলোর থেকে যা পাওয়া গিয়েছে তা নিয়ে গেছে।

ব্যাঙ্কে তদন্ত সেরে আমরা লালবাজারে এসে আমাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রগুলোকে চারদিকে সজাগ করে দিলাম। তারা তাদের কাজ শুরু করে দিল। সে সময় ডাকাতদের মধ্যে একটা অলিখিত নিয়ম ছিল, কলকাতার বাইরে, বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনায় ডাকাতি করলে ডাকাতরা কলকাতায় তাদের পরিচিত বন্ধুদের কাছে চলে আসত, আবার কলকাতায় ডাকাতি করলে তারা উত্তর কিংবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তাদের বন্ধুদের আস্তানায় চলে যেত।

এমনও হয়েছে, হয়ত উত্তর চব্বিশ পরগনায় একটা ডাকাতি করে কলকাতায় গোপন আস্তানায় দিন কাটাচ্ছে, তার মধ্যেই হঠাৎ কলকাতায় একটা ডাকাতি করে অন্য জায়গায় পালিয়ে গেল। যেদিন ডাকাতি হত, সেদিন থেকে রেড লাইট এলাকাগুলো ও বার রেস্তোঁরায় নজর বাড়িয়ে দিতাম, কারণ সাধারণ ডাকাতরা টাকা ওড়াতে এইসব জায়গায় আসত।

ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরদিন অনেক রাতে খবর পেলাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর রেড লাইট এলাকায় দুটো অপরিচিত ছেলে অনেক টাকা নিয়ে এসে একটা বাড়িতে ফুর্তি করছে। আমি

আমাদের চারজন সহকর্মীকে নিয়ে ছুটলাম। আমাদের একজন সহকর্মী 'ছিল, সে একসময় বটতলা থানায় ছিল, এবং তার ওই সব বাড়িগুলো একদম নখদর্পণে। তাকেও গাড়িতে তুলে নিলাম।

যে বাড়ির কথা শুনে এসেছি সেই বাড়ি ও এলাকার অন্য বাড়িগুলোকে সে ভালভাবেই চেনে।

বাড়িটার একটাই দরজা, সেই দরজা বন্ধ করে দিলে অন্য কোনও রাস্তা নেই পালিয়ে যাওয়ার। রাতের রাস্তা ফাঁকা, মেট্রো রেলের খোঁড়াখুঁড়িতে রাস্তার যা হাল, তাতে ওই এলাকায় দিনের বেলা দ্রুত পৌঁছন যায় না। বড় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করলাম। বড় রাস্তা ফাঁকা থাকলেও ওই অঞ্চলের গলিগুলো কিন্তু রাতের বেলা চঞ্চল থাকে, ব্যস্ত থাকে।

বটতলা থানার ভ্যান কয়েকবার ওইসব অঞ্চলে হানা দেয়। অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য দৈনন্দিন রুটিন টহলদারির ব্যবস্থা আছে। আমি বড় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বসে আছি, আমার সহকর্মীরা গাড়ি থেকে নেমে ওই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর ফিরে এসে আমার এক সহকর্মী বলল, “স্যার, ওদের পাইনি, তবে অন্য একজনকে পেয়েছি।”

আমি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কাকে পেয়েছ?” অন্য এক সহকর্মী হাসতে হাসতে পেছন দিক থেকে একটা মানুষকে আমার সামনে নিয়ে এসে হাজির করাল। লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো দেখেই চিনতে পেরেছি।

বললাম, “তুমি? তুমি এখানে কি করছ?”

লোকটা বলল, “একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে এখানে এসেছিলাম।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তা প্রায়ই আস নাকি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে?”

সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম, অভিজ্ঞতার ঘাটতি পড়লেই বাবু ছুটে এখানে চলে আসেন। আমি আর কি বলব? বললাম, “তা যাও, আজকের অভিজ্ঞতার কথাটা ফলাও করে কালকের কাগজে লিখে দাও, আমরা এখন চলি।”

গাড়িতে আমাদের সহকর্মীরা উঠে বসেছে। গাড়ি ছাড়ার আগে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, “তা তুমি এখন কোথায় যাবে?”

লোকটা বলল, “আমি ঠিক চলে যাব।”

বললাম, “নেশা তো ভালই করেছ, এত রাতে এদিক ওদিক না ঘুরে, বেঘোরে প্রাণটা না দিয়ে এখানেই আরও অভিজ্ঞতা নাও, কাল সকালে বরং বাড়ি যেও।”

লোকটা বলল, “সেই ভাল।”

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। লোকটা দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা আমাদের সবারই খুব পরিচিত। কলকাতার এক নামজাদা পত্রিকার সাংবাদিক। লালবাজারে খবরের খোঁজে প্রায়ই আসে, সেই সূত্রে আমাদের সাথে আলাপ। সাংবাদিকতায় তার বেশ নামও আছে। তবে কিছু কিছু সাংবাদিক আছে না, যারা নিজেদের সবজান্তা মনে করে! এ সেই শ্রেণীর। সব জানতেই বোধহয় তার এখানে আগমন। আর তার ফলে আজ আমাদের কাছে তার মাথা নিচু হয়ে গেল।

গাড়িতে ফিরতে ফিরতে আমার এক সিনেমা প্রযোজক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তুমি হঠাৎ এই লাইনে ব্যবসা করতে গেলে কেন? ওই লাইনের তো ভীষণ বদনাম, সবাই নাকি নেশাগ্রস্ত, তারপর অন্য দোষও সবার আছে।”

প্রযোজক বন্ধুটি হেসে বলেছিল, “ভুল, একেবারে ভুল ধারণা, আচ্ছা এই যে শ’য়ে শ’য়ে ব্রথল আছে, সেখানে হাজার হাজার যৌনকর্মী আছে, তাদের চলে কি করে? সেখানে কি শুধু সিনেমার লোকজন যায়? খোঁজ নিয়ে দেখুন, যত লোক ওখানে যায় তার শতকরা একভাগ লোকও ফিল্ম লাইনের লোক নয়, বরং অন্য পেশার লোক, আপনাদের পেশার

লোকও আছে। আর মদ খাওয়ার কথা বলছেন? মদ কোম্পানিগুলো যে গ্যালন গ্যালন মদ তৈরি করছে, তা কি শুধু আমাদের লাইনের লোকেরাই খাচ্ছে, অন্যেরা খাচ্ছে না? খাচ্ছে, অনেক বেশি খাচ্ছে, কিন্তু বদনামটা আমাদের, কারণ ফিল্ম লাইনের লোকেরা, বিশেষ করে শিল্পীরা পাবলিক পার্সন, সাধারণ লোকজন তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় কৌতূহলী, তাঁদের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে দারুণভাবে উৎসাহী ও আগ্রহী, তাই এই লাইনের কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা এমনভাবে রটে যে সেটা তিল থেকে তাল নয় একেবারে মহাতাল হয়ে যায়।"

আজ আমি সেই প্রযোজক বন্ধুটির কথাটা কতটা খাঁটি, তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারলাম।

যদিও জানি এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কারণ, তখন আমাদের অনেক সাংবাদিক বন্ধু ছিল, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক ছিল, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমাদের দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক ছিল। তাঁরা যেমন আমাদের কাছ থেকে খবর নিতে আসতেন আমরাও তাঁদের মাধ্যমে অনেক খবর পেয়ে যেতাম। তবে আমাদের থেকে তাঁরা কখনও আগাম কোনও খবর পেতেন না।

কোন ঘটনার তদন্ত করতে আমরা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছি তাঁরা জানতে উৎসুক থাকতেন স্বাভাবিকভাবেই, কিন্তু আমাদের কারও কাছ থেকেই আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপের বিন্দুমাত্র আন্দাজও তাঁরা পেতেন না।

পেলে তো তাঁরা পত্রিকায় নিজেদের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য আগাম প্রকাশ করে দেবেন এবং আসামীরা সতর্ক হয়ে যাবে, আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু এই পদ্ধতি পরবর্তীকালে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সাংবাদিকরা আগাম খবর পেয়ে যেতে এবং তা কাগজে প্রকাশ হয়ে যেতে তদন্তের ব্যাঘাত ঘটতে দেখলাম। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। এটা আসলে নিজেদের মধ্যে কর্মের যোগাযোগের অসারতাই প্রমাণ করে।

সেদিন রাতে ফিরে যে যার বাড়িতে চলে গেলাম। পরদিন সোর্সদের নির্দেশ দিলাম আরও সক্রিয় হতে। আমরাও বসে নেই, নানান দিকে চিন্তাভাবনা করে খোঁজখবর নিচ্ছি।

কে হতে পারে, কারা হতে পারে। পুরনো ডাকাতদল যারা জেলের বাইরে আছে, তাদের ভেতরে খবর নিচ্ছি, না, তেমন কাউকে পাচ্ছি না।

ডাকাতির দিন পাঁচেক পর সোর্সের মাধ্যমে খবর পেলাম বিরাটির মাইকেল নগরের পুরনো ডাকাত তিল দেবু হঠাৎ খুব টাকাপয়সা খরচা করছে। একটা বেকার নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হঠাৎ দুহাতে টাকাপয়সা খরচা করছে, তা বন্ধুমহলে এবং এলাকায় একটু গুঞ্জন তো হবেই। এবং সদ্য একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেছে, তাতে তার চালচলন তো আমাদের পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়বেই। খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা ব্যবস্থা নিলাম।

বিরাটিতে তার বাড়ি সেদিন রাতেই ঘিরে ফেললাম। তিল দেবুকেও পেয়ে গেলাম। সাথে ষাট হাজার টাকা।

লালবাজারে নিয়ে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেবু স্বীকার করল ডাকাতির কথা। তার সঙ্গী কে কে ছিল তাও জানতে পারলাম। তিল দেবু যে ধরা পড়েছে সেই খবর যাতে বেশি প্রকাশ না হয়ে পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম, যাতে তার সঙ্গীরা সজাগ হয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাদের নেতার খবর পেয়ে। ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার, ফার্স্ট ক্লাস এম.টেক। সে বেলঘরিয়ার একটা স্কুলে চাকরি করে। তার দাদা ডাক্তার, কলকাতার নামকরা ক্যান্সার স্পেশালিস্ট। ছেলেটার স্ত্রী সুন্দরী, বিদূষী, জ্যাঠামশাই একসময় বেলঘরিয়ার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। বেলঘরিয়ায় তাঁদের পরিবারকে সবাই এক ডাকে চেনে।

সেই ছেলে হঠাৎ ডাকাতি করতে গেল কেন? ছেলেটি অঞ্চলে সি.পি.আই. (এম)-র মাঝারি ধরনের নেতা ছিল। তাছাড়া ওই পার্টির বিরাট বিরাট তাবড় সব নেতাদের স্নেহধন্য।

তিল দেবুকে যেদিন গ্রেফতার করলাম, তার পরদিনই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সেই নেতার সব খবর আমরা পেয়ে গেলাম।

যে স্কুলে সে চাকরি করত, ডাকাতির দিন থেকে সেখানেও অনুপস্থিত। কোর্টে তিল দেবুকে হাজির করিয়ে, ওর সঙ্গীদের নামেও পরোয়ানা বের করে নিলাম। কারণ বেলঘরিয়ার সেই ডাকাতির নেতা সূর্য মুখার্জির বাড়িতে আমরা হানা দেব। গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া যদি ঢুকতে না পারি, তাই সেই পরোয়ানা নিয়ে চললাম সূর্য মুখার্জির বাড়ি।

বেলঘরিয়ায় সবাই তাদের চেনে, সুতরাং বাড়ি খুঁজতে আমাদের কোনও অসুবিধাই হল না। বিশাল বাড়ি ঘিরে ফেললাম। সূর্য নেই। স্ত্রী ও তার ছোট্ট মেয়ে কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। সূর্য রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরছিল ট্যাক্সিতে। বাড়ি পৌঁছনর একটু আগে রাস্তায় অঞ্চলের দুই মাস্তানের কাছ থেকে জানতে পারল বাড়িতে লালবাজার থেকে পুলিশ এসেছিল। সে স্ত্রী আর মেয়েকে বাড়িতে পাঠিয়ে নিজে পালাল। সূর্যের ঘর খুঁজলাম, না কোনও আলো পেলাম না। আমরা অন্যদের বেশি বিরক্ত না করে ওই বাড়ি থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম।

সূর্য সম্পর্কে খোঁজ করতে শুরু করলাম। খোঁজ করতে করতে জানতে পারলাম, সূর্যের প্রচণ্ড রেসের নেশা হয়ে গিয়েছিল। ঋণের বোঝার ফলে সে একদম অক্টোপাসের জালে ফেঁসে গিয়েছিল। সেই ঋণ থেকে মুক্তি পেতেই ডাকাতির দল গড়ে ডাকাতি করেছে।

ওর বাড়িতে আমরা ওর কোন ফটো পাইনি, সেগুলো বোধহয় সে সরিয়ে ফেলেছিল। আমরা খুঁজতে খুঁজতে ওর এক আত্মীয়কে ধরলাম, তার ময়দান মার্কেটে দোকান ছিল, তার কাছ থেকে আমরা সূর্যের একটা ফটো যোগাড় করলাম। কিন্তু ফটো পেলেই তো হবে না, আমরা চাই আসল লোকটাকে। সোর্সদের সক্রিয় করা হল আরও।

একদিন রাত দশটা নাগাদ দমদম বিমানবন্দরের কাছ থেকে আমার এক সোর্সের ফোন এল। ফোনে জানাল, বিমানবন্দরের কাছে এক বাড়িতে সে সূর্যকে দেখেছে। আমায় বলল তক্ষুণি চলে যেতে। আমি জেনে নিলাম সে কোথায় আছে। তাকে সেখানে থাকতে বলে আমি ফোন নামিয়ে রাখলাম।

সেদিন ছিল বাংলা বন্ধ। দফতর ফাঁকা। ঠিক করলাম আমি একাই যাব। সোর্সের কাছ থেকে সূর্যের আস্তানাটা দেখে নিয়ে দমদম থানায় গিয়ে ওদের থেকে ফোর্স নিয়ে সূর্যকে গ্রেফতার করতে যাব।

সেই অনুযায়ী একটা জিপ নিয়ে ছুটলাম বিমানবন্দরের দিকে। সঙ্গে আছে শুধু আমাদের এক ড্রাইভার।

বন্ধের রাত। ফাঁকা। হু হু করে আলো-আঁধারির রাস্তা দিয়ে ছুটল আমাদের জিপ। বেলেঘাটা ফুলবাগান মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরে কিছুটা যেতেই দেখি এক যুবক রাস্তায় দুহাত তুলে ডানদিক বাঁদিক করে পাগলের মত হাত নাড়িয়ে আমাদের থামতে বলছে।

তা দেখে ড্রাইভার বলল, “স্যার।”

বললাম, “দাঁড়াও।”

ড্রাইভার জিপটা যুবকটির সামনে দাঁড় করাতেই সে লাফ দিয়ে আমার কাছে এসে বলল, “স্যার, আমায় বাঁচান।”

প্রশ্ন করলাম, “কেন, কি হয়েছে?”

বলল, “আমার স্ত্রীর বাচ্চা হবে, ব্যথা উঠেছে, প্রচণ্ড কাতরাচ্ছে। এখানে কোনও গাড়ি পাচ্ছি না। যাদের আছে, তারা কেউ আজকে যেতে চাইছে না। অ্যাম্বুলেন্সও পাচ্ছি না।”

জানতে চাইলাম, “আপনার বাড়িটা কোথায়?”

সে পাশের একটা গলি দেখিয়ে বলল, “এই গলির ভিতর, বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যায়।”

প্রশ্ন করলাম, "আপনার স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?"

যুবকটি বলল, "রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সদনে।"

হসপিটালের নাম শুনেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "উরেব্বাস সে তো অনেক দূর, হাজরায়। আমার তো ভাই এত সময় নেই।"

সে আমার কথা শুনে প্রায় কেঁদেই ফেলল। বলল, "তাহলে কি হবে?"

আমি ভাল করে তার মুখের দিকে তাকালাম। বুঝতে চাইলাম ছেলেটা সত্যি বলছে না মিথ্যা। মনে হল, মিথ্যা বলছে না। ওদিকে সূর্য। সোর্স দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে দুটো প্রাণ। কোনদিকে যাব?

আমি জিপ থেকে নেমে পড়লাম। ড্রাইভারকে বললাম, "যাও ওর স্ত্রীকে নিয়ে এস।" যুবকটিকে বললাম, "জিপের সামনের সিটে বসুন, ওখানেই স্ত্রীকে বসিয়ে নিয়ে আসবেন।"

ড্রাইভার যুবকটিকে নিয়ে জিপ ঢুকিয়ে দিল প্রায়ান্ধকার গলির ভেতর। আমি গলির মুখের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেলেঘাটা বিপজ্জনক জায়গা। তাই আমি গলির মধ্যে গেলাম না।

অন্ধকারে একটা পাঁচিল ঘেঁষে এমনভাবে দাঁড়ালাম যাতে ওরা গলির থেকে বের হয়ে আমাকে দেখতে না পায়, কিন্তু আমি সব দেখতে পাব।

কোথায় কোন ফাঁদ পাতা থাকবে, কে আগের থেকে বলতে পারবে? রিভলবার একটা আছে সঙ্গে, কিন্তু তা কি আর যথেষ্ট?

মিনিট দশেকের মধ্যে জিপের আওয়াজ শুনতে পেলাম, অর্থাৎ ফিরে আসছে। হেড লাইটের আলো লাফ দিয়ে বড় রাস্তার ওপর পড়ল। জিপও বড় রাস্তায় পড়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ড্রাইভার আর যুবকটি চারদিকে তাকিয়ে আমায় খুঁজছে। ততক্ষণে আমি যা দেখার দেখে নিয়েছি। যুবকের স্ত্রী জিপের সামনের সিটে যুবকের গায়ে আধশোয়া হয়ে তাকে জাপটে ধরে আছে। যুবকটিও তার স্ত্রীকে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। অল্পবয়সী ভদ্রমহিলার শরীরই জানান দিচ্ছে, তার স্বামী আমাকে মিথ্যা বলেনি।

আমি মুহূর্তে সব দেখে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে চট করে জিপের পেছনে উঠে ড্রাইভারকে বললাম, "গাড়ি ঘোরাও।"

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল। ভদ্রমহিলা ছটফট করছেন। যুবকটি আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সেদিকে কান না দিয়ে আমি ডাইনে-বাঁয়ে করে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে থাকলাম। বেলেঘাটার কাছেই আমার এক পরিচিত ডাক্তারের নার্সিং হোম আছে। আমি সেই নার্সিং হোমের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে যুবকটি বলে উঠল, "দাদা, এখানে?"

আমি জিপ থেকে নেমে তাকে বললাম, "হ্যাঁ এখানে।" তারপর সোজা নার্সিংহোমের সদর দরজায় গিয়ে কলিং বেল বাজালাম। কোনও সাড়া নেই। চার পাঁচবার বাজানর পর ভেতর থেকে একটা ছেলের গলা শুনতে পেলাম, "কে?"

বললাম, "খুলুন, একটা পেসেন্ট এনেছি।"

ভেতর থেকে উত্তর এল, "ডাক্তারবাবু নেই।"

আমি ডাক্তারের নাম করে বললাম, "ওকে গিয়ে বলুন লালবাজার থেকে একজন এসেছে।" ওদিকের আওয়াজ থেমে গেল।

মিনিট পাঁচেক পর দরজা খুলল ডাক্তার নিজেই। বললাম, তুমি না কি নেই?"

ডাক্তার হেসে বলল, "বন্ধের দিন, কোথায় কোন উৎপাত নিয়ে এসে হাজির হবে, তাই আমার লোককে বলে দিয়েছি, কেউ এলে বলবি আমি নেই। তা তুমি কি জন্য?"

বললাম, "একটা পেসেন্ট নিয়ে এসেছি, ভীষণ জরুরি, ডেলিভারি কেস।" ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "আমি তো গাইনি নই।" ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই

বললাম, “কি তোমার গাইনি? আগে তো আমরা দেশের বাড়িতে দাই-মার হাতে হয়েছি, এখন যতসব শুনি গাইনি-ফাইনি। তুমি তো ডাক্তার, আর নার্সও আছে তোমার এখানে। তাতেই হবে।”

ডাক্তার বলল, “তোমার সবটাতেই জোর, সিজার কেসও হতে পারে, পেসেন্টের কিছু হলে তখন তুমি আবার আমাকেই ধরবে।”

বললাম, “এত বুঝি না, যা হয় একটা ব্যবস্থা কর, আমার তাড়া আছে।”

ডাক্তার কি ভাবল, বলল, “ঠিক আছে নিয়ে এস তোমার পেসেন্টকে।”

আমি রাস্তায় দাঁড়ান জিপের কাছে গেলাম। ডাক্তার একটা ছেলের হাতে স্ট্রেচার পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি আর যুবকটি মিলে তার স্ত্রীকে স্ট্রেচারে বসিয়ে নার্সিংহোমের ভেতর নিয়ে গেলাম।

ডাক্তার নার্সদের কি বলতে তারা পেসেন্টকে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলে গেল।

ডাক্তার একটা ফোন করছিল। কথা শেষ করে আমাকে বলল, তোমার গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যাবে? পুলিশের জিপ, রাস্তায় কেউ কিছু বলবে না।”

জিজ্ঞেস করলাম, “কেন, কোথায় যাবে?

সে বলল, “একজন গাইনি ডাক্তারকে নিয়ে আসব, কাছেই থাকে। আমি ফোনে কথা বলে নিয়েছি।”

বললাম, “কে যাবে সঙ্গে?”

ডাক্তার তার এক কর্মচারীকে দেখিয়ে বলল, “এই ছেলেটা যাবে, তোমাকে যেতে হবে না।”

আমি ছেলেটাকে নিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে এলাম। ড্রাইভার তাকে নিয়ে ডাক্তার আনতে চলে গেল। আমার বন্ধু ডাক্তারও ভেতরে চলে গেল।

যুবকটি এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, ডাক্তার চলে যেতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, “দাদা, এখানে খরচ কেমন হবে?”

সূর্য তখন আমার মাথায়। ছেলেটার প্রশ্ন শুনে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, “আগে স্ত্রীকে বাঁচান, তারপর খরচের কথা চিন্তা করবেন।”

ছেলেটা আমার মুখ দেখে চুপ করে গেল। মিনিট পাঁচ-সাত পর ডাক্তার আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, “পেসেন্ট তোমার কে হন?”

প্রশ্ন শুনে বুকের ভেতর ধক করে উঠল, জানতে চাইলাম, “কেন?”

ডাক্তার বলল, “না, নাম, ঠিকানা সব লিখতে হবে তো।”

ওর কথা শুনে বুকের ভারটা নেমে গেল, বললাম, “আমার পরিচিত।” তারপর যুবকটিকে দেখিয়ে বললাম, “এর স্ত্রী।”

ডাক্তার তাকে বলল, “চলুন, সব লিখিয়ে খাতায় সই করে যান।”

ওরা দুজন নার্সিংহোমের অফিস ঘরের দিকে চলে যেতে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পর যুবকটিও আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ওর চোখ মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, দুশ্চিন্তায় কাহিল।

বললাম, “ভয় নেই। সব মা-বাবার জীবনেই এই সময়টা আসে।”

আমার কথা শুনে সে কেঁদে ফেলে বলল, “কিন্তু আজকের দিনটাতে আপনি না হলে হত না, আপনি তখন না এলে, আমায় না বাঁচালে কি যে হত?”

বললাম, “চুপ করুন ভাই, সাহস রাখুন।”

গাড়ির আওয়াজ পেতেই তাকিয়ে দেখলাম, একটা জিপ আসছে। ভাবলাম, আমাদেরটা

তো?

হ্যাঁ। জিপ এসে নার্সিং হোমের সামনে দাঁড়াল। ডাক্তার নেমে সোজা ঢুকে গেল ভেতরে।

আমার কাজ শেষ, এবার আমি সূর্যকে ধরতে যাব। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে বলে যাই।

ভেতরে ঢুকে একজন নার্সকে বললাম ডাক্তারকে একটু ডেকে দিতে।, নার্স ফিরে এসে জানাল, "আপনাকে আর মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে বলেছে।"

কি করি? এতক্ষণ যখন গেছে তখন আর নয় পাঁচ মিনিট যাক।

ডাক্তার সত্যিই মিনিট পাঁচেক পর আমার কাছে এল। একটা প্রেসক্রিপশান ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই ওষুধগুলো কিনে নিয়ে এস। শোন, এদিকে কোনও দোকান এত রাতে খোলা পাবে না। একটা দোকান আছে, যার মালিক দোকানের ওপরের ফ্ল্যাটে থাকে। তাকে তুলে ওষুধগুলো আনতে পার। কিন্তু আমার নাম, করবে না।" ডাক্তার দোকানের নামটা জানাল।

যুবকটি বলল, "আমি যাব সাথে?"

বললাম, "না, আপনি থাকুন।"

যুবক তাড়াতাড়ি ওর পার্স বের করে টাকা দিতে চাইল। বললাম, "থাক, একসঙ্গে বিল হলে নেওয়া যাবে।"

রাত তখন প্রায় বারোটা বাজে। আমি ছুটে এসে জিপে উঠে ড্রাইভারকে বললাম, "চল।" ড্রাইভার গাড়ি ছোটাল। আমরা সেই দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। জিপ থেকে নেমে সেই ফ্ল্যাট বাড়ির দারোয়ানকে খুঁজে বের করে তার কাছে জেনে নিলাম দোকানদার ভদ্রলোক কোন ফ্ল্যাটে থাকেন। পুলিশের জিপ দেখে দারোয়ান গেট খুলে দিলে আমি সেই ফ্ল্যাটের দরজায় বেল টিপলাম।

দরজা খুললেন এক ভদ্রলোক। বছর চল্লিশেক বয়স হবে। তাকে প্রশ্ন করলাম, "নিচের মেডিকেল শপটা কি আপনার?"

আমার প্রশ্ন শুনেই দরজাটা বন্ধ করতে করতে বলল, "এখন দোকান খোলা যাবে না।"

ততক্ষণে আমি দরজার ফাঁক দিয়ে আমার বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছি, যাতে দরজাটা বন্ধ না করতে পারে।

ওপাশ থেকে ভদ্রলোক বললেন, "এ কি মাস্তানি নাকি? জবরদস্তি? রাত বারোটায় দোকান খুলব !"

হাত আমার ঢোকানই। বললাম, "দরজাটা খুলুন, বলছি।"

লোকটা কোনমতে একটু ফাঁক করতে আমি বাধ্য হয়েই আমার ব্রহ্মাস্ত্রটা ছুঁড়লাম। আমি আমার বদ নামটা বললাম। দেখলাম, বদ নামটা শুনে একটু কাজ হয়েছে। তখন বললাম, "একটা ডেলিভারি কেস, দুটো জীবনের ব্যাপার, দয়া করে ওষুধগুলো দিয়ে দিন।"

লোকটা আর কোন কথা না বাড়িয়ে ভেতরে চলে গেল। তারপর হাতে একগোছা চাবি নিয়ে এসে বলল, "চলুন।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে বলল, "আসলে, জানেন তো কি সময় পড়েছে, যে সে এসে জ্বালাতন করে। তাই, একবার দোকান বন্ধ করলে আর খুলি না।"

দোকানের পেছন দিক দিয়ে দরজা আছে। আমাকে সেখান দিয়ে নিয়ে গিয়ে, দোকানে ঢুকে, প্রেসক্রিপশনটা নিল। একটা একটা করে ওষুধ বের করে এক জায়গায় রেখে বলল, "একটা ওষুধ নেই।"

কি আর করি, তাকে টাকা পয়সা দিয়ে আমি জিপে এসে উঠে চললাম নার্সিংহোম।

ডাক্তারকে ওষুধগুলো দিয়ে বললাম, "একটা ওষুধ পাওয়া যায়নি, পরে এসে দেখছি।"

আমার একটু তাড়া আছে, ঘুরে আসছি। নার্সিংহোম থেকে ছুটে বের হতে হতে যুবকটিকে বললাম, "আপনি থাকুন, আমি ঘুরে আসছি।"

জিপ এবার দ্রুত ছুটল বিমানবন্দরের দিকে। যেতে যেতে ভাবছি, "সত্যিই এই বন্ধের দিনে রোগীদের কি দুর্দশা হয়, ভুক্তভোগীরা ছাড়া ক'জন বোঝে? বন্ধ যাঁরা ডাকেন, তাঁরা বলবেন, অ্যাম্বুলেন্সকে তো বন্ধের আওতার বাইরে রাখা হয়। আরে, তাঁরা কি জানেন না, সারা পশ্চিমবাংলায় কটা অ্যাম্বুলেন্স আছে। তাতে কটা রোগীর সেবা করা যায়?"

বিমানবন্দরের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাতে, অন্ধকার থেকে আমার সোর্স বের হয়ে এল।

সে এসে আমায় বলল, "এত দেরি করলেন স্যার।"

বললাম, "আগে চল বাড়িটা দেখে আসি, তারপর তোর কথা শুনব।" সে বলল, "কোথায় যাবেন? সূর্য তো ঘণ্টাখানেক আগে সেই বাড়ি থেকে সাইকেলে চড়ে বিরাটির দিকে চলে গেছে। কোথায় গেছে কিছুই বলতে পারব না।"

আমি হতাশ হয়ে বললাম, "ঠিক আছে, তুই আর কি করবি। খোঁজ রাখ।"

আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নার্সিংহোমে এসে শুনলাম, ভদ্রমহিলা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

ডাক্তারকে ডেকে বললাম, "যুবকটির কাছ থেকে কোন টাকাপয়সা নিও না, আমি পরে এ ব্যাপারে জানাব।"

গাইনি ডাক্তারকে তার বাড়িতে দিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবলাম, ডাকাত, সূর্যকে আজ না ধরতে পারলেও আসল একটা সূর্যকে পৃথিবীতে আনতে শ্রমটা আমার ব্যর্থ হয়নি।

অন্য আর এক জন সেই ডাকাতিতে ছিল। হাওড়ার বালির রাজচন্দ্রপুরের তপন গাইন। তিল দেবুর কাছ থেকে সব খবর নেওয়া হল, তারপর সোর্সের মাধ্যমে তপনের সব খবর আস্তে আস্তে আসতে থাকল। ওই রাজচন্দ্রপুরে সব গাইন পরিবারের বাস। ওখান থেকে যদি ওকে গ্রেফতার করতে যাই তবে সব গাইন পরিবারেরা আমাদের কাজে বাধা তো দেবেই এমনকি দাঙ্গাও লেগে যেতে পারে। গাইন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড একতা।

তার ওপর ওখানে ওরা বংশানুক্রমে বাস করার ফলে ওদের কাছে নানা ধরনের অস্ত্র মজুদ থাকার সম্ভাবনা। সুতরাং গ্রামের ভেতর গিয়ে তপনের বাড়ি থেকে তপনকে গ্রেফতার করার ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

সোর্সকে আরও সক্রিয় হতে বললাম। গ্রাম থেকে বেরিয়ে কোথায় কখন যায়, কখন কোথায় গ্রামের এলাকার বাইরে আড্ডা মারে, এইসব খবর যোগাড় করতে বললাম। আমাদের একজন খুবই দক্ষ কনস্টেবল অসিত বেরা তপনকে চিনে এল। সে স্বাস্থ্যবান ঝকঝকে যুবক, দেখলেই বোঝা যায় শরীরে ভাল শক্তি ধরে।

তপনকে দেখার দিন দুই পর খবর পেলাম, সে গ্রাম থেকে প্রতিদিনই সকাল নটা সাড়ে নটা নাগাদ একটা বুলেট মোটর সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে এসে দিল্লি রোডের ওপর একটা চায়ের দোকানে চা খেতে আসে। ওখানে কিছুক্ষণ আড্ডা মেরে মোটর সাইকেল নিয়ে হাওড়া শহরের দিকে চলে যায়। অবশ্য কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় নয়, আজ এখানে, কাল ওখানে, নিজের মর্জিমত বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা করতে বা আড্ডা মারতে যায় সে।

আমরা ঠিক করলাম, দিল্লি রোডের ওই চায়ের দোকান থেকেই ওকে ধরব। কিন্তু সেখানেও খুবই সতর্কতার মধ্য দিয়ে এগতে হবে, কারণ চায়ের দোকান থেকে তাদের গ্রাম রাজচন্দ্রপুরের দূরত্ব বেশি নয়। একবার যদি খবর সেখানে পৌঁছে যায় তাহলে গ্রামের মানুষ হৈ হৈ করে এসে আমাদেরই আক্রমণ করতে পারে। নিরীহ গ্রামবাসীকে আক্রমণের সময় বোঝানও যাবে না যে তপন একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির আসামী, ওকে এমনি এমনি গ্রেফতার করতে আসিনি। যদি উন্মত্ত গ্রামবাসীরা আমাদের আক্রমণ করে বসে, আমরা তো আর চট

করে প্রতিআক্রমণ করে সাধারণ গ্রামবাসীকে আঘাত করতে পারি না, তাই বিশেষ সতর্ক হয়ে তপনকে গ্রেফতার করতে যেতে হবে।

দিনক্ষণ ঠিক হল তপনকে ধরতে যাওয়ার। আমরা দুটো গাড়ি নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক ভোরবেলা ছুটলাম দিল্লি রোডের দিকে।

সেই চায়ের দোকানে যেতে হবে, রাজচন্দ্রপুর ছাড়িয়ে আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে গেলাম। আমরা আগেই দেখে রেখেছিলাম, ভোরবেলা ডানলপে কয়লা খালাস করে অনেক লরি।

সেদিন আমরা একটা লরিকে কয়লা খালাস করার পরই ধরলাম। ড্রাইভার তো কিছুতেই রাজি নয় আমাদের সঙ্গে যেতে। তখন প্রায় জোর করে ওকে রাজি করালাম।

লরির ড্রাইভার আর খালাসিকেও সঙ্গে রাখলাম, যাতে ওরা গিয়ে কোনও জায়গায় প্রচার না করতে পারে, কোনও বিশেষ অভিযানের জন্য লালবাজারের লোকেরা তাদের লরি নিয়ে গেছে। আমাদের সাথে আটজন প্রচণ্ড বলিষ্ঠ চেহারার সিপাই ছিল। তারা কয়লার লরির খালাসির মত কালিঝুলি মেখে নিল। তেমন জামা, গামছা পরে নিল। তার মধ্যে মাত্র দুজন বাঙালি, বাকি ছ'জন বিহারী ও উত্তরপ্রদেশীয়। ওরা মাথায় বেঁধে নিল কালিমাখা গামছা, ওদের মেকআপটা এমন হল যে কেউ বুঝতেই পারবে না ওরা খালাসি নয়, লালবাজার গোয়েন্দা দফতরের অত্যন্ত দক্ষ কনস্টেবল। যাদের অনুপস্থিতিতে লালবাজারের গোয়েন্দা দফতর রক্তবাহী শিরাবিহীন একটা স্থবির, অথর্ব প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাবে। ওরা তৃণমূলের কর্মী, সমস্ত কাজকর্মের বিদ্যুৎবাহী তার। একটা জীবন্ত গাছের শিকড়, পাতা, শাখা-প্রশাখা, যার দ্বারা গাছ আলো, বাতাস, জল আহরণ করে বেঁচে থাকে।

কয়লার লরি ছুটল সেই চায়ের দোকানে, যেখানে তপন প্রতিদিন চা খেতে আসে। লরি নিয়ে ওরা পৌঁছে গেল সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে। লরিটা ওরা ঘুরিয়ে এনে দাঁড় করাল কলকাতার দিকে মুখ করে।

অফিসারদের দুটো প্রাইভেট গাড়ি দোকান ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল, গাড়ি দুটোকে এমনভাবে ধুলো দিয়ে ময়লা করা হল যেন মনে হয় আরোহীরা বহু দূর থেকে আসছে। গাড়ির ভেতর আমরা সবাই তেমন ভাবেই আড্ডা মারতে লাগলাম। বনেট তুলে রাখা হয়েছে, মনে হবে যেন ইঞ্জিনকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। আমরা কেউ গাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কেউ গাড়িতে বসে লক্ষ্য রাখতে লাগলাম দোকান ও রাজচন্দ্রপুরের দিকে।

খালাসিবেশী সিপাইরা চায়ের দোকানের সামনে লরি লাগিয়ে, দোকানদারকে চা বানানর নির্দেশ দিয়ে কেউ দোকানের ভেতর, কেউ দোকানের বাইরে রাস্তায় বসল। সঙ্গে ড্রাইভার আর লরির আসল খালাসিকে রাখল, যাতে ওরা কাউকে না বলতে পারে সঙ্গীরা সব পুলিশ, কোনও বিশেষ উদ্দেশে ওদের লরি নিয়ে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে।

সেইসব গল্প রটতে রটতে যদি একবার আসামীর কাছে পৌঁছে যায়, সে কিছুতেই ফাঁদে এসে পা দেবে না, সাত যোজন দূর থেকে পালিয়ে যাবে। তখন ব্যর্থ হয়ে যাবে আমাদের এত পরিশ্রম, অভিযান। আর একবার যদি অপরাধী বুঝে যায় সে চিহ্নিত হয়ে গেছে, তখন সে পুরনো যোগাযোগ ছিন্ন করে আত্মগোপন করার চেষ্টায় এমন জায়গায় যাবে যে সুলুক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

ইতিমধ্যেই আমরা সূর্যের বাড়িতে হানা দিয়ে ও দমদমে বাংলা বধের রাতে তাকে না পেয়ে ব্যর্থ তো হয়েইছি, উল্টে সে সতর্ক হয়ে যাওয়াতে এমন জায়গায় চলে গেছে যে তার কোনও সন্ধানও আমরা পাচ্ছি না। সে শিক্ষিত ছেলে, উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্ম, বিভিন্ন মহলে তার যোগাযোগ আছে। সে আমাদের প্রদেশে আছে, না অন্য প্রদেশে চলে গেছে, তাও বুঝতে পারছি না।

অন্য প্রদেশে চলে গেলে, খোঁজ পাওয়া আরও মুশকিল হয়ে যায়, যদি না সে তার যোগসূত্র কোনও না কোনওভাবে ফেলে যায়।

তবে মানুষ বড় মায়ায় বাঁধা, এমনকি পেশাদার অপরাধীরাও বিভিন্ন মায়ার বাঁধনে পড়ে যায়, তাই পুরনো সুতো সবই সে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। আমরা সেই সুতোর সন্ধান করে, সুতো ধরে এগিয়ে যাই, সুতোর ভিত্তিতে চেকিং ও ক্রসচেকিং করে করে এগতে হয়।

তাই আমাদের সিপাইরা সব সাবধান, যাতে ড্রাইভার আর খালাসির মুখ থেকে বাইরে কোনও কথা না বেরিয়ে যায়।

অফিসাররা দিল্লি রোডের ওপর সকালের মিষ্টি রোদ মেখে এমনভাবে ঠাট্টা ইয়ারকি মারছে যেন কোনও তাড়াহুড়ো নেই। সিগারেটে টান দিচ্ছে, জোরে জোরে হাসছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখে যেন মনে হয়, বহু দূরের ভ্রমণে সময় পায়নি নিজেকে পরিষ্কার করার। ওদিকে পাশ দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে লরি, বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট গাড়ি।

হঠাৎ শোনা গেল দূর থেকে একটা বুলেট মোটর সাইকেলের ভট ভট আওয়াজ উদ্ধত ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসছে। সকাল নটা বেজে দশ। আমাদের সোর্সের নিরীক্ষণ তাহলে সম্পূর্ণ সঠিক। হ্যাঁ, মোটর সাইকেল গর্জন করতে করতে এগিয়ে এল। স্বাস্থ্যবান, মাথা উঁচু একটা ছেলে, পায়ে ঝকঝকে জুতো, নতুন গেঞ্জি পরা, বেপরোয়া ভাবে চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক সেই ভঙ্গিতে বুলেটটা দাঁড় করিয়ে, গাড়ির চাবির গোছা ঘোরাতে ঘোরাতে চায়ের দোকানীকে “চা দে” বলে একটা হুঙ্কার ছেড়ে দোকানের সামনে রাখা একটা বেঞ্চিতে দুদিকে পা রেখে বসে পড়ল।

অসিত তপনকে আগে চিনে এসেছিল, সে ওই ছেলেটাকে দেখে ইশারায় জানান দিল, আগন্তুক ছেলেটাই আমাদের লক্ষ্যবস্তু। অন্যদিকে অফিসাররা গাড়ির বনেট নামিয়ে দিয়ে খেয়াল রাখছে দোকানের দিকে।

ছেলেটা বুঝতেই পারছে না কুলি আর খালাসির দলটা লালবাজারের সিপাই। সবাই ততক্ষণে জায়গা নিয়ে নিয়েছে। তিনজন খালাসিবেশী সিপাই তপনের কাছে গিয়ে ঝট করে তাকে তুলে ধরল। তপন চিৎকার করতে লাগল “বাঁচাও, বাঁচাও” করে। ততক্ষণে তাকে লরিতে তুলে ফেলা হয়েছে। সিপাইরা লরিতে উঠে গেছে। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতেই সে গাড়ি ছোটাল। তপন ছটফট করছে, আর চিৎকার করে চলেছে।

প্রাইভেট গাড়ি দুটো লরি ছেড়ে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল।

তপনের “বাঁচাও বাঁচাও” চিৎকাবে ওখানকার মানুষ ভেবেছে, তপনকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে চলেছে। চায়ের দোকানদার, দোকানের কর্মচারী, আশেপাশের লোকজন ছুটতে শুরু করেছে দিল্লি রোড ধরে। রাজচন্দ্রপুরে গাইনদের গ্রামেও খবর চলে গেছে, “একদল লোক তপনকে চায়ের দোকান থেকে তুলে নিয়ে চলে গেছে।”

রাজচন্দ্রপুর থেকে হৈ হৈ করে “গাইন গোষ্ঠীর” লোকজন দিল্লি রোডে চলে এসে দুটো লরি ধরে তাতে উঠে পড়েছে। সেই লরি দুটোর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিচ্ছে “জলদি চালাও, সামনের একটা লরিকে আমাদের ধরতে হবে।” এসবই ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

রাজকুমার মোটর বাইকে চড়ে আসতে আসতে চিৎকার শুনে পেছন ফিরে দেখতে পেল, অসম্ভব গতিতে দুটো লরিতে চিৎকার করতে করতে প্রচুর লোকজন আমাদের লরিটা ধরতে আসছে। সে বাইকের গতি বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের লরিটার কাছে গিয়ে বলল, পেছনে দুটো লরিতে লোকেরা আমাদের ধরতে আসছে। সুতরাং আরও জোরে চালাও। সেও বাইকের গতি বাড়িয়ে দিল, আমাদের লরির ড্রাইভারও প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করল। লরির ওপরে তপনকে ততক্ষণে হাতে পায়ে হ্যান্ড কাফ পরিয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তার আর নড়ার ক্ষমতা নেই।

রাজকুমার আমাদের জানিয়ে গিয়েছিল পেছনে রাজচন্দ্রপুরের লোকেরা দুটো লরিতে করে আসছে। তখন আমরা প্রাইভেট গাড়ি দুটো এমনভাবে চালাতে লাগলাম যে ওরা যেন টপকে আমাদের লরির কাছে যেতে না পারে। খুব আস্তে আস্তে আমাদের গাড়ি চলতে লাগল। ওরা প্রচণ্ড জোরে হর্ন বাজাতে লাগল। ওই লরির থেকে লোকেরা আমাদের চালক

দুজনকে গালাগালি দিতে লাগল, কিন্তু ওরা কান না দিয়ে আমাদের নির্দেশ মত গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল। তার ফলে আমাদের লরির সাথে ওই লরির দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে গেল, ওরা পিছিয়ে পড়ল।

এমন সময় রাজ্য পুলিশের ট্র্যাফিক পুলিশ ভ্যানও ঘটনাস্থলে এসে পড়ল।

তারা ট্র্যাফিক পুলিশ নামাতে নামাতে আসছিল। সামনে তপনকে নিয়ে আমাদের লরি ছুটছে। মাঝে আমাদের প্রাইভেট গাড়ি দুটো পেছনের গাড়িকে পথ আটকে চলছে। তারও পেছনে পুলিশের ভ্যান।

লরি দুটো যতই হর্ন দিক না কেন, আমাদের গাড়ি না ছুটছে দ্রুত, না দিচ্ছে জায়গা, যাতে রাজচন্দ্রপুরের লোকেরা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

এদিকে পুলিশের ভ্যান লরি দুটোকে টপকে চলে এসে আমাদের গাড়ির পেছনে হর্ন দিয়ে জায়গা চাইছে। আমরা ওদের জায়গা দিলাম। ভ্যানটা দ্রুত গতিতে এসে আমাদের গাড়ি দুটোর সামনে দাঁড়াল। ওদিকে তখন তপনকে নিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে আমাদের লরি। তাকে ধরা যাবে না। বালি আর উত্তরপাড়ার মাঝামাঝি জায়গায় ভ্যান থেকে নেমেই একজন সিপাই আমাদের গালাগালি দিয়ে বলল, “আপনারাও কি ডাকাত দলের লোক? কতগুলো ডাকাত গ্রাম থেকে একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে। গ্রামের লোক তাদের ধাওয়া করেছে, আর আপনারা জায়গা দিচ্ছেন না। যেন ন্যাকামি করে রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, এমনভাবে চলছেন !” আমরা ততক্ষণে রাস্তায় নেমে আমাদের পরিচয়পত্র ওদের দেখিয়ে বললাম,

“আমরা লালবাজারের লোক, আমরা ডাকাত নই। একটা ডাকাতকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস না হয় আমাদের সঙ্গে লালবাজারে চলুন।”

রাজ্য পুলিশের সিপাইরা আমাদের ছেড়ে দিয়ে রাজচন্দ্রপুরের লোকেদের কি বলল। তারা চুপ করে গেল। আমরা ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। এবার স্বাভাবিক গতিতে। ওদিকে আমাদের লরি তপনকে নিয়ে লালবাজারে পৌঁছে গেল নিরাপদে।

তিল দেবু আর তপনকে তো গ্রেফতার করলাম। কিন্তু দলের নায়ক সূর্য আমাদেরই ভুল সিদ্ধান্তে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে কোথায় গেছে তার কোনও হদিস পাচ্ছি না। তারপর থেকে আর কোনও খবর নেই। খবর নেই ওদের দলের অন্য সদস্য রিষড়ার পুরনো ডাকাত গোপাল সাউয়ের। সে ওই ডাকাত দলের চতুর্থ সদস্য ছিল। এদিকে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। মামলা মোটেই এগচ্ছে না।

প্রায় মাস তিনেক পর আমি আমার বিশ্বস্ত সোর্স নারায়ণ সরকারের মাধ্যমে একটা খবর পেলাম। শিয়ালদা থেকে ডায়মন্ড হারবার রেল লাইনের ওপর গোচারণ নামে একটা জায়গা আছে। গোচারণ থেকে বাঁদিকে গেলে একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। সেই গ্রামে সূর্য হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করছে।

এর আগে আমরা দেবু ও তপনের কাছ থেকে জেনে ছিলাম যে সূর্য ওদের শরীর খারাপ হলে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিত। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করছে শুনে বুঝলাম, নারায়ণের খবরটা সত্যি।

খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা গোচারণে আমাদের নিজস্ব নজরদার পাঠালাম। নজরদার খবর দিল, হ্যাঁ, ওখানে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার আছে যার সঙ্গে সূর্যের চেহারার মিল আছে, কিন্তু অন্য নাম। আমরা বুঝলাম, সূর্য ওখানে নাম ভাঁড়িয়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসাবে রয়েছে। একদিন সকালবেলা গোচারণে আমাদের দল দুটো গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেল। গাড়ি বহু দূরে রেখে আমাদের তিনজন অফিসার আর আটজন সিপাই কিছুটা গ্রাম্য বেশে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে রেখে হেঁটে চলল গোচারণের সেই গ্রামের দিকে। যেখানে সূর্য হোমিওপ্যাথ হিসাবে ছদ্মবেশ নিয়ে ডাক্তারি করে যাচ্ছে।

কাঁচা রাস্তা। আমাদের দল গ্রামের রাস্তায় ঢুকে পড়ল। সূর্য গ্রামের একটা ছোট

দোকানঘরের মত ঘর ভাড়া নিয়েছে। আমাদের প্রথম দুজন সূর্যর চেম্বারে ঢুকে গেল রোগী হিসাবে। সূর্য তখন গ্রামের একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখছিল। সেই ছেলেটা চলে যেতে আমাদের দুজন সোজাসুজি সূর্যর হাত ধরে ওকে চেয়ার থেকে টেনে তুলল।

সূর্য কিছু বোঝার আগেই তাকে ঘিরে ধরল আমাদের সাত আটজন লোক, হাতে রিভলবার। সূর্য কাঁপতে লাগল।

আমাদের লোকেদের সাথে বেরিয়ে এল তার হোমিওপ্যাথ চেম্বারের বাইরে। সে একবার বাড়ি যেতে চেয়েছিল। কিন্তু অফিসাররা তাকে কোন সুযোগই দিল না। ওকে হাঁটিয়ে গ্রাম থেকে বড় রাস্তার দিকে যখন নিয়ে আসছে, গ্রামের লোকেরা উঁকি মেরে মেরে দেখতে লাগল। তাদের গ্রামের ডাক্তারকে হাতকড়া দিয়ে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে !

তারপর গাড়ি করে একেবারে লালবাজার। লালবাজারে এসে সূর্য হতভম্ব যেন কিছুই জানে না। প্রশ্নের উত্তরে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটাই জবাব দিচ্ছে, "আমি জানি না স্যার এসব কিছু, কি যে বলছেন, আমি গ্রামের গরিব হোমিওপ্যাথ, আমাকে কেন ধরে এনেছেন?" ওর উত্তরে আমরা ধন্দে পড়ে গেলাম।

তবু ওকে নানারকমভাবে আমরা প্রচণ্ড ভয় দেখালাম, তখনও কিন্তু ও একই কথা বলছে। একজন ওকে আমাদের বিভাগের তিনতলার বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বলল, "সত্যি কথা বল, নয়ত এখান থেকে ফেলে দেব।"

কিন্তু সে অনড়। সেদিন রাতে ওকে সেন্ট্রাল লক আপ থেকে নিয়ে এলাম। মুখোমুখি ওকে দাঁড় করালাম। চারপাশে আমাদের বলিষ্ঠ চেহারার সিপাইরা দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি সত্যি করে বল, তুমি সূর্য মুখার্জি নয়? বেলঘরিয়ায় তোমার বাড়ি নয়?"

সে বলল, "বিশ্বাস করুন, আমার নাম সূর্য মুখার্জি নয়। বেলঘরিয়ায় বাড়ি কি, আমি কোনদিনও বেলঘরিয়াতেই যাইনি। যে নামে আমি ডাক্তারি করছি, সেটাই আমার একমাত্র নাম, অন্য কোনও নাম আমার নেই, তবে — "

প্রশ্ন করলাম, "তবে কি?" সে বলল, "তবে কমাস আগে আমাদের গ্রামে আর একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এসেছে, তার নাম আর আমার নাম এক। সে গ্রামেই একটা বাড়িতে থাকে, বিয়ে থা করেনি।"

এতক্ষণে বুঝলাম আমরা ভুল লোককে ধরে এনেছি। কি আশ্চর্য, লোকটার চেহারার সাথে সূর্যের চেহারার অদ্ভুত মিল, তার ওপর দুজন একই নামে হোমিওপ্যাথি করছে। অর্থাৎ সূর্য ইচ্ছে করেই এই ডাক্তারের নামটা নিজে ব্যবহার করে সবাইকে ধোঁকা দিতে চেয়েছে।

আমাদের বাহিনী ভুল সূর্যের কাছ থেকে খবর পেয়ে ফের ছুটল গোচারণ। গ্রামের ভেতর খবর নিয়ে জানতে পারল, ভুল সূর্যের কথাই ঠিক। একই নামে আরও একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ওই গ্রামে ছিল। কিন্তু যেদিন আমরা ওই ডাক্তারকে ধরে এনেছি, সেদিনই সে গ্রাম থেকে কোথায় চলে গেছে, কেউ বলতে পারল না।

গ্রামে যে বাড়িতে সে থাকত, সেখানেও কেউ কিছু জানে না। সে যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরবে না, কি করে তারা আন্দাজ করবে? গ্রামের সরল মানুষ তারা, এতসব মারপ্যাঁচ জানে না।

কোনও খবর না পেয়ে আমাদের বাহিনী ফিরে এল। এই নিয়ে তিনবার সূর্য আমাদের হাত থেকে ফস্কে বেরিয়ে গেল। আমরা ওই ডাক্তারকে ছেড়ে দিলাম, সে গোচারণে বাড়ি ফিরে গেল।

প্রায় মাসখানেক পর আমরা খবর পেলাম, সূর্য গোচারণের সেই গ্রাম থেকে পালিয়ে আরও ভেতর দিকে প্রায় সুন্দরবনের কাছাকাছি একটা অত্যন্ত গ্রামে চলে গিয়েছে। সেখানে সে ওই গ্রামের মানুষের সাথে মিশে এস.ইউ.সি.আই পার্টি করছে।

চালাক ছেলে, যেখানে যেমন, তেমনভাবে ঠিক মানিয়ে গ্রেফতার এড়িয়ে আত্মগোপন করে আছে। একসময় করত সি.পি.আই(এম)। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে সে ভোল পাল্টে ফেলেছে। বাড়ির ঐতিহ্য এবং নিজের পড়াশুনোর গুণে সে নিজের পার্টির নেতাদের খুবই কাছের লোক হয়ে গিয়েছিল। এমন কি একসময় সে পার্টির এক নেতার সাথে মিলে ভবানীপুর অঞ্চলে ওষুধের দোকান দিয়েছিল। ওই গ্রামে গিয়ে এস.ইউ.সি.আই পার্টি করতে তার কোনও অসুবিধাই হয়নি। তার ওপর ওই প্রত্যন্ত গ্রামে তার মত শিক্ষিত লোক আর কেউ ছিল না। ফলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে সেখানকার এস.ইউ.সি.আইয়ের নেতা হয়ে গেল। এস.ইউ.সি.আইয়ের সাথে সি.পি.আই (এম)-এর মাঝেমাঝে ঝামেলা হত ওখানে বিভিন্ন কারণে। এস.ইউ.সি. আইয়ের অঞ্চলে ভাল সংগঠন ছিল। সি.পি.আই (এম) চাইত, ওদের সংগঠন ভেঙে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে।

তাছাড়া জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ, খাস সম্পত্তির ওপর ফসল কাটার সময় ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে তো সংঘর্ষ চলতই। সূর্য তার নতুন পার্টির ওই অঞ্চলের কর্মীদের বোঝাল, এইভাবে লড়াই করে পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, অন্য লড়াই করতে হবে, আধুনিক অস্ত্র কিনতে হবে। সবাই যদি রাজি হয় তবে সূর্য সেই অস্ত্র কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে আসতে পারে, তার এমন যোগাযোগ আছে। সূর্যের কথায় সেখানকার এস.ইউ.সি.আই পার্টির লোকেরা রাজি হতে, সূর্য লুকিয়ে কলকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে এল এক নামকরা সি.পি.আই (এম) নেতার ছেলের কাছে। সেই ছেলে পার্টি করত। কিন্তু তার চলনবলন ছিল জঙ্গী ধরনের। সে তার পূর্বপরিচিত ছিল। সেই নেতার ছেলের সাথে সূর্য অস্ত্র কেনার আলোচনা করল।

সে সূর্যর সব কথা শুনে, তাকে তিনদিন পরে আবার তার কাছে আসতে বলল। সূর্য তিনদিন পর এলে তাকে সে বলল, রিভলবার পাওয়া যাবে, সাথে দশ রাউন্ড করে গুলি। দুটো কিনতে গেলে ১০ হাজার টাকা দিতে হবে, সূর্য যেন সেই টাকার আগে বন্দোবস্ত করে।

সূর্য তার কথা শুনে গ্রামে ফিরে গেল এবং স্থানীয় এস.ইউ.সি.আই কর্মীদের টাকার কথা বলল। তারা বহু কষ্টে চাঁদা তুলে সেই টাকা যোগাড় করতে লাগল। ঠিক সময় মত সূর্যের হাতে তারা টাকা তুলে দিলে, সূর্য এসে ছেলেটার সাথে দেখা করে বলল, টাকা সে যোগাড় করে ফেলেছে। যেন দুটো রিভলবার ঠিক রাখে, সে এসে নিয়ে যাবে।

টাকাটা সূর্য সেই ছেলেটাকে দিয়ে দিল। সূর্য তার দেওয়া তারিখ অনুযায়ী বেলগাছিয়ায় সেই ছেলেটার কাছে এল রিভলবার নিতে। সেই ছেলেটা আমাদের আগেই সব কিছু জানিয়ে দিয়েছিল।

সে আমাদের এক অফিসারের সোর্স ছিল। সে বলে রেখেছিল কখন সূর্য তার কাছে, তার বাড়িতে রিভলভার নিতে আসবে। সেদিন দুপুরের আগে থেকেই আমাদের লোকেরা সেই নেতার বাড়ির এলাকায় সাধারণ পোশাক পরে ঘিরে রেখে দিয়েছিল।

সূর্য এল। সূর্যর ফটো সবাই দেখে রেখেছিল, তাই সূর্য আসতেই প্রত্যেকে তাকে অনায়াসে চিনতে পারল। সূর্য সেই নেতার বাড়িতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় আমাদের লোকেরা তাকে ঘিরে ধরে গ্রেফতার করে ফেলল। না, এবার আর সূর্য ফস্কে গেল না বা আর কোনও ভুল সূর্যকেও আমরা ধরলাম না।

সূর্য লালবাজারে এসে আমাদের কাছে তার ডাকাতির কথা অস্বীকার করার কোনও সুযোগই পেল না। আমরা আদালতে চার্জশিট দিলাম, মামলা চলল, আমাদের অফিসার দুলাল চক্রবর্তী তদন্ত ভালই করেছিল।

সাজা হয়ে গেল সূর্যের। গোপাল সাউকে আমরা ধরতে পারিনি। শুনেছি সে বিহারে কোথায় আত্মগোপন করে আছে। ধরতে পারলে হয়ত তার থেকে অন্য কোনও ডাকাতির কথা জানতে পারতাম।

জেলের ভেতর থেকে সূর্য আমাকে চিঠি দিত, জেলখানার পরিবেশ আর অন্যান্য অবস্থা জানিয়ে।

জেল থেকে তপন আর দেবু আগে ছাড়া পেয়ে গেল। কারণ ওদের সাজা কম হয়েছিল। ছাড়া পেয়ে ওরা নিজেদের বাড়ি ফিরে গেল। সূর্য বেলঘরিয়ায়, তিল দেবু বিরাটিতে আর তপন রাজচন্দ্রপুরে। তার বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ খবর পেলাম তপন রাজচন্দ্রপুরের কাছে অজানা আততায়ীর হাতে খুন হয়ে গেছে। জানি না তপনের খুনীরা ধরা পড়েছিল কিনা বা ধরা পড়লে তাদের সাজা হয়েছিল কিনা।

জানা না থাকলে কি করা যায়? জানতে পারলে তার প্রতিকার করার জন্য এগিয়ে যাওয়া যায়।

প্রিন্স

তখন নকশাল আন্দোলনের সময়। সে সময় অনেক পেশাদার অপরাধী আমাদের নকশাল আন্দোলনের মোকাবিলায় বেশি ব্যস্ত থাকার সুযোগটা নিয়েছিল। অনেক কুকীর্তি অবাধে বহু দিন ধরে চালিয়ে গেছে তারা।

দমদম এলাকার এক ওয়াগন ব্রেকারের এমন কুকীর্তির কথা আমার এক সোর্সের মাধ্যমে প্রথম জেনেছিলাম।

সে আবার ওয়াগনের মালপত্র অদ্ভুতভাবে পাচার করত। বিশেষভাবে বানানো লোহার এক যন্ত্র দিয়ে মালবোঝাই ওয়াগন তলায় ফুটো করে নিচে রাখা নিজেদের বস্তা ভর্তি করে নিত। ওদের অপারেশনের জায়গা ছিল ঘেঁষের মাঠের পাশে। সেখানে ওয়াগন দাঁড়ালেই রক্ষীরা রাতের অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে সিগন্যাল দিত। তখন তারা সেখানে যেত। রক্ষীরাই জানিয়ে দিত কোন ওয়াগনে কি কি মাল আছে। যাতে দামী মাল পাওয়া যায় তাই এই ব্যবস্থা।

আবার রক্ষীদের সহায়তায় ওয়াগনের সিল ভেঙেও জিনিসপত্র সরিয়ে ওরা আবার নতুন করে ওয়াগন সিল করে দিত। এমনভাবে করত যাতে বোঝাই যেত না ওয়াগন ভাঙা হয়েছে। রক্ষীদের সাথে দর কষাকষি করেও ওয়াগনের মাল নিজের ডেরায় তুলে বিক্রি করে সেই টাকার হিস্যা পার্টনারদের দিত।

সেই ছেলেটার বয়স বেশি ছিল না। দেখতে সুন্দর, কিন্তু দমদমের শেঠবাগান, শেঠ কলোনী, লালগড় অঞ্চলে একচ্ছত্র “দাদা” হয়ে গিয়েছিল। এলাকায় সে “প্রিন্স” নামে খ্যাত ছিল।

তাকে আবার মদত দিত অঞ্চলের এক ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা। আর সে যে অঞ্চলে থাকত, সেখানে ঢোকার মুখেই নকশাল আন্দোলনের মোকাবিলার জন্য একটা সি.আর.পি. ক্যাম্প বসান হয়েছিল। সে সেই ক্যাম্পের সিপাইদের হাত করে নিয়েছিল। তাদের সে প্রতি সন্ধেবেলায় খানাপিনার জন্য ভেট পাঠাত। ফলে তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলা বা প্রতিরোধ গড়ার সাহস দেখাতে পারত না।

এইসব কাজ করতে গেলে স্থানীয় পুলিশকে হাতে রাখতেই হয়। সেই কাজটা সে ভালভাবেই করেছিল। তার বিরুদ্ধে তারা কোন ব্যবস্থাই নিত না।

ওই এলাকা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। তবু টিপ্‌স যখন পাওয়া গেছে তখন সোর্সের মাধ্যমে আস্তে আস্তে তার সব খবর সংগ্রহ করতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে সে অনেকগুলো খুন করে ফেলেছে। সে ছিল প্রিন্স। হ্যাঁ, তার আচার আচরণ সামন্তযুগের প্রিন্সদের মতই সে করে তুলেছিল। কোন প্রতিবাদ বা তার কথার অমান্যতা সে সহ্য করতে পারত না। আর তার দরবারে তাকে অমান্য করার একটা অঘোষিত শাস্তি ছিল, তা হচ্ছে—মৃত্যু। খোকা নামে একটা ছেলে তার দলে ছিল। সে বখরা নিয়ে একদিন প্রতিবাদ করল। তাকে দুপুরবেলা লীলা সিনেমা হলের কাছে তুলে নিয়ে এসে খুন করে ফেলে দিল। কিন্তু প্রিন্সের বিরুদ্ধে কেউ কোন আওয়াজ তুলল না।

রতন নামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের এক কনস্টেবল ব্যারাকপুরের লাটবাগানে পুলিশের আর্মারির এক রক্ষী হিসাবে পোস্টেড ছিল। সে সেই প্রিন্সকে বুলেট যোগান দিত।

একবার রতনের সঙ্গে প্রিন্সের টাকাপয়সা নিয়ে গণ্ডগোল বাধল। প্রিন্স রতনকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এল। রতন আর কোনদিন বাড়ি ফিরল না। প্রিন্স তাকে তার ঔদ্ধত্যের সাজা দিয়ে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিল।

যশোহর রোডের ওপর একদিন ওর দলের লোকেরা একটা লরি লুঠ করল। পাওয়া গেল প্রচুর কম্বল। আর কম্বলের ভেতর থেকে ওদেরই অবাক করে বের হল লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি টাকা।

টাকার বেশিটা নিয়ে নেয় গোবিন্দ আর লক্ষ্মী তালুকদার। সে কথাটা প্রিন্সের দলের এক সদস্য অজিত সাহা বলে দিল তাকে। কদিন পর লক্ষ্মী তালুকদারের লাশ গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গেল দমদমের বাগজালা খালে।

এইভাবে সে চালিয়ে যাচ্ছিল তার সাম্রাজ্য। তার অঞ্চলে সে তার দলবল নিয়ে খোলাখুলি কাঁধে রাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। কে কি বলবে? বললেই তো তাকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

যখন আমার কাছে গোপনে খবর আসে, তার আগে কতজনকে যে প্রিন্স খুন করেছে তার হিসাব পাওয়া যায়নি।

লীলা সিনেমা হল ছিল তার অফিস ঘর। আর চাষীর মাঠ ছিল তার খেলার মাঠ। পেশার জায়গা হচ্ছে রেল লাইন।

ঠিক করলাম, প্রথমে প্রিন্সকে চিনতে হবে। কি করা যায়? একদিন ম্যাটিনি শোতে আমি ও আমার এক সোর্স দুটো টিকিট কেটে আলাদা আলাদা ভাবে লীলা হলে সিনেমা দেখার ভান করে ঢুকে পড়লাম।

সোর্স আমাকে প্রিন্সের চেহারার বর্ণনা দিয়েই রেখেছিল। আমি হলে ঢুকে এদিক ওদিক এক চক্কর ঘুরে নিলাম। না, তেমন কোনও চেহারা আমার নজরে এল না।

বাধ্য হয়ে হলে ঢুকে সিনেমা দেখতে শুরু করলাম। মিনিট দশেক পর আমার সোর্স ছেলেটা আমার পাশের সিটে এসে বলল, “প্রিন্স নেই।” হল থেকে আবার আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়ে এলাম দুজনেই। যাতে সোর্স সব সময় সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকে। সোর্স এসে জানাল, প্রিন্স সওদা করতে বড়বাজার গেছে।

বড়বাজার শুনে আমার মনটা নেচে উঠল। বড়বাজারে কার কাছে সে চোরাই মাল বিক্রি করে জানতে হবে। সেখানকার তেমন কতগুলো ক্রেতাকে চিনি।

আমি সেসব জায়গায় খোঁজ করতে শুরু করলাম। না, প্রিন্সের মাল সরাসরি ওরা কেউ কেনে না, “ভায়া” হয়ে আসে। কে সেই “ভায়া”?

কদিন পর খবর পেলাম, ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে প্রিন্সের পেটে রেল পুলিশের গুলি লেগেছে। কোথায় আছে কেউ বলতে পারল না।

ভাবলাম, এই সুযোগ, এবার ওকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু একদিকে নকশাল আন্দোলনের টানাপোড়েন, অন্যদিকে প্রিন্সের খোঁজ নেওয়া, দুইয়ের মাঝে প্রিন্স যে কোথায় পেট থেকে গুলি বার করতে অপারেশন করাল বা তারপর সে কোথায় গেল কিছুই খবর পেলাম না।

প্রিন্স বেশ কিছুদিন আমার সূত্রের কাছ থেকে হাওয়া হয়ে রইল।

মাসখানেক এভাবে চলে যাওয়ার পর আমার সোর্স এসে খবর দিল, প্রিন্স ভালই আছে। পেট থেকে অপারেশন করে গুলি বার করে নিয়েছে। আর জানাল, কোন রক্ষীর গুলি তার লাগেনি। পিস্তল নিয়ে খেলতে গিয়ে নিজের পিস্তল থেকেই গুলি হঠাৎ বের হয়ে ওর পেটে লাগে। কিন্তু নিজে দলের কাছে হিরো সাজার জন্য রক্ষীদের গুলি লেগেছে বলে প্রচার করে দেয়।

সারাদিন মদ খাওয়ার পরিণতিতেই নেশার ঘোরে. অসাবধানে পিস্তলের ট্রিগারে তার আঙুল পড়ে যায়, আর গুলি বেরিয়ে পেটে ঢোকে।

তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ওর দলের দেবু ব্যানার্জি ওরফে গোঁসাই দলের নেতা হতে চাইল। সে তার ইচ্ছার কথা শচীন, দিলীপ, অজিত, মাধবকে জানাল।

দেবু সবাইকে বোঝাল, কেন তারা প্রিন্সের সব কিছু মেনে নেবে?

তারাও তো ওয়াগনের লুঠের মালের ব্যবসা কেমন করে চালাতে হয় তা সবই জানে। তারাই তো নিজেদের হাতে সব কাজ করে। তারাই ওয়াগনের নিচে ফুটো করে চিনি, চাল,

গম ইত্যাদি বস্তা বস্তা ভর্তি করে পিঠে বয়ে নিয়ে আসে। অথচ প্রিন্স পুরো ব্যবসার থেকে বেশি টাকা নিয়ে নেয়। সেই টাকা নিয়ে সে তার খুশিমত যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ায়। . "

মাধব, দিলীপ, গোঁসাই, নরেশরা ওই অঞ্চলের ছেলে ছিল না, তারা বাইরে থেকে আসত। কাজ করত, কাজ শেষে বখরা নিয়ে চলে যেত। দলের বাচ্চু, তিনা, হারাধন, নিতাইরা ছিল প্রিন্সের এলাকার ছেলে। প্রিন্স ফিরে আসতেই তারা তাকে দেবু ব্যানার্জির কথা জানাল।

ক্ষমতার লোভে দল দুভাগ হয়ে গেল। একদিকে পুরনো প্রিন্স সুধীর, অন্যদিকে নতুন অধিপতি দেবু ব্যানার্জি। দেবু সে অঞ্চলেই থাকতে শুরু করল।

কাজকর্মও দুভাগ হয়ে গেল। তাদের এতদিনের পার্টনার রেলরক্ষীরাও সেইরকম ভাবে কাজ শুরু করল। প্রিন্সের এতে আঁতে ঘা লাগল। এতদিন যে নিয়মে সে দল পরিচালনা করেছে, তাতে সেই ছিল দলের সর্বময় কর্তা। সেই-ই ছিল রাজা, সেই-ই মন্ত্রী, সেই-ই বিচারক, সেই-ই জহ্লাদ। তাতে কিনা তার দলের এক নগণ্য সদস্য ভাগ বসিয়েছে! এতে সে প্রচণ্ড রেগে গেল।

প্রিন্স দেখল, পার্টনারদের সে লুঠের মালের যা দাম বলে আসে, দেবু গিয়ে তার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে মাল নিয়ে চলে যায়। দেবুর এই কাজ সে সহ্য করবে কেন?

দেবু রাতে নিজের বাড়িতে থাকত না। সে প্রিন্সকে ভালভাবেই চেনে। প্রিন্সের উত্থান থেকে সে তার সাথে আছে। সুতরাং তার কাজ যে প্রিন্স মেনে নিতে পারবে না তা তার জানা ছিল। তাই সে বাড়ির বাইরে রাত কাটাত।

দেবু শেঠবাগানের পোস্ট অফিসের ছাদে রাতে শুয়ে থাকত। দেবুর রাতের ঠিকানাটা প্রিন্সের কানে পৌঁছতেই প্রিন্স তার শাগরেদ বাচ্চু, তিনা, নিতাই আর পরেশকে নিয়ে একদিন রাতে উঠে পড়ল পোস্ট অফিসের ছাদে। তখন দেবু মদের নেশায় অঘোরে ঘুমচ্ছে। প্রিন্সরা দেবুকে তার বিছানাপত্র, মাদুর সমেত সেখানেই বেঁধে ফেলল। দেবু কোনও বাধাই দিতে পারল না। শীতকালেও মৃত্যুভয়ে সে ছাদে শুয়ে থাকত। কিন্তু তাতেও প্রিন্সের হাত থেকে সে রেহাই পেল না।

দেবু জেগে গিয়ে একবার তার পুরনো দোস্তকে অনুরোধ করল, "প্রিন্স আমায় ছেড়ে দে, তোর কথামত এবার চলব।"

প্রিন্স দেবুর অনুরোধ শুনে মুখে মারল সজোরে এক লাথি। দেবুর কথা বন্ধ হয়ে গেল। প্রিন্সের সঙ্গীরা একটা গামছা দিয়ে দেবুর মুখ পেঁচিয়ে বেঁধে দিল। প্রিন্সের লাথি খেয়ে দেবুর নাক-মুখ দিয়ে তখন রক্ত বের হচ্ছিল। তা গামছায় লেগে মাখামাখি হয়ে গেল।

প্রিন্সরা দেবুকে ওই অবস্থায় পোস্ট অফিসের ছাদ থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। নিয়ে চলল তার খেলার মাঠে। তারপর জায়গা মত নামিয়ে রাখল দেবুকে।

চাষীর মাঠে এসে আগে থেকে রাখা কোদাল, শাবল নিয়ে মাঠের মাঝখানে খুঁড়তে শুরু করল গর্ত। বাচ্চু, তিনা, পরেশরা দ্রুত হাতে নরম মাটি খুঁড়ে সাজিয়ে ফেলল দেবুর কবরস্থান। একটু দূর থেকে দেবু বাঁধা অবস্থায় শুয়ে শুয়ে সবই দেখতে লাগল। কিন্তু তখন তার ছটফট করার অবস্থাও তো নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে কাঁথা-মাদুর দিয়ে বাঁধা।

সে কি তখন ভেবেছিল, এমন কবর সেও কতবার প্রিন্সের হয়ে খুঁড়েছে, অন্য অনেক শত্রুদের জন্য। তাদেরও কি তার মত অবস্থা হয়েছিল? তখন তাদের কান্না সে দেখেছিল কি?

চারদিকে কচুগাছের বন। ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকার ডাক। জোনাকির দেওয়া আলো ছাড়া দেবুর সামনে সব অন্ধকার।

গর্ত খোঁড়া সম্পূর্ণ হলে প্রিন্স ও তার সঙ্গীরা মিলে দেবুকে ওই অবস্থায় নামিয়ে দিল তার জন্য তৈরি কবরে।

জ্যান্ত দেবুর শরীর ধুপ করে একটা আওয়াজ করে পড়ে গেল গর্তে। প্রিন্সরা দ্রুত হাতে মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিল গর্ত। নিচে চিরদিনের জন্য শুয়ে পড়ল তার শত্রু দেবু ব্যানার্জি। মাঠের মাঝখানেই একটা মসজিদ আছে। সেই মসজিদ নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিশ্চিন্ত প্রিন্স জায়গা মত রেখে দিল কোদাল শাবল। সে তার দলের অন্য ছেলেদের দেখাল যে, তার দল ভেঙে নতুন দল গড়ার যে স্বপ্ন দেখবে তার পরিণতিও দেবুর মতই হবে। তারও স্থান হবে সজ্ঞানে, কবরে। দেবুকে খুন করে, প্রিন্স রটিয়ে দিল দেবু পালিয়ে গেছে। কেউ কোথাও তাকে পাচ্ছে না।

খবর গেল রেল লাইনে, তার পার্টনারদের কাছে। তারাও দেখল, সত্যিই দেবুর কোনও খোঁজ নেই। লুঠের মালের দাম প্রিন্সই ঠিক করতে লাগল।

দেবু হারিয়ে যাওয়ার দিন দুই পর দেবুর স্ত্রী পদ্মা বাড়িতে আর দেবুর জন্য অপেক্ষা করতে না পেরে প্রিন্সের কাছেই দেবুর খোঁজ করতে গেল।

প্রিন্স দেবুর স্ত্রীকে পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তাকে বলল, দেবুকে সে এক জায়গায় পাঠিয়েছে। একটু পরেই আসবে। তাকে লালগড়ের হরি শীলের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল। সেই বাড়িতে দেবুর স্ত্রীকে একটা ঘরে প্রিন্স আটকে দিল। পাহারাদারীতে বহাল হল ওই বাড়ির লোকেরা।

সেখানে প্রিন্স আর তার শাগরেদ পাঁচ ছ'জন মিলে পদ্মার ওপর শুরু করল পালা করে দৈহিক অত্যাচার, দেবুর কাছে তাকে পাঠিয়ে দেওয়ার মাশুল হিসাবে।

লালগড়ের সেই বাড়ি থেকে পদ্মার কান্না কেউ শুনতে পেলেও প্রিন্সের ওপর কথা বলার সাহস দেখাতে পারল না। এমন কি সেই বাড়ির লোকেরাও ছিল প্রিন্সের পদানত প্রজা।

পদ্মার ওপর এইভাবে চলল ক্রমাগত অত্যাচার। পদ্মার শরীর নিংড়ে নিংড়ে তিন চারদিনেই ছিবড়ে বানিয়ে দিল। তার আর তখন নড়বার শক্তি নেই

প্রিন্সরা বাইরের কাজ শেষ করেই লালগড়ের সেই বাড়িতে এসে প্রচণ্ড মদ্যপান করে ঝাঁপিয়ে পড়ত পদ্মার ওপর। পদ্মার প্রতিরোধের শক্তি কোথায়? সে তখন যেন মরতে পারলেই বাঁচে।

চারদিন পর গভীর অন্ধকার রাতে প্রিন্সরা পদ্মাকে নিয়ে চলল সেই চাষীর মাঠে। যেখানে কদিন আগে রেখে এসেছে তার স্বামীকে। ওরা দেবুর কবরস্থানটাই দ্বিতীয়বার খুঁড়ে ফেলল। পদ্মাকে হাতমুখ বেঁধে বসিয়ে রেখেছে মাঠে। পদ্মা দেখছে ওরা মাটি খুঁড়ছে, কিছু একটা করার জন্য।

একটু পরে তুলে আনল দেবুর পচা গলা লাশ। তারপর সেই লাশের সাথে পদ্মাকে বেঁধে দিল ইলেকট্রিক তার দিয়ে জড়িয়ে। দয়া করে প্রিন্স পদ্মাকে জুড়ে দিল তার স্বামীর সাথে। নামিয়ে দিল কবরে।

দুজনের দেহ নামিয়ে ঝপঝপ করে ফেলতে লাগল আলগা মাটি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভর্তি হয়ে গেল গর্ত। প্রিন্সের মুখে ফুটে উঠল হাসি। সে মদের বোতল খুলে মদ ঢালতে লাগল গলায়।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আলমবাজারের সি.পি.আই (এম) পার্টির এক ছোট নেতা, যে আমাদের এক দক্ষ অফিসার প্রদ্যুৎ দাসের সোর্স ছিল, সে লালবাজারে এসে তাকে প্রিন্সের কথা জানাল।

তার বর্ণনায় আমরা স্তম্ভিত। স্থানীয় পুলিশ যখন গ্রেফতার করে তার তাণ্ডব বন্ধ করছে না, তখন আমরাই এগিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা নেব ঠিক করলাম।

আমরা যখন তাকে ধরবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, ওই অঞ্চলে আমাদের জাল বিস্তার করে

প্রিন্স কোথায় কখন যায়, তার সঙ্গীরা কে কে ওর সাথে সবসময় থাকে এই সব খবরাখবর নিচ্ছি, ওর গতিবিধিকে আমাদের জালে ফাঁসিয়ে ওকে তুলে নিতে চাইছি, এমন সময় একদিন এলাকার সমস্ত মানুষ ওর ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওকে আর ওর দলের ছেলেদের তাড়া করল।

সে তখন লালগড়ে ছিল। ওই হরি শীলের বাড়িতে। ওই রকম মানুষের ঢল দেখে সে পালাল। মানুষের হাতে ধরা পড়ল পরেশ। ক্ষিপ্ত জনতা হরি শীলের বাড়ি তছনছ করে দিল।

এইসব ঘটনা যখন দ্রুতগতিতে ঘটছে, তখন আমাদের কাছে খবর এল। আমরা ছুটলাম।

গিয়ে দেখি জনতা স্থানীয় থানার লোকজনকে তাড়া করছে। তারা এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল, এই তাদের বিরুদ্ধে জনতার অভিযোগ।

আমরা গিয়ে সেটা সামাল দিই। তারপর শুরু করি চাষীর মাঠে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে লাশ খোঁজা।

মাঠ নামে পরিচিত হলেও আসলে সেটা ছিল নিচু জমি। আর তা বড় বড় কচুগাছ আর বিছুটি গাছে ভরা। মাঠের মাঝখানটায় মসজিদের সামনে কিছুটা জমি ফাঁকা। আমরা কচুগাছ টান দিয়ে তুলতেই ঝুরঝুর করে পড়তে লাগল আলগা মাটি।

পরেশের কথা মত শুরু হল অনুসন্ধান। সে দেখাতে লাগল, কোথায় কোথায় প্রিন্স খুন করে পুঁতে দিয়েছে। আমাদের লোকেরা সেই অনুযায়ী গর্ত খুঁড়ে একটার পর একটা কঙ্কাল তুলতে লাগল।

মাঠের চারপাশে তখন মানুষের ভিড়। একটা করে কঙ্কাল উঠলে তারা সেই কঙ্কাল সম্বন্ধে আলোচনা করছে, সেই সব কথা কানে আসছে। কেউ বলছে, এটা অমুকের কঙ্কাল, কেউ বলছে না, তার নয়, সে আরও লম্বা ছিল, এটা তমুকের। কেউ বলছে এটা ওই দুজনের একজনেরও নয়, এটা অমুকের, যাকে বছর দেড়েক ধরে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রিন্সের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গেল একটা জাপানী হাইড্রোলিক কাঁচি যা দিয়ে হাইভোল্টেজ ইলেকট্রিক তার কাটা যায়।

পরেশের কাছ থেকে জানতে পারলাম, যখন "ওয়াগনের কাজ" তাদের কম হত, তখন তারা রেল লাইনের ওপরের তার ও রাস্তার ইলেকট্রিক তামার তার কাটত, সেগুলো প্রিন্সের নির্দেশে বিক্রি করে এসে "অসময়ের দিনগুলো" চালাত। তাছাড়া তারা অঞ্চলের বিভিন্ন বাড়িতে ডাকাতিও করত।

পরদিন সকালেই আমরা লোকজন নিয়ে চাষীর মাঠে হাজির। কচুগাছ সরিয়ে সরিয়ে পরেশ দেখাতে লাগল কোথায় কোথায় গর্ত করতে হবে। শুরু হল আবার গর্ত খোঁড়া। সি.আই.ডি.র অফিসাররাও হাজির। হাজির আমাদের ফটোগ্রাফাররা।

লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফুট আর ছ'ফুট সাত ফুট গভীর গর্ত খুঁড়তে বেশি সময় লাগছে না।

প্রথমেই উঠল একটা পুরুষের কঙ্কাল, বাঁদিকের হাতের হাড়ে তখনও রয়েছে শিখ পুরুষের মত পেতলের বালা।

ফটোগ্রাফাররা ফটাফট ফটো তুলে রাখল। পরেশ একটা নাম বলল, তাতে জানা গেল যার কঙ্কাল, সেও ছিল পুরনো এক ওয়াগন ব্রেকার। প্রিন্সের সাথে ঝগড়ার পরিণতিতে মাটির তলায় শুয়ে পড়েছে চাষীর মাঠে।

সকাল থেকেই হাজার হাজার কৌতূহলী মানুষের ঢল নেমেছে চাষীর মাঠে, সবাই প্রিন্স আর তার সঙ্গীসাথীদের কীর্তি দেখতে এসেছে। স্থানীয় থানার সিপাইরা ঘিরে রেখেছে মাঠ। যাতে মানুষজন সামনে এসে আমাদের কাজের ব্যাঘাত না ঘটায়।

একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম, কয়েকজন ফেরিওয়ালা, চায়ের দোকানদার ভিড়

দেখে অস্থায়ী দোকান বসিয়ে দিয়েছে, দর্শকরাও তাদের থেকে কিনে এটা ওটা খাচ্ছে আর ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন মেলা বসেছে। একটা করে কঙ্কাল উঠছে আর সবাই হৈ হৈ করে উঠছে।

মানুষের চরিত্র বোঝা দায়, আগের দিন যারা সাহস নিয়ে ক্ষোভে ফেটে প্রিন্সকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল, তারাই পরদিন মজা দেখতে ভিড় জমিয়েছে।

পরেশের নির্দেশ মত এবার যে গর্তটা খোঁড়া হচ্ছিল, তার চার-পাঁচ ফুট তলাতেই কোদাল আটকে গেল একটা গাঢ় নীল রঙের কার্ডিগানে। কোদাল সরিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ছোট শাবল দিয়ে সরান হল মাটি।

পদ্মা। গর্ত আরও চওড়া করতে হল। ইলেকট্রিক তার দিয়ে বাঁধা রয়েছে নিচে আরও একটা লাশের সাথে।

পরেশ জানাল, ওই পচা গলা দেহটা হচ্ছে দেবু ব্যানার্জির। দুটো লাশ একসঙ্গে তুলতেই দুর্গন্ধে মাঠের পরিবেশ অসহ্য হয়ে উঠল।

ফটো তুলেই লাশ দুটো পাঠিয়ে দেওয়া হল থানায়, সেখান থেকে যাবে পোস্ট মর্টেমে।

পদ্মা আর দেবু ব্যানার্জির জোড়া লাশ দেখে জনতা আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দেবুর ডান হাতের মধ্যমায় একটা আংটি ছিল। তাতে খোদাই করা ছিল ইংরেজিতে "ডি"। তা দেখে চিহ্নিত করা হল ওই পচা লাশটা দেবুর। জনতা প্রিন্সকে না পেয়ে পরেশের দিকেই ধেয়ে আসতে চাইল প্রতিশোধের ইচ্ছায়।

অবস্থা আয়ত্তে আনতে আমাদের হিমসিম খেতে হল। পরেশ ভয়ে কুঁকড়ে আছে আর বলে যাচ্ছে, "আমি মারিনি, আমি মারিনি।"

পদ্মার বাঁ হাতের অনামিকায় রয়েছে দেখলাম একটা মুক্তার আংটি। হাতে শাঁখা আর পলা। স্বামীর সঙ্গে ঠিক সহমরণে নয়, সহকবরে সজ্ঞানে স্থান হয়েছে তার চাষীর মাঠের কচুবনে। স্বামীর কাছে যাওয়ার পথটা তার মসৃণ তো হয়ই নি, বরং সে প্রিন্স ও তার শাগরেদদের হাতে চারদিন ধরে ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা, চরম অপমানিতা হয়ে বীভৎস ভাবে স্বামীর কাছে এসে পৌঁছেছে। লালগড়ের যে বাড়িতে তাকে প্রিন্সরা নরক যন্ত্রণা দিয়েছিল, সেই বাড়ি জনতার রোষে আগেই তছনছ হয়ে গেছে।

প্রিন্সের টাকার লোভের সাথে আমাদেরই একাংশের লোভ যোগ হয়ে ছিল বলে এ রকম ঘটনা দিনের পর দিন সম্ভব হয়েছে। তাই জনতার রাগ তাদেরও ওপর আছড়ে পড়ছে।

হ্যাঁ, আমাদের পুলিশের মধ্যেও এই লোভের শিকার অনেকেই হয়।

স্থানীয় থানার কেউ কেউ এই অতিরিক্ত লোভের শিকার হয়ে পড়েছিল বলেই প্রিন্সের রাজত্ব রমরম করে চলেছিল। তাই যখন এক একটা করে কঙ্কাল ও পচাগলা লাশ উঠছে, তখন জনতার রাগ গিয়ে পড়ছে প্রিন্সের ওপর ছাড়াও স্থানীয় থানার লোকের ওপর।

প্রতি কবরের ওপর প্রিন্স লাগিয়ে দিয়েছিল কচু গাছ। সেই গাছ পরিষ্কার করে গর্ত করে করে মোট আটটা মানুষের কঙ্কাল ও লাশ উঠল।

তিনদিন ধরে আমরা চাষীর মাঠ চষে ফিরে এলাম লালবাজার। সি.আই.ডি.-র অফিসাররা ফিরে গেলেন তাঁদের দফতরে। কঙ্কালগুলো পরীক্ষার জন্য চলে গেল ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে।

প্রিন্সকে ধরতেই হবে। তখন আমাদের দফতরে অন্য কাজ কমিয়ে এটাই শীর্ষে চলে এল। সি.আই.ডি. অফিসাররাও খোঁজ খবর শুরু করেছেন, কোথায় প্রিন্স?

কলকাতা, উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলির সব সোর্সকে প্রিন্সের বর্ণনা জানিয়ে দেওয়া হল। প্রিন্সের খোঁজের জন্য তারাও নেমে পড়ল কাজে।

প্রিন্স যেদিন পালাল, তার তিনদিন পর খোঁজ পেলাম, তার দলের গোলগাল, অল্পবয়সী

হারাধন আমহার্স্ট স্ট্রিট অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে। নজর রাখতে শুরু করলাম। কোথায় থাকে সে? তবে কি প্রিন্সও আছে তার সাথে? যে খবর দিল, তার সাথে আমি আমাদের দুজন নজরদার ও লাগালাম। হারাধনের সমস্ত গতিবিধির খবর রাখতে যাতে সুবিধা হয়।

সারাদিন ওরা ওই অঞ্চল চষে ফেলল, কিন্তু পেল না। কোথায় সে সারাদিন?

নজরদার পরদিন সকালে দেখতে পেল তাকে। খবর দিল কোথায় আছে, আমরা তাকে সকাল এগারটা নাগাদ মারোয়াড়ি হাসপাতালের উল্টোদিকে এক বাড়ির পাশের রকে আড্ডা মারার সময় ধরে নিয়ে এলাম। তাকে আর সুযোগ দিলাম না পালিয়ে বেড়াবার। একসঙ্গে প্রিন্সকে ধরবার ইচ্ছায় সেও যদি হাত ছাড়া হয়ে যায়, তখন আমাদের হাত কামড়াতে হবে। তাই প্রথম সুযোগেই গ্রেফতার করলাম। তার থেকে আমরা প্রিন্সের কার্যকলাপের আরও খবর পেলাম।

কিন্তু প্রিন্স কোথায়, সেই খবর সে দিতে পারল না। আমরাও খাওয়া ঘুম বন্ধ করে হন্যে হয়ে তার খোঁজ করতে লাগলাম।

হারাধনকে নিয়ে প্রিন্সের খোঁজ চারদিকে শুরু করলাম। সে যে সব জায়গায় গোপন আস্তানা নিত, হারাধন আমাদের সেই সব জায়গা দেখাল। গেলাম উত্তর চব্বিশ পরগনার বহু জায়গায়, ডানলপ থেকে বনগাঁ পর্যন্ত। হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে, কোন্নগর, রিষড়া প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলেও হানা দিলাম।

কলকাতারও অনেক ডেরায় হারাধন নিয়ে গেল, প্রিন্সের পরিচিত রেড লাইট এলাকায়, মদের ঠেকে, যেখানে নিয়মিত তার যাতায়াত ছিল। কিন্তু. কোথাও তাকে পেলাম না। ব্যর্থ হলাম। যদিও সব জায়গায় নজরদার রেখে দিলাম, যাতে ওকে দেখতে পেলেই আমরা খবর পাই।

তখন আলিপুর কোর্টে অনন্তবাবুদের চতুর্থ ট্রাইব্যুনাল মামলা চলছিল। কোর্টে ছিলেন তপেনদা, মনাদা ও রাজকুমার। রাজকুমার হঠাৎ দেখল, কোর্টঘর থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় মনাদা একটা লোকের সাথে ফুসফুস করে কথা বলছেন।

মিনিট দশেক ওই ভাবে কথা বলার পর লোকটা চলে গেল। রাজকুমার মনাদার সামনে এগিয়ে যেতেই মনাদা বললেন, “কিছু বুঝলা?” রাজকুমার নিচু স্বরে চটপট উত্তর দিল, “বুঝেছি, ওই খুনীটার খোঁজ পেয়েছেন তো?” মনাদা একটা সিগারেট ধরিয়ে রাজকুমারকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, “কি কইরা বুঝলা?” রাজকুমার বলল, “আপনার মুখের খুশি খুশি ভাব দেখে স্যার।”

মনাদা সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, “হ, তুমি ঠিকই ধরছো। তা যাইবা না কি তারে ধরতে, প্লেনে কইরা যাইতে হইবো।” অন্য লোক আসছে দেখে রাজকুমার কথা থামিয়ে দিল।

সেদিন কোর্ট শেষ হওয়ার পর তারা লালবাজারে ফিরে এলে মনাদার কাছে জানা গেল, প্রিন্স আছে গুয়াহাটিতে। ঠিক হল গুয়াহাটিতে প্রিন্সকে ধরতে যাবে অফিসার দীপক রায় ও সুকমল।

পরদিন ভোরের বিমান ধরে ওরা যখন গুয়াহাটি বিমানবন্দরে পৌঁছল, তখন প্রায় দশটা বাজে। দুজনে ছুটল যে কোন একটা হোটেলের খোঁজে। হোটেলে কোনমতে জিনিসপত্র রেখে দুজনে বেরিয়ে গেল দুদিকে।

মনাদার কাছে খবর এসেছিল, প্রিন্স প্রতিদিন শহরের একটা জায়গায় এক বিশেষ চায়ের দোকানে সকাল এগারটা নাগাদ চা খেতে আসে। হোটেল থেকে যখন তারা বের হচ্ছে তখনই এগারটা বাজে, তবু তারা চায়ের দোকানটা আর খবরের সত্যাসত্য যাচাই করতে বেরিয়ে পড়ল।

সুকমল যখন নির্দিষ্ট চায়ের দোকানের সামনে গেল, দেখল, দীপক দোকানের ভেতর একটা টেবিলে বসে চা খাচ্ছে। সুকমলও অন্য একটা টেবিলে বসে চায়ের অর্ডার দিল।

তখন প্রায় বারোটা বাজে। দীপক দাম মিটিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। একটু পর সুকমলও। প্রিন্স সেখানে এলেও সম্ভবত আগেই চলে গেছে।

দোকান থেকে বেশ খানিকটা দূরে তারা দুজনে এক জায়গায় রাস্তার ওপরেই মিলল। ঠিক করল, যে বাড়িতে প্রিন্স আত্মগোপন করেছে বলে মনাদা বলে দিয়েছে, সেখানে সেদিন রাতেই তারা স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় হানা দেবে।

সেই অনুযায়ী তারা স্থানীয় থানায় গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে দারোগাবাবুকে বলল, তারা কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা এক নকশাল নেতাকে ধরতে এসেছে। প্রিন্সকে থানায় নকশাল নেতা বানানোটা একটা কৌশল। প্রথমত, স্থানীয় পুলিশ তাহলে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। দ্বিতীয়ত, খুনীর কাছে যদি কোনরকমে কলকাতা পুলিশের গুয়াহাটিতে পৌঁছনর খবরও যায়, তবু সে জানবে, তাকে নয়, তারা এসেছে নকশাল ধরতে। সে নিশ্চিন্ত মনে নিজের আস্তানাতেই থাকবে।

ঠিক হল, দীপক আর সুকমল রাত বারোটায় থানায় যাবে, সেখান থেকে ফোর্স নিয়ে সেই বাড়িতে হানা দেবে, যেখানে প্রিন্স আছে। তারা কিন্তু থানায় সেই বাড়ির ঠিকানা জানাল না।

থানা থেকে বেরিয়ে তারা রিকসা করে গুয়াহাটি শহর কিছুটা ঘুরে হোটেলে ফিরে এল। অপেক্ষা করতে লাগল রাত বারোটার। সময় হলে তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে ঠিক বারোটায় থানায় এসে দেখল বিশাল বাহিনী নিয়ে অফিসাররা "নকশাল নেতা" ধরতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ওদের যুদ্ধের মত সাজগোজ দেখে দীপকদের হাসি পেল।

রাত ঠিক সাড়ে বারোটায় বেশ কয়েকটা জিপ আর ভ্যান ছুটল প্রিন্সকে ধরতে। দীপক স্থানীয় পুলিশের এক অফিসারকে তখন জানাল ঠিকানাটা। সেই অফিসারের নির্দেশে গাড়িগুলো চলতে লাগল। মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে পৌঁছে গেল তারা নির্দিষ্ট বাড়ির কাছে। অফিসারের নির্দেশে বাহিনীর সিপাইরা দ্রুত ঘিরে ফেলল বাড়িটা। সবাই রাইফেল উঁচিয়ে তাক করে রইল।

দীপক আর সুকমল অন্য অফিসারদের নিয়ে বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়ল। এক ভদ্রলোক একটু পরে দরজা খুলে দিতেই দীপকরা লাফ মেরে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতর। বাড়ির কর্তার সঙ্গে স্থানীয় অফিসাররা অসমিয়া ভাষায় কি কথাবার্তা বলছে, দীপকরা সেদিকে পাত্তা না দিয়েই এঘর, সেঘর তল্লাশি করে চলল। একটা ঘরে পেয়ে গেল প্রিন্সকে।

প্রিন্সের চেহারার বর্ণনা তারা জানতই, তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য দীপক একটানে তার গেঞ্জিটা তুলে দেখে নিল পেটের অপারেশনের দাগটা। দীপক প্রিন্সকে বলল, "সুধীর, তোকে জন্ম দিয়েছিল কে রে?" প্রিন্স উত্তরে বলল, "আমার নাম সুধীর নয়।" সুকমল ওর ডান হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, "তোর নাম, তোর বাপের নাম সব লালবাজারে গিয়ে জানতে পারবি, এখন চল। নিজে নিজেই তো নিজের নাম রেখেছিলি প্রিন্স, সেই প্রিন্সের মুকুটটা এবার তোর হাতে ধরিয়ে দেব।"

তারা প্রিন্সকে নিয়ে ফিরে এল থানায়। তাকে হাজতে পুরে দেওয়া হল। থানার অফিসাররা বিশাল বাহিনী দিয়ে পুরো এলাকাটা ঘিরে রাখল, যাতে আসামী না পালিয়ে যেতে পারে। আসলে তারা তো জানে যে যাকে তারা গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে, সে কলকাতার একটা নকশাল নেতা। আর নকশাল মানে তাদের কাছে বিরাট আতঙ্কের ব্যাপার, তাই এত সাবধানতা। ব্যবস্থা দেখে দীপক আর সুকমল হোটেলে ফিরে এল। হোটেলে ফিরে তারা লালবাজারে টেলিফোনে জানিয়ে দিল, মনাদার খবরটা একেবারে পাক্কা, প্রিন্স এখন হাজতে।

পরদিন অসমের সব পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হল, "কলকাতার এক নকশাল নেতা কলকাতার পুলিশের হাতে গুয়াহাটিতে গ্রেফতার।" তা দেখে দীপকদের আর এক চোট হাসি। কোর্টে গিয়ে দীপকরা প্রিন্সকে শিয়ালদহ কোর্টে হাজির করার নির্দেশ পেয়ে গেল।

কিন্তু তারা আর প্রিন্সকে কলকাতায় নিয়ে এল না। তারা তাকে গুয়াহাটির জেলে রেখে চলে গেল শিলং বেড়াতে।

দিন দুই পর এখান থেকে আমাদের অন্য দুই অফিসার প্রিন্সকে আনতে গেলেন গুয়াহাটি। সেখানে আমাদের অফিসারদের কাছে নিজের সব অপরাধ স্বীকার করে একটা অনুরোধ করল সে, "যার কাছেই নিয়ে যান না কেন, প্লেন থেকেও ফেলে দিন, তবু আমায় আপনারা রুণুবাবুর কাছে হাজির করাবেন না।"

তারা জবাবে বলল, "কি ভেবেছিস, আমরা তোকে জামাই আদরে রাখব?"

সুধীর চুপ করে রইল। সেদিনই প্লেনে করে প্রিন্সকে তারা নিয়ে এল লালবাজার। লালবাজারে ওকে যখন জেরা করা হচ্ছে, আমি তখন তার কৃতকর্মের ফটোগুলো একটার পর একটা দেখাতে লাগলাম। যে ফটোগুলো আমরা চাষীর মাঠে তুলেছিলাম।

দেখতে দেখতে একসময় সে চিৎকার করে বলে উঠল, "দেখাবেন না, দেখাবেন না, আমি আর দেখতে পারছি না।" বললাম, "মানুষকে খুন করে পুঁতে ফেলার সময় মনে ছিল না, এখন নিজের কীর্তি দেখতেই ভয় পাচ্ছিস!" ফটো দেখতে দেখতেই সে সব স্বীকার করল। জানাল কোথায় আছে তার রাইফেলগুলো।

পরদিন প্রদ্যুৎদা আমাদের বাহিনী নিয়ে গিয়ে শেঠবাগানের এক পাতকুয়ার নিচ থেকে তুলে নিয়ে এলেন চারটে রাইফেল।

আমরা প্রিন্সকে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দিলাম, তার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য। রাজ্য পুলিশের তরফে সি.আই.ডি.-র এক অফিসার মামলা পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু মামলায় প্রিন্সের সাজা হল না, সে জেল থেকে বেরিয়ে গেল।

জেল থেকে বেরিয়ে সে দমদমে ফিরে গেল না। চলে গেল হিন্দমোটরে। দমদম সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময়ই জেলের ভেতর তার দোস্তি হয় আলমবাজারের মাস্তান হীরার সাথে। সেই দোস্তির সূত্র ধরে বামফ্রন্টের এক প্রাক্তন মন্ত্রীর সহায়তায় সে পেয়ে গেল হিন্দমোটর কারখানা থেকে অ্যাম্বাসাডর গাড়ি বিভিন্ন প্রদেশে পৌঁছে দেওয়ার কাজ।

সে পনের-কুড়িটা গাড়ির ফ্লিটের নেতা হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে পৌঁছনর কাজ করতে লাগল। আবার হিন্দমোটরে সেই প্রাক্তন মন্ত্রীর দলের হয়ে ইউনিয়নের নেতা বনে গেল। সেখানে অন্যান্য পার্টির ইউনিয়নও ছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড রেষারেষি।

একবার সে তার গাড়ির ফ্লিট নিয়ে চলল হায়দারাবাদ। তার আগেই একই জায়গায় অন্য একটা ফ্লিট নিয়ে অনেকটা আগে আগে যাচ্ছিল কংগ্রেস ইউনিয়নের নেতা রঞ্জিত সিং।

অন্ধ্র প্রদেশ এলাকায় প্রিন্স গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে দেখল, রাস্তায় একটা ধাবার ধারে রঞ্জিত সিং গাড়ি লাগিয়ে, জানালার কাঁচ তুলে দিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে ঘুমচ্ছে। রঞ্জিতের সাথে তার ইউনিয়নগত বিরোধ ছিল। সে দেখল, এই সুযোগ, রঞ্জিত সিংকে সরিয়ে ফেলার।

সাথে সাথে সে তার গাড়ি থামাল। সঙ্গী বন্ধু আলমবাজারের ইজাহারকে নিয়ে এগিয়ে গেল রঞ্জিত সিংয়ের গাড়ির দিকে। প্রিন্স হাতুড়ির এক আঘাতে গাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলল। ইজাহার হাত ঢুকিয়ে খুলে দিল দরজার লক। প্রিন্স একটা বড় স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে দিল রঞ্জিতের পেটে। জানালা ভাঙার সাথে সাথে রঞ্জিত জেগে উঠলেও প্রিন্সদের প্রতিরোধ করার কোনও সুযোগ পায়নি।

পেটে স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে দিতে রঞ্জিত চিৎকার করে উঠল। প্রিন্স পেট থেকে সেটা বের করে ঢুকিয়ে দিল গলায়। গল গল করে পড়তে লাগল রক্ত। নতুন গাড়ির সিট রঞ্জিতের রক্তে ভেসে যেতে লাগল। রঞ্জিত পড়ে যেতে চাইল, প্রিন্স মাথার চুল ধরে তাকে বসিয়ে স্ক্রু ড্রাইভারটা এবার ঢুকিয়ে দিল চোখে। রঞ্জিতের চিৎকার করারও ক্ষমতা নেই। প্রিন্স দ্বিতীয় চোখটাও স্ক্রু ড্রাইভারের খোঁচায় বের করে আনল বাইরে। আবার সেটা ঢুকিয়ে দিল গলায়।

প্রিন্স তার গলা থেকে স্ক্রু ড্রাইভার বের করে ঢুকিয়ে দিল বুকে। রঞ্জিত এবার শুয়ে পড়েছে। প্রিন্স তবু স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ক্রমাগত খুঁচিয়েই যেতে লাগল পেটে। পেট থেকে বের করে নিল নাড়িভুঁড়ি। সেখানেই মারা গেল রঞ্জিত।

পেশাদার খুনী প্রিন্স রাজনৈতিক দাদাদের উস্কানিতে হিন্দমোটরে নিজের প্রভাব বাড়ানব জন্য, বিরোধী নেতাকে সরিয়ে ফেলার প্রবল বাসনায় রঞ্জিতকে পেয়ে তার কদর্য জান্তব রূপটা বের করে ফেলল। মদ তো সে খেয়েই থাকে। মদের সাথে রক্তের গন্ধ পেলে সে যেন হয়ে উঠত হিংস্র ক্ষুধার্ত হায়না। আব বহুদিন সে ছিল নির্জলা, রক্তহীন, শুকনো। রঞ্জিতের রক্ত পেয়ে নেচে উঠল তার মন। ক্ষুধার্ত প্রিন্স ক্ষুধা মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রঞ্জিতকে খুন করে প্রিন্স আর ইজাহার তাদের হাতে লাগা রক্ত ধুয়ে পুঁছে এগিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। যেন কিছুই হয়নি।

এ জ্যাকেল ক্যান চেঞ্জ হিজ কালার, বাট ক্যান নট চেঞ্জ হিস নেচার। ধূর্ত শেয়ালরা চালচলন বদলালেও অভ্যাস বদলাতে পারে না। যেখানেই সুযোগ আসে সেখানেই বেরিয়ে পড়ে তার স্বরূপ।

প্রিন্স খুন করে করে ম্যানিয়াক হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর কুকর্মের জন্য শাস্তি না হওয়াতে খুনের অভ্যাসটাও বদলাতে পারে নি।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত এ-জাতীয় রোগগ্রস্ত খুনী দেখা গেছে, তার চেয়ে প্রিন্সেব রোগ কোন অংশে কম ছিল না। হিচকক যদি জানতে পারতেন প্রিন্সের সম্পূর্ণ কাহিনীটা, তবে হয়ত তিনি তা নিয়ে একটা থ্রিলারই বানিয়ে ফেলতেন, যা দুনিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি করত। নৃশংসতার সেই রূপ দেখে মানুষ কেঁপে উঠত।

লালবাজারে আমার কাছে তার কৃতকর্মের ফটোগুলো দেখতে দেখতে যখন চিৎকার করে উঠেছিল, “দেখাবেন না, দেখাবেন না,” তখন সে কিন্তু তার মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য চিৎকার করেনি, চিৎকার করেছিল ভয়ে। পেশাদার অপরাধীরাও তার আগের কাজের ফলের বিকৃত রূপটা পেছন ফিরে দেখতে চায় না। ভয় পায়, ভাবে এই রূপগুলো দেখলে যদি তার মানসিক পরিবর্তন হয়, তবে সে আর পারবে না অপরাধ করতে।

রঞ্জিতকে খুন করে কিন্তু প্রিন্স বাঁচল না। ধরা পড়ল। তারপর আমরা যা পারিনি, সেটাই করে দেখাল অন্ধ্র প্রদেশের পুলিশ। সেই খুনের মামলায় তার ও ইজাহারের যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেল। কম হলেও সাজা পেল প্রিন্স।

যেদিন খবর পেলাম প্রিন্সের সাজা হয়েছে, মনটা খুশিতে ভরে গেল। সেই মন নিয়ে রাতে ফিরে গেলাম লালবাজারে আমার কোয়ার্টারে।

কোয়ার্টারে ঢুকেই শুনছি টেলিফোন বাজছে। তাড়াতাড়ি সেটা তুলে কানে লাগালাম। ওপারে ডি.সি.ডি.ডি. দেবী রায়। বললাম, “স্যার।” তাঁর কথা শোনামাত্রই আমি বললাম, “আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, আপনাকে কাল সকালেই রিপোর্ট দেব।” ফোন নামিয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে “গুড নাইট” জানিয়ে বেরিয়ে এলাম কোয়ার্টার থেকে কলকাতার রাস্তায়, তখন রাত প্রায় বারোটা !